

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ
ମା'ଆକୁଫି
ପାଠୀ

ସଂ ବୀ

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন ষষ্ঠ খণ্ড

[সূরা মারইয়াম, সূরা তোয়া-হা, সূরা আবিয়া, সূরা হজ্জ, সূরা আল-মু'মিনুন, সূরা
আন-নূর, সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-ও'আরা, সূরা আন-নাম্ল, সূরা আল-
কাসাস, সূরা আল-আনকাবুত ও সূরা রাম]

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শকী (র)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তফসীরে যা 'আরেফুল কোরআন (ষষ্ঠ খণ্ড)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪৮

ইফা প্রকাশনা : ৬৯০/৮

ইফা প্রকাশনা : ২৯৭.১২২৭

ISBN : 984-06-0178-4

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৩

নবম সংস্করণ (রাজবন্দ)

মার্চ ২০১২

চৈত্র ১৪১৮

রবিউল সালি ১৪৩৩

মহাপরিচালক

সামীয় মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেলা মোস্তকা কামাল

পরিচালক, প্রকাশন: বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১৮১৫৩৮

প্রচন্দ শিল্পী : জাসিম উল্লিল

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৪১২.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (6th Vol) : Bangla version by Maulana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Phone : 8181538

March 2012

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com

Website: www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk. 412.00; US Dollar : 25.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাঘষ্ঠ আল-কুরআন সর্বশেষ নবী হয়রত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ অনন্য মু'জিয়াপূর্ণ আসমানি কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাঘষ্ঠ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মহান রাবুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জানের সুবিশাল ভাষার এ প্রস্ত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পূর্ণ এমন কোন বিষয় নেই যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত বিশুদ্ধতম ঐশ্বী ঘষ্ঠ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাঘষ্ঠ, ইসলামী জীবন-ব্যবহার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আধিরাতে মহান আল্লাহ রাবুল আলামীনের পূর্ণ সত্ত্বটি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সংযুক্তভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঙ্গনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাফসীর শান্তের উদ্ধৃব ঘটে। তাফসীর শান্তবিদগণ মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহত্তী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, ঘষ্ঠকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাঠিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্যাতিমান করেছে। তাঁর ঘষ্ঠসমূহের মধ্যে 'তাফসীরে যা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ ঘষ্ঠ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনদিত এই তাফসীর প্রস্তুতি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

(চার)

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তাফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হ্যারত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংক্রণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর নথৰ সংক্রণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাকুন আলামীন আমাদের এ প্রয়াস করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আকজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

২০১৩

১০৮

১০৯

১১০

১১১

১১২

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত তাফসীর প্রস্তাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় প্রস্তাবলো হলো ‘তফসীরে মা’আরেফুল কোরআন’। উপমহাদেশের বিদ্ধি ও শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ প্রস্তুত পৰিত্রকে কুরআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) নিজে মাযহাব চতুর্থয়ের অনুসারীগণের কাছে স্বীকৃত মুফতী ছিলেন বিধায় তাঁর বক্তব্যগুলোতে সকল মাযহাবের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ব্যাখ্যাগুলো বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এই প্রস্তুত তাফসীর বিষয়ে ইতোপূর্বে রচিত প্রাচীন প্রস্তাবলীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অংশগতি এবং এ অংশগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পরিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদ্ধিভাবের সাথে পেশ করেছেন। মূল প্রস্তুতি উর্দ্ধ ভাষায় রচিত, প্রস্তুতির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দ্ধ থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

পূর্ববর্তী সংক্রান্তে প্রস্তুতির মুদ্রণে কিছু প্রমাদ ছিল। ইফা প্রেসের প্রিন্টার মাওলানা মোঃ ওসমান গণী (ফারাক) প্রমাদগুলো সংশোধন করেন। এরপরও এত বড় তাফসীর প্রস্তুতি অনিষ্ট্যকৃত কিছু ভুল-ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহজে পাঠকদের দ্যুষিত আকর্ষণ করছি। তাঁদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

প্রস্তুতির ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নবম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃক্ষি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহু তা’আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওঁফীক দিন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা-বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

অনুবাদকের আরয়

রাবুল আলামীনের আসীম অনুগ্রহে 'তাফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর মঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। আলহামদুল্লাহ ! সমগ্র প্রসংশা আল্লাহুর ! তাঁর তওফীকেই অসহায় বাস্তুর পক্ষে বড় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তিনিই সব কাজের নিয়ামক। অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরই তওফীক ভিক্ষা করি।

দরদ ও সালাম হ্যুমে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, একমাত্র যার পথ লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর ঘনজিলে-ঘকসুদে পৌছা সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হ্যুরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হ্যুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উক্তি, সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেঙ্গন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষীগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে।

এ কারণেই উর্দু ভাষায় রচিত এ তফসীর প্রত্যুষি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাকাত্ত্যের একাধিক ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যস্ত করেন। আল্লাহর শোকর যে, আট খণ্ডেই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে।

এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে আমাকে কয়েকজন বিজ্ঞ আলিম সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাম্মদিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ মওলানা আবু আশরাফ ও জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেই অনুদিত পাখুলিপি নিরীক্ষা কার্য সমাধা করেছেন ঢাকা আলীয়া মদ্রাসার হেড মাওলানা প্রখ্যাত আলিম হ্যুরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সূর্য ব্যক্তি আন্তরিক অগ্রহ সহকারে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য ত্বরিত করার জন্য আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রুত মুদ্রণের যোগারে মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহিইয়া নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে ছিলেন। আল্লাহ পাক এদের সবাইকে যোগ্য প্রতিদান দান করবেন। আমীন!

পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াগ্রাহী, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে অবশিষ্ট দুটি খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন।

বিনীত খাদেম
মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক : মাসিক মদ্রাসা, ঢাকা

জ্যামিইউল আউয়াল, ১৪০৩ হিঃ

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মারিয়াম/১১		গোত্রপতি বিভক্তি সামাজিক / ১০২	
দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগতজ্ঞ/ ১৫		সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য / ১০৩	
পয়গঘরগণের সম্পদের উন্নৱাদিকার চলেনা/ ১৫		মুসলমানদের দলে অনেক থেকে / ১০৩	
মৃত্যু কামনার বিধান / ২১		পয়গঘরসূলভ দাওয়াতের একটি / ১০৪	
মৌনতার রোয়া ইসলামী শরীয়তে/ ২১		মূসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের / ১০৭	
পুরুষ ব্যক্তিত শুধু নারী থেকে সত্তান হওয়া/ ২১		আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বতু সৃষ্টি / ১০৭	
সিদ্ধীক কাকে বলে / ৩১		প্রত্যেক মানুষের আশ্বিনে বীর্যের / ১১১	
বড়দেরকে নিস্বিহত করার পক্ষ ও আদব/ ৩১		জাদুর ব্রহ্মপ, প্রকার / ১১৩	
ওয়াদা পূরণ করার ক্ষমতা ও অর্তবা/ ৩৬		জাদুকরদের প্রতি মূসা (আ) / ১১৭	
পরিবার পরিজন থেকে সংক্ষার কাজ শুরু/ ৩৭		জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় / ১১৯	
রাসূল ও নবীর সংজ্ঞার পার্থক্য / ৩৮		ফিরাউন পত্নী আছিয়ার তড় পরিণতি / ১২০	
কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না / ৩৯		ফিরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্রবিক পরিবর্তন / ১২০	
নামায অসময়ে অথবা জামাআত ছাড়া / ৪১		মিসর থেকে বের ইওয়ার সময় / ১২৩	
সূরা তোয়া-হা / ৫৭		তুরা করা সম্পর্কে মূসা (আ) / ১২৭	
মূসা(আ) আল্লাহ তা'আলার শব্দমুক্ত কালায়/ ৬৫		সামরী কে হিল / ১২৮	
সন্তুষ্যের স্থানে জুতা খুলে ফেলা আদব/ ৬৫		কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য / ১৩০	
কোরআন শুবগের আদব / ৬৬		পয়গঘরদের মধ্যে মতানেক্য / ১৩৫	
সংকর্মপর্বতায়ণ সঙ্গী যিকর ও ইবাদতেও / ৭৪		সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক / ১৩৮	
নবী ও রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে শুহী / ৭৭		দ্বীর জরুরী তরণ-পোষণ / ১৪৯	
মূসা জননীর নাম / ৭৮		মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের / ১৫০	
মূসা (আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী / ৭৯		পয়গঘরদের সম্পর্কে একটি জরুরী / ১৫১	
হাদীসুল ফুতুন / ৮০		কাফির ও পাপাচারীর জীবন / ১৫২	
উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাণ ফলাফল / ৯৮		শাকদের নিপীড়ন থেকে আঘারক্ষার / ১৫৬	
ফিরাউনের বোকাসূলভ চেষ্টা-তদবীর / ৯৮		দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ / ১৫৬	
মূসা জননীর প্রতি অলোকিক নিয়ামত / ৯৯		যে ব্যক্তি নামায ও ইবাদতে / ১৫৮	
শিল্পতি, ব্যবসায়ী প্রযুক্তের জন্য / ৯৯		সূরা আবিয়া / ১৬০	
মূসা (আ)-এর হাতে ফিরাউনী/ ৯৯		সূরা আবিয়ার ফয়লিত / ১৬৩	
অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা / ১০০		কোরআন আরবদের জন্য সম্মান / ১৬৪	
দুইপয়গঘরে মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক/ ১০০		মৃত্যু কি ? / ১৮১	
কাউকে কোন পদ বা চাকরী দান / ১০১		সংসারের প্রত্যেক কঠ ও সুখ পর্যাক্ষা / ১৮২	
জাদুকর পয়গঘরদের কাজে সুস্পষ্ট / ১০২		তুরাপ্রবণতা নিন্দনীয় / ১৮২	
ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর ব্রহ্মপ / ১০২		কিয়ামতে আমলের গুণ ও দাঁড়িপাল্লা / ১৮৩	

(আট)

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আমল কিভাবে শ্যন করা হবে / ১৮৪		জিহাদ ও মুক্তির একটি রহস্য / ২৬৬	
আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ / ১৮৪		খুলাফালে রাশেদীনের পক্ষে / ২৬৬	
ইত্তাহিম (আ)-এর উক্তি মিথ্যা নয় / ১৯২		শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য / ২৬৯	
হাদীসে ইত্তাহিম (আ)-এর দিকে তিনটি / ১৯৩		পরকালের দিন এক হাজার বছরে / ২৭০	
ইত্তাহিম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত / ১৯৫		একটি উপর্যুক্তি দ্বারা শিরক ও মূর্তি পূজার / ২৮২	
ইত্তাহিম (আ)-এর জন্য নমরাদের / ১৯৬		সূরা হজের সিজদায়ে তিলাওয়াত / ২৮৫	
রায় দানের পর কোন বিচারকের / ২০৩		উচ্চতে মুহাম্মদী আল্লাহর মনোনিত উচ্ছত / ২৮৬	
দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরম্পর / ২০৪		সূরা আল-মুমিনুন / ২৮৯	
কারণ ও জন্ম অন্যের জান অথবা / ২০৫		সূরা মুমিনুনের বৈশিষ্ট্য ও প্রেরণাত্ম / ২৯০	
পর্বত ও পক্ষীকূলের তসবীহ / ২০৫		সাফল্য কি এবং কোথায় / ২৯০	
বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে / ২০৬		নামাযে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর / ২৯৩	
যে শিল্প দ্বারা সাধারণের লোকের / ২০৬		মানব সৃষ্টির সংগ্রহ স্তর / ২৯৯	
সুলায়মান (আ)-এর জন্য বাস্তুকে / ২০৭		মানব সৃষ্টির শেষ স্তর / ৩০০	
সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন / ২০৮		প্রকৃত কুহ ও জৈব কুহ / ৩০০	
আইউব (আ)-এর কাহিনী / ২০৯		মানুষকে পানি সরবরাহের / ৩০১	
আইউব (আ)-এর দোয়া / ২১১		এশারা কিস্মা-কানিহী বলা নিষিদ্ধ / ৩১৯	
ফুলক্ষিকল নবী ছিলেন না গোলী / ২১২		মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আবাব / ৩২১	
ইউনুহ (আ)-এর কাহিনী / ২১৬		হাশেরে মুমিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য / ৩৩১	
ইউনুহ (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য / ২১৮		আমল ওয়নের ব্যবস্থা / ৩৩৩	
সূরা হজ / ২৩০		সূরা আল-সূর / ৩৩৬	
কিয়ামতের ভূক্ষণ করবে হবে / ২৩১		সূরা নূরের কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৩৬	
মাতৃগর্ভের মানব সৃষ্টির স্তর / ২৩৫		ব্যভিচার একটি মহা অপরাধ / ৩৩৭	
মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর / ২৩৬		একশ কব্যাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি / ৩৩৯	
সমগ্র সৃষ্টি বস্তুর আনুগত্যশীল / ২৪২		ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিনস্তর / ৩৪৪	
জাত্বাতীদের কংকন পরিধান / ২৪৫		ইসলামের প্রথম পর্যায়ের অপরাধ / ৩৪৫	
রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম / ২৪৫		ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান / ৩৪৬	
মক্কার হেরেমে সব মুসলমানদের / ২৪৮		ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান / ৩৪৯	
হজের ত্রিয়াকর্মে ক্রমের উকুলত্ব / ২৫৪		মুহসিনাত কারা / ৩৫০	
ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আমল / ২৬৩		ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান / ৩৫২	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মিথ্যা অপৰাদের কাহিনী / ৩৬০		আর্জামুং বলে কি বুঝানো হয়েছে / ৪৪৫	
হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব / ৩৬৬		সূরা আল-ফুলকান / ৪৪৭	
হ্যরত আয়েশা (রা) কতিপয় বৈশিষ্ট্য / ৩৭০		প্রত্যেক শৃষ্ট বস্তুর বিশেষ / ৪৪৮	
নির্জনতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা / ৩৭৫		মানব সমাজে অর্ধনৈতিক সাম্যের / ৪৫৭	
সাহাবায়ে কিরামকে উভয় চরিত্রের / ৩৭৬		দুর্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বস্তুর / ৪৬১	
গৃহ চার প্রকার / ৩৮০		কোরআনকে কার্যত পরিভ্যক্ত করাও / ৪৬২	
অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা / ৩৮২		শরীয়তবিরোধী প্রত্যক্ষির অনুসরণ / ৪৬৭	
অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত তরীকা / ৩৮৩		কোরআনে দাওয়াত প্রচার করা / ৪৭৫	
টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা / ৩৮৮		সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন / ৪৮১	
পর্দাপ্রথা নির্জনতা দমন / ৩৯২		আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের / ৪৯৩	
শান্তিবিহীন বালকদের প্রতি / ৩৯৪		শরীয়তের বিধানাবালী পাঠ করাই / ৪৯৯	
বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত / ৩৯৪		সূরা আশ-শুআরা / ৫০২	
পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম / ৩৯৫		আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ / ৫০৮	
আলজকারীর আওয়াজ বেগানা / ৩৯৯		হ্যরত মুসা (আ)-এর জন্য সুন্নত শব্দের / ৫০৮	
সুগকি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া / ৪০০		পয়গমবরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা / ৫০৯	
সুশোভিত বোরকা পরিধান / ৪০০		কিয়াবিত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে / ৫২২	
বিবাহের কতিপয় বিধান / ৪০১		খ্যাতি ও যশপ্রাপ্তি নিম্নলীয় / ৫২৩	
বিবাহ ওয়াজিব না সুন্নাত / ৪০২		অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি / ৫২৫	
অর্থনীতি একটি স্বত্ত্বপূর্ণ / ৪০৮		সৎকাজে পারিশ্রমিক এহণ করার বিধান / ৫২৮	
নূরের সংজ্ঞা / ৪১৫		ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র / ৫২৮	
মুম্বিনের নূর / ৪১৫		বিনা প্রয়োজনে আট্টালিকা নির্মাণ / ৫৩১	
নবী করীম (সা)-এর নূর / ৪১৭		উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত / ৫৩৪	
যায়তুনের তৈলের বৈশিষ্ট্য / ৪১৭		অব্রাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম / ৫৩৫	
মসজিদের কতিপয় ফজিলত / ৪২০		আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঠে / ৫৩৮	
মসজিদের পনরাটি আদব / ৪২১		শব্দ ও অর্থ সন্তারের সমষ্টির নাম কোরআন / ৫৪৫	
অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম ব্যবসাজীবী / ৪২২		নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ / ৫৪৬	
সাফল্য সাজের চারটি শর্ত / ৪২৯		কোরআনের উর্দ্ধ অনুবাদকে / ৫৪৬	
আঞ্চলিকজন ও মাহরামদের জন্য / ৪৩৬		ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান / ৫৪৯	
নারীদের পর্দার তাগিদ / ৪৩৮		যে জন ও শান্ত আল্লাহ ও পরকল / ৫৫০	
গৃহে পৃহে প্রবেশের প্রবর্তী কতিপয় / ৪৪০			

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আল-কাসাস / ৫৫১		সূরা আল-কাসাস / ৬১০	
মানুষের নিজে প্রয়োজন ঘটানোর / ৫৫৫		কোন চাকরী অথবা পদ ন্যস্ত / ৬২৬	
সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্তীর / ৫৫৫		সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় / ৬৩১	
মূসা (আ)-এর আগুন দেখা / ৫৫৫		তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি / ৬৩৯	
পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থ সম্পদের / ৫৬০		মুসলিম শব্দটি উচ্চতে মোহাম্মদীর / ৬৪২	
বিহংগকুল ও চতুর্পদ জন্মদের / ৫৬১		মুক্তার হয়ে প্রত্যেক প্রকার / ৬৪৮	
সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও / ৫৬২		নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর / ৬৪৯	
শাসকের জন্য জনসাধারণের / ৫৬৪		বুদ্ধিমান তাকেই বলে / ৬৫০	
পক্ষীকুলের মধ্যে হৃদয়দকে বিশেষভাবে / ৫৬৫		এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর / ৬৫৪	
যে জন্তু কাজে অলসতা করে / ৫৬৬		গুনাহের দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ / ৬৬৪	
পয়গম্বরগণ আলিমুল গায়ের নন / ৫৬৬		কোরআন শক্তির বিস্তৃত বিজয় / ৬৬৭	
জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ / ৫৬৭		সূরা আল-আনকাবুত / ৬৬৮	
নারীর জন্য বাদশা হওয়া / ৫৬৭		যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয় / ৬৭৪	
লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ / ৫৬৮		দুনিয়ার সর্বথম হিজরত / ৬৮১	
মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো / ৫৬৮		আল্লাহর কাছে আলিম কে / ৬৮৭	
কাফিরদের মজলিশ হলোও সব / ৫৬৮		নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে / ৬৮৯	
সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় / ৫৭১		বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জিলকে সত্যও / ৬৯৫	
পত্র লেখার কতিপয় আদব / ৫৭১		নিরক্ষন হওয়া রাম্মানুজাহ (সা)-এর / ৬৯৬	
প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখে / ৫৭২		হিজরতের বিধি-বিধান / ৬৯৯	
পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গম্বরগণের / ৫৭২		হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয় / ৭০০	
চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখা / ৫৭৩		ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে / ৭০৬	
পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ / ৫৭৪		সূরা আর-জুম / ৭০৭	
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপরাদিতে পরামর্শ / ৫৭৪		সূরা অবতরণ এবং বোমক / ৭০৮	
সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে / ৫৭৪		পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার / ৭১২	
সুলায়মান (আ) বিলকিসের উপটোকন / ৫৭৬		আল্লাহর কুদরতের প্রথম নির্দর্শন / ৭২১	
কোন কাফিরের উপটোকন গ্রহণ / ৫৭৬		বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শাস্তি / ৭২২	
মুজিয়া ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য / ৫৮০		নিদ্রা ও জীবিকা অব্যৱণ / ৭২৪	
বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা / ৫৮০		ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে / ৭০৩	
সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকিসের / ৫৮২		বাতিলপঞ্চাদের সংসর্গ / ৭৩২	
নিঃস্থায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার / ৫৯০		দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের / ৭৩৬	
মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা / ৫৯৮		বিপদের সময় পরীক্ষা / ৭৩৯	
ভূগর্ভের জীব কি / ৬০০		হাশেরে আল্লাহর সামনে কেউ মিথ্যা / ৭৪৭	

سورة مریم

সূরা মারিয়াম

মঙ্গল অবগতি, ১৪ আশাত, ৬ কক্ষ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

كَهِيْعَصٌ ⑤ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، ذِكْرِيَّا طَحْ ⑥ اذْنَادِيْ رَبِّهِ نِدَاءَ
 خَفِيْقَيَا ⑦ قَالَ رَبِّيْ وَهُنَ الْعَظِيمُ مِنْيٌ وَاسْتَعْلَمَ الرَّأْسُ شَيْئًا وَلَمْ أَكُنْ
 بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيْقَيَا ⑧ وَرَأَيْ خَفْتُ الْمَوْالِيَ مِنْ وَرَاءِيْ وَكَانَتْ امْرَأَيِ
 عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلَيْئًا ⑨ يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ أَلِيْعَقْوبَ ⑩ وَاجْعَلْهُ
 رَبِّ رَضِيْقَيَا ⑪ يَرِثُكَيَا أَتَابِنْشِرَكَ بِغُلْمَانِهِ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ
 سَمِيْقَيَا ⑫ قَالَ رَبِّيْ لَتَ كُونُ لِيْ غُلْمَانَ وَكَانَتْ امْرَأَيِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
 مِنَ الْكِبَرِ عِتَيَا ⑬ قَالَ كَذِلِكَ ⑭ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَيْهِ هَيْنَ وَقَدْ خَلَقْتَكَ
 مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑮ قَالَ سَرِبَ اجْعَلْ لِيْ أَيْةً ⑯ قَالَ أَيْتُكَ أَلَا
 تَنْكِلِمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لِيَالٍ سَوِيْقَيَا ⑰ فَخَرَجَ عَلَى قَوْفَهِ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأَوْحَى
 إِلَيْهِمْ أَنْ سَيْحُوا بَكْرَةً وَعَشِيْقَيَا ⑱ يَعْيَى خُنِ الْكِتَبِ بِقُوَّةٍ ⑲ وَاتَّيْنَاهُ
 الْحُكْمَ صَيْقَيَا ⑳ وَحَنَانِيَا مِنْ لَدُنِيَا وَزَكُوَّةً ⑳ وَكَانَ تَقِيَّا ⑳ وَبَرَّا
 بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَيْبَارًا عَصِيَّا ㉑ وَسَلَمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلْدَهِ وَيَوْمَ
 يَمْوَتُ وَيَوْمَ يُبَعْثَ حَيَّا ㉒

প্রয় কর্তৃগাময় দয়ালু আল্লাহর নামে পক্ষ করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বাস্তু যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অঙ্গি বয়স-ভারাবলত হয়েছে; বার্ধক্যে মন্তব্য সুন্দর হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ হইনি। (৫) আমি ডয় করি আমার পর আমার বংশেতেকে এবং আমার জ্ঞী বক্ষ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার হৃলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাঁকে করুন সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুস্বাদ দিছি, তাঁর নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারণ নামকরণ করিনি। (৮) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার জ্ঞী যে বক্ষ্যা, আর আমি যে বার্ধক্যের শেষ প্রাপ্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেনঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেনঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেনঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সৃষ্টি অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাঁদেরকে সকাল-সক্ষ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বললঃ (১২) হে ইয়াহইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রহ ধারণ কর। আমি তাঁকে শৈশবেই বিচারবৃক্ষি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আবহ ও পরিজ্ঞান দিয়েছি। সে ছিল পরহিয়গার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উক্ত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তাঁর প্রতি শাস্তি— যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুদ্ধিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--(এর মর্ম আল্লাহ তা'আলাই জানেন) এটা (অর্থাৎ বর্ণিত কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁর (পিয়া) বাস্তু (হয়রত) যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে নিভৃতে আহবান করেছিল। (তাঁতে) সে বললঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অঙ্গি (বার্ধক্যজ্ঞনিত কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের উত্তোল ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেছে)। এই অবস্থার দাবি এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি; কিন্তু আপনার কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যন্ত। সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বক্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালনকর্তা বিফল মনোরথ হইনি। (এ কারণে দৃষ্টর থেকেও দৃষ্টর উদ্বিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও

কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি আমার (মৃত্যুর পর) অজনদের (পক্ষ থেকে) ডয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছায়ত শরীয়ত ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে করে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হলো, যার মাঝে দীনের বিদ্যমত সম্পন্ন করার মত গুণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা; ; (যার দৈহিক সুস্থিতি সম্মেুখ কথনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত।) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকেই) এমন একজন উত্তোলাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান করুন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুলো) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (ঐতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং (আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ সে অলিম্প হবে এবং আমলেও হবে। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থিতায় বললেন) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহুইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগ্রসম্পন্ন করিনি(অর্থাৎ তুমি যে ইল্ম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব; তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহর ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া করুলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো বার্ধক্যের শেষ প্রাপ্তে উপনীত হয়েছি? (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, সা বর্তমান অবস্থাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হলো (বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে। হে যাকারিয়া,) তোমার পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (ওধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই ছিল না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনন্তিত্বকে অতিক্রে আনা আমার জন্যে সহজ, তখন এক অতিক্র থেকে অন্য অতিক্র আনয়ন করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহর এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হ্যুত যাকারিয়ার আশাকে জোরদার করা; সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) যাকারিয়া [(আ)-এর আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেনঃ হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসংশ্রান্তেও) আমাকে একটি নির্দশন দিন (যাতে আরও অধিক শোকর করি। হ্যুৎ বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়বিষয়ই)। ইরশাদ হলোঃ তোমার (সে) নির্দশন হলো এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না, অথচ তুমি সুহ অবস্থায় থাকবে (কেন অসুখ বিসুখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহর যিকিরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে। সেবতে আল্লাহর নির্দেশে

যাকারিয়ার মুখ বক্ষ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল : (কারণ সে মুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধিয়ায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়াতের কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন ; কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত প্রাণির শোকরান্বয় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও তদৃপ তসবীহ আদায় করতে বলেছেন। যোটকথা, অতঃপর ইয়াহুইয়া (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হলো হে ইয়াহুইয়া, এ কিভাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত) ইনজীল পরে অবর্তীণ হয়েছে।) দৃঢ়তার সাথে প্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল কর)। আমি তাঁকে শৈশবেই (ধর্মের) জ্ঞানবৃদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হনয়ের কোমলতা (গুণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম। (عَنْ حَمَّامَةَ وَعَنْ زَكْرُوْنَ بْلَأَয় চারিত্রের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিযগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধৃত (অথবা আল্লাহ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহর কাছে এমন গৌরবাবিত ও সশ্বান্নিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহর তরফ থেকে বলা হচ্ছে :) তার প্রতি (আল্লাহ তা'আলার) শাস্তি (বর্ষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উথিত হবে।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ

সূরা কাহফে ইতিহাসের একটি বিশ্বব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাচার্য একটা বিশ্বব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহফের পরে সূরা মারইয়ামকে হান দেয়া হয়েছে। — (জহুল মাজানী)

ଏତୋ ଥଣ୍ଡିତ ଓ ଅବୋଧଗମ୍ୟ ବର୍ଣମାଲାର ଅନ୍ତର୍ଭୂକ । ଏଇ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଵାହ
ତା'ଆଲାଇ ଜାନେନ । ବାନ୍ଦାର ଜଳ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଥ ଅବେଳଣ କରାଓ ସମୀଚିନ ନଯ ।

এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্ছবের ও গোপনে করাই উক্তম। হ্যরত
সাদ ইবনে আবী ওয়াক্সের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ৪
ان خير الذّكّر الخفيٌ
অর্থাৎ অনুচ্ছ যিকরাই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যাব এমন যিকিরাই
শ্বেষ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না)।—(কুরআনী)

অসমীয়া অসমীয়া দুর্বলতা উল্লেখ কৰা হয়েছে। কাৰণ, অসমীয়া দেহেৱ খুঁটি। অসমীয়া দুর্বলতাৰ নামাস্তুৰ। এৰ শাব্দিক অর্থ প্ৰজলিত হওয়া। এখনে চুলেৱ শুভতাকে আগন্মেৱ আগন্মেৱ সাথে ভুলমা কৰে তা সমস্তকে ছড়িয়ে পড়া বৈৰাগ্যো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবস্তুতা প্রকাশ করা মুস্তাহব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর প্রস্তুত হিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবস্তুতা উল্লেখ করা দোয়া ক্ষুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন : দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবস্তুতা বর্ণনা করা উচিত।

..... এটা মৌলি-শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধি। তনোধে এক অর্থে চাচাত ভাই ও বৰজন। এখনে উদ্দেশ্য ভাই।

পয়গঞ্চরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিতা চলে না : **أَلْيَقْنُوبُ** অধিক
সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিতার অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিতা
নয়। কেননা, প্রথমত হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ
নেই, যে কারণে চিহ্নিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গঞ্চরের পক্ষে
একপ চিন্তা করাও অবাস্তু। তাহাত্তা সাহাবায়ে ফিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংশ্লিষ্ট
একটি সহীত হানীসে বলা হয়েছে :

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافز -

নিচিতই আলিঙ্গন পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। “পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম
রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে
বিগ্রাট সশ্বদ হাসিল করে।” —(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরিমিয়ী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রহেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **صَدْقَةٌ لَا نُرُثُ مَا تَرَكْنَا** : আমাদের (অর্থাৎ প্রয়োগব্রহণের) আর্থিক উত্তোধিকারিতা কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

ব্রহ্মং আলোচ্য আয়াতে **وَرِثَ مِنْ أُلِّيَّقُوبِ** বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হচ্ছে। কেননা, যে পুত্রের অনুলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাতে তাদের নিকটবর্তী আজীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব **مَوْلَى** তথা স্বজন, যাদের উপরে আয়াতে করা হচ্ছে, তারা নিশ্চলেহে আজীব্নাতায় হ্যারত ইয়াহ-ইয়া (আ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার-স্বাইনের পরিপন্থী।

কল্পনা মানুষের শিয়াগ্রহ থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে :

روى الكيني في الكافي عن أبي البخزى عن أبي عبد الله قال ان سليمان ورث راود وان محمدا عليهما السلام ورث سليمان -

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান (আ)-এর ওয়ারিস হন।

বলা বাহ্য্য, রাসমুদ্ধাহ (সা) যে হ্যরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, **وَرُبْ سُلْطَانٍ** [রুব সুলতান] **مِنْ قَبْلِ سَعْيِهِ** [মিন কবل سعى ه] শব্দের অর্থ সমনাখণ হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুল্পটি যে, তার পূর্বে ‘ইয়াহইয়া’ নামে কারণ নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহু ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারণ মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত, চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আ) পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের চাহিতে সর্বাবস্থায় প্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হ্যরত ইবরাহীম খলীফুদ্ধাহ ও মুসা কলীমুদ্ধাহর প্রেষ্ঠত্ব বীকৃত ও সুবিদিত। —(মায়হারী)

শব্দটি 'শুন' থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ প্রভাবিত না হওয়া। এখানে অস্ত্রির শক্তি বোঝানো হয়েছে। শব্দের অর্থ সুন্ধ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ)-এর কোন মানবের সাথে কথা না বলাঙ্গ। এ অবস্থাটি কোন রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিনদিনই পূর্বৰৎ খোলা ছিল। বরং এ অবস্থা মুজিয়া ও গর্ভসঞ্চারের নির্দশন হয়েপাই প্রকাশ পেয়েছিল। প্রত্যেক শাব্দিক অর্থ হদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দতা। এটা হয়েরত ইয়াহুইয়া (আ)-কে স্বত্ত্বাবে দান করা হয়েছিল।

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ مَاذَا نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِقِيًّا ۝ فَأَتَخْذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا قَتَفَ أَرْسَلَنَا إِلَيْهَا وَحَنَافَتَشَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝
قَالَتْ رَأَيْتُ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنِّي كُنْتُ تَقِيًّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أَنْذَرَنَا سُولُ
رَبِّكَ قَلِيلٌ لَّهُمْ لَكُمْ غُلَمًا زَكِيًّا ۝ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَرُ
يَمْسِسْنِي بِشَرٍّ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكَ ۝ قَالَ رَبِّكَ هُوَ عَلَىَّ

هِينَ وَلَنْجَعَلَهُ أَيَّةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْهَا وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا ②٦

(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করল, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক হাসে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তাঁর কাছে আমার কাহকে প্রেরণ করলাম, সে তাঁর নিকট পূর্ণ যানবাকৃতিতে আস্ত্রপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল : আমি তোমা থেকে দয়ামন্ত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ-ভীরু হও। (১৯) সে বলল : আমি তো তখু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পরিত্র পুত্র দান করে যাই। (২০) মারইয়াম বলল : কিরণে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যক্তিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল : এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নির্দর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হস্তপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিতিকৃত ব্যাপার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্ধাং কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্ধাং সুরায় হয়েরত] মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করলন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর উদ্ধিষ্ঠিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের দ্বিতীয় থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন,) যাতে এর আড়ালে গোসল করতে পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাইল)-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তাঁর সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে একজন পূর্ণ মানুষরূপে আস্ত্রপ্রকাশ করলেন। (হ্যাত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে করলেন, তাই অঙ্গীর হয়ে) বললেন : আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহর আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ-ভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন : আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (ফেরেশতা। আমার আগমনের উদ্দেশ্য—) যাতে তোমাকে এক পরিত্র পুত্র দান করি। (অর্ধাং তোমার মুখে অধ্বা বুকের উন্নুক অংশে ফুঁ মারি, যার অভাবে আল্লাহর ইকুমে গর্ত সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।) তিনি (বিশ্বাসের) বললেন : (অঙ্গীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরণে হবে, অর্থাৎ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর ঘণ্টে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি (অর্ধাং আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি ব্যক্তিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন : (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুত্র) হয়ে যাবে। (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না ; বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন : এটা (অর্ধাং অভ্যন্ত কারণাদি ছাঁড়াই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, যাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নির্দর্শন ও (এর মাধ্যমে মাআরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৩

মানুষের হিদায়েত পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই। এটা পিতাবিহীন (এই পুত্রের জন্মাণ্ডল) একটি ছিরীকৃত ব্যাপার (যা অবশ্যই ঘটবে)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَدِّيْدٌ اَنْبَثَتْ থেকে উত্তৃত । এর আসল অর্থ দূরে নিষ্কেপ করা । **فَلَمْ يَرْقُبْ**—অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন । নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সজ্ঞাবনা ও উক্তি বিস্তৃত বর্ণিত আছে । কেউ বলেন : গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন । কেউ বলেন : অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকে কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন । কুরতুবীর মতে ধীরীয় সজ্ঞাবনাটি উভয় । হ্যরত ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই শ্রিনগর পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে ।

فَأَرْسَلَنَا إِلَيْهَا رُوْحًا অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে কহ বলে জিবরাইস্লকে বোঝানো হয়েছে । কেউ কেউ বলেন : বয়ং দ্বিসা (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে । তখন আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন । কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অঞ্চলগ্য । পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায় ।

فَنَذَلَ لَهَا بَشَرًا سُوْبِيًّا কেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়—ডয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায় ; যেমন বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) হেরা গিরিশ্বার এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ডয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন । এ কারণে হ্যরত জিবরাইস্ল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আঘাতকাশ করেন । মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসং বলে আশংকা করলেন । তাই বললেন :

إِنِّي أَعْوَذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ আমি তোমা থেকে আল্লাহ রহমানের আঘাত প্রার্থনা করি । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাইস্ল একথা শনে (আল্লাহর কথা শনে) আল্লাহর নামের সম্মানার্থে কিছুটা শেছনে সরে গেলেন ।

إِنْ كَبَّتْ بَقِيًّا এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারণ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি দিমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুনুম করো না । এ জুনুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ইমান যথেষ্ট হওয়া উচিত । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে তয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন । কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আতিশয় বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহভীরও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহর আঘাত প্রার্থনা করি । এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুল্পষ্ট । —(মাযহায়ী)

كَلِمَاتٍ এখানে পুত্র সম্মান প্রদানের কাজটি জিবরাইস্ল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন । কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য

প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া পৃত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে-যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

فَحَمِلْتَهُ فَأَنْبَيْتَهُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ②২
جِدْعَ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلِيْتِنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ②৩
فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَعْزَفِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ
سَرِيًّا ②৪ وَهُنْزِيَ إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ سُرَطَبًا
جَنِيًّا ②৫ فَكُلْيِ وَاشْرِيْ وَقَرِيْ عِيَنًا فِي مَاءِ تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكِلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ②৬

(২২) অতঃপর তিনি গর্ডে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন : হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের শৃঙ্খল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (২৪) অতঃপর ক্ষেরেশ্তা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়াব দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চকু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও : আমি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে রোগ ঘানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাসিল তাঁর বুকের উন্তুত স্থানে ফুঁ মারলেন যদ্দরূপ) তিনি গর্ডে পৃত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ড ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) সৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে (বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা প্রক্র হলো তখন) প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার উপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যাথায় অস্থির। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা। অবশেষে দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ

হায় । আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে যেতাম এবং মানুষের সৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম । অতঃপর সে সময়েই আল্লাহর নির্দেশে (হ্যরত) জিবরাইল (পৌছে গেলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সম্মুখে উপস্থিত হলেন না; বরং যে জায়গায়-মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিজে ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং তিনি) তাকে নিম্নস্থান থেকে আওয়ায় দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনেলে যে, তিনি ক্ষেরেশ্তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ডয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা এক্ষণ্প হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যা দেখলে এবং তার পান করলে স্বাভাবিক ফুলতা অর্জিত হবে । ঝল্ল মা'আনীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন । চিকিৎসা শান্তের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম যন্ত্রে ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, দূষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে । পানিতে যদি উভাপও থাকে—যেমন ক্লোন কোন নহরের পানি এক্ষণ্প হয়ে থাকে, তবে তা মেয়াজের আরও অনুকূল হবে । এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদাপ্রাণ (জিটামিন) থাকে । খেজুর, রক্ত উৎপাদন করে দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অঙ্গের জোড়কে শক্তিশালী করে দেয় । এ কারণে এটা প্রসূতির জন্য সব উষ্ণ ও থায় থেকেই উপ্তম । গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উভাপ কর । যেটুকু থাকে, পানি ধারা তা সংশোধিত হয়ে যায় । এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে । নজুব কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয় । এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহর প্রিয়প্রাত্ হওয়ার আলায়ত, তাই তা আত্মিক ফুলতার কারণও বটে । তুমি এই খেজুর গাছের কাষকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক খেজুর ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহারের বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলস্ত হওয়ার কারণে আত্মিক বাদ উত্তমই একত্রিত আছে) । এখন (এ ফল) আহার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্র শীতল কর (অর্ধাং পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহর প্রিয়প্রাত্ হওয়ার আলায়তপ্রাণ হওয়ার কারণে আমন্দিত থাক) । এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্ধাং কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এক্ষণ্প হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তুমি নিজে কিছু বলবে না ; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবে : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে (এমন রোধার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ । সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না । (তবে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া তিনি কথা । ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিত হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলাই এই সদ্ব্যাকৃত শিখকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পছায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন । ফলে পরিত্রাতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রয়াণ আত্মপ্রকাশ করবে । মোটকথা সর্বপ্রকার দৃঃখ্যের প্রতিকার হয়ে যাবে ।)

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু-কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওপর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বভোগাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সত্ত্বত এর মুকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার উন্নাহে লিঙ্গ হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ উন্নাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এক্ষেপ মৃত্যু-কামনা নিবিজ্ঞ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে : তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেন নি। এটা কি শিখ্য বলার শিক্ষা নয় ? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোধা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ও ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোধাও ইবাদতের অঙ্গরূপ ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলপ্রভু (সা) বলেন : بَنِمْ بَعْدَ حَنْلَامَ وَلَا مُسْمَاتَ يَوْمِ الْلَّيلِ^১ অর্থাৎ সন্মান সাবলক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সক্ষ্য পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাস্তুত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়।

পুরুষ ব্যক্তিত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া সুভিত্রিত নয় : পুরুষের অধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গৰ্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মুঝিয়া। মুঝিয়ায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা ও গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনৰূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পত্তিত হওয়াও আল্লাহর কুদরতের অঙ্গরূপ ছিল। এতে বোর্বা যায় যে, রিয়িক ইসলামের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।—(রহল-মা'আনী)

এর আলিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাইলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতেই বর্তমান আছে। এখানে অণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সাম্মনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও

পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। **كُلِّيٰ وَ اشْرِبِيٰ** কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ ব্রহ্মাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি ঘোঁট করে ; বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত ! কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(রহল-মা'আনী)

فَاتَتْ بِهِ قَوْمٌ هَا تَحْمِلُهُ قَالُوا إِيمَرِيمْ لَقَدْ حِتَ شَيْئًا فَرِيَّا ④١
 هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرًا سُوءٍ وَمَا كَانَ أَمْكِ بَغْيًا ④٢ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
 قَالُوا كَيْفَ تُحَكِّمُ مِنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا ④٣ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَاتِلُ
 الْكِتَبِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ④٤ وَجَعَلَنِي مُبَرِّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ مَوْا صَنِيفِي
 بِالصَّلْوَةِ وَالرِّزْكُوَةِ مَا دَمْتُ حَيًّا ④٥ وَبَرَّأْبُو الْدَّاقِ زَوْلَمْ يَجْعَلُنِي جَيْتَارًا
 شَقِيَّا ④٦ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمِ الْمِلْدُتْ وَيَوْمِ الْأَمْوَاتِ وَيَوْمِ الْأَبْعَثْ حَيَّا ④٧

(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্পদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল : হে মারইয়াম, তুমি একটি অষ্টটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হাকুম-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যক্তিচারীণি। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইশিত করলেন। তারা বলল : যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ? (৩০) সন্তান বলল : আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরুকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উচ্ছত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মাবশ্ব করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠিত হব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোটকথা, এ কথায় মারইয়াম সান্দুনা লাভ করলেন এবং ইসা (আ) জন্মাবশ্ব করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে (সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি চললেন এবং) তার সম্পদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজ্ঞাত শিশু, তখন কৃধারণা করে) বলল : হে মারইয়াম, তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউয়ুবিল্লাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ

করে, তা মন্দ ; কিন্তু তোমার দ্বারা এক্ষণ্প হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। কেননা) হে হারুন-জগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এক্ষণ্প অপকর্ষ করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এক্ষণ্প করবে) এবং তোমার জননী ব্যতিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিঙ্গ হবে)। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! মোটকথা, যার গোটা পরিবারই শুন্ধ-পবিত্র, তার দ্বারা এক্ষণ্প কাও হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অঙ্গপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা শনে কোন উত্তর দিলেন না। বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিন্তু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে; তাই) বলল : সে মাত্র কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে কথা বলব? (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব? ইতোমধ্যে) সন্তান (নিজেই বলে উঠল : আমি আল্লাহর (বিশেষ) দাস (আল্লাহ নই; যেমন মূর্খ শ্রিষ্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহর অপ্রিয় নই; যেমন ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জিল) দিয়েছেন (যদিও ত্বরিষ্যতে দেবেন; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা উপকৃত হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌছতে থাকবে। এ উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবূল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। (বলা বাহ্য্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার প্রমাণ ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে) এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছাড়া জন্মহস্তের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধৃত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য কর্য করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন জন্মহস্ত করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তী আসমান থেকে অবতরণের পর হবে)। এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে জীবিত হয়ে উঠিত হব। (আল্লাহর সালাম বিশেষ বাস্তা হওয়ার প্রমাণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এ বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্লায় ও জাহলা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাফির হয়রত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চাহিদেশ দিন পর নিকাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।—(রহফ মাজানী)

আরবী ভাষায় **فَرِيْ** শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু একাশ গেলে সাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে **فَرِيْ** বলা হয়। আবু ইইমান বলেন : প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে **فَرِيْ** বলা হয়-ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

بِإِحْرَاتٍ مَّا رُونَ হয়রত মুসা (আ)-এর ভাই ও সহচর হয়রত হারুন (আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুল্ক হতে পারে না। হয়রত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হয়রত মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নী বলা হয়েছে। অথচ হারুন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হয়রত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। কিন্তু এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্মত করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। এক, হয়রত মারইয়াম হয়রত হারুন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্মত করা হয়েছে--যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে ; যেখন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তার্বীয় গোত্রের ব্যক্তিকে এবং আরবের লোককে **أَخْتَمِيم** বলে অভিহিত করে। দুই, এখানে হারুন বলে মুসা (আ)-এর সহচর হারুন নবীকে বোঝানো হয়েন ; বরং মারইয়ামের ভাতার নাম ছিল হারুন এবং এ নাম হারুন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নী বলা সত্যিকার অর্থেই শুল্ক।

مَكَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْ কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ ও সৎ কর্মপ্রারণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্তানি যদি কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের যদি কাজের তুলনায় বেশি শুল্ক হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাভনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুরুগদের সন্তানদের উচিত, সৎ কাজ ও আল্লাহ'র অধিক মনোনিবেশ করা।

أَنْعَبْدُ اللَّهَ এক বেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্তসনা করতে শুরু করে, তখন হয়রত ইসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রাত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্তসনা শোনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে ঘনোয়েগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন : **أَنْعَبْدُ اللَّهَ** অর্থাৎ আমি আল্লাহ'র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হয়রত ইসা (আ) এই তুল বোঝাবুঝির সিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জনাপদ্ধত করেছি ; কিন্তু আমি আল্লাহ নই—আল্লাহ'র দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিঙ্গ না হয়ে পড়ে।

أَنْعَبْدُ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي تَبِيْ এ বাক্যে হয়রত ইসা (আ) তাঁর দুঃখ পানের যমানায় আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নবুত্ব ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর

চলিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিছাব লাভ করেন নি। তাই এর ঘর্ষ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি বখাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিছাব দান করবেন। এটা হুবহ এমন, যেখন মহানবী (সা) বলেছেন : আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্যই হয়নি—তার খামীর তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহ্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জন্মীর প্রতি ব্যতিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ আস্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন শুনাহের দখল থাকতে পারে না।

• تَكُنْ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّلَاةِ وَالزُّكْرَوْفِ
তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে শক্ত দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ইসা (আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের শরীয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব তাকীদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোয়া হ্যরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরীয়তে কর্য রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুটিমাটি বিষয়ান্তি বিভিন্ন রূপ ছিল। হ্যরত ইসা (আ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসা (আ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ

করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এসতাবছায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেওয়ার কি মানে ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয—এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ইসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাবপরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সংক্ষিপ্ত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়—(জহল মা'আনী)

• مَا فِي الْأَنْهَى
অর্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন—যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহ্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যথান।

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَسْتَرُونَ ⑩
• مَا كَانَ
إِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ وَلَدَ لِسْبُعْتَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرُ أَفْلَامِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ
لِلَّهِ أَنْ يَعْلَمُ مَنْ وَلَدَ لِسْبُعْتَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرُ أَفْلَامِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَيُكُونُ طَوْهٌ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَإِعْبُدُوهُ ۝ هُنَّا صَرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝
 فَأَخْتَلَفُ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۝ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمَعُهُمْ وَأَبْصِرُهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَا لِكِنَّ الظَّالِمُونَ
 الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَإِنِّي رَهِمٌ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
 وَهُمْ فِي غُفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نُرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
 عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

- (৩৪) এ-ই ইসা মারইয়ামের পুত্র। সত্যকথা, সে সশ্রক্তে লোকেরা বিতর্ক করে।
 (৩৫) আল্লাহহ এমন নন যে, সন্তান ধৰণ করবেন, তিনি পবিত্র ও যাইয়াময় সন্তা, তিনি
 যখন কোন কাজ করা হৈব করেন, তখন একধাই বলেন : 'হও' এবং তা হয়ে যায়।
 (৩৬) তিনি আরও বলেন : নিশ্চয় আল্লাহহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা।
 অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে
 দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করব। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের
 জন্য খৎস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার ঘনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার
 কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালিয়া থকাণ্য বিভ্রান্তিতে হয়েছে। (৩৯) আপনি
 তাদেরকে পরিতাপের দিবস সশ্রক্তে ইশ্বরীর করে দিন, যখন-সব ব্যাপারের মীরাংসা
 হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানভায় আছে এবং তারা বিশ্বাস হ্রাপন করছে না। (৪০)
 আমই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং
 আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ-ই ইসা মারইয়ামের পুত্র (যার উক্তি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়
 যে, সে আল্লাহর দাস ছিল। খ্রিস্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে
 আল্লাহর স্তরে পৌছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যে তাকে আল্লাহর
 প্রিয় বলে শীকার করে না এবং নানাৰ্থিক অপবাদ-আৱোপ করে, তা ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।) আমি
 (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সশ্রক্তে (বাহস্য ও ব্রহ্মাণ্ড-আৰ্থিক অবগুণকাৰী) লোকেরা
 বিতর্ক করছে। সেমতে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের
 উক্তি বাহ্যত ও পয়গঢ়ারের মৰ্যাদা হানিকৰ হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল, তাই
 তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গঢ়ারের

অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা নবীত্বের সাথে সাথে আল্লাহর পুত্রত্ব দাবি করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ তা'আলা'র তওহীদের অঙ্গীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহর মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ এরপ নন যে, তিনি (কাউকে) পুত্রন্নপে প্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরা কাঠাশালীর সন্তান হওয়া যুক্তিগতভাবে ঝটি।) এবং (আপনি তওহীদ প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও শুনে নেয় যে, নিচের আল্লাহ আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আতএব (একমাত্র) তাঁরই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাটিভাবে আল্লাহর ইবাদত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সম্বেদে) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) গৱাঞ্চে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অঙ্গীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিষ্কার করেছে।) সুতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভাস্তি দ্রু হয়ে যাবে।) কিন্তু যালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হিলিয়ার করে দিন যখন (জান্নাত ও দোয়াবের) চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোয়াববাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উক্ত প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্ত্রয় জীবিত খাকার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরিয়ী) তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।] তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানভায় আছে এবং তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশ্যে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার উপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আয়িই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 'বিষয়'

—হ্যরত ইসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অলীক চিজ্জাহারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাঢ়াবাঢ়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বলিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবসাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রির জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। (নাউয়ুবিন্নাহ) আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উক্ত প্রকার ভাস্ত লোকদের ভাস্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—(কুরতুবী)

أَقْرَأْتُ قَوْلَ الْحَقِّ — শামের ঘবরযোগে । এর ব্যাকরণিক রূপ হলো একপ কোন কোন কিরাআতে শামের পেশ ঘোগেও বর্ণিত রয়েছে । তখন অর্থ এই যে, ইসা (আ) বলঁ (সত্য উক্তি) যেমন তাকে اللّٰه (আল্লাহর উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে । কারণ তাঁর জন্য বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর উক্তির মাধ্যমে হয়েছে ।—(কৃতৃবী)

كِيَامَةَ يَوْمِ الْحُسْنَةِ — কিয়ামতের দিবসকে পরিভাষের দিবস বলা হয়েছে । কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিভাষ করবে যে, তারা ঈশ্বানদার ও সৎকর্মপ্রায়ণ হলে জান্নাত সাড় করত ; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আয়ার ভোগ করতে হচ্ছে । পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিভাষ জান্নাতীদেরও হবে । হযরত মুআবের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবু ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন : যেসব মৃহূর্তে আল্লাহর যিকর ছাড়া অভিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিভাষ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিভাষ হবে না । হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে ঝাসুলুল্লাহ (সা) বলেন অত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিভাষ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন : এই পরিভাষ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন : সৎকর্মশীলদের পরিভাষ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উক্তির অর্জিত হতো । পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিভাষ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না ।

وَإِذْ كُرِّفَ إِبْرَاهِيمُ هُنَّةَ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا ④ إِذْ قَالَ لِإِبْرِهِيمَ
يَا بَتَ لَوْ تَعْبُدُ مَا لَا يُسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ⑤ يَا بَتَ ابْنَى
قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَإِنَّمَا يَعْنِي أَهْدِ لَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ⑥
يَا بَتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا ⑦ يَا بَتَ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْأَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ⑧
قَالَ إِرَأْيْغَبَ أَنْتَ عَنِ الْهَتَّىٰ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَّا تَنَاهَ لَادْجِنَتَ وَاهْجَرَ فِي مَلِيَّا ⑨
قَالَ سَلَمَ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٰ هُنَّةَ كَانَ بِي حَفِيًّا ⑩ وَاعْتَزِلْكُمْ
وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا بِي دِعَسِي أَلَا كُونَ بِدْعَاعَ إِرَبِّيٰ ⑪

شَقِّيَّا ⑥ فَلَمَّا أَعْتَزَّ لَهُمْ وَمَا يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَهَبَنَا لَهُمْ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلَّا جَعْلَنَا نَبِيًّا ⑦ ۚ وَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيْهَا ⑧

(৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিচর সে হিল সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান আসেছে ; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শরতানের ইবাদত করো না। নিচর শরতান দরামরের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশকা করি, দয়ামরের একটি আশাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শরতানের সঙ্গী হয়ে থাবে। (৪৬) পিতা বলল : হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিছ? যদি তুমি বিরুদ্ধ না হও, আমি অবশ্যই প্রত্যরোচিতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরভরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে থাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন : তোমার উপর শাস্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা আর্থনা করব। নিচর তিনি আমার প্রতি ঘেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যক্তিত বাদের ইবাদত কর, তাদেরকে ; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব ; আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বকিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যক্তিত বাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, যখন আমি তাকে সান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং থত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে সান করলাম আমার অনুরাহ এবং তাদেরকে দিলাম সমৃক সুখ্যাতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করুন (যাকে তাদের কাছে তওহিদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ঝুটে ঝুটে।) সে (থত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (হিল ও) নবী হিল। (এখানে যে ষট্টাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, তুমি এমন ব্যক্তির ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা ; অথচ কোন বন্ধু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার পরও যদি 'সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে' এক্ষণ না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার অধ্যে এসব শুণও নেই, সে উত্তমজগে ইবাদতের শোগ্য

হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী; এতে আস্তির আশংকা ঘটেই নেই। সুতরাং আমি যা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতকৃতে সত্য। কাজেই) ভূমি আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেবাব। (তা হচ্ছে তওহীদ)। হে আমার পিতা, ভূমি শয়তানের ইবাদত করো না (অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো ভূমিও খারাপ মনে কর)। প্রতিমা পূজ্যায় শয়তান পূজা অবশ্যভাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহর বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে।) নিচয় শয়তান দয়ায়ের অবাধ্য। (অতএব সে আনুগত্যের যোগ্য হবে কিরণপে)। হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্চিত)। যে, তোমাকে দয়ায়ের কোন আশাব শ্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে)। অতঃপর ভূমি (আয়াবে) শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আশাব না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শাস্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না।)

ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ তনে। পিতা বলল : ভূমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম! (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ) মনে রেখ) যদি ভূমি (দেবদেবীর নিম্না থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই ভূমি এ থেকে বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। **ইবরাহীম (আ) বললেন :** (উত্তর) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) দরখাস্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়েত করুন, যাদুরা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিচয় তিনি আমার প্রতি অভ্যন্ত হেহেরবান। (কাজেই তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবূল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (ভূমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক। তাই) আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যক্তিত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছ, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা (অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বক্ষিত হব না (যেমন মৃত্তিপূজারীরা তাদের যিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বক্ষিত হয়। মোটকথা, এই কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন।) অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক (পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সঙ্গাতের কল্যাণে মৃত্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের সবাইকে আমি (নানা শুণে শুণাৰ্থিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ

দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বৎসরের অধে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমৃক্ত করেছি। (ফলে সবাই স্থান ও প্রশংসা সহকারে তাদের আয় উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাইল এমনি সব শুনসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

‘সিদ্ধীক’ কাকে বলে? مَدِينَةً — مَدِينَةً نَبِيًّا شব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আর্লিয়দের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন, সে সিদ্ধীক। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে বেদন বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক অনুপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও ওঠাবসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্ধীক। জন্ম মাঝানী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেরোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্ধীকের বিভিন্ন শর রয়েছে। অকৃত সিদ্ধীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্ধীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্ধীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরী নয় ; বরং নবী নয়—এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদ্ধীকের শর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিদ্ধীক বলে অভিহিত হবেন। হ্যরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক ‘সিদ্ধীক’ (أَنْ مَدِينَةً) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উচ্চতরে সংখ্যাধিক্রম মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দেরকে সমিহত করার পক্ষা ও আদব : প্রাণী আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য স্থান ও ভালবাসাসূচক সংযোধন। হ্যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলা সর্বগুণে শুণার্থীত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা যেযাজের সমতা ও বিপরীতমূর্তী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিখেই নয়—এর উদ্যোক্তারপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক যিটানোর জন্যই তিনি সুজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহসু ও ভালবাসা। এ দুটি বিপরীতমূর্তী বিষয়কে হ্যরত খলীলুল্লাহ (আ) চর্চকারভাবে সমর্পিত করেছেন।

আবু শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সংযোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোক্তির কারণ হতে পারে; অর্থাৎ পিতাকে ‘কাফির’ গোমরাহ ইত্যাদি বলেন নি: বরং পঞ্চাশয়রসূলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষয়তা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই মিজের ভূল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সংজ্ঞা কৃপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হঁশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিঞ্চাতাবনার পরিবর্তে অথবা পুনৰ্সূলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নতুনতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর সংজ্ঞিতে পুত্রকে সংযোধন করল। হ্যরত খলীলুল্লাহ আবু শব্দটি বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সংযোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে

বৎস,) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচিন ছিল। কিন্তু আহর তাঁর নাম নিয়ে **بِإِنْرَأْمِينْ** বলে সরোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রত্যরোধাতে হত্যা করার হৃত্কি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও অবরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন :

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ إِنْرَأْمِينْ এখানে **سَلَامٌ** শব্দটি ধিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। এক বয়কটের সালাম; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিল করার ভদ্রজনোচিত পথ্য হচ্ছে কথার উন্নত না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংস্য বলে :

وَإِذَا حَلَّتْهُمُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلَمْ يَأْتُوا سَلَامًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসূলভ তক্কবিতকে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিকল্পাচরণ সন্ত্রেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। বিভীষ অর্থ এই যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত ঘটকা এই যে, কোন কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হানীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হানীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **أَرْبَعَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى** **بِالسَّلَامِ** অর্থাৎ প্রিচ্ছান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হানীসে কাফির, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে বয়ং **রাসূলুল্লাহ** (সা) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হানীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরআনু আহকামুল কোরআন এছে এ আয়াতের ভক্তীর প্রসঙ্গে এর বিষ্টারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিঙ্কান্ত এই যে, যদি কোন কাফির ইহুদী ও প্রিচ্ছানের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোয় নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হানীসছয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।—(কুরআনু)

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي এখানেও উপরোক্ত ঘটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কাফিরের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শর্যাতের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয়। একবার রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন : **أَنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَغْفِرَنَ لِكَ مَالَ مَا نَهَى** অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ নবী ও ইমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইতিগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) চাচা জন্য ইতিগফার পরিত্যাগ করেন।

ঘটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইতিগফার করব-এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় مَكَانُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا لَيْسَ بِأَسْتَغْفِرَةٍ لَّكَ । সূরা তওবার ও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, مَكَانَ اسْتَغْفَارٍ آয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে জানা যায় যে, এখেকে জানা যায় যে, অর্থাৎ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে জানা যায় যে, এই ইঙ্গিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা । এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইঙ্গিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা । এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইঙ্গিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা । এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইঙ্গিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা ।

وَأَعْتَزَلُكُمْ وَمَا تَنْدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنْعُسُوا رَبِّيْ
একদিকে তো হযরত খলীফাহুহ (আ) পিতার আদব ও মহবতের চূড়ান্ত পরাকৃতি প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কল্পনিত হতে দেন নি । বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার বে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি ।

فَلَمَّا اعْتَزَلُهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বক্ষিত ও বিফল মনোরোধ হব না । বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল । আলোচ বাক্যে এই দোয়া কবৃল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন । এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে । পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন । কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি বৃত্ত পরিবার দান করলেন, যা পয়গঞ্চ ও সৎকর্মপন্নায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল ।

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ مُوسَى زَيْنَهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا لِّبِيَّا ① وَنَادَيْنَهُ
مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَهُ نَجِيَّا ② وَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا
أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ③ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِسْمَاعِيلَ زَيْنَهُ كَانَ صَادِقَ

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ④٦ وَكَانَ يَا مُرَأَهُلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورِ ④٧
وَكَانَ عِنْدَ رِبِّهِ مَرْضِيًّا ④٨ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادْرِيسَ رَبَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ④٩
فِيٰ ⑤٠ وَرَفِعْتُهُ مَكَانًا عَلَيْهِ ⑤١ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ لَهُمْ مِنْ
الشَّيْءِ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ حَسَنَاتِهِمْ نُوَجِّهُ زَوْجَهُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ ⑤٢
وَإِسْرَائِيلَ زَوْجَهُ مِنْ هَدِيَنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنِ ⑤٣

সিঙ্গল
খ্রোস্জেল ও বেকিয়া ④

(৫) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন অনোন্নীত এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫২) আমি তাঁকে আহবান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গৃহত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হাকুমকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাপ্নয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উকে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা—নবীগণের মধ্য থেকে যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাঁদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও অনোন্নীত করেছি, তাদের বংশোভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজদায় সুটিরে পড়ত এবং ঝুক্ত করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মূসা (আ)-এর কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ মানুষকে শোনান, নতুনা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই)। নিচয় তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন। আমি তাঁকে তুর পর্বতের ভানদিক থেকে আহবান করলাম এবং 'আমি তাঁকে গৃহত্ব বলার জন্য নিকটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হাকুমকে নবীরূপে (অর্থাৎ তাঁর অনুরোধে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁকে নবী করলাম এই কিতাবে ইসমাইলের কথাও বর্ণনা করুন, নিচয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাক্ষা ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও

নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিচয়ে তিনি অত্যন্ত সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাঁকে (গুণগরিমায়) উচ্চতরে উন্নীত করেছিলাম। এরা (সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হলো—যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাঁদের প্রতি আল্লাহ (বিশেষ) নিয়মাত নাবিল করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়মাত কিছু আর নেই।) এরা সবাই আমাদের বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাঁদেরকে আমি নৃহ (আ)-এর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সেমতে একমাত্র ইদরীস ছিলেন নহের শিত্তপুরুষ)। অবশিষ্ট সবাই নৃহ ও তাঁর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর। সেমতে হ্যরত যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ইসা ও মুসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর। ইসহাক, ইসমাইল ও ইয়াকুব (আ) ছিলেন শুধু হ্যরত ইবরাহীমের বংশধর।] তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়গাত্ম ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন (চূড়ান্ত মুখ্যপেক্ষিতা, নতুন ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদান্ত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) সূচিয়ে পড়ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—**আল্লাহ তা'আলা** যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য বাঁচিয়ে রেখে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যক্তিত অপর কোন কিছুর দিকে ঝক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহর জন্য নির্বেদিত করে দেয়, তাকে “**مُطْعَنْ**” বলা হয়। পয়গঢ়বরগঢ়ই বিশেষভাবে এ শুণে শুণারিত হন; যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : **أَنْ أَخْتَصْنَاهُمْ** — **بِالْمَسْكُرَى الدَّارِ** — অর্থাৎ আমি পয়গঢ়বরদেরকে পরকাল শ্রণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নির্যোজিত করেছি। উচ্চতরে যদ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গঢ়বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে শুনাও ও যন্ম কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহর হিফায়তে থাকেন।

—**এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্থানত্ব দান করেছেন।**

—**তুর পাহাড়ের ভাবন্দিক হ্যরত মূসা (আ)-এর দিকে দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে বাঁওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পর্যতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তুর পাহাড় তাঁর ভান দিকে ছিল।**

—**কালাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে এবং মাজাহ এবং ঘার সাথে একেপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে ন্যী বলা হয়।**

— وَوَمِنْتَنَا أَخَاهُ مَارِقَنْ —
শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হাক্কনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবৃল করা হয়। আয়াতে، مَنْبَنْ বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হাক্কন' দান করেছি। একারণেই হযরত হাক্কন (আ)-কে مَلَّا (আল্লাহর দান)-ও বলা হয়। (মাযহারী)
— وَأَنْكَرْ فِي الْكِتَابِ اسْتَسْأَمِيلْ —
বাহ্যত এখানে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সভ্যত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষাঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার আগে।

— كَانَ صَادِقَ الرَّعْدِ —
ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্বিক শুণ। প্রত্যেক স্তুতি ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ডঙ করাকে মুনাফেকীর আলাপত্ত বলা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাক্ষা ; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিলেম শুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এক্ষণ্ট নয় যে, এই শুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই শুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ শুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাইল (আ)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বাস্তুর সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনেক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন : কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিয়াতে যাহানবী (সা) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

ওয়াদা পূরণ করার শর্তক ও সৰ্তবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সংকর্মপরায়ণ মনীয়দের বিশেষ শুণ এবং স্তুতি লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : المَدِينَةِ دِينِ ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মু'মিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

কিকাহ্বিদগণ বলেছেন : ওয়াদার খণ্ড ইওয়া এবং ওয়াজিব ইওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওয়ার ব্যক্তীত ওয়াদা পূরণ না করা আন্দাহ্। কিন্তু ওয়াদা এখন খণ্ড নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন ইওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদার করা যায়। ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-বিচারে ওয়াজিব নয়। —(কৃত্যত্বী) পরিবার-পরিজন থেকে সৎকার কাজ শুরু করা সৎকারকের অবশ্য কর্তব্য :

كُنْ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصِّلَاةِ وَالزَّكْرِ—হযরত ইসমাইল (আ)-এর আরও একটি বিশেষ শুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও ঘাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে অশু হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মুসিম মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে : فُوْ أَنْفَسْكُمْ وَأَهْلِكُمْ تَارِ—অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাইল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি ? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয় ; কিন্তু হযরত ইসমাইল (আ) এ কাজের জন্য বিশেষ শুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রথমে চেষ্টিত ছিলেন ; যেমন মহানবী (সা)-এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে,—وَأَنْزَرْعَشِيرَتْلَوْلَقْرِبِينَ—অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আঞ্চলিকদেরকে আস্তাহ্ব আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণালয়োগ্য বিষয় এই যে, পয়গবরগণ সবাই সমগ্র জাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্ত্বের পয়গাম পৌছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি ? জওয়াব এই যে, পয়গবরদের দাওয়াতের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তাঁরা যখন কোন বিশেষ গ্রন্থে রাখিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পদ্ধা হচ্ছে একটি বিশুর ধর্মীয় পরিবেশ অঙ্গিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَأَنْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِنْرِيسْ—হযরত ইদরীস (আ) নৃহ (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যত্যম হিলেন। (মুস্তাদুরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পুর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আস্তাহ্ব তা'আলা ত্রিপ্তি সহীফা নামিল করেন। (যামাখশারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মুঁজিয়া হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্যে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বন্ধ সেলাই আবিক্ষার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের

তুলে জীবজন্মুর চামড়া ব্যবহার করত । ওয়ন ও পরিষাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অর্জনশংকের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয় । তিনি অন্ত নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিকল্পে জিহাদ করেন ।—(বাহরে মুহাম্মদ, কুরতুবী, মামহারী, কুহল মা'আনী)

অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ মর্তবায় সম্মুখ্যত করেছি ।
উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নেকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে ।
কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে । এ
সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন :

هذا من أخبار كعب الاحبار الأسرائيليات وفي بعضه نكارة

অর্থাৎ এটা কাঁবে আহ্বারের ইসরাইলী রেওয়ায়েত । এর কোন কোনটি অপরিচিত ।
কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিকার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ
করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে ।
কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অঙ্গীকৃতি অকাট্য নয় । কোরআনের তফসীর
এর উপর নির্ভরশীল নয় । (বয়ানুল কোরআন)

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারম্পরিক সম্পর্ক : বয়ানুল কোরআন
থেকে উদ্ধৃতি : রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উকি বর্ণিত আছে । বিভিন্ন আয়াত নিয়ে
চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উচ্চতের
কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল । এখন শরীয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে
নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উচ্চতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন
ইসমাইল (আ)-এর শরীয়ত ; এটা প্রকৃতপক্ষে হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন
শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ
শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না । হ্যরত ইসমাইল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত
সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে । এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয় ;
যেমন ফেরেশ্তা রাসূল, কিন্তু নবী নন । অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দৃত ।
আয়াতে তাদেরকে إِنَّمَا الرَّسُولُونَ بَلَّا হয়েছে অর্থে তারা নবী ছিলেন না ।

যার কাছে শুরী আগ্রহন করে, তিনি নবী; তিনি সতুন শরীয়ত প্রচার কর্তৃন কিংবা
প্রাচীন শরীয়ত । উদাহরণত বনী ইসরাইলের অধিকাংশ নবী মুসা (আ)-এর শরীয়ত
প্রচার করতেন । এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে
ব্যাপক । এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক । যে আয়াতে
উভয় শব্দ একেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُولٌ نَّبِيٌّ
বলা হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই । কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একটি সমাবেশ অযোক্ষিক নয় ;
কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরম্পর বিপরীতমূলী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন مَا أَرْسَلْنَا
منْ رَسُولٍ وَّلَّا نَبِيٌّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে হালের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি,
যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন ।

أَوْبَكَ الَّذِينَ أَنْجَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَبِيٍّ أَدْمَ
এখানে শুধু হযরত ইন্দ্ৰীস (আ)-কে
বোৰানো হয়েছে, এখানে শুধু হযরত ইবৰাহীম (আ)-কে বোৰানো
হয়েছে, এখানে ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোৰানো হয়েছে
এবং এখানে হযরত মৃসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া ও ইসা (আ)-কে
বোৰানো হয়েছে।

إِذَا شَاءَ عَلَيْهِمْ أَيَّاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبِكَيْ
—পূৰ্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান
পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের
প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল ; যেমন ইহুদীরা
হযরত ওয়ায়ারকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ইসাকে আল্লাহই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই
সমষ্টির পর তাঁরা যে আল্লাহর সামনে সিজদাকৰী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিলেন, এ
কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না
হয় এবং অবমাননাও না হয়। —(বয়ানুল কোরআন)

কোরআন তিলাওয়াতের সময় কানো অর্ধাৎ অশুসঙ্গে হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নতঃ এ
আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কানুর অবস্থা সৃষ্টি
হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবারে কিরাম; তাবেঙ্গন
এবং ওলীআল্লাহদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরুক্ষী বলেন : কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার
সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে মৃত্তাহাব। উদ্বাহুণত সূরা
সিজদায় এই দোয়া করা উচিত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكِبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ -

সূরা বনী ইসরাইলের সিজদায় এক্ষণ দোয়া করা উচিত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِبِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ
আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ
দোয়া করা দরকার :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عَبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ الْمَهْدِيَّينَ السَّاجِدِينَ لَكَ
الْبَاكِبِينَ عِنْدَ تِلَوَةِ آيَاتِكَ -

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غَيَّابًا لَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَوْلَئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ⑥ جَنَّتِ عَدْنٍ إِلَّتِيْ وَعَدْ
الرَّحْمَنُ عِبَادَةً بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتَى ⑦ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيشًا ⑧ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ
نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ⑨

(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অগদার্থ পরবর্তীরা । তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রভূতির অনুবর্তী হলো । সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে । (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে । সুতরাং তারা জালাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না । (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আস্ত্রাহ তার বাসাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন । অবশ্যই তার ওয়াদায় তারা পৌছবে । (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শনবে না এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য কৰ্মী থাকবে । (৬৩) এটা ঐ জালাত যার অধিকারী করব আমার বাসাদের মধ্যে পরিষিগ্নারদেরকে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ ।

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জন্মাই হণ করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্তীকার করল অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ছুটি করল) এবং (নকসের অবৈধ) খালেশের অনুবর্তী হলো (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল ।) সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) কিন্তু যে (কুফর ও গুনাহ থেকে) তওবা করেছে, (কুফর থেকে তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (গুনাহ থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সৎকর্ম করেছে । সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জালাতে প্রবেশ করবে । (প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সংকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জালাতে (যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আস্ত্রাহ তার বাসাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন । তার ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পৌছবে । সেখানে (জালাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শনতে পাবে না (কেননা সেখানে অনর্থক কথাবার্তাই হবে না । কেবলেশ্বরতাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) ব্যতীত । (বলা বাহ্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয় । অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে । (এটা হবে নিদিষ্টভাবে । এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে ।) এই জালাত (যার উল্লেখ করা

হলো) এমন যে, আমি আমার বাস্তাদের মধ্যে যাঁরা আল্লাহভীকু, তাদেরকে এর অধিকারী করব।

(আল্লাহভীকুতার ভিত্তি হচ্ছে ইমান ও সৎকর্ম।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“**১** লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্ত্র উন্নরসূরি, মন্ত্র সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উন্নম উন্নরসূরি এবং উন্নম সন্তান সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন একপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ জ্ঞানে করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জ্ঞানাত্ত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় শনাহ : আয়াতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, নবয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে জ্ঞানাত্ত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন :

ان اهم امركم عندى الصلة فمن ضيعها فهو لم يمسوها اضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে।—(মুয়াত্তা মালিক)

হযরত হ্যায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ ? লোকটি বলল : চল্পিশ বছর ধরে। হ্যায়ফা বললেন : তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো —মুহাম্মদ (সা)-এর বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরিয়ীতে হযরত আবু মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কর্নীম (সা) বলেন : এই ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে ‘একায়ত’ করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুকু ও সিজদায়, কুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে কুরম্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

গ্রোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওযুতে ত্রুটি করে অথবা নামাযের কুকু-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে কুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

মা’আরেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৬

হয়রত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন : শোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিঙ্গ হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ভৃত করে বলেন : আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন শোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শধু ওঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের শোক কুআপি পাওয়া যেত। আজ নামায়ীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, **نَعْوَذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْمُنْكَرِ**।

شَهْوَاتٍ وَأَتَبْغُوا الشَّهْوَاتِ (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর শরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হয়রত আলী (রা) বলেন : বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ শোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উপস্থিতি কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। —(কুরতুবী)

—আরবী ভাষায় **غُرْبَةٌ شَكْرَى رِشَادٌ**-এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে **غُرْبَةٌ** বলা হয়। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : ‘গাই’ জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাহিতে অধিক নানা রকম আঘাতের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আবুস (রা) বলেন : ‘গাই’ জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখের সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়। —(কুরতুবী)

لَنْوٌ وَلَا يَسْتَمْفِنْ فِيْهَا لَغْوًا—বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। কোনোক্ষণ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে খনিত হবে না।

—এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শাস্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। —(কুরতুবী)

وَلَمْ يُرْزِقْهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَمُشْبِّثًا—জান্নাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অতিক্রম থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্ষমাপ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনলোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুশ্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বন্ধু কামনা করবে, তখনই কালবিলু না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : —**وَلَمْ يَأْسِتُهُنَّ**—এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও ব্যাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যন্ত। আরবরা বলে : যে বাকি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য ঘোগাড় করতে পারে, সে সুধী ও স্বাচ্ছান্দশীল।

হযরত আব্দুস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন : এ থেকে বোৰা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোৰানো হয়েছে, ষেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাইশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্বদা উপস্থিত থাকবে —**وَاللَّهُ أَعْلَمُ** (কুরআনী)

وَمَا نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّاً ⑥৪) سَرَّبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا
فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ⑥৫) وَيَقُولُ إِلَّا نَسَانٌ
إِذَا مَأْمَتْ لَسُوفَ أُخْرَجَ حَيّاً ⑥৬) أَوْ لَاهِنَ كُرُّ إِلَّا نَسَانٌ أَنَا خَلَقْتُهُ مِنْ
قَبْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا ⑥৭) فَوَرِبِّكَ لِنَحْشِرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانِينَ ثُمَّ لِنَحْضُرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ حَتِّيًّا ⑥৮) ثُمَّ لَنْزِ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ عَلَى
الرَّحْمَنِ عَتِيًّا ⑥৯) ثُمَّ لَنْعَنْ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلَيْا ⑦০) وَإِنْ
مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ⑦১) كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا ⑦২) ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ
أَنْقَوْا وَنَذِرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا حِيتَيًا ⑦৩)

(৬৪) (জিবরাইল বলে :) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যক্তিত অবকরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পচাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিশ্বৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নড়োমঙ্গল, কৃমঙ্গল ও এতদুভয়ের শধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তারই বদ্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন ? (৬৬) মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবহাই পুনরুদ্ধিত হব ? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।

(৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহানাবের চতুর্পার্শে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্পদায়ের মধ্যে যে দয়াবয় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে দেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহানাবে প্রবেশের অধিক বোগ্য, আমি তাদের বিবরে ভালোভাবে জ্ঞান আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথার পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফরসালা। (৭২) অতঃপর আমি পরাহিয়গারদেরকে উজ্জ্বল করব এবং যালিয়দেরকে দেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শানে নয়ল ৪ সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত জিবরাইলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে : আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাইলের পক্ষ থেকে দিছি। জওয়াব এই (যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তাঁরই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের পক্ষাতে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পক্ষাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিককার স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বয়ঃ। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পক্ষাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবর্তীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিস্তৃত হওয়ার নন। (সেবতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগতভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর ভূলে যাওয়ার সংজ্ঞনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সরকিছুর পালনকর্তা। সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সর্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি তাঁর ইবাদত (ও আনুগত্য) কর এবং (দু'একবার নয় বরং) তাঁর ইবাদতে দৃঢ় থাক। (যদি তাঁর ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে ?) তুমি কি তাঁর সমগ্রসম্পদ কাউকে জান ? (অর্থাৎ তাঁর সমগ্রসম্পদ কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী।) (পরকালে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনর্জীবিত হব ? (আল্লাহ জওয়াব দেন যে,) মানুষ কি স্বরূপ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে (অনন্তিত্ব থেকে) অঙ্গিত্বে অনেছি এবং সে (তখন কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অঙ্গিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার

কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং (তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভাস্ত করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে, ﴿قَالَ فَرِينَتْ رَبِّنَا مَا أَطْفَلْنَا﴾ (অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের চতুর্লাখ্য এমতাবস্থার উপনিষত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয়ে) নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর (কাফিরদের) প্রত্যেক সম্পূর্ণায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহু তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (ইয়ে) তাদের সম্পর্কে শুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার (অর্ধাং প্রথমে) যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এই ক্রম শুধু প্রথমে প্রবেশ করার বেলায়। এরপর সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আয়াবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুনর্সিরাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাঢ়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে দেখে যখন জান্নাতে পৌছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে শুনাহ থেকে পরিবর্করণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তখন পৌছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য।) এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহকে ভয় (করে বিশ্বাস ছাপন) করত। (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল (ম'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আয়াব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে।) এবং জালিমদেরকে (অর্ধাং কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালীর জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (দৃঢ় ও বিশাদের আতিশয়ে) নতজানু হয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দের অর্থ পরিশুম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িভুক্ত পরিশুমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশর্রিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহু তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, কেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত ; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন যিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহু রাখেনি। সৃষ্টিগত ও

নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন যিথ্যা উপাস্য আল্লাহর নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সূচ্পট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমন্বান নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আবুস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এহলে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সূচ্পট যে, পূর্ণতার গুণবলীতে আল্লাহ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমবেক অথবা নজির নেই।

— (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না ; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহস্রবস্থান হয়ে যাবে। — (কুরআনী)

— حَوْلَ جِهَنَّمَ جِبَابًا— হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফির ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সবাইকে জাহান্নামের চতুর্পার্শে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি-বিহৃত হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রাহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

— شَيْعَةٌ لِّلَّتَّرِينِ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ— শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উচ্ছৃত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অঙ্গে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। — (মাযহারী)

— وَإِنْ مُنْكِمُ إِلَّا وَارِدًا— অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মু'মিন ও কাফির থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা। হ্যরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুসাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে ; যেমন হ্যরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরাদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী نَجِيُ الْذِينَ اشْفَوْ বাকোর অর্থ তাই। এই

বিষয়বস্তু হ্যরত ইবনে আকবাস (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ মেরা হলেও অভিক্রমের আকারে প্রবেশ ইবে। তাই কোন বৈশ্লেষণ্য নেই।

وَإِذَا أَتْتُنَّى عَلَيْهِمْ إِيمَانًا بِيَقِنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَلَّهِ مَنْ أَمْنَى لَا يُؤْمِنُ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّا مَنَّ وَأَحْسَنُ نَدِيَّا ⑭ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ
قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْاثًا وَرِعَيَا ⑮ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلِيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمَنُ مَلَّ أَهْلَهُ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَامًا الْعَنَابَ وَإِمَامًا السَّاعَةَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْحَفٌ جَنَّا ⑯ وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ
أَهْتَلَ وَاهْدَىٰ وَالْبِرِّيَّةِ الصِّلْحُ تُخْرِجُ عِنْدَ رِبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرًا ⑰

(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ডিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা মুামিনদেরকে বলে : দুই দলের মধ্যে-কোনটি মর্তবায় প্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উভয় ? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্মাদে ও জাঁকজমকে প্রেষ্ঠ হিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভৃত্যায় আছে, দয়ামুর আল্লাহ তাদেরকে বথেষ্ট অবকাশ দেবেন ; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আবাব হোক অথবা কিম্বামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। (৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃক্ষি করেন এবং স্থানী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে প্রেষ্ঠ এবং অতিদান হিসেবেও প্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব আয়াতে মুমিনদের সত্যপক্ষী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে : (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) ঘর্যাদা কার প্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার উভয় ? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঙ্গাম, পরিজন ও পারিবদ্ধজনিত প্রাচুর্যে আমরাই প্রেষ্ঠ। এ দাবি বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। বিভীষ পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত ঐ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়।

হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে পতিত ও লালিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ডরঙ্কর শাস্তি দিয়ে—যা নিচিত আয়াব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জ্ঞানক্ষমতাকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় দাবিটি ভাস্তু। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপছন্দনীয় ও অভিশঙ্ককেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি] বলুনঃ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বক করা, যেমন অন্য আয়াতে আছে **أَوْلَمْ نُعْمَرْكُمْ سَيِّئَتْكُرْفِينْهُ مَنْ تَذَكَّرْ**—এই আবকাশ ক্ষণস্থায়ী।] অবশ্যে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে—আয়াব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদবর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে। সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু। কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই **فَإِنْ** বলা হয়েছে।] এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা পথপ্রাঞ্চদের পথপ্রাণি (দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও শক্তি নেই।) এবং (পরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাণিচা সবই থাকবে। এসব সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত হায়িত্ব। সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা শুগগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহ্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“**خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا**”—এখানে বিভাসি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক, পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই, চাকর—নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভাস্তুপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টিমূলক ইতিহাস বিস্তৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত শুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শাস্তির উপায়েরপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা ব্যতো, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সশান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত শুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাধী মনে করে না ; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত

নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহর ধিতি-বিধাম মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই শুধু পার্থির ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়ঃসন, যেমন হয়রত সুলায়মান (আ), হয়রত দাউদ (আ) অনেক বিভিন্ন সাহাবী, উচ্চতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ বাজিকে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গুল বিস্তুতেব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফিরদের এই বিআশ্বি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণহায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র ইওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক সির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন-দৌলত স্ফীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বজ্র-বাক্স ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, অথবত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্ধাঁ বিপদের মুহূর্তে বজ্র-বাক্স ও আজীয়-সংজ্ঞন কোন কাজে আসে না। বিভীষিত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য ? মৃত্যুর পর হাশের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرْدًا

—باقيات صالحات—এর তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিজ্ঞারিত আলোচনা সূরা কাহাকে উল্লিখিত হয়েছে। এইগুরূপে উকি এই যে বاقيات صالحات মরদ। এর তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এইগুরূপে উকি এই যে, সংকর্ম আসল সম্পদ। সংকর্মের সওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরহায়ী শান্তি।

أَفَرَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاِيمَانِنَا وَقَالَ لَا وَتَيْنَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ أَطْلَعَ
الْغَيْبَ أَمْ رَا تَخْذِلَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمَلَّ
لَهُ مِنَ الْعَزَابِ مَلَّا ۝ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَاتِينَا فَرْدًا ۝ وَاتَّخَذَ دَا
مِنْ دُونِ اللَّهِ الرَّحْمَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عَزَّا ۝ كَلَّا ۝ سَيِّكَفْرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًا ۝

(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নির্দর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে : আমাকে অর্থসম্পদ ও সজ্ঞান-সন্তুষ্টি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে ? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা শিখে রাখব এবং তার শান্তি দীর্ঘস্থিত করতে থাকব । (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী । (৮১) তারা আল্লাহ ব্যক্তিত অন্যান্য ইলাহ প্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয় । (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অঙ্গীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ) আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নির্দর্শনাবলীতে (তন্মধ্যে পুনরুত্থানের নির্দর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং (ঠাণ্ডার ছলে) বলে : আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও সজ্ঞান-সন্তুষ্টি দেওয়া হবে । (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আচর্যজনক । অতঃপর খণ্ডন করা হচ্ছে ১) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহর কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে ? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামাঙ্গুর, নাকি পরোক্ষভাবে জ্ঞানতে পেরেছে ? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভূতিক নয় ; বরং বর্ণনাশৰ্য্যী, তাই বর্ণনাশৰ্য্যী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা'র বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে । আল্লাহ তা'আলা' একপ বর্ণনা করেননি । কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবাঙ্গুর ।) কখনই নয় (সে যিথ্যাং বলে), সে যা বলে আমি তা শিখে রাখব এবং (যথাসময়ে একপ শান্তি দেব যে,) তার শান্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সজ্ঞান-সন্তুষ্টির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না । আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না ; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সজ্ঞান-সন্তুষ্টি ছেড়ে) একাকী আসবে । তারা আল্লাহ ব্যক্তিত অন্যান্য উপাস্য প্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহর কাছে (সম্মান লাভের কারণ হয়) । (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে— يَقُولُونَ مُؤْلِأَ شَفَاعَةً — অতএব একপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে ব্যবং) তাদের ইবাদতই অঙ্গীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় ঝন্কতে বর্ণিত হয়েছে، قَالَ شَرِيكَاهُمْ مُّبِينٌ كَمْ لَيْلَاتِ فَلَيْلَاتٍ—) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে । (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হলো এবং অবস্থারও তা'ই হবে । অর্থাৎ সজ্ঞানের পরিবর্তে অপমানের কারণ হয়ে যাবে । এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে । সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন بِكَفَرِ رِبِّنَ— শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতিজ্ঞের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয় ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ —বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাববাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল : তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাববাব জওয়াব দিলেন : একপ করা আমার পক্ষে কোনক্ষেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল : ভাল তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব ? একপ হলে তাহলে তোমার খণ্ড তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে। —(কুরআনী)

কোরআন পাক এই আহাচক কাফিরের জওয়াবে বলেছে : সে কিরপে জানতে পারল যে, পুনর্বার জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে ? أَمْ أَتَعْلَمُ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ مَا لَيْلٌ فِي نَيْلٍ — অথবা সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে ? أَمْ أَتَعْلَمُ مَا فِي قَلْبٍ — অথবা সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? বলা বাহ্য, একপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে যন্তে একপ ধারণা কিরপে বজ্জুল করে নিয়েছে : وَنَبِيَّ مَصَّا فَقَرِبَ — (অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হরে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

—كِيَمَّا مَتَّهُ — কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্তুতি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। وَيَكْفِيَنَّ عَلَيْهِمْ هَذِهِ — (অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

الْمَرْءُ إِنَّمَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكُفَّارِ لِتُؤْزِّعُهُمْ إِذَا لَمْ يَأْتُهُمْ بِنَعْلٍ لَهُمْ عَلَى ۝ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَّا ۝ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمْ وِرْدًا ۝ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَا عَةً إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি । তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দবর্ষে) উৎসাহিত করে । (৮৪) সূতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহৃত্ত করবেন না । আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি যাত্র । (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিযগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহানামের দিকে ইঁকিয়ে নিয়ে যাব । (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে অতিশ্রদ্ধিত প্রাইতি প্রাপ্ত করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি যে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি । তারা তাদেরকে (কুফর ও পথভ্রষ্টতার) খুব উৎসাহিত করে । (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় তাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের ?) আপনি তাঁদের জন্য তাড়াহৃত্ত (করে আয়াবের দরখাস্ত) করবেন না । আমি স্বয়ং তাদের (শান্তিযোগ্য) বিষয়াদি গণনা করছি । (তাদের এই শান্তি ঐ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিযগারদেরকে দয়াময় আল্লাহর কাছে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোয়েখের দিকে ইঁকিয়ে নিয়ে যাব । (তাদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না । কেননা সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না ; কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছে । (তারা হচ্ছেন পয়গম্বর ও সৎ কর্মপ্রায়ণ মনীষীবৃন্দ । আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে । সূতরাং কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—আরবী অভিধানে حَسْنٌ - أَزْ - فَرْ - أَزْ - فَرْ - شব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা । শব্দুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে । শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কোশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধা করে দেওয়া । আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে অতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না ।

—(উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শান্তির ব্যাপারে তাড়াহৃত্ত করবেন না । শান্তি সত্ত্বেই হবে । কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে উন্নাশনতি দিল ও সময় দিয়েছি, তা স্মৃত পূর্ণ হয়ে যাবে । এরপর শান্তিই শান্তি । অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি । এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বলাহীন নয় । তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে । তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার

এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ ইওয়া মাত্র তাদের উপর আঘাত ঝাপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এ সমর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরম্ভ করলেন : আমাদের খাস-প্রস্থাসই যেখানে শুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই স্মৃত নিশ্চেষ হবে যাবে। জনেক কবি বলেছেন :

حياتك انفاس تعدد فكلما
مضى نفس منك انقضى به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবনের খাস-প্রস্থাস শুনতিকৃত। একটি খাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হাস পায়।

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চক্রিশ হাজার খাস গ্রহণ করে। —(কুরআনী) জনেক ব্যুর্গ বলেছেন :

وَكَبِفْ يُفْرَحُ بِالْدُنْيَا وَلَذْتَهَا
فَتَنِي يَعْدُ عَلَيْهِ الْلَّفْظُ وَالنَّفْسُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিছুপে বিজোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও খাস-প্রস্থাস গণনা করা হচ্ছে। —(জহল মা'আনী)

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَقِّينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدًا
যারা বাদশাহ অথবা কোম শাসনকর্তার কাছে সন্ধান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে বলা হয়। হাদীসে রয়েছে : তারা সওয়ারীতে সওয়ার হবে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন : তাদের সৎ কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর ক্লপ ধারণ করবে। —(জহল মা'আনী, কুরআনী)

إِلَيْهِمْ وَرِزْقًا — إِلَيْهِمْ وَرِزْقًا — مَنْ أَنْجَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا
মাগলেই মানুষ অথবা ক্ষম পানির দিকে যায়। তাই এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

— مَنْ أَنْجَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا — হযরত ইবনে আবুস (রা) বলেন : (অঙ্গীকার) বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ বোবানো হয়েছে। কেউ বলেন : বলে কোরআনের ইহ্য বোবানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ইয়ান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, তখু তারাই পাবে। —(জহল মা'আনী)

وَقَالُوا تَخْلُنَ الرَّحْمَنِ وَلَدًا ① لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ② شَكَدُ السَّمَوَاتِ يَتَغَطَّرُونَ
مِنْهُ وَتَنْسَقُ الْأَرْضُ وَمَخْرَجِ الْجَبَلُ هَذَا ③ أَنْ دُعَوْلَرَحْمَنِ وَلَدًا ④

وَمَا يَنْبَغِي لِرَحْمَنِ أَنْ يَتَخَذَ وَلَدًا ۝ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا أَتَى الرَّحْمَنَ عِبْدًا ۝ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدُّهُمْ عَدًّا ۝ وَكُلُّهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فَرَدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنَ
وَدًا ۝ فَإِنَّمَا يَسِّرُنَّهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لَّا ۝ وَكُوَّا هَلْكَنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۝ هَلْ تُحْسِنُ مِنْهُمْ مِّنْ
أَحَدٍ أَوْ تُسْمِعُ لَهُمْ كَزًا ۝

(৮৮) তারা বলে : দয়াময় আল্লাহু সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিচয় তোমরা তো এক অস্তুত কাও করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমগুল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহুর জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমগুল ও ভূমগুলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহুর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিম্বাইতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। (৯৬) বারা বিশ্বাস হ্রাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহু ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর স্বারা পরহিয়গারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে খৎস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শনতে পান ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কাফিররা) বলে : (নাউবিজ্ঞাহ) আল্লাহু তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক প্রিস্টান অল্লসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই ভাস্ত বিশ্বাসে লিঙ্গ ছিল। আল্লাহু তা'আলা বলেন) তোমরা (এ কথা বলে) শুক্রতর কাও করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা তেজে পড়বে ; কারণ তারা আল্লাহুর সাথে সন্তানকে সরক্ষযুক্ত করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহু তা'আলাৰ জন্য শোভনীয় নয়। (কেবলা) নভোমগুল ও ভূমগুলে

যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহু তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি সবাইকে শীঘ্ৰ কুদুরত দারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং (শীঘ্ৰ জ্ঞান দারা) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহু তা'আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে। সুতরাং আল্লাহুর সন্তান ধাকলে আল্লাহুর মতই “সদাসর্বদা বিদ্যমান” গুনে উগাছিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদুরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহুর সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরিটির বিপরীত। সুতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরণে হতে পারে?)

নিচয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পদান করে, আল্লাহু তা'আলা(তাদেরকে উত্তীর্ণিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে,) তাদের জন্য (স্ট জীবের অভ্যরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দারা আল্লাহ-ভীকুন্দেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কিপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতর্কীকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শাস্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্রুং করেছি। (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন? (এখানে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কাফিররা এই জাগতিক শাস্তিরও যোগ্য। যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাফিরের উপর এই শাস্তি পতিত হয়নি; কিন্তু আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَخْرُ الْجِبَالَ مَدًا এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বৃক্ষ ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বৃক্ষ ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানবলী প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্র পর্যন্ত উল্লিখ নয়। এই বৃক্ষ ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বন্দু আল্লাহুর মানের তসবীহ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে: وَإِنْ مَنْ شَاءْ فَلَا يَسْتَعْجِلْ بِحَفْنَدٍ; অর্থাৎ আল্লাহুর প্রশংসা কীর্তন করে না,— এমন কোন বন্দু দুনিয়াতে নেই। বন্দুসমূহের এই বৃক্ষ ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহু তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত আল্লাহুর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্ত্রিত ও ভীত হয়ে পড়ে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস বলেন: জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টি বন্দু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ হয়ে যাওয়ার উপকৰণ হয়। —(রহম মা'আনী)

أَرْدَىٰ وَعَذَّلَهُمْ أَنَّهُمْ أَنْجَلُهُمْ رَبِّهِمْ । অর্দাঃ আল্লাহু তা'আলা সবগু মানবমওলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে প্রৱোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের শোকমা ও চোক আল্লাহুর কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

سَبَّاجُ مَلِئُهُ الرَّحْمَنُ وَدَا । অর্দাঃ ইমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহু তা'আলা বহুভূত ও জ্ঞানবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইমান ও সৎকর্ম পূর্ণক্রিপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কৃপ্তভাব থেকে মুক্ত হলে ইমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারম্পরিক ভালবাসা ও সম্মৌতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বক্ষনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টি জীবের মনেও আল্লাহু তা'আলা তাদের প্রতি মহকৃত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ইত্যাদি হাদীসগুলোতে হয়রত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহু তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাইলকে বলেন, আমি আমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাইল সব আকাশে এ কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবর্তীর হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন : কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় : **إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَبَّاجُ مَلِئُهُ الرَّحْمَنُ وَدَا ।** (জুলুল মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়ান বলেন : যে ব্যক্তি সর্বাঙ্গকরণে আল্লাহুর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহু তা'আলা সমস্ত ইমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।—(কুরতুবী)

হয়রত ইবরাইম খলীলুল্লাহ (আ) যখন ত্রী হাজেরা ও দুঃখপোষ্য সন্তান ইসমাইল (আ)-কে আল্লাহুর নির্দেশে মৃক্তার তত্ত্ব পর্বতমালা বেষ্টিত ঘরমন্ডিতে রেখে সিরিয়া অত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন : **فَاجْعَلْ أَفْنَدَةً مِّنْ النَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ ।** হে আল্লাহু, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু সোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মৃক্তা ও মৃক্তবাসীদের প্রতি মহকৃতে সমস্ত বিশ্বের অন্তর আপৃত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দুরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মৃক্তার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَنْسَنْمَعَ لَهُمْ رَكْزَ—বোধগম্য নয়—এমন ক্ষীণতম শব্দকে বলা হয় ; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহু তা'আলার আয়াব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ল আর শোনা যায় না।

سُورَةُ طَهٌ সূরা তোয়া-হা

মকাব অবতীর্ণ, ১৩৫ আমাত, ৮ রক্ত

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম-ও (كَمَا ذُكِرَ السَّخَارِيُّ)। কারণ এতে হ্যরত মুসা কলীমুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত হ্যরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা নভোয়ল ও ভূমগল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন। (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে শোনান), তখন কেরেশতারা বলেছিলেনঃ ঐ উচ্চত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; ঐ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিফ্য করবে এবং ঐ মুখ অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী উমর ইবনুল খাতাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে সুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। সীরাত ইস্থাদিতে এ ঘটনা প্রমিঙ্গ ও সুবিদিত।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খাতাব একদিন খোলা তরবারি হত্তে মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করল : কোথায় যাচ্ছেন ? উমর ইবনে খাতাব বললেনঃ আমি ঐ পথজ্ঞ ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কুরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের মিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বলল : উমর, তুমি মারাত্মক ধোকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে আর তাঁর গোত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে বছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে ? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে দাগ কাটল। তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী খাকাব ইবনে আরত স্বামী-ঝীকে সহীফায় লিখিত কোরআন পাকের সূরা তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন।

উমর ইবনে খাতাবের আগমন টের পেয়ে হ্যরত খাকাব গৃহের এক কক্ষে অধ্বা কোণে আস্থাগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে সুকিয়ে ফেললেন।

কিন্তু তাতে কি হয়, উমরের কানে খাক্কাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এই পঢ়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল ? ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন :) ও কিন্তু না। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন : আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগিনীকে সাঙ্গে ইবনে যায়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগিনী উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন : শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুত্ত হলেন এবং বোনকে বললেন : সহীফাটি আমাকে দেখাও যা তোমরা পড়ছিলে ; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখার জন্য চাইলেন। ভগিনী বললেন : আমরা আশংকা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন : তোমরা তয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশাবিত্ত হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ শৰ্প করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। উমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হলো। সহীফায় সূরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেন : এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সমানার্থ। খাক্কাব ইবনে আরত গৃহে আবাগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। উমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন : হে উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহর রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের দোয়ার ফলস্থিতিতে তোমাকে ঘনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী (সা)-কে একপ দোয়া করতে শুনেছি : اللهم ابِدِ الْاسْلَامَ بَابِيِ الْحُكْمِ بْنَ هَشَامَ أَوْ بِعُمْرِيْبِينَ بَلْ بَلْ تَعَالَى هে আল্লাহ, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল)-এর মাধ্যমে না হয় উমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্বীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাক্কাব বললেন : হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন : আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরআনী)-এর পরবর্তী ঘটনা সবাইই জানা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ○

طَهٌ ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقِقَ ۝ لَا إِلَّا تَذَكَّرُهُ لِمَنْ يَخْشِي ۝
 تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
 اسْتَوْىٰ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
 الْتَّرَىٰ ۝ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۝ أَللَّهُ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ ۝ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝

পরম কর্মান্বয় দয়ালু আল্লাহর নামে তফ্র করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্রেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন অবজীর্ণ করিনি। (৩) কিছু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবজীর্ণ, যিনি ভূমগল ও সমৃক্ষ নভোমগল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাচীন হয়েছেন। (৬) নভোমগল, ভূমগল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকর্ত্তও কথা বল, তিনি তো শক্ত ও তদপেক্ষাও শক্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ, তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

তোয়া-হা (এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি কোরআন (পাক) এজন্য অবজীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট করবেন ; বরং এমন ব্যক্তির উপদেশের জন্য (অবজীর্ণ করেছি), যে (আল্লাহকে) ভয় করে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ করা হয়েছে, যিনি ভূমগল ও সমৃক্ষ নভোমগল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি পরম দয়াময়, আরশের উপর (যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ) সমাচীন (ও বিরাজমান) আছেন (যেভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমগলে, ভূমগলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমগলের উপরে) এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত যাটি, যাকে ত্রুটি বলা হয়, তাৰ নিচে যা আছে। উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো হলো আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও আধিগত্য।) আর (জানের পরিধি এই যে) যদি তুমি (হে সংৰোধিত ব্যক্তি) চিন্কার করে কথা বল, তবে (তা শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই-ই) তিনি (এমন যে)

গোপনভাবে বলা কথা (বরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা (অর্থাৎ যা এখনও মনে মনে আছে) জানেন। (তিনি) আস্তাহ, তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। তাঁর খুব ভাল ভাল নাম আছে। এগুলো তাঁর শুণগরিমা বোঝায়। সুতরাং কোরআন এমন সর্বত্ত্বে শুণগরিত স্বার অবঙ্গীর্ণ প্রস্তু এবং নিশ্চিত সত্য।

ଆନୁଷ୍ଠିକ ଜୀବନ ବିଷୟ

‘^{४८} এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উকি রয়েছে। হ্যুরত ইবনে আবুস থেকে এর অর্থ যার্জুল (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে খিন্সিয়া (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, ^{৪৯} ও লুস্তুরাত্তাহ (সা)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হ্যুরত আবু বকর সিন্ধীক (রা) ও বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে উকি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন: কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে ^{৫০} এর নাম বেশ কিছু সংখ্যক বঙ্গ অক্ষর উন্নিষিত রয়েছে। এগুলো অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম আল্লাহ ব্যক্তিত অপর কেউ জানে না। ^{৫১} শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

— مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَعُ فِي — شবّهটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্রেশ, পরিশম ও কঠ। কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সারারাত ইবাদতে দখাইয়ান থাকতেন এবং তাহাজুন্নদের নামাযে কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পা ফুলে যায়। কাফিররা কোন রকমে হিদায়েত সাত করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবৃল করুক তিনি সারাদিন এ চিঞ্চায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই উভয়বিধি ক্রেশ থেকে উজ্জ্বার করার জন্য বলা হয়েছে : আপনাকে কঠে ও পরিশমে ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এক কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নামিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্বাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজুন্নদ পড়তেন। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবৃল করল না, তা নিয়ে চিঞ্চা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। —(কুরতুবী- সংক্ষেপিত)

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবোধবহু। এই হাদীসটি হয়রত সালাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للعلماء يوم القيمة اذا قعد على كربله لقضاء عباده انى لم اجعل علمي وحكمتني فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا ابالى -

রাসূলসুলাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বাস্তাদের আমলের ফয়সালা করার জন্য তাঁর সিংহসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেন : আমি আমার ইল্ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গুনাহ ও ক্রটি সন্দেশে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরাগ্য করি না।'

কিন্তু এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত ইল্মের মুক্ত অর্থাৎ আল্লাহর ডয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপত্র নয়。وَاللَّهُ أَعْلَمُ ।

(আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের থেকে একপ বর্ণিত আছে যে, এর ব্রহ্ম ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা **متشابهات** তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। একপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপরের করতে পারে না।

—আর্দ্ধ ও তেজা মাটিকে **تُرْىٰ** বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নিচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই **تُرْىٰ** পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নিচে কি আছে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সন্দেশে মাটি খুঁড়ে এপার থেকে উপরে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও আল্লাস্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে; কিন্তু মাত্র হয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নিচে এমন প্রস্তর সদৃশ তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র হয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান সাপ্ত করতে পেরেছে; অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

—**مَانُوش** মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় **سِرْ وَأَخْفِي**। বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই

জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদ্দিত হবে।

وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ⑩ إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي
أَنْسَتُ نَارًا عَلَىٰ إِتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبِيسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَىٰ النَّارِ هُدًى ⑪
أَتَهَا نُودِي بِيْمُوسَىٰ ⑫ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَمُ نَعْلِيْكَ هُنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقْدَسِ طَوْيٌ ⑬ وَأَنَا أَخْتَرُكَ فَاسْتَعِمُ لِمَا يُؤْتِي ⑭ إِنِّي أَنَا اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ⑮ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِزِكْرِي ⑯ إِنَّ السَّاعَةَ أَتِيَّةٌ
أَكْدُ أَخْفِيْهَا لِتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ⑰ فَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْهَا مَنْ
لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَبْعَهُ هُوَ هُ فَتَرْدِي ⑱

(৯) আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন পরিবারবর্গকে বললেন : তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। সত্ত্বত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌছে পথের সঞ্চালন পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন তখন আওয়াজ আসল, হে মূসা, (১২) আমিই তোমার পাশনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তোয়ায় রাখেছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা তনতে ধাক। (১৪) আমিই আল্লাহ আমা ব্যক্তিত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার শরণপার্শে নামায কার্যেম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই; যাতে অভ্যোকেই তার কর্মানুবায়ী কল দাঙ করে। (১৬) সৃতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাইশের অনুসরণ করে, সে কেবল তোমাকে তা থেকে নিষ্পত্ত না করে। নিষ্পত্ত হলে তুমি ধৰ্ম হংস হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (অর্থাৎ তা শ্রবণযোগ্য); কেননা তাতে তপুয়ীদ ও নবুয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান নিহিত আছে। সেগুলো প্রচার করলে উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই : যখন তিনি (মাদইয়ান থেকে ফেরার পথে এক প্রবল শীতের

বাতে পথ জুলে ত্বর পর্বতের উপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের আকারে নূর), তখন তিনি পরিবারবর্গকে (পরিবার বলতে একমাত্র স্তু ছিল অথবা খাদিয় ইত্যাদিও ছিল) বললেন : তোমরা (এখানেই) অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার পেছনে পেছনে এসো না। কেননা পরিবারবর্গকে হেড়ে তিনি চলে যাবেন—এরপ সজ্ঞাবনাই ছিল না।) আমি একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সংবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন (লাকड়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে) আনতে পারব (যাতে শীতের প্রতিকার হয়) অথবা (সেখানে) আগুনের কাছে পৌছে পথের সঙ্গান (জানে, এমন ব্যক্তিও) পাব। অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন, তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমি তোমার পালনকর্তা। অতএব তুম জুতা জুলে ফেল। (কেননা,) তুমি পবিত্র “তোয়া” উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপত্যকার নাম।) আমি তোমাকে (নবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে) ঘনোনীত করেছি। অতএব (এখন) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (ঘনোযোগ দিয়ে) তুমতে থাক। (তা এই যে) আমি আল্লাহ। আমা ব্যক্তিত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগা) নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আমি তা (স্টেজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই।— (কিয়ামত আসার কারণ এই যে,) যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন নিশ্চিত, তখন যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিখ্যাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে (অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকতে) বিরত না রাখে (অর্থাৎ তুমি এরপ ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত হয়ে না।) তা হলে তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধৰ্মস হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَلَأْتَكَ حَدِيثَ مُرْسَلٍ—**পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাজ্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসসূলের মাহাজ্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হ্যরত মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারম্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পঞ্চাশয়শ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সা)-এর জানা থাকা দরকার। যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :**

وَكُلَّاً نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَبْنَاءِ الرُّسُلِ مَا تَنْبَثُ بِهِ فَوَادَكَ—**অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি সবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।**

এখানে উল্লিখিত মূসা (আ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হ্যরত মুহাম্মদ (আ)-এর গৃহে এরপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর বিদমত করবেন। তফসীর বাহুরে-মুহীতের রেওয়ায়েত

অনুযায়ী তিনি যখন উক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শুআয়ব (আ)-এর কাছে আরয় করলেন । এখন আমি জননী ও তগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই । ফিরাউনের সিপাহীরা তাঁকে প্রেক্ষণার ও হত্যার জন্য খোজ করছিল । এ আশঁকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন । দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঁকা বাকি ছিল না । শুআয়ব (আ) তাঁকে স্ত্রী অর্ধাং নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকভি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন । পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঁকা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অধ্যাত পথ অবলম্বন করলেন । তখন ছিল শীতকাল ! স্ত্রী ছিলেন অস্তঃসন্তু এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী । সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সঙ্গবন্ধ ছিল । রাত্না ছিল অপরিচিত । তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে ভূর পর্বতের পিচিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন । গভীর অঙ্ককার । কনকনে শীত । বরফসিক্ত মাটি । এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল । মুসা (আ) শীতের কবল থেকে আঘাতকার্যে আগুন জ্বলাতে চাইলেন । তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর ছলে চকমাকি পাথর ব্যবহার করা হতো । এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত । মুসা (আ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন । আগুন জ্বলল না । এই হতবৃক্ষি অবস্থার মধ্যেই তিনি ভূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন । সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর । তিনি পরিবারবর্গকে বললেন । তোমরা এখানেই অবস্থান কর । আমি আগুন দেখেছি । দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা । সম্ভবত আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সঞ্চান জানতে পারব । পরিবার বর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত । কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন বাদেমও সাধে ছিল । তাকে উদ্দেশ্য করেও সংশোধন করা হয়েছে । আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল ; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েন ।

—(বাহুরে মুহীত)

মার্টান্ট— অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন; মুসনাদে আহ্মদে ওয়াহাব ইবনে মুনাবেহ বর্ণনা করেন যে, মুসা (আ) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিশ্঵াকর দৃশ্য দেখতে পেলেন । তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে ; কিন্তু আকর্ষণের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না ; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও উজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে । মুসা (আ) এই বিশ্বাকর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন কুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন । অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন । বলা বাহ্যিক, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল । কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো । তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন । মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না । তিনি এই অত্যাক্রম আগুনের প্রভাবে বিশ্বাসিত্ব ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো । (কাহল

মা'আনী) মূসা (আ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার 'সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

بَلْ مُوسَىٰ يَأْمُرُنِي أَنِّي أَنَا رَبُّ فَلَمَّا خَلَقْتَنِي
আছে, হযরত মূসা (আ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্ববণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। তনেছেনও অপরূপ ভঙিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধারা উনেছেন। এটা ছিল একটা মুজিথার ঘতই। আওয়াজের সারমৰ্ম ছিল এই যে, যে বন্তকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়—আল্লাহ তা'আলাৰ দৃষ্টি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মূসা (আ) কিরণে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলাৰই আওয়াজ! এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলাৰই আওয়াজ। এছাড়া মূসা (আ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঐচ্ছিল্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসে নি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়—হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্ববণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলাৰই।

মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলাৰ শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্ববণ করেছেন : রহল-মা'আনীতে মুসলাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা (আ)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাববায়েক (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হলো : আমি তোমার উপরে, সামনে পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আ) আর করলেন : আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশ্তার কথা শুনছি ; জওয়াব হলো : আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রহল মা'আনীর ঘষ্টকার বলেন : এ থেকে জানা যায় যে, মূসা (আ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশ্তাদের যথ্যস্থৰ্তা ব্যতীত নিজে উনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামা'আতের মধ্যে একদল আলিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরস্তন হওয়া সন্তোষ শ্ববণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তাৰ জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষম্যিক ভাষায় প্রকাশ কৰা হয়। এরজন্যে সুলতা ও দিক শৰ্ত। একপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে শ্ব কালাম শোনেন নি এবং শুধু কানেই শোনেন নি, বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধারা উনেছেন। বলা বাহ্য্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সভাবনা থেকে যুক্ত।

সন্ধিমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : مَلَكَ لَهُ جُوْتَاهُ بِلْ مُوسَىٰ
দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সমস্ত প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আ)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্মের চর্মনির্মিত। হয়়ন্ত আঙী, হাসান বসরী ও ইবনে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৯

জুরায়াজ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মূসা (আ)-এর পদব্যয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক—এটাই হিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন : বিনয় ও ন্যূনতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন, পূর্ববর্তী ব্যুর্গগণ বায়তুল্লাহুর তওয়াক করার সময় একল করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন : اَنْتَ فِي مُثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلُعْ تَعْلِيقَكَ اَنْتَ فِي مُثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلُعْ تَعْلِيقَكَ অর্থাৎ তুমি ধূম এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফিকাহবিদদের মতে জায়েব। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে; কিন্তু সাধারণ সুন্নত একল প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হতো। কারণ এটাই বিনয় ও ন্যূনতার নিকটবর্তী। —(কুরতুবী)

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ
স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন ; যেমন বায়তুল্লাহ, মজজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী।
তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যক্তম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে
অবস্থিত। —(কুরতুবী)

কোরআন শুবশের আদব : ﴿فَاسْتَبِّغْ لِمَا يُوحَىٰ وَلَا تَمْسِحْ بَلْ تَطْهِيرًا﴾ ইবনে মুনাবেরহু থেকে বর্ণিত
রয়েছে, কোরআন শুবশ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রতদেশকে কাজে কার্যকলাপ থেকে
নির্বাচিত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপ্ত হবে না। দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম
বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি একল আদবসহকারে কালাম শুবশ করে,
আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তওফিক দান করেন। —(কুরতুবী)

এই কালামে হ্যারত মূসা (আ)-কে
ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ; অর্থাৎ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল।
বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। —فَاعْبُدْنِي— এর অর্থ শুধু আমার
ইবাদত কর-আমা ব্যক্তিত কারও ইবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর
‘السَّاعَةَ أَنْتَ بِهِ’ বলে পরকাল বর্ণনা করা হয়েছে। —فَاعْبُدْنِي— এই নির্দেশে নামাযের কৃত্ত্বাও
রয়েছে ; কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণে এই যে, নামায সমস্ত ইবাদতের
কেরাই ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের কৃত্ত্ব, ইস্লামের মূল এবং নামায বর্জন
কর্তৃত্বের আলামত।

উক্তেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহর কৃত্ত্ব। নামায
আদ্যোপাত্ত যিকরই যিকর—মুখে অন্তরণে এবং সর্বাঙ্গে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা
আল্লাহর কৃত্ত্ব থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কেন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী
এক অর্থ একল যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপ্ত
থাকার দ্রুত নামাযের কৃত্ত্ব খুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ
হয় অথবা নামাজের কথা শ্রবণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে। —فَاعْبُدْنِي— অর্থাৎ

কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই ; এমনকি পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও । ১৮—একাং বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে জীবন ও সৎ কাজে উদ্বৃত্ত করা উদ্দেশ্য না হলে, আমি কিয়ামত আসবে—একথা প্রকাশ করতাম না ।

كُلْ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى—(যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়) । এই বাক্যটি “^{أَنْتَ} শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে । রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয় । এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না । কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়—একটি নমুনা হয় মাঝে । তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শান্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে ।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি ^{أَنْتَ} এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে । রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও চেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক ।—(ঝহল-মা'আনী)

فَلَا يَصُدُّكُمْ هَذِهِ الْأَيْمَانُ
এতে হয়ত মুসা (আ) -কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানভাবে পথ বেছে নিয়ে না । তা'হলে তা তোমার ধৰ্মসের কারণ হয়ে যাবে । বলা বাহ্য্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থকেন । তাঁদের তরফ থেকে একপ অসাবধানভাবে আশংকা নেই । এতদসত্ত্বেও মুসা (আ) -কে একপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উদ্ধত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো । এতে তাঁরা বুঝবে যে, আল্লাহর পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাঁরীদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের ক্ষতিকৃত যত্নবান হতে হবে ।

وَمَا تِلْكَ بِرَبِّيْنِكَ يَوْسَىٰ ① قَالَ هِيَ عَصَمَىٰ اٰتُوكُمْ عَلَيْهَا وَاهْشِبْ ②^{وَهُنَّ}
 هَلْ أَغْنَمُّ وَلِيٰ فِيهَا مَارِبُ اُخْرَىٰ ③ قَالَ أَعْقَهَا يَمْوَسَىٰ ④ فَالْقَهْمَهَا فِي ذَاهِي
 حِيَةٌ تَسْعِيٰ ⑤ قَالَ خَذْهَا وَلَا تَخْفِيْ ⑥ لِقَهْ سَنْعِيْدُهَا سِيرَتَهَا الْأَوْلَىٰ ⑦
 وَاضْرِمْ يَدِكَهَا إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بِيَضْنَاءِ مِنْ غَيْرِ سُوِّيْدَهَا اُخْرَىٰ ⑧
 لِنُورِيْكَ مِنْ أَيْتَنَ الْكَبْرَىٰ ⑨ إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ⑩

(১৭) হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি ? (১৮) তিনি বললেন : এটা আমার লাভটি, আমি এর উপর তার দেই এবং এর অর্থ আমার হাগশালের জন্য বৃক্ষশত ঝেড়ে

ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে । (১৯) আল্লাহু বললেন : হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর । (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । (২১) আল্লাহু বললেন : তুমি তাকে ধর এবং তর করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবহায় কিরিয়ে দেব । (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নির্দর্শনজুল্পে ; কোন দোষ ছাড়াই । (২৩) এটা এজন্যে বে, আরি আমার বিরাট নির্দর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই । (২৪) ফিরাউনের নিকট যাও, সে দাক্ষ উজ্জ্বল হয়ে থেছে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহু তা'আলা মূসা (আ)-কে আরও বললেন :] হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি ? তিনি বললেন : এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময়) এর উপর তর দেই এবং (কোন সময়) এর দাঢ়া আমার ছাগপালের অন্য (বৃক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে । (উদাহরণত কাঁধে ঝেথে আসবাবপত্র খুলিয়ে নেওয়া, এর সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি) । আল্লাহু বললেন : একে (অর্ধাং লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা । অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা (আল্লাহর কুদরতে) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল । [এতে মূসা (আ) ভীত হয়ে পড়লেন] । আল্লাহু বললেন : তুমি একে ধর এবং তর করো না, আমি এখনি (অর্ধাং ধরতেই) একে পূর্বাবহায় কিরিয়ে দেব । (অর্ধাং এটা আমার লাঠি হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না । এ হচ্ছে এক মু'জিয়া !) এবং (দ্বিতীয় মু'জিয়া এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম) বগলে রাখ । (এরপর বের কর) সেটা নির্দোষ (অর্ধাং কোন ঝবলকুঠি ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে (আমার কুদরত ও তোমার নবুয়াতের) অন্য এক নির্দর্শনজুল্পে । (লাঠি নিক্ষেপ করা ও হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার (কুদরতের) বিরাট নির্দর্শন্যাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই । (অতএব এখন এসব নির্দর্শন নিয়ে) ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমালজ্বন করেছে—(খোদায়ী দাবি করে) তুমি তার কাছে তঙ্গীদ অচার কর । তোমার নবুয়াতে সম্মেহ করলে এসব মু'জিয়া দেখিয়ে দাও ।]

আনুষঙ্গিক জ্ঞানব্য বিবরণ

وَمَا تَلَكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسى ! —আল্লাহু রাবুল আল্লামীনের পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে একপ জিজ্ঞেস করা নিস্মদেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকূল্য ও মেহেরবানীতে সূচনা হিল, যাতে বিশ্বকর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহর কালাই শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায় । এটা ছিল একটা হৃদয়ভাপূর্ণ সরোধন । এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে ঝপাঞ্চরিত করা উদ্দেশ্য ছিল । তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে দাও । তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঁচের লাঠি সার, তখন একে সাপে ঝপাঞ্চরিত করার মু'জিয়া প্রদর্শন

করা হলো। নতুনা মূসা (আ)-এর মনে এক্ষণ ধারণার সভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অঙ্ককারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এলেছি।

فَالْمُسَّا (আ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি ? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (আ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরও করেছেন। এক এই — ‘ঝঁঝার, দুই, আমি একে অনেক কাজে লাগাই ; প্রথমত এর উপর ভর দেই ; দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আবাত করে আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষগত খেড়ে ফেলি এবং তিনি এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিত্তারিত জওয়াবে ইশ্ক ও মহবত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশ্ক ও মহবতের দাবি এই যে, প্রেমাঙ্গদ যখন অনুকূলাবশত মনোযোগ দান করেছেন তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাত্তিরিক্ত নিঃসংকোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন — وَلَنْ فِيهَا مَأْرِبٌ أَخْرَى — আর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেইসব কাজের বিত্তারিত বিষয়গত দেননি।—(রহস্য-মাধ্যানী, মাঘহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এক্ষণ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জারোয়।

মাসআলা ৪ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গবরগণের সুন্নাত। রাস্লুল্লাহ (সা)-এরও এই সুন্নাত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।—(কুরতুবী)

فَإِذَا هَيَّتْ شَفْعِي হয়রত মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি আল্লাহর নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পর্যবেক্ষণ হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে, আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانْ كَانْ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে، অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে تَعْبَانْ بَلَّه বলা হয় : আলোচ্য আয়াতে حَبَّ بَلَّه বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে حَبَّ بَلَّه বলা হয়। এসব আয়াতের পারম্পারিক বিরোধ নিরসন এভাবে সভবপর যে, সাপটি উরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল ; কিন্তু বড় সাপ ব্যাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে, تَعْبَانْ শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে تَعْبَانْ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।—(মাঘহারী)

جَنَاحٌ وَاضْسُمْ يَدُكَ الَّيْ جَنَاحٌ
আসলে জন্মুর পাথাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহতে অর্থাৎ
বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় বালমল করতে থাকবে।
হয়রত ইবনে আবুস থেকে এর অরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

شَرْفُ بَيْضَا
—শীয়া রাসূলকে দুটি বিরাট মুজিয়ার অঙ্গ দ্বারা সুসজ্জিত করার পর
আদেশ করা হওয়েছে যে, এখন উক্ত ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়ার জন্ম চলে যাও।

قَالَ رَبِّ اشْرَهْلِيْ صَدْرِيْ ⑩ وَيَرِلِيْ امْرِيْ ⑪ لَا وَاحْلَلْ عُقْدَةَ مِنْ
لِسَانِيْ ⑫ يَفْقِهُوْ اقْوَلِيْ ⑬ وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيرًا مِنْ اهْلِيْ ⑭ هَرُونَ أَخِيْ
اَشْلَدْ دِبَاهَ اَزِيرِيْ ⑮ وَاسْرِكَهِ فِي امْرِيْ ⑯ كَسِيْحَكَ كِثِيرًا ⑰ وَنَذْ كُرَكَ
كِثِيرًا ⑱ اَنْكَ كَنْتَ بِنَابِصِيرَا ⑲ قَالَ قَدْ اوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَمْوَسِيْ ⑳

(২৫) মূসা বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন।
(২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর
করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের
মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন।— (৩০) আমার ভাই হারুনকে।
(৩১) তাঁর মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং তাঁকে আমার কাজে
অংশীদার করুন (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার পরিদ্রোগ ও মহিমা ঘোষণা
করতে পারি। (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্বরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি
তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ বললেন : হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ
তা তোমাকে দেয়া হলো।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মূসা] (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত
দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই শুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার
জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং বললেন : হে আমার
পালনকর্তা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশি) প্রশস্ত করে দিন (যাতে প্রচারকার্যে
হীনস্থন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের) কাজ
সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দূর হয়ে যায়)
এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির) জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা
বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিয়ুক্ত
করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারুনকে। তাঁর মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাঁকে
আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ তাঁকেও পয়গম্বর করে প্রচারকার্যের

আদেশ করুন, যাতে আমরা উভয়েই প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারি এবং আমার অস্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে আমরা উভয়েই (প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে (শিরক ও দোষকৃতি থেকে) আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং আপনার (গুণবলীর) অচুর পরিমাণে আলোচনা করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রত্যেকের বর্ণনা অপরের সমর্থনে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে)। নিচ্ছয় আপনি আমাদেরকে (এবং আমাদের অবস্থা) সম্যক অবলোকন করছেন। (এ অবস্থাদৃষ্টি আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আপনার খুব জানা রয়েছে)। আল্লাহ বললেন : হে মুসা, তোমার (প্রত্যেকটি) প্রার্থনা (যা 'شَرِحْ لِبْ بِ'থেকে বর্ণিত হয়েছে) মঙ্গুর করা হলো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মুসা (আ) যখন আল্লাহ'র কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়াত ও রিসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ স্বত্ব ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই স্বারস্ত হলেন। কারণ, তাঁরটি সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো : ১. সিমুখে বয়ণ করার ঘনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ'র দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া **رَبِّ أَشْرَعْ لِبْ بِ** অর্থাৎ আবার বক্ফ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়াতের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। দ্বিমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা উন্নতে হয়, তা সহজ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া (অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন।) এই উপলক্ষি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়াতেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটা ও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ'র কাছে এভাবে দোয়া করবে :

اللَّهُمَّ انْطُفْ بِنَافِي تَيْسِيرٍ كُلَّ عَسِيرٍ فَإِنْ تَيْسِيرَ كُلُّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ
بَسِيرٌ

(অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া (অর্থাৎ আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুবাতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মুসা (আ) দুঁধ পান করার যমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফিরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মুসা দুধ ছেঁড়ে দিলে ফিরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্রের পেন্ডের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন

শিশু মূসা (আ) ফিরাউনের দাঢ়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছাঢ়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছাঢ়ি দ্বারা তিনি ফিরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফিরাউন রাগাহিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন : রাজাধিরাজ ! আপনি অবৃত্ত শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফিরাউনকে পরীক্ষা করামোর জন্য আছিয়া একটি বাসনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মূসা (আ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবৃত্ত শিশু শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাঢ়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অঙ্গতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহর ভাষী রাসূল ছিলেন, যাঁর উভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ) আগন্তের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাঢ়াতে চাইলেন; কিন্তু জিবরাইল তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বাসনে রেখে দিলেন এবং মূসা (আ) তৎক্ষণাতে আগন্তের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রাপ্তিত নয় ; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অঙ্গতাবশত। এ ঘটনা থেকেই মূসা (আ)-এর জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই **وَلَمْ يَكُنْ** বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই মূসা (আ) দোয়া করেন। —(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে ; কারণ রিসালত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ)-এর সব দোয়া কবূল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামির দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু ব্যাং মূসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে রিসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথা বলেছেন যে, **وَمُؤْفِسٌ مِّنْ يَسِّرٍ**—অর্থাৎ হারুন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, **وَلَمْ يَكُنْ**—অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিক্ষার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলিয় এর উন্নরে বলেন : হযরত মূসা (আ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। বলা বাহ্য্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবূল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া **وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ** অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক

রাখে। হযরত মুসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোৰা বহনকাৰী। রাষ্ট্ৰের উজির তাৰ বাদশাহৰ বোৰা দায়িত্ব সহকাৰে বহন কৰেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মুসা (আ)-এর পরিপূৰ্ণ বৃদ্ধিমত্তাৰ পৱিচয় পাওয়া যায় যে, কোন সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পৱিচালনাৰ জন্য সৰ্বাপ্রে সহকাৰী ও সাহায্যকাৰীৰ অযোজনীয়তা অনন্বীক্ষণ ; পচন্দসই সাহায্যকাৰী পাওয়া গেলে পৱিবৰ্ত্তিতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকাৰীদল প্রাণ হলে যাৰতীয় উপায় ও উপকৰণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজ কালকাৰ রাষ্ট্ৰ ও সৱকাৰসমূহে যেসব দোষকৃতি পৱিলক্ষিত হয়, চিন্তা কৰলে দেখা যাবে যে, এতলোৱা আসল কাৰণ রাষ্ট্ৰ প্ৰধানেৰ সহকাৰী মন্ত্ৰী ও দায়িত্বশীলদেৱ কৰ্তব্যবিশুদ্ধতা, দুৰ্কৰ্ম ও আযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কাৰণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ঘৰন কোন ব্যক্তিৰ হাতে রাষ্ট্ৰেৰ শাসনক্ষমতা অৰ্পণ কৰেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ কৰুক এবং সুচাৰুজ্ঞপে রাষ্ট্ৰ পৱিচালনা কৰুক, তখন তাৰ সাহায্যেৰ জন্য একজন সৎ উজির দান কৰেন। রাষ্ট্ৰপ্রধান কোন জনৱৰী কাজ ভূলে গেলে তিনি তাকে অৱগত কৰিয়ে দেন। তিনি যে কাজ কৰতে চান, উজির তাতে তাকে সাহায্য কৰেন।—(নাসায়ী)

এই দোয়ায় হযরত মুসা (আ) যে উজির প্রার্থনা কৰেছেন, তাৰ সাথে مَنْ أَفْلَىٰ^ي কথাটিও যুক্ত কৰে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পৱিবারেৰ মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা, পৱিবারভুক্ত ব্যক্তিৰ অভ্যাস-আচৰণ জানাশোনা এবং তাদেৱ মধ্যে পারম্পৰাক সম্মীতি ও মিল-হৰকত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায় ; তবে তাৰ মধ্যে কাজেৰ যোগ্যতা থাকা এবং অপৱেৱ চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শৰ্ত। নিষ্ক ব্যবহৰীতিৰ ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বৰ্তমান যুগে সাধাৱণতাৰে সততা ও আন্তৰিকতা অনুপস্থিতি এবং প্ৰকৃত কাজেৰ চিন্তা কাৰণ মধ্যে পৱিলক্ষিত হয় না। তাই কোন শাসনকৰ্ত্তাৰ সাথে তাৰ আজীবনৰজনকে মন্ত্ৰী অথবা উপমন্ত্ৰী নিযুক্ত কৰাকে নিষ্কন্নীয় মনে কৱা হয়। যেক্ষেত্ৰে ন্যায়পৰায়ণতাৰ পুৱোগুৱি ভৱসা থাকে, সেখানে কোন সংকৰ্মপৰায়ণ আজীবনকে কোন উচ্চপদ দান কৱা দোষেৰ কথা নয় ; বৰং শুল্কপূৰ্ণ বিষয়াদিতিৰ নিষ্পত্তিৰ জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এৰ পৱ খুলাফায়ে রাশদীন সাধাৱণত তাৰাই হয়েছেন, যাঁৰা নবী-পৱিবারেৰ সাথে আজীবন্তাৰ সম্পর্কও রাখতেন।

মুসা (আ) তাৰ দোয়ায় প্ৰথমে তো অনিদিষ্টভাৱেই বলেছেন যে, উজির আমাৰ পৱিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপৰ নিষ্পত্তি কৰে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির কৰতে চাই, সে আমাৰ তাই হাক্কন-যাতে রিসালতেৰ শুল্কপূৰ্ণ বিষয়াদিতি আমি তাৰ কাছ থেকে শক্তি অৰ্জন কৰতে পাৰি।

হযরত হাক্কন (আ) হযরত মুসা (আ) থেকে তিনি অথবা চার বছৰেৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি বছৰ পূৰ্বেই ইত্তিকাল কৰেন। মুসা (আ) ঘৰন এই দোয়া কৰেন তখন তিনি মিসৱে অবস্থান কৰছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-এৰ দোয়াৰ ফলে তাঁকেও পয়গঘৰ কৰে দেন। কেৱেশতাৰ মাধ্যমে তিনি মিসৱেই এ সংবাদ প্ৰাপ্ত হন। মুসা (আ)-কে যখন মিসৱে ফিরাউনেৰ দাওয়াত দেয়াৰ জন্য প্ৰেৱণ কৱা হৈ, তখন হাক্কন মা'আৱেশুল কুৱআন (৬ষ্ঠ)—১০

(আ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। —(কুরআন)

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ

(আ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। —(কুরআন)

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ وَإِذَا قَاتَلْتُمُ الْكُفَّارَ فَلَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ ۚ

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكُمْ مَرَّةً أُخْرَى ۝ إِذَا أُوحِيَنَا إِلَيْكُمْ مَا يُوحَىٰ ۝
أَنْ أَقْرِنُ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْتُنْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلِيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُولَهُ طَوَّلَتْ عَلَيْكُمْ مَحْبَبَةٌ مِنْهُ وَلَتَصْنَعُ عَلَيْ
عَيْنِي ۝ إِذْ تَمْشِي أُخْتَكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُوكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفِلُهُ مَفْرَجُكُ
إِلَيْكُمْ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنِهَا وَلَا تَحْزَنْ هُوَ قَاتَلَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاهُ مِنْ
الْغَرَّ وَفَتَنَكَ فَتَوْنَا هُوَ فَلِيُثْنَ سَيِّنَ فِي أَهْلِ مَدِينَ هُوَ ثُمَّ حَتَّ عَلَىٰ

قَدْرِيْمُوسِيٌّ ۚ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيٍّ ۚ اذْهَبْ انتَ وَاحْوَكْ بِأَيْتِيٍّ وَلَا

تَنِيَافِيْ ذِكْرِيٍّ ۚ اذْهِبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَقَوْلَاهُ قَوْلًا لِيَنَّا ۚ

لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشِيٌّ ۚ

(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাঠাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাঁকে (মুসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাঁকে তীরে ঠেলে দেবে। তাঁকে আমার শত্রু ও তাঁর শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহাবত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাঁকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাঠার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর চক্র শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুষ্ক্ষিণ্য থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মুসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার শ্বরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উক্ত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাঁকে নত্র কথা বল, ইঞ্জতো সে চিন্তাবন্ধন করবে অথবা ভীত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তো আরও একবার (অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মাঠাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে) ইলহাম দ্বারা বলার (যোগ্য) ছিল। (তা) এই যে, মুসাকে (জল্লাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (সিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিল) ভাসিয়ে দাও। এরপর দরিয়া তাকে (সিন্দুকসহ) তীরে নিয়ে আসবে। (অবশ্যে) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে (কাফির হওয়ার কারণে) আমার শত্রু এবং তারও শত্রু (হয় তো উপস্থিত কালেই; কারণ সে সব পৃত্র সন্তানকে হত্যা করত অথবা ভবিষ্যতে তার বিশেষ শত্রু হবে।) এবং (যখন সিন্দুক ধরা হলো এবং তোমাকে তা থেকে বের করা হলো, তখন) আমি তোমার (মুখমণ্ডলের) উপর নিজের পক্ষ থেকে মায়ামতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, সে-ই আদর করে) এবং যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তত্ত্বাবধানে সালিত-শালিত হও। (এটা তখনকার কথা,)।

যখন তোমার ভগিনী (তোমার খৌজে ফিরাউনের গৃহে) হেঁটে আসল, অতঃপর (তোমাকে দেবে অপরিচিত হয়ে) বলল : (যখন তুমি কোন ধাত্রীর দুখ পান করছিলে না) আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে (উত্তমদলে) লালন-পালন করবে? (সেমতে তারা যেহেতু এমন ব্যক্তি তালাশ করছিল তাই তার কথা মন্তব্য করল। এবং তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল।) অতঃপর (এই কৌশলে) আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে আবার পৌছিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তার কোন দৃঢ়ত্ব না থাকে (যেমন বিছেদের কারণে সে কিছুকাল দৃশ্যমান হিল।) এবং বড় ইউয়ার পর আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে,) তুমি ভূলক্রমে এক (কিবতী) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে (সুরা কাসাসে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে—শাস্তির ভয়েও এবং প্রতিশোধের ভয়েও) অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই (ক্ষমা প্রার্থনার তৎক্ষণ দিয়ে শাস্তির ভয় থেকে এবং যিসর থেকে মাদইয়ানে পৌছিয়ে প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং (মাদইয়ান পৌছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেগুলোতে উন্নীর্ণ করেছি। সুরা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরীক্ষায় উন্নীর্ণ করা যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ ; কারণ, এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য লাভের কারণ। সুতরাং তা হত্যা অনুগ্রহ।)

অতঃপর তুমি (মাদইয়ান পৌছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। হে মূসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবৃত্য ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত হিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর) আমি তোমাকে নিজের (নবী করার) জন্য মনোনীত করেছি। (অতএব এখন) তুমি ও তোমার তাই উভয়েই আয়ার নির্দর্শনাবণী (অর্থাৎ দু'টি মূল মুজিয়া—সাঠি ও ষষ্ঠেত্তু হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ হয়েছে—) নিয়ে (যে হানের জন্য আদেশ হয়ে সেখানে) যাও এবং আয়ার ক্ষরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো না। (এখানে যাওয়ার স্থান বলা হচ্ছে যে) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্বজ্ঞ হয়েছে। অতঃপর (তার কাছে পিয়ে) নন্দি কথা বল। হয়ত সে (সাম্রাজ্যে) উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহর শাস্তিকে) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى
করা হয়েছে, নবৃত্য ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মুজিয়া প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামত ও অরণ করিয়ে দিলেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যবিত হয়েছে। উপর্যুক্তি পরীক্ষা এবং প্রাণলাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসকর পছায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে **অন্তর্ভুক্ত** করে দেব।

মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এক্সপ নয় যে, এই দিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং **أَخْرَى** শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রগতাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রহম-ম'আনী) মূসা (আ)-এর এই আদ্যোপাত্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

أَوْحَيْنَا إِلَيْكُمْ مَا يُوحَىٰ অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফিরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাইলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিলুকে রেখে দরিয়ায় ডাঙিয়ে দাও এবং তার ধর্মসের আশংকা করো না। আমি তাকে হিয়াহতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বল্পা বাহল্য, এসব কথা বিবেকযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা'র শয়াদা এবং তাঁর হিফায়তের অবিশ্বাস্য ব্যবহা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রাসূল নব—এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি ? **وَهُنَّ** শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে—অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ শুণ নয়—নবী, রাসূল, সাধারণ সৃষ্টি জীব বরং জন্ম-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

(أَوْحَى رَبُّكَ إِلَيْنَا النَّصْلُ) আয়াতে শৌমাহিকে ওহীর মাধ্যমে শিকাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহর বাণী পৌছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয় ; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারও অন্যের কোন বিষয়বস্তু জগতে করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবু হাইয়ান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশত জিবরাইল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংক্ষার এবং তরঙ্গীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়াতের ওহীর উদ্দেশ্যেই জনসংক্ষারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এক্সপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস হাপন করা এবং অপরকেও তাঁর স্বীকৃত ও ওহী শানতে বাধ্য করা ; যারা সা মানে, তাদেরকে কাহিনির আধ্যা দেবো।

ইলহামী ওই তথা আভিধানিক ওই এবং নবুয়তের ওই তথা পারিভাষিক ওইর ঘধে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওই সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু মবুয়ত ও নবুয়তের ওই শেষনবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুয়ুর্গের উকিতে একেই 'ওই-তশরীয়া' ও 'গায়র-তশরীয়া'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে-আরাবীর সৃষ্টি বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুর্তক 'খতমে-নবুয়তে' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা-জনীর নাম : رَحْمَل-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' ধাষ্টে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ ভাঁর নাম 'বারেখা' এবং 'কেউ' কেউ 'বাষখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশৰ্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রহমল-মা'আনীর অঙ্কার বলেন : আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

يَمْ شَدِّهِ الرَّبِيعُ الْيَمْ بِالسَّاحِلِ
এখানে শদ্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত মীলনদ বোঝানো হয়েছে। আরাতে এক আদেশ মূসা (আ)-এর মাতাকে দেয়া হয়েছে যে; এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দেরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দেরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি ; রৱং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলিমদের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টিক্রু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয় ; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলক্ষ্মি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলক্ষ্মির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহর তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধুক রহমী চমৎকার বলেছেন :

جَاهٌ وَبَادٌ وَأَبٌ وَأَنْشٌ بَنْدَهُ اند

بَامِنْ وَتُومِرَدَهُ بَاجِقٌ زَنْدَهُ اند

(মৃত্তিকা বাতাস পানি ও অগ্নি আল্লাহর বাত্সা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত ; কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবিত।)

‘يَا خَذْلَهُ عَدْوَلَهُ وَعَدْوَلَهُ’ অর্থাৎ এই সিন্দুক ও চেতনাধ্যাত্মিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শক্তি ; অর্থাৎ ক্রিয়াকল। ফিরাউন যে আল্লাহর দুশ্মন, তা তার কুফরের কারণে সৃষ্টি। কিন্তু মূসা (আ)-এর দুশ্মন হওয়ার

ব্যাপারটি প্রগতিশীলযোগ্য। কারণ, তখন ফিরাউন মূসা (আ)-এর দুশ্মন ছিল না ; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অক্ষের অর্ধ ব্যয় করছিল। এতদসম্বন্ধেও তাঁকে মূসা (আ)-এর শক্তি বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরাউনের শক্তি পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফিরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মূসা (আ)-এর শক্তি ছিল। সে জ্ঞি আহিয়ার মন রক্ষাধৈর শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব অঙ্গ করেছিল। তাই পরেও যখন তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাঁকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বার্চাল হয়ে যাও।—(জাহল মা'আনী, মাযহারী)

এখানে ধাত্রু শপটি-আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
আল্লাহু বলেন : আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বে মধ্যে আদরণীয় হওয়ার
গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সে-ই আদর করতে পাধ্য হতো। ইব্রাত
ইবনে আবাস ও ইকবারা থেকে এরূপ তৎসীরই বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝান হয়েছে।
আরবে বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার বোঢ়ার উত্তম
লালন-পালন করেছি। উপরের উক্ত পদ্ধতি অর্থেই বলে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমার তা'আলার
ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আমার তত্ত্বধানে হবে।
তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফিরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে
যে, সে জ্ঞানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশ্মনকে লালন-পালন করেছ। —(মাযহারী)

মুসা (আ)-এর ভগিনী সিল্কের পশ্চাদ্বাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—**وَفَتَّالْ فَتَّوْ** অর্থাৎ আমি বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি—(ইবনে আবুসাম)। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি—(যাহুচাক)। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাশায়ির একটি দীর্ঘ দাদীসে হ্যারভ ইবনে আবুসের রেওয়ামেতে উন্নত হয়েছে। তা এই :

ମୂଳା (ଆ)-ଏର ବିଷ୍ଟାଯିତ କାହିନୀ : ନାସାରୀର ଶକ୍ତ୍ସୀଦ ଅଧ୍ୟାୟ 'ହାଦୀସୁଲ୍ ଫୁତ୍ତୁମ' ନାମେ ଇବନେ-ଆକାଶେର ରେଓୟାଯେତେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ହାଦୀସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ, ଇବନେ କାଶୀରେ ତା ପୁରୋଗୁରି ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ କରାର ପର ବଜ୍ଞା ହେଁଛେ, ହୃଦାରତ ଇବନେ ଆକାଶ ଏହି ରେଓୟାଯେତଟିକେ 'ମରଫୁ' ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାତିହୀନ ବର୍ଣ୍ଣାର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରାଣ ରାସ୍ତୁଙ୍ଗାହୁ (ସା) -ଏର ବର୍ଣ୍ଣା ଆଖ୍ୟା ଦିଯେଛେ । ଇବନେ କାଶୀର ନିଜେ ତା ସମ୍ପର୍କ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏରପର ଏକଥାଓ ଲିଖେଛେ ଯେ, ଇବନେ-ଜାରୀର ଏବଂ ଇବନେ 'ଆ'ବି ହାତେରେ ତାଂଦେର ଶକ୍ତ୍ସୀର ପାଇଁ ଏହି ରେଓୟାଯେତଟି ବର୍ଣ୍ଣା କରେଛେ ; କିନ୍ତୁ ଏକେ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଇବନେ-ଆକାଶେ ନିଜେର ବର୍ଣ୍ଣା ବଲେଛେ । ମରଫୁ' ହାଦୀସେର ବାକ୍ୟ ଏତେ କୃତ୍ତାପି ବ୍ୟବହରିତ ହେଁଛେ । ମନେ ହୁଯ, ଇବନେ ଆକାଶ ଏହି ରେଓୟାଯେତଟି କାବୈ-ଆହବାରେ କାହିଁ ଥେବେ ଲାଭ କରେଛେ । ଯେମନ ଅନ୍ତରେ ଜାପଣାଯ ଏହିପର ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ହାଦୀସେର ସମାଲୋଚକ ଇବନେ-କାଶୀର ଏବଂ ହାଦୀସେର ଇମାମ ନାସାରୀ

একে 'মরফ' স্বীকার করেন। যারা মরফ' স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অঙ্গীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু দ্বয়ই কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগামোড়া হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে মূসা (আ)-এর বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল কৃত্তল ৪ : ইমাম নাসাফীর সনদে কাসেম ইবনে আবু আইয়ুবের বর্ণনা : আমাকে সাইদ ইবনে জুবায়ির জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আববাসের কাছে মূসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের পুরুষ প্রতিকৃতি আয়াতের তফসীর জিজেস করলাম যে, এখানে ফেন বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আববাস বললেন : এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যন্তে আমার কাছে এস--বলে দেব। পরদিন শুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে পতকাসের ওয়াদা পূরা করিবে নেই। হযরত ইবনে আববাস বললেন : শোন, একদিন ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ পয়দা করবেন। একথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, বনী ইসরাইল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল জন্মাবৎ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুবাত্রও বিধান্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ)। তাঁর ইঙ্গেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোন নবী ও রাসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে।) ফিরাউন এ কথা শুনে চিঞ্চিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাইল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোন নবী ও রাসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাইলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজেস করল : এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? সভাসদরা পরম্পর পরামর্শ করতে আগল। অবশ্যে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, ইসরাইল বংশে কোন ছেলে-সন্তান জন্মাবৎ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেয়তে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রত্যেকের হাতে হুরি থাকত। তারা বনী ইসরাইলের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যাদর হলো। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো বনী-ইসরাইলই আন্তর্জাম দেয়। এভাবে হত্যাক্ষণ অব্যাহত থাকলে, তাদের বৃক্ষদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাইলের মধ্যে কোন পুরুষও অবশিষ্ঠ থাকবে না, যে দেশের কাজকর্ম আশঙ্কাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনর্সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মাবৎ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় বছর যারা জন্মাবৎ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেয়াও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাইলের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুক্তও থাকবে, যারা বৃক্ষদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশি ও হবে না,

যা ফিরাউনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেবতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেয়া হলো। এ দিকে আল্লাহর কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মুসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল যখন সন্তানদেরকে ঝীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারুন (আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মুসা (আ)-এর মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখ বিশাদে মৃহুমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে-আবাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন : হে ইবনে-জুবায়র, فَأَرْبَعَتْنَـ وَـ أَرْبَعَتْنَـ অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মুসা (আ) তখনও দুমিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা মুসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে একপ সাম্মনা দিলেন :

لَا تَحْسِنْ إِلَّا مَنْ يُمْسِيْنَ وَلَا تَخَافْ إِلَّا مَنْ يُمْسِيْنَ اَنَّا رَأَيْنَاهُ اِلَيْكُمْ وَلَا جَاءُوكُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
আমি তাঁর হিফায়ত করব এবং কিছুদিন বিছিন্ন ধারার পর আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রাস্তগণের অস্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন মুসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মুসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে একপ কুম্ভণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে? যদি বাচ্চা জ্ঞেয়ার কাছে থেকে নিহত ও হতো, তবে তুমি নিজ হাতে তাঁর কাষন-সফন করে কিছুটা সাম্মনা পেতে। এখন তো তাকে সামুজিক জন্মরা খেয়ে ফেলবে। মুসা-জননী এই দুঃখ ও বিশাদে মৃহুমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফিরাউনের বাদী-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আসল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বললঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফিরাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হলো যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

ফিরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই ভাবতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মাঝামাঝি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতিপূর্বে বোন-শিশুর প্রতি হালনি। এটা অকৃত পক্ষে আল্লাহর ﴿وَالْأَنْتَ عَلَيْهِ مُمْلِكَةٌ مُّمْبَاهٌ﴾ উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে মুসা-জননী শয়তানের কুম্ভণার ফলে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত ওয়াদা তুলে গেলেন এবং ক্ষেত্রস্থানের ভাষ্যায় তাঁর অবস্থা দাঢ়াল فَاصْبَحَتْ قَوَادِمُ مُؤْسِى অর্থাৎ মুসা-জননীর অস্ত্রে যাবতীয় অসম্ভব ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুরো চিন্তা ছাড়া তাঁর অস্ত্রে আর কোন কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফিরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, মাঝারেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ১১

তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন পঞ্জীর কাছে উপস্থিত হলো এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপন্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌছে হযরত ইবনে-আবুস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন : হে ইবনে জুবায়র, এটা হযরত মুসা (আ)-এর পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফিরাউন-পঞ্জী সিপাহীদেরকে বললেন : একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাইলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উন্ম, নতুন তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না ; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই ভুল দেব। একথা বলে তিনি ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন : এই শিখটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফিরাউন বলল : হ্যাঁ, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায় ; কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে-আবুস বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহর কসম, যদি ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পঞ্জী আহিয়াকে হিদায়েত করেছেন।

মোটকথা, স্তুর কথায় ফিরাউন শিখকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখন ফিরাউন-পঞ্জী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের অহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ কাজ আনজাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আচর্যের বিষয়, শিখটি কারও স্তন পান করল না। এখন ফিরাউন পঞ্জী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিখটি কারও দুধ প্রহণ না করে, তবে জীবিত র্থাকবে কিরণে! তিনি শিখটিকে বাঁদীদের হাতে দিয়ে বললেন : একে বাজারে এবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত, সে কেোন মহিলার দুধ কুল করবে।

এদিকে মুসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কল্যাকে বললেন : বাইরে গিয়ে তার একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুর ও নবজ্ঞাত শিখর কি দশা হয়েছে; সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জলের আহারে পরিণত হয়েছে। মুসা (আ)-এর হিফায়ত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্বরূপে ছিল না। হযরত মুসার ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহর কুদরতের এই জীবা দেখিতে পেলেন যে, ফিরাউনের বাঁদীরা শিখটিকে কোচ্চ নিয়ে ধাঁচীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে যখন জানতে পারল যে, শিখটি কারও দুধ প্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদীরা বুক উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল : আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সঙ্গান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ প্রহণ করবে এবং তাঁরও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যত্ন সহকারে সালন-পালন করবে। একথা শুনে বাঁদীরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সম্মেহ হলো যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিখটির অনুরী অথবা কোন নিকট-আল্লীয়া। ফলে সে আল্লাবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, এ পরিবার তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়ল।

এখানে পৌছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন : এটা ছিল পরীক্ষার ত্রুটীয় পর্ব।

তখন মুসা-জননী নজুন কথা উন্নাবন করে বলল : এই পরিবারটি শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে—এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্নে ও শুভেচ্ছায় কেন ঝটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদীরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপাস্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাকে নিয়ে বাঁদীরা যেখানে সহবেত ছিল, সেখানে পৌছলেন। বাঁদীদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মুসা (আ) তৎক্ষণাত তাঁর স্তনের সাথে একাঞ্চ হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট তরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফিরাউন-পঞ্চী মুসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন দেখলেন এবং বুরালেন যে, ফিরাউন-পঞ্চী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফিরাউন-পঞ্চী বললেন : তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেবলা; অপরিসীম মহবতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির অধৃতে রাখতে পারব না। মুসা-জননী বলুলেন : আমি তো নিজের বাড়িয়র ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পাস করাই। তাকে আমি কিন্তু পে ছেড়ে দিতে পারি ? হ্যা, আপনি যদি সম্ভত হয়ে শিশুকে আয়ার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হিফায়ত ও দেখাশোনায় বিন্দুমাত্রও ঝটি করব না। বলা বাহ্য, তখন মুসা-জননীর মান আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, কয়েকজিল বিশ্বেদের পর আমি তাকে তোমার কাছে ক্ষিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের কাম্পায় অটল রাইলেন। অবশেষে ফিরাউন-পঞ্চী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মুসা-জননী সেদিনই মুসা (আ)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর মালন-পালন করলেন।

মুসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন; তখন ফিরাউন-পঞ্চী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যক্তির হয়ে গেছি। ফিরাউন-পঞ্চী সরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাঁকে উপযুক্ত উপচোকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মুসা (আ) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তাঁর উপর বাদীয়া ও উপচোকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পঞ্চীর কাছে পৌছলেন, তিনি তখন বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপচোকন পৃথকভাবে পোশ করলেন। ফিরাউন-পঞ্চী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপচোকন মুসা-জননীকে দান করে দিলেন। অঙ্গঃপর ফিরাউন-

পঞ্জী বললেন : এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরুষার ও উপটোকন দান করবে। সেখানে তাকে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। মূসা (আ) ফিরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফিরাউনকে রলল : আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর ইস্ত্রাহীম (আ)-এর সাথে গুরুদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশে ও সম্পত্তির ঘাসিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই ঘোষণাক্তিতাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি ?

ফিরাউন যেন সরিং ফিরে পেল। তৎক্ষণাত্মে সঞ্চাল হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে-আবাস এখানে পৌছে পুনরায় ইবনে ঝুবায়রকে বললেন : এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মূসা (আ)-এর মন্তকের উপর ছায়াপ্তি করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পঞ্জী বলল : তুঁ তো এই বাঢ়া আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে ফিরাউন বলল : তুমি দেখ মা, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফিরাউন-পঞ্জী বলল : এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সভ্য ফুটে উঠবে এবং বোৰা শাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অঙ্গতাবশত করেছে, না জেনেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আল্লারক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞানপ্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেন। কেমনো, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফিরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি মূসা (আ)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূসা (আ) মোতির দিকে হাত বাড়তে চেয়েছিলেন ; কিন্তু জিবরাইল তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে ফিরাউন কালাবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিলিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পঞ্জী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন : অটনার আসল ব্রহ্ম দেখলে তো ! এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা র কৃপায় মূসা (আ) আপনি বেঁচে গেলেন। কারণ, তিনি বিবিধভাবে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। মূসা (আ) এমনিভাবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সন্তুষ্টি ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাজার করছে লালিতপালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

তাঁর রাজকীয় সম্মান-সন্তুষ্টি দেখে ফিরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাইলের প্রতি যুদ্ধ, নির্যাতন, অগমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রাইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাইলের উপর অহরহ চলত। একদিন মূসা (আ) শহরের এক পার্শ দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফিরাউন

বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাইল বংশীয়। ইসরাইল বংশীয় ব্যক্তি মূসা (আ)-কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টা দেখে মূসা (আ) নিরতিশয় রাগাবিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা (আ)-এর অসাধারণ সদ্বান ও প্রজাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাইলীকে বলশূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরও জানত যে, মূসা (আ) ইসরাইলীদের হিফায়ত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাইলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাইলী।

মোটকথা, মূসা (আ) রাগাবিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্তলেই আগত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে মূসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হলো। ইসরাইলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।

যখন ফিরাউন বংশীয় লোকটি মূসা (আ)-এর হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেনঃ ‘‘**أَرْبَعَةِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَكُنْ فَقْرَنِي فَأَغْرِيَنِي أَنَّهُ مِنَ الْفَقْرُ الرَّجِيمِ**’’ হে আমার পাদনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি—আমার হাতে স্বলক্ষ্যে ফিরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ ঘটনার পর মূসা (আ) তীরচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের উপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিজ্ঞিয়া হয়েছে এবং ফিরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন ফিরাউনের কাছে পৌছেছে, তা এইঃ জনস্ক ইসরাইলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাইলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে যোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উভয়ের বললঃ হত্যাকারীকে সনাত্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ যদিও তোমাদের আগন লোক; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিয়ো হত্যা করা তার পক্ষে যোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং অমানাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শনে ফিরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্র ছিঁতে লাগল; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

ইঠাঁ একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। পরের দিন মূসা (আ) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাইলীকে অন্য একজন ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে শাড়িহৱত দেবতে পেলেন।

ইসরাইলী আবার তাঁকে দেখামন্তেই সাহায্যের জন্য ডাক দিল । কিন্তু মূসা (আ) বিগত ঘটনার জন্যই অনৃতগু ছিলেন । একগে সেই ইসরাইলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসম্মুট হলেন । তিনি বুরাতে পারলেন যে, মূলত ইসরাইলীই অপরাধী এবং কলহণ্ডিয় । এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) ফিরাউন বংশীয় বাস্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাইলীকেও সতর্ক করে বললেন : তুই গতকলাও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস । কাজেই তুই-ই অপরাধী । ইসরাইলী মূসা (আ)-কে গতকালের ন্যায় রাগাবিত দেখে এবং একথা শনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে । তখন সে কালবিলু না করে বলে ফেলল : হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে ।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল । কিন্তু ফিরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অবেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাইলী মূসা (আ)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে । সংবাদটি তৎক্ষণাত রাজনীতিকারীদের পৌছানো হলো । ফিরাউন একদল সিপাহী মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল । সিপাহীদের বিশ্বাস হিল যে, মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না । তাই তারা ধীরে-সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হলো । এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী মূসা (আ)-এর জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফিরাউনের সিপাহী মূসা (আ)-এর খোঁজে বের হয়ে পড়েছে । সে একটি ছোট গলির পথে অবসর হয়ে মূসা (আ)-কে সংবাদ পৌছিয়ে দিল ।

এখানে পৌছে ইবনে আবাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন : হে ইবনে জুবায়র, এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব । মৃত্যু মাথার উপর ছায়াপাত করেছিল । আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন ।

সংবাদ শনে মূসা (আ) তৎক্ষণাত শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিযুক্ত রণয়না হলেন । তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় সালিত-পালিত হয়েছিলেন । কষ্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় হিল না । মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে ; কিন্তু পথঘাট অজ্ঞান । একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহর উপর ভরসা হিল যে, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন ।

মাদইয়ানের নিকটে পৌছে মূসা (আ) শহরের বাইরে একটি কৃপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন । তারা কৃগে জন্মেরকে পানি পান করাচ্ছিল । তিনি আরও দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডযমান রয়েছে । মূসা (আ) কিশোরীয়কে জিজ্ঞেস করলেন : আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডযমান কেন ? তারা বলল : এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কৃপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন সোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব ।

মূসা (আ) তাদের আভিজ্ঞাত্যে মুক্ত হয়ে নিজেই কৃগ থেকে পানি তুলতে শাগলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতি শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন । তিনি প্রতি তাদের মেষপালকে

তৃষ্ণি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্বয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌছল এবং মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন :

رَبِّنَا لَمْ أَنْزَلْنَا مِنْ خَيْرٍ فَقُبْرَ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়মাত্মের অত্যার্থী, যা আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌছল, তখন তাদের পিতা আকর্যাবিত হয়ে বললেন : আজ তো মনে হয় নতুন কোন ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্বয় মূসা (আ)-এর পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে আদেশ দিলেন : যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাকে ডেকে আনল। পিতা মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত জেনে বললেন : نَجَوْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَنَفَرْتُ مِنْ حَمْدَنْ অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি যালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফিরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের উপর তার কোন ঝোরও চলতে পারে না।

يَا أَبَتْ اسْتَأْخِرْهُ إِنْ خَيْرٌ مِنَ السُّنْنَاجَرْ

অর্থাৎ আকাজান, আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশৃঙ্খল ব্যক্তি চাকরীর জন্য অধিক উপযুক্ত কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আস্তস্মানে কিছুটা আবাস্তি অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিরণে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশৃঙ্খল। তাই তিনি অশু করলেন : তুমি কিরণে অসুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশৃঙ্খল। কন্যা বলল : তাঁর শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করোছি, যখন সে কৃপ থেকে পানি ঝুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশৃঙ্খলার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম ঘজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচ করে ফেলল। অতঃপর ঘতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি উপরে ঝুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল : আপনি আমার পিছে পিছে চলুন ; কিন্তু পেছনে থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশৃঙ্খল ব্যক্তিই একপ কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে বিচিত্র হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর হযরত উত্তীর্ণ আব্দুর রহমান (আ)] মূসা (আ)-কে বললেন : আমি আমার এক কল্যাকে এই শক্তি আপনার সাথে পরিগ্রহস্থোত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবেন। যদি আপনি বেছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরও উত্তম হবে ; কিন্তু আমি এই শক্তি আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না—যাতে আপনার কষ্ট বেশি না হয়। আপনি এই প্রত্যাব-মঞ্চের করেন কि, হযরত মূসা (আ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে আট বছরের চাকরী অনুযায়ী জরুরী হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর মূসা (আ)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

সাইদ ইবনে জুবায়ির বলেন : একবার জামেক প্রিন্টান আলিমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কि, মূসা (আ) উভয় মেয়াদের মধ্য থেকে কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি—বললাম : আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত হয়রত ইবনে আবুআসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হয়রত ইবনে আবুআসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন : আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী ঝরেন্তুই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলাৰ ইচ্ছা ছিল তাঁৰ রাসূল ইমামুল উয়াসাৰ পূর্ণ করলক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি প্রিন্টান আলিমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন : আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের যথে শ্রেষ্ঠ আলিম? আমি বললাম : হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত জনী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর ষষ্ঠন মূসা (আ) স্তীকে সাথে নিয়ে তায়াব (আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কলকনে শীত, গভীর অঙ্গুলি, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাত তিনি তূর পর্বতের উপর আতঙ্ক দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিশ্বকর দৃশ্যাবলী দেখার পর লাঠি ও সুত্র হাতের মুঁজিয়া এবং রিসালত ও নবুয়াতের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হয়রত মূসা (আ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পশাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবর্তীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাস্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। একথে ফিরাউনের কাছেই রিসালতের দাওয়াত পৌছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ তা'আলাৰ দরবারে আবেদন-নিরবেদন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁৰ প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁৰ ভাই হাজুলকে রিসালতে জংশীদার করে তাঁৰ কাছে শুরী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মূসা (আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌছলেন। হাজুল (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফিরাউনকে সত্যের দাওয়ার জন্য তাঁৰ দরবারে পৌছলেন। ফিরুজুল পর্যন্ত তাঁৰা দরবারে হাবির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁৰা প্রবেশাবাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিলিয়ে হাবির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফিরাউনকে বললেন : আর্দ্ধে আর্দ্ধে আমুলা উভয়েই তোমার পালনকর্তাৰ পক্ষ থেকে দৃত ও বার্তাবাহী। ফিরাউন জিজেস কৱল : তোমাদের পালনকর্তা কে ? মূসা ও হাজুল (আ) কোরআনে উল্লিখিত উভৰ দিলেন : مَنْ يُرِيكُنْ لِلْأَذْيَى فَلَنْ يُنَظِّمْ خَلْقَهُ مَنْ يُرِيكُنْ لِلْأَذْيَى فَلَنْ يُنَظِّمْ خَلْقَهُ এরপর ফিরাউন বলল : তুহলে তোমরা কি চাও ? সাথে সাথে সে নিহত কিবর্তীৰ কথা উল্লেখ করে মূসা (আ)-কে অপরাধী সাব্যস্ত কৱল এবং নিজ গৃহে মূসা (আ)-কে লালন-পালন কৱার অনুমতিৰ কথা প্রকাশ কৱল। মূসা (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ঝটি শীকার করে অঙ্গতার ওয়র পেশ করলেন এবং গৃহে আলিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন : তুমি সমগ্র বনী ইসরাইলকে সাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের উপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাছ। এরই ফলক্ষণভিত্তে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পৌছানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলায় যা-ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোন অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ ? ফিরাউন অঙ্গীকার করে বলল : তোমার কাছে রাসূল ইওয়ার কোন আলামত থাকলে দেখাও। মূসা (আ) তাঁর সাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। আপনি তা অঙ্গর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত হলো। ফিরাউন তীক্ষ্ণ হয়ে সিংহাসনের নিচে আঘাতে পেপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য মূসা (আ)-এর কাছে কাকুত্তি-মিনতি করতে লাগল। মূসা (আ) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত বলমূল করতে লাগল। ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মুজিয়া। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্ববস্থায় ফিরে এল।

ফিরাউন অতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা দেখতেই পাইছ। এখন আমাদের করণীয় কি ? সভাসদরা সংগ্রিষ্ঠভাবে বলল : চিন্তার কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই জাদুকর। জাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফিরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোন দাবির কাছে নষ্টি শীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় জাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের জাদু দ্বারা তাদের জাদুকে নস্যাং করে দেবে।

ফিরাউন রাজ্যময় হৃকুম জারি করে দিল যে, যারা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের সরাইকে রাজদরবারে হাযির হতে হবে। সারা দেশের জাদুকররা সমবেত হলে তারা ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল : যে জাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে চান, সে কি করে ? ফিরাউন বলল : সে তার সাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। জাদুকররা অজ্ঞত নিঙ্কবেগের হয়ে বলল : এটা কিছুই নয়। সাঠি ও বশিকে সাপে পরিণত করার যে জাদু, তা পুরোপুরি আমাদের করায়ত। আমাদের জাদুর মুকাবিলা কষার শক্তি কারও নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফিরাউন বলল : জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন জাদুকররা মুকাবিলার সময় ও স্থান মূসা (আ)-এর সাথে পরামর্শক্রমে হির করল। তাদের দৈন দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হলো। ইবনে-আব্দুল্লাহ (বাবে দিন) হিসেবে আপনার অর্থাৎ মূহাররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে মাঝারিমুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ১২

মুকাবিলা: দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফিরাউনের লোকেরা পরম্পরে বলাবলি করতে লাগল : ﴿إِنَّا نَتْبَعُ السَّخْرَةَ أَنْ كَانُوا مِنَ الْفَالِيْنَ﴾ অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই আকা উচিত, যাতে জাদুকররা অর্থাৎ মূসা ও হারন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদের প্রতি বিদ্রূপের ছলে ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের জাদুকরের বিকল্পে মূসা ও হারন (আ) জয়লাভ করতে পারবেন না।

মুকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। জাদুকররা মূসা (আ)-কে বলল : প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ জাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে সূচনা করবঃ মূসা (আ) বললেন : তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের জাদু প্রদর্শন কর। তারা (অর্থাৎ ফিরাউনের আনুকূল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।) বলে কিছু সংর্খ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ) কিছুটা ভয় পেলেন। ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفْفَةً مُؤْسِى﴾ মূসা (আ) মনে মনে ভীত হলেন।

একজন মানুষ হিসেবে এই তয় বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরপ বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এক্ষণও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপন্নি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অঙ্গগ্রহণ সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিক্ষণ লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই গলধণ্ডকরণ করে ফেলল।

ফিরাউনের জাদুকররা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, মূসা (আ)-এর অঙ্গগ্রহণ জাদুর ফলশ্রুতি নয় ; বরং আল্লাহ্র দান। সেমতে জাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঝোঁপা করল যে, আমরা আল্লাহ্ প্রতি এবং মূসা (আ)-এর আনন্দিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাত্রদের কোমর ডেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা তারা সেখানে পর্যন্ত ও লালিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল। ﴿فَغَلَبُوا هُنَّا لَكَ وَأَنْقَلُوا مَسَاغِيْرِنَ﴾

যে সময় এই মুকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী আহিয়া ছিন্নবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহ্র দরবারে মূসা (আ)-এর সহিযোর জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিঞ্চায় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা মূসা (আ)-এর জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।

এ ঘটনার পর মূসা (আ) যখনই কোন মুঁজিয়া প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্র প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিপ্রেক্ষণ করত, তখনই ফিরাউন ওয়াদা করত : এখন আমি বনী ইসরাইলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন মূসা (আ)-এর দোয়ার ফলে আধাবের আশক্তা

টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত : আপনার পালনকর্তা আরও কোন নির্দশন দেখাতে পারেন কি ? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহু তা'আলা ফিরাউন-গোষ্ঠির উপর ঝাড়ুঝুঁড়া, পঙ্গপাল, পরিধেয় বন্ধে উকুন, পাত্র ও খাদ্যবেয়ে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আয়াব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন পাকে এগুলোকে “বিস্তারিত নির্দশনাবলী” শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোন আয়াব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হতো, তখনই মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করে বলত : কোন রকমে আয়াবটি দূরীভূত করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বন্নী ইসলাইলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আয়াব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহু তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন : বন্নী ইসলাইলকে সাথে নিয়ে যিসর ত্যাগ কর। মূসা (আ) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। অত্যুষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্বাবন করল। এদিকে মূসা (আ) ও বন্নী ইসলাইলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহু তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন : যখন মূসা (আ)-তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বন্নী ইসলাইলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্বাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে যিশে যাবে।

মূসা (আ) দরিয়ার নিকটে পৌছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কুণ্ঠাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বন্নী ইসলাইল ভীত-সন্ত্রিত হয়ে বলতে লাগল : لَمْ يُذْرِكْنَاهُ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্বাবন তাদের নজরে পড়েছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার পাটীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহু তা'আলার ওয়াদা মূসা (আ)-এর মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি তৎক্ষণাত লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বন্নী ইসলাইলের পশ্চাদ্বর্তী অংশকে ফিরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল ধ্রায় ধরেই ফেলেছিল। হ্যবরত মূসা (আ)-এর মু'জিয়ায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) বন্নী ইসলাইলসহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্বাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্঵ারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহুর নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌছে মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বল : আমাদের আশক্ত হয় যে ফিরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন মূসা (আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহুর অপার শক্তি ফিরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বন্নী ইসলাইলীদের সবাই তার মৃত্যু বচকে প্রত্যক্ষ করল।

এরপর বনী ইসরাইল সম্বুদ্ধে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল। তারা বহনে নির্ভিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাইল মূসা (আ)-কে বলতে লাগল : **يَأَيُّهَا أَيُّهَا قَاتِلُ الْكُفَّارِ قُوَّمٌ فَجَاهُوكُمْ فَاجْعَلْنَا كَمَا لَمْ يَمْلِئُوا** — হে মূসা, আমাদের জন্যও মারুদ তৈরি করে দাও, যেমন তারা অনেক মারুদ করে নিয়েছে। মূসা (আ)-কে বললেন : তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্কল হবে। মূসা (আ) আরও বললেন : তোমরা পালনকর্তার একসব মু'জিয়া ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসূলভ চিঞ্চাধারা বদলায়নি! এরপর মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় পৌছে তিনি বললেন : তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রভ্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারুন (আ) আমার স্থলাভিক্ষ হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে।

মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহর ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবাৱাত্রির রোয়া রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপনের পৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবাৱাত্রি উপর্যুপরি রোয়ার কারণে ইভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস ঘারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো : মূসা, তুমি ইফতার করলে কেন? [আল্লাহ তা'আলা জানা ছিল যে, মূসা (আ) কোন কিছু পানাহার করেন নি, তখন ঘাস ঘারা মুখ পরিষ্কার করেছেন; কিন্তু পয়গম্বরসূলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।] মূসা (আ) এই সত্য উপলক্ষ্য করে আরয করলেন : হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আগাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গম দূর করে দেই। আল্লাহ তা'আলা বললেন : তুমি কি জান না যে, রোয়াদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়! এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরও দশদিন রোয়া রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মূসা (আ) তাই করলেন।

এদিকে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অভিবাহিত হওয়ার পরও মূসা (আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হলো। এদিকে হারুন (আ) মূসা (আ)-এর চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাইলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেলি। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে—আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত

দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালন করল। হারুন (আ) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ক্ষম হয়ে গেল। অতঃপর হারুন (আ) বললেন : এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাইলের সাথে গাড়ী পৃজ্ঞারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনেক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও মুসা (আ) ও বনী ইসরাইলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্ষেত্রে সে জিবরাইল (আ)-এর একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চালিত হয়ে থার)। জিবরাইলের পা পড়েছে, এমন এক জ্বায়গা থেকে সে এক শুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারুন (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। হারুন (আ) ছনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেন : সবার মত জুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল : এটা তো সেই রাস্তারের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব না ; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হারুন (আ) দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হারুন (আ) দোয়া করলেন : হে আল্লাহ, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল : আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিষ্কেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসেতে পরিণত হোক। হারুন (আ)-এর দোয়া কবূল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত অলঙ্কার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোন আঘা ছিল না ; কিন্তু গাড়ীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আবুস বলেন : আল্লাহর কসম, এটা কোন জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাত্ত্বাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

এই অত্যাশৰ্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাইল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করল : এটা কি ? সে বলল : এটাই তো আমাদের খোদা। কিন্তু মুসা (আ) পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। একদল বলল : মুসা (আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না। আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা মুসা (আ)-এর কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বলল : এগুলো সব শয়তানী ধোকা। এই গো-বৎস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার থলে মনে হলো। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল।

এই মহা অনৰ্থ দেখে হাক্কন (আ) বললেন :

يَأَقْوَمُ أَنَّمَا فَتَنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَآطِبِعُونَا أَمْرِي

অর্থাৎ হে আমার সম্পদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা দয়ায়িত্ব আল্লাহ। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী ইসরাইল বলল : বলুন তো দেখি মূসা (আ)-এর কি হলো, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ দিনের শয়াদা করে গিয়েছিলেন ; এখন চাল্লিশ দিন অভিবাহিত হচ্ছে তবুও তাঁর দেখা নেই। কোন কোন নির্বোধ বলল : মূসা (আ) পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তাঁর খোজে ঘোরাফেরা করছেন।

এদিকে চাল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মূসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই অনন্তরের সংবাদ দিলেন, যাতে সম্পদায় লিঙ্গ হয়ে পড়েছিল ফরাগু মুসী তাঁ কুমুক মুসা (আ) সেখান থেকে ক্রোধাভিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ অর্থাৎ মূসা (আ) তুম্হি হয়ে তার ভাই হাক্কনের মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ তিমিত হলে তাইয়ের সত্ত্বিকার ওয়ার জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজেস করলেন : তুমি এ কাও করলে কেন? সে উত্তর দিল :
فَبَصَّتْ قَبْضَةً مِّنْ أَنْرِ الرَّسُولِ

অর্থাৎ আমি রাসূল জিবরাইলের পদচিহ্নের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বন্ধুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিস্তারিত গোপন রেখেছিলাম।

অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির স্তুপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল।

قَالَ فَلَذِهَبَ فَانْ لَكَ فِي الْحَبْلَةِ أَنْ تَقُولَ لِأَمْسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنَّ
خَلْفَةٌ وَإِنْظُرْ إِلَى الْهِكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ حَرَقَتْهُ ثُمَّ لَنْسَفَتْهُ
فِي الْيَمِّ نَسْفًا -

অর্থাৎ মূসা (আ) সামেরীকে বললেন : যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবে : আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নজুব সে-ও আয়াবে ছেক্ষণের হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আশুনে ভুল করব। অতঃপর এর ভুল দিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে একই ব্যবহারের শক্তি আমাদের হতো না।

তখন বনী ইসরাইল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হলো যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হ্যারত হাক্কন (আ)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে

লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাইল এই মহাপাপ বৃঞ্চিতে পেরে মুসা (আ)-কে বলল : আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

মুসা (আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তুষ্টজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্জানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরুদ্ধ ছিল। তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সন্তুষ্টজন মনোনীত সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মুসা (আ) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবুল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। মুসা (আ) তূর পর্বতে পৌছলে ঝুঁপ্টে ভূমিকম্প সংঘটিত হলো। এতে তিনি প্রতিনিধি দলের সাথে এবং দীর্ঘ কওয়ে বনী ইসরাইলের সাথে খুবই সজ্জিত হলেন। তাই আরু করলেন :

رَبُّ لَوْشَتْ أَهْلَكْتُمْ مِنْ قَبْلٍ وَآيَىٰ أَتَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا۔

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে খৎসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই খৎস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে খৎস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে খৎস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে ? এক্ষতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, মুসা (আ)-এর সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সন্তুষ্ট এবং অনন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের অস্তরে গো-বৎসের মহাত্ম্য বিরাজমান ছিল।

৩. মুসা (আ)-এর এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হলো:-

وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأْكِنْبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكْوَةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبَعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِينَ يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْأَنْجِيلِ۔

অর্থাৎ আল্লাহ থলেন : আমার অনুগ্রহ সরকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার যহুদিতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করে, যাকাত আদায় করে, আমার নির্দর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওবাত ও ইন্জীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা শুনে মুসা (আ) আরু করলেন : পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্পদায়ের তওবা সম্পর্কে আরু করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওয়সহ অন্য কওয়কে রহমত দান করার কথা বলেছিস। আপনি আমার জন্য আরও পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পর্যবেক্ষণের উপরের অস্তর্ভুক্ত করলেন না কেন ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বনী ইসরাইলের তওবা কবুল হওয়ার একাদি পদ্ধতি বলে দেওয়া হলো। তা এই যে, তাদের মধ্যে অত্যোকেই তার পিতা, পুরুষ ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে,

তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। যেহেনে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেখানেই এই পাইকারী হত্যাকাও চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা মূসা (আ)-এর জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গোবৎস-পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুভূত হয়ে তাওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা করুল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আর্দ্ধায়স্তজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি-স্বার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর মূসা (আ) তওবাতের যেসব ফলক রাগায়িত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে পরিত্ব ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাকারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপায়িত সম্প্রদায়ের অধিকারভূক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎসীভূন, শক্তি ও শান-শক্তিতের সোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাইলের প্রতিগোচর হলো। মূসা (আ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন; কিন্তু এই প্রতাপায়িত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাইল আতঙ্কাত্মক হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল : হে মূসা, এই শহরে ত্যানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এই শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

—فَالْرَّجُلُونَ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ—আলোচ রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়ায়িদ ইবনে হারুনকে জিজেস করা হয় যে; হযরত ইবনে আবাস এই আয়াতের কিরাজাত এভাবেই করেছেন কি ? ইয়ায়িদ বললেন : হ্যাঁ, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে **رَجُلُون** (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপায়িত সম্প্রদায়ের দুইব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাইলকে আতঙ্কাত্মক দেখে তারা বলল : আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাইছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের স্বধ্যে যন্ত্রোভল বলতে মোটেই নেই। তারা মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

কেউ কেউ —আয়াতের তফসীর একপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের ছিল।

—قَاتَلَا إِنَّمَّا مُوسَى أَنَّ لَنْ تُدْخِلَهَا أَبَدًا مَادَاهُوا فِيهَا فَلَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتَلَا إِنَّمَّا هُنَّا قَاعِدُونَ—

অর্থাৎ বনী ইসরাইল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও মূসা (আ)-কে কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল : হে মূসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত

কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহু তা'আলার অগণিত নিয়ামত সহেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহলশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনকুণ্ঠ এবং দুর্ঘিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ‘ফাসেক’ (পাগাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহুর পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হলো এবং পবিত্র ভূমি থেকে ঢলিশ বছরের জন্য বর্ষিত করে দেওয়া হলো। এছাড়া তাদেরকে উলুক্ত প্রাপ্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া যে, অস্ত্র হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহুর রাসূল হ্যরত মূসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাক্তির দিমগুলোতেও আল্লাহু তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা ভীত প্রাপ্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার উপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য ‘মাল্লা’ ও ‘সালওয়া’ নাযিল হতো। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে মরলাযুক্ত হতো না এবং ছিল হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর বাঁটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হতো। বনী ইসরাইলের বাঁটি গোত্রের মধ্যে ঝরনাগুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ক্ষেত্র, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত।—(কুরআন)

হ্যরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিবরণবন্ধু অঙ্গীকার করলেন যে, কিবর্তীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবর্তী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাইলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কিবর্তী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিন্তু দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র বাগড়াকারী ইসরাইলী ব্যক্তিই জানত।

মুআবিয়া (রা) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অঙ্গীকৃত হলে ইবনে আব্বাস (রা) রাগবিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সাঁদ ইবনে মালেক যুহন্নীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন : হে আবু ইসহাক, তোমার স্বরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) মূসা (সা)-এর হাতে নিহত কিবর্তীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন তেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাইলী ছিল, না দ্বিতীয় কিবর্তী? সাঁদ ইবনে মালেক বললেন : দ্বিতীয় কিবর্তীই ঘটনা ফাঁস করেছিল। মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—১৩

কেননা সে ইসরাইলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সেই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। ইব্রাম নামায়ী এই বিজ্ঞারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' এছে তফসীর অধ্যায়ে উক্ত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তফসীর গ্রন্থে ইয়ামিদ ইবনে হাজনের সমন্বয়েই উক্ত করে বলেছেন : হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষ্য নয় ; বরং ইবনে আববাসের নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহ্বারের ঐ সব ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উক্ত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাক্যবলীও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে আদোপান্ত হাদীস ও তার উপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন : আমাদের শুন্দেয় শাযখ আবুল হাজ্জাজ মিয়সী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে আববাসের ভাষ্য বলতেন।

উপরিখ্রিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ক্ষাকল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় : কোরআন পাক মূসা (আ)-এর কাহিনীকে এত শুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিপ্রকাশ ঘটিল হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ইমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মেন্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গজন্মে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফিরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-ক্ষমতার এবং প্রত্যুষের আল্লাহ তা'আলার বিশ্বাসকর প্রতিক্রিয়া : ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাইলের ঘন্থে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাইলী ছেলে সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত ধর্মোজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হতো, সেই বছর মূসা (আ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার ছিল ; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাত করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা (আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উত্তর ঘটালেন, যাতে মূসা (আ) স্বযং এই আল্লাহদ্বারা জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল। সারা দেশের ইসরাইলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আ) স্বযং ফিরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিডি অতিক্রম করছিলেন।

دربه بند و دشمن اندر خان بود

حبلة-فرعون زین افسانه بود

(দরজা বক্ষ করে দিল, অথচ শক্র ভিতরেই রায়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা এই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি।)

মূসা-জননীর প্রতি অঙ্গৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ : মূসা (আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাতীর দুখ কবৃল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শক্র ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে ব্রাহ্মন্দে হতো। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে খ্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুখ পেতেন। আল্লাহ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গব্ররকে কাফির মহিলার দুখ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালায়স্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন ; মুক্তি ও এমনভাবে দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঝণী হয়ে রইল এবং উপটোকন ও উপহারের বৃষ্টি ও বর্ষিত হলো। নিজেরই প্রাণপ্রতিষ্ঠি সন্তানকে দুঃখ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাস্তাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হলো না।

শিল্পতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদ : এক হানীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে শিল্পতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুখ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, ধানকাহ, মদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপর্যুক্ত নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরপ নিয়তও করে যে, এই নির্বাণকাজ সৎ কাজে নিয়োজিত হবে, এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে—এজন্য এ কাজকে সে অন্য কাজের ওপর অব্যাধিকার দেয় তবে সে মূসা জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারণ লাভ করবে।

আল্লাহর বিশেষ বান্দারা প্রেমাঞ্চলসুলত মাধুর্য প্রাপ্ত হন, তাদেরকে যে-ই দেখে, সে-ই মহবত করে : ﴿أَفْبَتَ عَلَيْكَ مُحَبَّبٌ مِّنْ نَّارٍ﴾—আয়াতে ইস্তিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাঞ্চলসুলত সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন, পর, শক্র, যিত্র সবাই মহবত করতে থাকে। পয়গব্রদের ক্ষেত্র অনেক উর্ধ্বে, অনেক উলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

মূসা (আ)-এর হাতে ফিরাউনী কাফিরের হত্যাকে ‘ভূলক্রমে হত্যা’ কেন সাব্যস্ত করা হলো : মূসা (আ) জনৈক ইসরাইলী মুসলিমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত দেখে ফিরাউনীকে ঘৃষি মারলেন ; ফলে সে প্রাপ্ত্যাগ করল। মূসা (আ) নিজেও এ কাজকে ‘শয়তানের কাজ’ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির হলুবী ছিল। তার সাথে মূসা (আ)-এর কোন শাস্তিচূড়ি ছিল না এবং তাকে যিষ্ঠী কাফিরদের তালিকাভুক্ত করা যেত না, যাদের জানমাল ও সম্মানের হিকায়ত করা মুসলিমানদের

মায়িদে জ্ঞানিব। সে হিল একাত্তই ইহুবী কাফিৰ। ইসলামী শরীয়তের আইনে এৱপ ব্যক্তিকে হত্যা কৰা গুৰুত্ব নোৱ। এমতাবধায় এ হত্যাকে শর্তানৰে কাজ ও তুল কি কাৰণে সাৰ্বাঙ্গ কৰা ইলো ?

বিলিউ শকসীরে এইসময়ে কেট কেট এ প্ৰস্তুৱ প্ৰতি অক্ষেপ কৰেন মি। আমি যখন হাকীমুল উপত্থ ঘোষণালা আশীৰ্বাদ আলি ধানভী (৩)-এৰ নিৰ্মেশে 'আহুকামুল কোৱআন' এছেৱ রচনার বাবে দিলাম, তখন এ দুটা উৰাপন কৰাবল তিনি উভয়ে বললেন : এ কথা ঠিক যে, এই কিমাউনী বনকিৰেৱ সাথে সাৰাসৰি ও প্ৰকাশ্য কোন শাস্তি-চূড়ি অথবা যিয়ী হওয়াৰ চূড়ি হিল না ; কিন্তু উখন মূসা (আ)-এৰও রাজ্যত্ব হিল না এবং সেই কিমাউনীৰও হিল না। বৰং তাৰা উভয়েই কিমাউনীৰে রাজ্যত্বে নাপৰিব হিল এবং একজন অপৰাজনেৱ পক্ষ থেকে সিৱাপন হিল। এটা হিল এক একাৰ অঙ্গীকৃতি কাৰ্যগত চূড়ি। কিমাউনীকে হত্যার কলে এই কাৰ্যগত চূড়িৰ বিবৃক্ষাচৰণ হয়েছে। তাই একে 'তুলজন্মে হত্যা' সাৰ্বাঙ্গ কৰা হয়েছে। তুলটি দেৱেক ইহুকৃত নো-ষ্টলাঙ্গমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ)-এৰ বনুয়াতেৰ পৰিপন্থী নোৱ।

এ কাৰণেই ঘোষণা ধানভী (৩) অবিভক্ত ভাৱতে কোন মুসলিমানেৰ পক্ষে কোন হিন্দুৰ জানমানেৰ কৰ্তৃত কৰা বৈধ মনে কৰল্লেন না। কেননা মুসলিমান ও হিন্দু এ উভয় সন্মুদ্ধারই ইহুয়েজনেৰ রাজ্যত্বে বাস কৰাত।

অকজনেৰ সাহায্য ও জনসেৱা ইহুকৃত ও পৱনকালে উপকাৰী : হয়ৱত মূসা (আ) মাদইয়াল শহৰেৰ উপকৰ্ত্তা দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তাৰা অক্ষমতাৰ কাৱণে তাৰেৰ ছাপলকে পানি পান কৰাতে পাৰাবে না। মহিলাৰ সম্মুখ অপৰিচিত এবং মূসা (আ) একজন মুসলিম হিলেন। কিন্তু অক্ষমদেৱ সেৱা অনুভাৱ আৰু আলোচনা কৰাবল পক্ষে পক্ষেনীয় কাজ হিল। তাই তিনি তাৰেৰ জন্য পৰিশ্ৰম হীকাৰ কৰলেন এবং তাৰেৰ ছাপলকে পানি পান কৰিয়ে দিলেন। এ কাৰ্যেৰ সওয়াব ও পুৱকাৰ আনন্দাহুৰ কাছে বিৱাট। দুনিয়াতেও তাৰ এ কাৰ্যকৰী পৰামৰ্শ জীবনেৰ অসহায়ত্ব ও সংশলিনিতাৰ প্ৰতিকাৰ সাৰ্বাঙ্গ হয়েছে। পৰবৰ্তীকালে নিজেৰ শান অনুযায়ী জীবন পঢ়ন কৰাৰ সুযোগ তিনি এৰ মাধ্যমেই পাল কৰেন এবং হয়ৱত উজ্জ্বল (আ)-এৰ সেৱা ও তাৰ জামাতা হওয়াৰ গৌৱব অৰ্জন কৰেন। যৌবনে পদাৰ্পণ কৰাৰ পৰ তাৰ মাতাকে যে দায়িত্ব পালন কৰতে হতো, আনন্দাহুৰ তা'আলা পৰামৰ্শ জীবনে তা একজন পঞ্চগৱেৰ হাতে সশ্নন্দ কৰিয়ে দিয়েছেন।

দুই পৱনগৱেৰ বাবো চাকৰ ও মণিবেৰ সশ্নক : এৰ বহুল ও অভাবনীয় উপকাৰিতা : মূসা (আ) অৰাবৰ (আ)-এৰ গৃহে অতিথি হয়ে কিমাউনী সিপাহীদেৱ কৰল থেকে নিশ্চিত হলে উজ্জ্বল (আ) কন্যার পৱনগৱেৰ সুলক্ষণ অনুভূতিৰ সাহায্যে এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সৎসাহনী মূসা (আ) এ ধৰনেৰ আতিথ্য কৰুল কৰবেন না এবং অম্যত চলে গেলে

বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল ধর্মাবলী পরিহার করে শেষদেশের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্মেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের পৃষ্ঠে গিয়ে তার গল্পাই হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাপ।

বিত্তীয়ত আল্লাহু তা'আলা মুসা (আ)-কে বিসালত ও মনুষ্যত ঘারা কৃতিত করতে চাইতেন। এর জন্য যদিও কোম্পন সাধনা ও কর্ম সূচ নষ্ট এবং কোন সাধনা ও কর্ম ঘারা তা অর্জনও করা যায় না, কিন্তু আল্লাহুর তিয়াচরিত কৃতি এই যে, তিনি পরমাত্মাদেরকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশুমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা এটা যামুর চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের শুধুমাত্র কারণ হয়ে আসে। মুসা (আ)-এর জীবন এ পর্যন্ত বাজকীয় স্বাম ও জাঁকজমকের মধ্যে অভিযাহিত হয়েছিল। তিব্বতে তাঁকে জনগণের পথপ্রসরণ ও সংকোচনকের উচ্চতপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। উআয়ব (আ)-এর সাথে শুধু ও মজুমীর এই চৃতিতে তাঁর চারিত্বিক সালম-পালনের গোপন তেজও নিহিত ছিল। সাধক শিরাজী তাই বলেন :

شبان وادی ایمن گھے رسد بمراد
کے چند سال بجان خدمت شعیب گند

তৃতীয়ত মুসা (আ)-এর কাছ থেকে ছাগল চুরামোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আচর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পরমাত্মারকে এ কাজে দিয়েজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এডিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। কলে রাখালের বলে বারুরার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবজী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যাক্তির খোরাকে পরিষ্কত হবে। পক্ষাত্মে ইজ্জাত পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মাস্পিট করে, জীবনকার জন্ম হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া যিচ্ছিব নয়। এ ক্ষেত্রে রাখালকে অভ্যাধিক দৈর্ঘ্য ও সহস্রীলভার পরিচয় দিতে হয়। পরমাত্মার সাথে সাধারণ যানব সমাজের ব্যবহারও অনুগ্রহ হয়ে থাকে। এতে পরমাত্মার ভাসের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরভাব যাথেও পথে আমতে পারেন না। কলে দৈর্ঘ্য ও সহস্রীলভার অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

কাউকে কোন পদ ও চাকরী দান করার চমৎকার যাপকাটি : এই কাহিনীতে উআয়ব (আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর মালা হোক। এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, পতিশালী ও বিবৃত ব্যক্তিই সর্বোচ্চ চাকর হতে পারে। ‘শক্তিশালী’ বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং ‘বিশ্বাস’ বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বাসতার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদের জন্য ধার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব উপরে প্রতি লক্ষ্য মালা হয়, তিনি করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দুটি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। যরই প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিভাগিত শর্তাবলীর মধ্যে উপরোক্ত বিভাগে সাধারণত পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বাসতা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিবরণে পরিগণিত হয় না; তখন শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই যাপকাটি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারী

প্রতিষ্ঠানসমূহের র্যবহৃপনায় যেসব জ্ঞান-বিচ্ছুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশই এই সততা বিষয়ক ঘূর্ণনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল ; শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও ঘূর্মখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিক্ষার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না । এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে । এ কারণেই ইসলামী ব্যবহার এর প্রতি অত্যধিক শুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সূকল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে ।

জাদুকর ও পয়গম্বরদের কাজে সুল্পষ্ঠ পার্দক্ষ্য ; ফিরাউন সমবেতে জাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল । এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল । কিন্তু তারা কি করেছে ? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে ।

এর বিপরীতে আল্লাহ-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : *وَلَا إِسْكَانٌ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ*—অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না । পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক । ইসলামী বায়তুল মাল থেকে অলিম, মুক্তী ও ওয়ায়েয়দের ভাতা প্রদানের ব্যবহা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায় ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন । এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকাহবিদদের মতে অপারণ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংক্ষের ক্ষেত্রে এর কুফল অঙ্গীকার করার উপায় নেই । বলা বাহ্য্য বিনিয়য় গ্রহণের ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে ।

ফিরাউনী জাদুকরদের জাদুর ব্রহ্মপ : ফিরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল । প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল ? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা *سُخْرِفْمُ أَنْهَا شَنْعِي* (জাদুর কারণে এগুলো ইত্তে ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল । ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটির সাপ মনে হচ্ছিল ।

অবশ্য এ ঘারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর ব্রহ্মপ পরিবর্তিত হতে পারে না । এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরাউনী জাদুকরদের জাদু বস্তুর ব্রহ্মপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না ।

গোত্রগত সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত নিম্ননীয় নয় ; ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসেব করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে । পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ । এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিঙ্গী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ । বিশ্বনবী (সা) মদীনায় ইসলামী ঝান্টের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাম্মদের ও আনসারদের মধ্যে

একাত্মতা ও ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিম্বামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের ঘূর্ণিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদস্ত্রেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মুসা (আ) যে বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে যিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীব্র প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধারাধারি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি সাঙ্গ করতে পারে। *وَاللَّهُ أَعْلَمُ*

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা : মুসা (আ) এক মাসের জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে ভূর পর্যটে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হাক্কন (আ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারম্পরিক মতভেদ ও অনেক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গব্রহ্মের সুন্নত।

মুসলমানদের দলে অনেক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিস্তৃত মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় : মুসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের মধ্যে গোবৎস পূজা অনর্থ মাধ্যাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিনি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হাক্কন (আ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মুসা (আ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মুসা (আ) কৃত হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাইল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقِبْ قَوْلِيْنَ

—অর্থাৎ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিষ্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে অনেক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি।

মুসা (আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইতেগফা করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নতুন প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। *وَاللَّهُ سَمِيعٌ أَعْلَمُ*

মূসা (আ)-এর কাহিনীর উপরোক্তিখিত হিদায়েতসময়ের শেষে মূসা ও হারুন (আ)-কে একটি বিশেষ নির্দেশন সহকারে ফিরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই : **فَوْلَأْتُ لِبْنَيَ لَعْلَةً بِتَنْكُرٍ أَوْيَخْشِلِي**

পরগবরসুলত দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভাস্ত বিদ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংক্ষার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গিতে নম্মভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ'র তর সৃষ্টি হতে পারে।

ফিরাউন খোদারী-দাবিদার অভ্যাচারী বাদশাহ ছিল এবং আপন সন্তার হিফায়তের জন্য বনী ইসরাইলের হাজারো ছেলে-সন্তান হতার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ'র তা'আলা তাঁর বিশেষ পরগবরস্বয়কে নম্মভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ'র তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা ও পদ্ধতিটা থেকে বিরত হবে না ; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ'র নীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গবরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে অধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন হিদায়েত লাভ করুক বা না করুক ; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হিদায়েত ও সংক্ষারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলিম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে পালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা উচিত।

قَالَ لَرَبِّنَا إِنَّا نَغَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغِي ④٤٠ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي
 مَحْكُمٌ أَسْمَعْ وَارِي ④٤١ فَأَتَيْهُ فَقَوْلًا إِنِّي رَسُولُ رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنِّا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا لَا تَعْذِيْبَهُمْ قَدْ جِئْنَاهُ بِإِيمَانِ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى
 مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ④٤٢ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَبَ
 وَتَوْتَى ④٤٣ قَالَ فَنِّ رَبِّكَ مَوْسِيٌّ ④٤٤ قَالَ رَبِّنَا الَّذِي أَعْطَى مُلْكَ شَيْءٍ
 خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ④٤٥

(৪৫) তাঁরা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশেকা করি যে, সে আমাদের প্রতি সুলুব করবে কিন্তু উভেজিত হবে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ'র বললেন : তোমরা তর করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি তুমি ও আমি দেবি। (৪৭) অতএব তোমরা

তাঁর কাছে যাও এবং বল : আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাইলকে থেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নির্দশন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তাঁর প্রতি শাস্তি। (৪৮) আমরা ওই লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাঁর উপর আয়াব পড়বে। (৪৯) সে বলল : তবে হে মূসা, আমাদের পালনকর্তা কে ? (৫০) মূসা বললেন : আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর ঘোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঙ্গের পথপ্রদর্শন করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন মূসা ও হারুন এই নির্দেশ পেলেন, তখন) উভয়ে আরঝ করলেন : হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হায়ির আছি ; কিন্তু) আমরা আশংকা করি যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) যুদ্ধ না করে বসে (ফলে প্রচারই না হয়) অথবা (ঠিক প্রচারের সময় কুফরে) মাত্রাতিরিক্ত সীমালংঘন না করতে থাকে (যেন সার্তসত্ত্বেও কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিজেও না শোনে এবং অন্যকেও উন্তে না দেয় ; যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়।) ইরশাদ হলো : (এ বিষয়ে) তব করো না, (কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি—সব শুনি এবং দেখি। (আমি তোমাদের হিকায়ত করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেব। ফলে তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে। অন্য আয়াতে বলেছে : نَجْمٌ كُنْكَسْتَ أَنْجَمْلَ تَوْهِي অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার কাছে যাও এবং (তাকে) বল : আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল (তিনি আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। অতএব (তুঃ আমাদের আনুগত্য কর)। তওহাদ মেনে নিয়ে বিশ্বাস সংশোধন কর এবং যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং) বনী ইসরাইলকে (যাদের প্রতি তুঃ অন্যান্য যুদ্ধ কর—যুদ্ধের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাদের সাথে থেতে দাও (তারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা পাকবে) এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা (শুধু শুধুই নবুয়ত দাবি করি না ; বরং আমরা) তোমার কাছে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (নবুয়তের) নির্দশন (অর্থাৎ মু'জিয়াও) নিয়ে আগমন করেছি। (সত্যায়ন ও সত্য প্রহরের সুফল এই সামরিক নীতি দ্বারা জানা যাবে যে,) যে (সেরল) পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খেদায়ি আয়াব থেকে) শাস্তি। (এবং মিথ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওই লাভ করেছি যে, (আল্লাহর) আয়াব এই ব্যক্তির উপর পাতিত হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তাঁরা ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বলল : তবে হে মূসা (বল তো শুনি) তোমাদের পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রাসূল বলে দাবি করছ ; জওয়াবে) মূসা (আ) বললেন : আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঙ্গের (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের মাঝারোফুল কুরআন (৬৭))—১৪

উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই অত্যেক জরু তার উপযুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয়। সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকর্তা।)

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବବ୍ୟ ବିଷୟ

হয়রত মুসা (আ) কেন তয় পেলেন ? — موسى و هارون (آ) اخوان
 آن‌یف‌رط‌شندের আল্লাহ তা'আলার সাথনে দুই প্রকার তয় প্রকাশ করেছেন। এক তয় শব্দের
 মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালজ্বন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফিরাউন সভ্বত
 আমাদের বক্তব্য প্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় তয় অন
 শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সভ্বত সে আগন্তুর শানে
 অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আ)-কে নবুয়াত ও রিসালত দান করা হলে তিনি হকেন (আ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কৃষ্ণ করার সাথে সাথে আল্লাহু তা'আলা তাঁকে বলে দেন :

سَنُكْ عَضْدُكَ يَا خُلُكَ وَنَجِعْلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ الْيَكْمَا -

ଅର୍ଥାଏ ଆମି ତୋମାର ଭାଇୟେର ମାଧ୍ୟମେ ତୋମାର ବାହୁ ସବଳ କରବ ଏବଂ ତୋମାଦେରକେ ଆଧିପତ୍ୟ ଦାନ କରବ । ଫଳେ ଶକ୍ତରା ତୋମାଦେର କାହେ ପୌଛିତେ ପାରବେ ନା । ଏହାଡ଼ା ଏ ଆଶ୍ୱାସ ଦାନ କରେଣ ସେ, ତୁମି ଯା ଯା ଆର୍ଥିକା କରେଛ, ସବୁଇ ତୋମାକେ ଦାନ କରଲାମ ।

-এসব আর্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্নোচনও ছিল। বক্ষ উন্নোচনের সারমর্ম এই যে, শক্তির সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সাঠি হবে না।

আঞ্চলিক তা'আশার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি ? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষম্যিক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মুঁজিয়া দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্নোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

ପ୍ରତୀଯତ, ଭୟର ବନ୍ଧୁ ଦେଖେ ସ୍ଵଭାବଗତଭାବେ ଭୟ କରା ସବ ପୟଗହରେର ସୁନ୍ନତ । ଏ ଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈମାନ ଓ ବିଶ୍වାସ ଥାକା ସନ୍ଦେଖ ହୁଯାଇଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳା (ଆ) ତାରଇ ଲାଠି ସାପେ ଝପାଞ୍ଚିରିତ ହେଉଥାର ପର ତାକେ ଧରତେ ଭୟ ପାଛିଲେନ, ତଥାନ ଆଶ୍ରାହ ବଲଲେନ : ‘ତୁ ତୁ ଭୟ କରୋ ନା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବ ଭୟର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏମନିଭାବେ ସ୍ଵଭାବଗତ ଓ ମାନବଗତ ଭୟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ, ଯା ଆଶ୍ରାହ ତା'ଆଲା ସୁସଂବାଦେର ମାଧ୍ୟମେ ଦୂର କରେଛେ । ଏହି ଘଟନା ଏସଙ୍ଗେଇ *نَاصِبُونَ فِي الْمَدِينَةِ* ଆଶାତ୍ସମ୍ଭବ ଏର ପକ୍ଷେ ଫାଂଗ୍ସ ମାତ୍ର ନିଜେ ଖିଲ୍ଫା ମୁଁ ଏବଂ ଖାନ୍ତା — ଫ୍ରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଖାନ୍ତା ଯିନ୍ତର୍କାଳୀନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ । ଏହି ମାନବଗତ ଭୟର କାରଣେଇ ଶେଷମନ୍ତିର (ସା) ଯଦୀନାର ଦିକେ ଏବଂ କିଛି ସଂଖ୍ୟକ

সাহায্য প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহবাব যুক্তে এই ডয় থেকেই আগ্রাকার জন্য পরিখা ধনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলাৰ পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্ৰ ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ডয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

—أَنْلَى مَكْنَكًا أَسْمَعَ وَأَرَى—
আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : আমি তোমাদের সাথে আছি।
আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ শুরুপ ও শুণ
মানবের উপলক্ষ্মি বাইরে।

মুসা (আ) ফিলাউনকে ইমানের দাওয়াতসহ বলী ইসরাইলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে ব্রহ্ম দেওয়ারও আহবান জানান । এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ইমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উহ্রতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মুসা (আ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটি উপ্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা অভ্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপরোগী নির্দেশ দিয়েছেন, কলে সে তাঁর কাজে নিয়োজিত হয়েছে : এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাদ ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সহান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমগল, নভোমগল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ, সূর্য তাদের কাজ করছে। এই, উপর ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে ঘশ্গুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপ্ত আছে এবং আল্লাহ্ৰ নির্দেশ ব্যক্তীত তাতে কেশাঘ পরিয়াণও ব্যতিক্রম করছে না। হাঁ, ব্যক্তিগতের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নি ও পুল্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওয়ে নৃহের জন্য করেছিল। (أَنْفَرُوا تَذَكَّرُ) (তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিকেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাৰার্তা শিক্ষা দেওয়াৱৰ সাধ্য কাৱও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়েৰ স্তন থেকে খাদ্য হাসিল কৰতে হবে এবং মায়েৰ স্তন চেপে ধৰে দুখ ছুঁয়ে নেওয়াৰ কৌশল তাকে কে বলে দিল ?

কৃধা, ত্বক্ষা, শীত ও গরমে ক্রমে ক্রমে করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রমে কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহর নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্টির জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকেও কারণ শিক্ষা ব্যক্তিত প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টি জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। হিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়। বরং ইচ্ছাদীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আবাবের অধিকারী হয়।

—**أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُهْدِيًّا**—আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মূসা (আ) ফিরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সময় সৃষ্টি জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফিরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্ত্বিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রফ্তিগোচর হলে তারা মূসা (আ)-এর প্রতি বীতশ্বস্ক হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উদ্ভিত ও জাতি প্রতিদ্বা পৃজ্ঞা করত, আগন্তুক মতে তারা কিরণ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মূসা (আ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফিরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেঙ্কুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা তৈনি জনসাধারণ তাঁর থতি কৃধারণা পোষণ করবে। ফলে ফিরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গতর মূসা (আ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞানোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

قَالَ فَسَابَ الْقُرُونُ الْأُولَى ① قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَبٍ لَا يَضِلُّ
رَبِّيْ وَلَا يَنْسِي ② الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَىً وَسَلَكَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجْنَا بِهِ أَذْوَاجًا مِنْ
شَتِّي ③ كُلُّوْ أَوْرَعْنَا نَعَمَكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا يَلِتْ لِأَوْلَى النَّهَى ④ مِنْهَا
خَلْقَنَّكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُ كُمْ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ⑤ وَكَفَدَ أَرْيَنَّا إِنْتَانَا
كُلُّهَا فَكَلَّ بَ وَأَبِي ⑥ قَالَ أَجْعَنَّكَ التُّرْجِنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمْوَسِي ⑦ فَلَنَّا

تَيْنَكَ بِسْحُرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ
مَكَانًا سُوئِيًّا ④ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشِرَ النَّاسُ ضُجَّىٰ ⑤

(৫১) কিরাউন বলল : তাহলে অজীত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (৫২) মূসা বলল : তাদের ঘবর আমার পালনকর্তার কাছে শিখিত আছে। আমার পালনকর্তা আপ্ত হন না এবং বিস্তৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শব্দ্যা করেছেন এবং তাতে চোর পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উষ্ণিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুর্শিদ জন্ম চুরাও। নিষ্ঠয় এতে বিবেকবানদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিয়িরে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই উৎসুক করব। (৫৬) আমি কিরাউনকে আমার সব নির্দর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে শিখ্যা আরোপ করেছে এবং আসান্ত করেছে। (৫৭) সে বলল : হে মূসা ফুমি কি জাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিকার করার জন্য আগমন করেছ ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার সুকাবিশায় তোমার নিকট অনুরূপ জাদু উপহিত করব! সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি উয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং ফুমিও করবে না একটি পরিকার প্রাপ্তব্যে। (৫৯) মূসা বলল : তোমাদের উয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিরাউন কেন্দৰে আয়াতের বক্তব্যে সন্দেহ করল এবং) বলল : আচ্ছা তা হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি ? (তারা তো পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের উপর কোন আয়াব নাযিল হয়েছে ?) মূসা (আ) বললেন : (আমি একলে দাবি করিনি যে, সেই প্রতিশ্রূত আয়াব দুনিয়াতেই আসবে। বরং তা কোন সময় দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে) তাদের (কুকর্মের) ঘবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে (অবশ্য) তার জন্য আমলনামার প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে আমলনামাই রাখা হয়েছে। মোটকথা, তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তা'আলার জানা আছে এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী যে,) তুল করেন না এবং তুলেও যান না। [সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁর আছে। কিন্তু তিনি আয়াবের জন্য সহয় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সহয় এলেই তাদের উপর আয়াব জারি করা হবে। অতএব দুনিয়াতে আয়াব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও শিরক আয়াবের কারণ নয়। এ পর্যন্ত মূসা (আ)-এর বক্তব্য পেশ করা হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পালনকর্তার কিছু বিদরগ দান করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মূসা

(আ)-এর এই বাক্যে ছিল : ﴿عَلِمْهَا عِنْدَ رَبِّيِّ الْخَ—لَا يُبَصِّلُ رَبِّيِّ الْخَ﴾
 ইরশাদ হচ্ছে যে,] তিনি (পালনকর্তা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয়া (সদৃশ) করেছেন,
 (তোমরা এর উপর আরাম কর) এবং এতে তোমাদের (চলার) জন্য পথ করেছেন, আকাশ
 থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা (পানি) দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ধিদ উৎপন্ন
 করেছি (এবং তোমাদেরকে অনুভূতি দিয়েছি যে,) নিজেরা (ও) খাও এবং তোমাদের
 চতুর্পদ জন্মদেরকে (ও) চুরাও। (উদ্বিধিত) এসব বস্তুর মধ্যে বিবেকবানদের (বোঝার)
 জন্য (আবাহুর কুদরতের) নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (উদ্ধিদকে যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন
 করি, তেমনিভাবে) আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই (প্রথমে) সৃজন করেছি (আদম
 মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে সবার দূরবর্তী উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।)
 এতেই আমি তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে দেব (মৃত ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না
 কেন, দেরিতে হলেও পরিগামে মাটির সাথে মিশে যাবে।) এবং (কিয়ামতের দিন)
 পুনর্বার এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব।

আমি ফিরাউনকে আয়ার (ঐ) সব নির্দর্শন দেখিয়েছি, [যা মূসা (আ)-কে দান করা
 হয়েছিল। অতঃপর সে যিথ্যাই আরোপ করেছে এবং অঙ্গীকারই করেছে। সে বলেন : হে
 মূসা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবি নিরে) এজন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের
 দেশ থেকে জাদুর জোরে বহিকার করে দেবে। (এবং নিজে জনগণকে মুক্ত ও অনুগত করে
 সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলাস অনুরূপ জাদু উপস্থিত করব।
 তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর ; যার খেলাফ আমরাও
 করব না এবং তুমিও করবে না। কোম সমতল যয়দানে (যাতে সবাই দেখে নেয়)। মূসা
 (আ) বললেন : তোমাদের (মুকাবিলাস) ওয়াদার দিন (তোমাদের) মেলার দিন এবং
 পূর্বাহ্নে সোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহ্যিক, মেলার স্থান সমতল ভূমিই হয়ে
 থাকে। এতেই এর শর্তটিও পূর্ণ হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—فَالْعِلْمُ مَعِنْهَا عِنْدَ رَبِّيِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَبْصِلُ رَبِّيِّيْ وَلَا يَنْسِلِي—
 ফিরাউন অতীত উত্থনদের
 পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে,
 তারা গোমরাহ, ও জাহান্নামী, তবে ফিরাউন এক্সপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে,
 সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা
 জনগণের প্রতিগোচর হলে তারাও মূসা (আ)-এর প্রতি সন্দেহপূর্ণ হয়ে যেত। মূসা
 (আ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও
 বিভিন্ন ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও যারেছে এবং শাঠিও ভাঙেনি।'
 তিনি বললেন : তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আয়ার পালনকর্তার কাছে আছে। আয়ার
 পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে শিয়ে
 অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ হানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : — **মন্ত্রান্তক** শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সঙ্গেধন করা হয়েছে; অর্থ এক আদম (আ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হ্যরত আদম (আ)। তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া ঘোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন : সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও মতে আশ্চর্য তা 'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সংযুক্ত করা হয়।

इयाम कुरतूबी बलेन : कोरआनेर भाषा थेके बोझा याइ ये, माटि द्वाराइ प्रत्येक यानुष सृजित हयेहे। हयरत आबू हुरायरा बर्नित एक हादीस एवं पक्षे साक्ष्य देय। एहि हादीसे रासुलुल्लाह् (सा) बलेन : मातृगर्ते प्रत्येक यानुष शिष्टर यधे ऐ छानेर किछु माटि शाखिल करा हय, येथाने आस्ताहर जाने तार समाधिस्तु हउया अवधारित। आबू नाईम एहि हादीसटि इवने सिरानेर तायकेराय उत्तेक करे बलेहेन :

نبيل وهو أحد الثقات الاعلام من اهل المصدرة -

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হ্যুরাত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেও
বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন : যখন মাতৃগর্ভে বীর্য শিংগীল হয়, তখন
সূজনকাজে আদিট ফেরেশতা গিয়ে সে ছানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিশু
হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শাখিল করে দেয়া হয়। কাজেই

মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বরু দ্বারাই হয় । আতা এই বক্তব্যের প্রমাণবর্জন এই আয়াত পেশ করেছেন : **مَنْ يَعْلَمْ كُمْ وَفِيهَا نَعْلَمْ كُمْ**—(কুরতুবী)

তফসীরে ঘায়হারীতে আবদুল্লাহ ইবনে ঘাসিউদ্দের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেক শিশুর মাতিতে মাটির অংশ রাখা হয় । মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিষ্ঠ হয়, যেখানকার মাটি তার আমিরে শাশিল করা হয়েছিল । তিনি আরও বলেন : আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিষ্ঠ হব । ধর্তীর এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি গরীব । ইবনে জওয়ী একে মওমুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন । কিন্তু শায়খ মুহাম্মদিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদরশী (রহ) বলেন : এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হয়েরত ইবনে উমর, ইবনে আবুবাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়া থেকে বর্ণিত রয়েছে । ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে । কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয় । —(মায়হারী)

مَكَانًا سَوْيَ—ফিরাউন মূসা (আ) ও জাদুকরদের মুকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাৱ কৱল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাইলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত—যাতে কোন পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট বীকার করতে না হয় । মূসা (আ) এই প্রস্তাৱ সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন কিন্তু—**مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرِّزْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحْنِي**—অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত । উদ্দেশ্য-ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন । এটা কোন দিন ছিল, এ সম্পর্কে যতভেদ রয়েছে । কেউ বলেন : ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল । সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো । কেউ কেউ বলেন : এটা ছিল নববর্ষের দিন । কেউ বলেন : এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান কৱত । আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল ।

জ্ঞাতব্য : হয়েরত মূসা (আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন । তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্ৰেণীৰ লোকেৱ সমাবেশ পূৰ্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল । এৱ অবশ্যাঙ্গাৰী পৰিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরেৱ অধিবাসীদেৱ উপস্থিতি নিশ্চিত কৱবে । সময় রেখেছেন পূৰ্বাহু, যা সূর্য বেশ উপৱে ওঠাৰ পৰ হয় । এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা কৱে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পাৰবে । দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্ৰকাশেৱ দিক দিয়ে সমস্ত দিনেৱ মধ্যেই উত্তম । এৱপ সময়েই একাধিতা ও ক্ৰিয়া সহকাৱে শুৰুপূৰ্ণ কাজ সমাধা কৱা হয় । এৱপ সময়েৱ সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশেৱ বিষয়বস্তু দূৰ-দূৰান্ত পৰ্যন্ত প্ৰচাৰিত হয় । সেবতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউনী জাদুকরদেৱ বিজয় দান কৱলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বৰং দূৰ-দূৰান্ত পৰ্যন্ত এই সংবাদ প্ৰচাৰিত হয়ে পড়ে ।

আদুর বক্স, থকার ও শব্দীর কল্পত বিধি-বিধান ; এই বিষয়বস্তু বিজ্ঞারিত বর্ণনাসহ তক্ষণের মাঝের কুল-কোরআন পথের ক্ষেত্রে সূরা বাকারায় হাল্কত ও মাল্কতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

فَتَوْلِي فِرْعَوْنَ فَجَمِعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ① قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْرُوا
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْعِكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ② فَتَنَازَعُوا عَوْاً مِرْهُم
بِيَتِهِمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ③ قَالُوا إِنَّ هَذَا مِنْ سَحْرٍ إِنْ يُرِيدُنَا أَنْ يُخْرِجَنَا
مِنْ أَرْضِكُمْ بِسُحْرِهِنَا وَيَدْهَبُ إِلَيْكُمْ يُقْتِلُنَا شَتَّى ④ فَاجْعَلُوهُمْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ
إِنْ تَوَاصَهُمْ ۚ وَقَدْ أَفْلَمَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ⑤ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا أَنْ تُلْقِي
وَإِنَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَنْتَ ⑥ قَالَ بِلَّاَ القَوْاءِ فَإِذَا أَحْبَبَهُمْ وَعَصَيْهِمْ
يُخْيِلُهُمْ سُحْرُهِمْ أَنْهَا تَسْعِي ⑦ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ⑧
قُلْنَا لَا تَخْفِي إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ⑨ وَأَنْتَ مَا فِي يَمِينِكَ تُلْقِي مَا صَنَعْوَا إِنَّا
صَنَعْوَا كَيْدَ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِمُ السَّاحِرُ حِيثُ أَتَى ⑩ فَإِنْتَقِي السَّحْرَةَ سُجَّلَ
قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ⑪ قَالَ أَمْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذْنَ لَكُمْ إِنَّهُ
كَيْرَكُومُ الدِّيْنِيْ عَلِمْتُكُمُ السَّحْرَ ۖ فَلَا قَطْعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَارْجِلَكُمْ مِنْ
خِلَافٍ ۖ وَلَا وَصِلَبَنَكُمْ فِي جُدُوْعِ النَّخْلِ ۖ وَلَتَعْلَمُنَّ إِيَّاَنَا أَشَدُ عَذَابًا
وَأَبْعَثُ ⑫ قَالُوا إِنَّ نُوْثَرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَا آتَنَا قَاضِ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هُنْدِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ⑬ إِنَّا أَمْنَا
بِوَيْنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطِيئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السَّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ

وَابْقِي ⑯ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يُمُوتُ فِيهَا
وَلَا يُحْيى ⑭ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصِّلَاحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ
الَّذِي رَجَتُ الْعُلُو ⑮ جَنَّتُ عَدُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانِهِرُ
خَلِدِينَ فِيهَا وَذُلِّكَ جَزْءٌ أَمَّا مَنْ تَزَكَّى ⑯

- (৬০) অতঃপর কিলাউন ধ্বনি করল এবং তাঁর সব কলাকৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হলো। (৬১) মুসা (আ) তাদেরকে বললেন : দুর্ভাগ্য তোমাদের ; তোমরা আশ্চর্য প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না । তাহলে তিনি তোমাদেরকে আশাৰ দ্বাৰা ধূস কৰে দেবেন । যে মিথ্যা ডুঁজাবন কৰে, সেই বিকলমনোৱারখ হয়েছে । (৬২) অতঃপর তাঁরা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করল এবং গোপনে পুরামৰ্শ করল । (৬৩) তাঁরা বলল ৪ এই দুইজন নিচিতই জানুকৰ, তাঁরা তাদের জানুৱ দ্বাৰা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিকার কৰতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা গ্রহিত কৰতে চায় । (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কৰ, অতঃপর সারিবক্ষ হয়ে-আস । আজ যে জয়ী হবে, সেই সকলকাম হবে । (৬৫) তাঁরা বলল ৪ হে মুসা, হয় তুমি নিকেপ কৰ, না হয় আমরা প্রথমে নিকেপ কৰি । (৬৬) মুসা বললেন ৪ বৰং তোমরাই নিকেপ কৰ । তাদের জানুৱ প্রভাৱে হঠাৎ তাঁর ঘনে হলো, যেন তাদের রশিতলো ও লাঠিতলো ছুটোছুটি কৰছে । (৬৭) অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা জীতি অনুভব কৰলেন । (৬৮) আমি বললাম ৪ তাৰ কৰো না, তুমিই বিজয়ী হবে । (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিকেপ কৰ । এটা যা কিছু তাঁরা কৰেছে তা ধোস কৰে ফেলবে । তাঁরা যা কৰেছে তা তো কেবল জানুকৰের কলাকৌশল । জানুকৰ বেখানেই ধাক্ক, সফল হবে না । (৭০) অতঃপর জানুকৰৱা সিজদায় পড়ে গেল । তাঁরা বলল ৪ আমরা হারুন ও সুসার পালনকৰ্ত্তাৰ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কৰলাম । (৭১) কিলাউন বলল ৪ আমাৰ অনুমতি দানেৰ পূৰ্বেই ? তোমরা কি তাঁৰ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কৰলে দেখছি সেই তোমাদেৰ প্রধান, সে তোমাদেৰকে জানু শিক্ষা দিয়েছে । অতএব আমি অবশ্যই তোমাদেৰ হস্তপদ কিপৰীত দিব-থেকে কৰ্ত্তন কৰব এবং আমি তোমাদেৰকে খৰ্জুৰ বৃক্ষেৰ কাণে শূলে ঢ়াৰ এবং তোমরা নিচিতকল্পেই জানতে পাৰবে আমাদেৰ মধ্যে কাৰ আশাৰ কঠোৱতৰ এবং অধিকক্ষণ হৰাবী । (৭২) জানুকৰৱা বলল ৪ আমাদেৰ কাছে যে সুস্পষ্ট প্ৰয়াণ এসেছে তাঁৰ উপৰ এবং যিনি আমাদেৱকে সৃষ্টি কৰেছেন, তাঁৰ উপৰ আমরা কিছুতেই তোমাকে প্ৰাণন্তি-দেব না । অতএব তুমি যা ইচ্ছা কৰতে পাৰ । তুমি তো তধু এই পাৰ্থিব জীবনেই যা কৰার কৰবে । (৭৩) আমরা-আমাদেৱ পালনকৰ্ত্তাৰ প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কৰেছি-যাতে তিনি আমাদেৱ

পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ, তা আর্জনা করেন। আল্লাহ প্রেরণ
ও চিরস্মাগী। (৭৪) নিচের বে তাঁর পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তাঁর অন্য
রয়েছে জাহানাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে
আসে এমন ইমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ
মর্তব। (৭৬) বসবাসের এমন পুল্মোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্বারণীসমূহ
প্রবাহিত হয়। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরুষার, যারা পবিত্র হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (একথা শনে) ফিরাউন (দুরবার থেকে থস্থানে) প্রস্থান করল এবং তার
কলাকৌশলের (অর্থাৎ জাদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে নির্ধারিত
ময়দানে) উপস্থিত হলো। (তখন) মূসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত জাদুকরদেরকে)
বললেন : শুহে ইত্তাগারা, আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ তাঁর
অস্তিত্ব অথবা একজুবাদ অঙ্গীকার করো না কিংবা তাঁর প্রকাশকৃত মু'জিয়াসমূহকে জাদু
বলে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আঘাত দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে
দিতে পারেন। যে মিথ্যা উচ্চাবন করে, সে (পরিগামে) বিফল মনোরথ হয়। অতঃপর
জাদুকররা (একথা শনে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে) গরম্পর বিতর্ক করল এবং গোপনে
পরামর্শ করল। (অবশ্যে সবাই একমত হয়ে) বলল : নিশ্চিতই তাঁরা দুইজন জাদুকর।
তাদের মতলব এই যে, তাঁরা তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে
বহিকার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধর্মীয়) জীবন-ব্যবস্থাও রাখিত করে দেবে।
অতএব তোমরা সমিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে
(মোকাবিলায়) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম। (অতঃপর) তাঁরা মূসা
(আ)-কে বলল : হে মূসা, (বল) তুমি (তোমার শাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, না আমরা
প্রথমে নিক্ষেপ করব ? মূসা (অত্যন্ত বেপরওয়া হয়ে) বললেন : না, প্রথমে তোমরাই
নিক্ষেপ কর। (সেমতে তাঁরা তাদের দড়ি ও শাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবদ্ধী করে
দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও শাঠিসমূহ নজরবদ্ধীর কারণে মূসা (আ)-এর কল্পনায় এমন
মনে হলো, যেন (সেগুলো সাপের মত) ছটেছুটি করছে। অতঃপর মূসা (আ) মনে মনে
কিছুটা ভীত হলেন। [তিনি আশঁকা করলেন যে, এসব দড়ি ও শাঠিও যখন দৃশ্যত সাপ
হয়ে গেছে এবং আমার শাঠি নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন
দর্শকরা তো উভয় বস্তুকেই একই মনে করবে। এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য
কিভাবে হবে ? এই ভীতি স্বভাবের তাগিদে ছিল। নতুনা মূসা (আ) পূর্ণক্রমে বিশ্বাস
করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর যাবতীয় উখান-পাতনের
ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন। মানসিক
কল্পনার স্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকোথা, এই ভয়
দেখা দেওয়ায় তাঁকে] আমি বললাম : ভয় করো না, তুমই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে
হবে যে) তোমার ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ শাঠি), তাঁরা যা কিছু
(অভিনয়) করেছে এটা (অর্থাৎ এই শাঠি) সেগুলো আস করে ফেলবে। তাঁরা যা করেছে,

Digitized by srujanika@gmail.com

—**বিজ্ঞান যুদ্ধ** (আ)-এর মুকাবিলাসে কৌশল হিসাবে আনুকরণ ও তাদের সম্পর্কের অভ্যন্তর থেকে শিখ। একই কৌশলে আনন্দের থেকে আনন্দজননের সূত্রে বাহাসূর বর্ণিত আছে। সেখানে কৌশলের অন্যান্য আনন্দ বিজ্ঞান উচ্চি আছে। চারপথ থেকে নয় শাখ

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମେର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲୁ ଆହୁ ଏହାରେ ଆଶିଷ ଦାତାଙ୍କ ଏହାରେ ଆଶିଷର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳ କରି କରନ୍ତି । ଅଧିକ ଆଜାହ ନେଇ ଆଶିଷ ଦାତାଙ୍କ ଏହାରେ ଆଶିଷ ଦାତାଙ୍କ ହିନ୍ତି ।
—(ଫୁରତୁରୀ)

বলা বাহ্য, কিন্তু কিম্বা পরামর্শ পক্ষি ক'নেই আমার অভিজ্ঞতা যথা কুকুলা
করার জন্য ময়দানে অবশিষ্ঠ হাতেলি, এবং উপরের কাছে আম কালো প্রকাশিত দণ্ডে
আদের অন্য সুস্থিতিহীন ছিল। কিন্তু প্রকাশের ক'নেই ক'নেই আমের আক্তার
একটি গোপন পক্ষি ও স্বীকৃতক পাইক প্রকাশের সামগ্ৰিক আধাৰ উপরে আছেৰ কীৱ
ও দুৰিৰ প্যার কিম্বা কৰে। দুনা (খা)-এই মন্দ বাহ্য দুন্দ ক'নেই আমের কাতার
চিন্ম-বিচিন্ম হয়ে দেল ক'নেই আমের ক'নেই ক'নেই ক'নেই ক'নেই ক'নেই ও আক্তার
কথাৰাতি কোন আনুভৱেৰ সুখ উপার্যত হ'তে পাবে না। আমের আমের ক'নেই
মনে হয়। তাই কেউ কেউ বলাবে : এমনে কুকুলা কৰা সহজ নাই। আবাহ কেউ
কেউ নিজেৰ ঘটেই আটল রাইল। لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ أُخْرِجَ مِنْ بَيْتِهِ—এই আর্দ্ধ আর্দ্ধ। আমের ক'নেই আমের
দূৰ কৰার অন্য আড়া শোশ্বেনে প্রাপ্তিৰ ক্ষমতা আমে— فَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُورٌ—কিন্তু আমেৰে
যুকুবিলার পক্ষেই সহিত অতি অকাল শেল। আম কৰুণ।

أَنْ هَذَا لِسَانُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِيَّةٍ
وَيَذْهَبُ بِطَرَيْقَتِكُمُ الْأَسْفَلُ

अर्धां आठा उत्तरे आस्ट्रेलिया। अब वह आपने आमूल जीवन बदलने के अर्द्ध मिनीटिन व बिनीटिन बदलने के लिए लिपि खोने भवित्व में देखा। उद्देश्य ऐसे ये, आमूल जीवन के लिए अधिकार लाने के लिए और लोगों के सर्वोत्तम वर्षके लिए चाहे। **पुरुष शक्ति** और **पुरुष शक्ति**। एक अर्थ इतन्य ओ प्रेषित। उद्देश्य ऐसे ये, जोशका ये विनाइसके आड़ाए उ जागरणाली बात बन दे—ए धमजि उत्तम ओ देखा दर्श, एवा और दर्शके उत्तम उत्तम लिङ्गले एवं दृष्टित बनाते चाय। कोने कर्तव्यमें नहाना ओ अधिकिलिन्डरके उ कर्तव्य उत्तिका बना हय। एथामे इत्यरत इत्यन्ये आकाश उ आकाश (हो) देखे अधिकार एवं अधिकार समिति बदलावे। आकाशेव अर्थ एवं ये, आठा उत्तराहम्बन्द बदलते नहाना एवं देखा देखे एवं पश्यामास वात्तिवर्गके घटना बदले लिए चाहे। कामकै आठावे अधिकार लिङ्गले लोगोंके पर्य

କଳାକୌଣସି ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତି କରେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସବ ଜୀବନକର ସାରିବନ୍ଧ ହୁୟେ ଏକଯୋଗେ ତାଦେର ମୁକାବିଲାଙ୍ଘ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । —**فَاجْمِعُوا كَبَدْكُمْ لَمْ اشْتُوا صَنْفًا** ।—ସାରିବନ୍ଧ ହେଲା ପ୍ରତିପଦ୍ଧର ମନେ ଭିତ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରାର ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକର ହୁୟେ ଥାକେ । ତାଇ ଜୀବନକରା ସାରିବନ୍ଧ ହୁୟେ ମୁକାବିଲା କରଲ ।

জাদুকররা তাদের জ্ঞানের ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা (আ)-কে বলল :
প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আ) জওয়াবে
বললেন : —**بِلْ (فَقْعُونَ)** — অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিষ্কেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন
করুন। মূসা (আ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুকায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী
শিষ্টাচারের কারণে এক্ষেপ জওয়াব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ
করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর অদ্বিতীয়ে জওয়াব ছিল এই
যে, মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার
অনুমতি দেওয়া। হিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিন্তিতা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার
উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মূসা (আ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের
চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিন্তিতার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে মূসা (আ)-এর সামনে
তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর ঘূর্জিয়া প্রকাশ করেন।
এভাবে একই সময়ে সত্ত্বের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা মূসা
(আ)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও
দড়ি একযোগে মাটিতে নিষ্কেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত
ছটাছটি করতে লাগল।

—يُخْلِلُ أَنَّهَا مِنْ سُخْرِيهِ— এখেকে জানা যায় যে, ফিরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্ধী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্ধীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এক্সপই হয়ে থাকে।

—**মূল্য** (আ)-কে শুইর মাধ্যমে বলা হলো যে, তোমার দক্ষিণ হতে যা আছে, তা নিকেপ কর। এখানে **মূল্য** (আ)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে; কিন্তু তা পরিকার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর, কোন মূল্য নেই। এজন্য

পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিষ্কেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। মুসা (আ) তাঁর জাঠি নিষ্কেপ করতেই তা একটি অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা সুস্পষ্টভাবে হয়ে সিজদায় সূচিয়ে পড়ল : মুসা (আ)-এর শাস্তি যখন অজগর হয়ে তাদের কাঞ্চনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুবাতে বাকি রইল না যে, এ-কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিয়া, যা একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল : আমরা মুসা ও হাকনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা, ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ আল্লাহর কুদরত তাদেরকে জানাত ও দোষখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়।—(রহস্য মা'আনী)

—আল্লাহ! তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফিরাউনের লাঙ্ঘন ফুটিয়ে ভুললেন, তখন হতভব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগলঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরাপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে ? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোন কথা ও কাজ খর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিয়া দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যিকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে বড়যদ্বৰে অভিযোগ উধাপন করে বললঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মুসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি বীকার করেছ।

—এখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হ্রাসকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কঢ়া হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফিরাউনী আইনে শাস্তির এই পদ্ধাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফিরাউন এ পদ্ধাই অস্তাৰ হিসেবে দিয়েছে। অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা বুলে থাকবে।

—জাদুকররা ফিরাউনের কঠোর হ্রাসকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে এসব নির্দর্শন ও মু'জিয়ার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেতো মুসা (আ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে। হ্যবরত ইকরামা বলেন ঃ জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ! তা'আলা তাদেরকে জানান্তের উচ্চ স্তর ও নিয়মাতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বললঃ এসব নির্দর্শন সঙ্গেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।—(কুরআনী) এবং অগৎ-স্তোত্র আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা বীকার করতে পারি না।—فَأَنْفَضْ مَا أَنْتَ فَাচِر়।—এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে

সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও । —أَنْتَ تَقْضِيْ فَهَذِ الْحِبْرَةَ الدُّنْبَا— অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্বিব জীবন পর্যবেক্ষণ করবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আমাদুর অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিহ্ন অপ্রগত্যা।

—وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السُّخْرِ—জাদুকররা এখন ফিরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুনা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে দেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা হেজ্যায় মুকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মুকাবিলার জন্য দর কঢ়াকবিও ফিরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরণে শুরু হবে? এর এক কারণ এরপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সর্বানুর লোতে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিয়ার মুকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ একটি বৃক্ষণ ও বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে জাদুশিল্প বাধ্যভাব্যভাবে করে দেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। —(জহুল মা'আনী)

ফিরাউন-পত্নী আছিয়ার উভ পরিণতি : তফসীরে কুরআনীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া মুকাবিলার উভ কলাকলের জন্য সদা উদয়ীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারান (আ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি কালবিলখ না করে ঘোষণা করলেন : আমিও মূসা ও হারানের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ উন্মে ফিরাউন আদেশ দিল : একটি বৃহৎ প্রত্যরোগ উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ্জ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

فِرَوْنَيْنِيَّةِ جَزَاءً مِنْ يَاتِ رَبِّهِ مُجْرِمًا : থেকে এই মুসলিম পরিবর্তন : —إِنَّمَّا يُعَذِّبُ مِنْ تَرَكَى—এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য যা খৌটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরাজয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলিমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হয়রাত মূসা (আ)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকভাবে প্রভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিপৃত্ত তরুণের ঘার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাপনাশের প্রতিও জঙ্গেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে শীর্ষের ঐ তরে উন্মীত হয়ে গেছে, যে তরে উন্মীত

فَتَبَارَكَ الْمُحْمَدُ^{۱۷۰} هُنَّا لِلْأَوَّلِينَ^{۱۷۱}
هُنَّا لِلْآخِرِينَ^{۱۷۲} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۷۳} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۷۴} وَمَا يَرَى^{۱۷۵} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۷۶}
مَا فِي السَّمَاوَاتِ^{۱۷۷} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۷۸} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۷۹} وَمَا يَرَى^{۱۸۰} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۸۱}
مَا فِي السَّمَاوَاتِ^{۱۸۲} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۸۳} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۸۴} وَمَا يَرَى^{۱۸۵} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۸۶}
مَا فِي السَّمَاوَاتِ^{۱۸۷} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۸۸} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۸۹} وَمَا يَرَى^{۱۹۰} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۹۱}
مَا فِي السَّمَاوَاتِ^{۱۹۲} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۹۳} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۹۴} وَمَا يَرَى^{۱۹۵} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۹۶}
مَا فِي السَّمَاوَاتِ^{۱۹۷} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۱۹۸} مَا
فِي الْأَرْضِ^{۱۹۹} وَمَا يَرَى^{۲۰۰} إِنَّمَا يَعْلَمُ^{۲۰۱}

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَىٰ^{۲۰۲} أَسْرِيْ بِعِبَادِيْ فَأَصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا^{۲۰۳}
فِي الْبَحْرِ^{۲۰۴} بِإِبْرِيزِيْسَا^{۲۰۵} لَا تَخْفَ دَرِيْكًا^{۲۰۶} وَلَا تَغْشِي^{۲۰۷} ۱۷۱
يُجْنُودُهُ فَغَشَوْهُمْ مِنَ الْيَوْمِ مَا غَشَيْهِمْ^{۲۰۸} وَأَضْلَلَ فَرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا
هَذِي^{۲۰۹} يَبِيْنَى^{۲۱۰} إِسْرَاءِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ^{۲۱۱}
جَانِبَ الظُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَى^{۲۱۲} كُلُّوا مِنْ^{۲۱۳}
طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَنْطَعِلُوْ فِيهِ فَيَعْلَمَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ^{۲۱۴}
وَمَنْ يَعْمَلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ فَقَدْ هُوَ^{۲۱۵} وَإِلَى لَعْنَاتِ رَبِّيْلِيْمَنْ قَاتَ^{۲۱۶}
وَامْنَ وَعِيلَ صَالِحَاتِمَ اهْتَدَى^{۲۱۷}

(۷۷) আমি মুসার ধৃতি এই ঘর্ষে ওহী করলাম বৈ, আবার বাবাদেরকে খিলে
জাহিয়োগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সম্মুখে অক্ষণ্য নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে
তোমাদের ধরে কেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ঝুবে বাগ্ধারার করও করো না।
(۷۸) অভঃপর কিমাউল তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পচাঙ্গাবস করল এবং সম্মু
তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করল। (۷۹) কিমাউল তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্র করেছিল
এবং সৎ পথ দেখাইল। (۸۰) হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শক্তির
কর্তৃত থেকে উত্তোল করেছি, তৃতৃ শাহাজের মকিন পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিক্রিয়ি দান
করেছি এবং তোমাদের কাছে ‘বাল্মী’ ও ‘সালতানা’ নামিল করেছি। (۸۱) বলেছি: আবার
দেরা পরিত্র বন্ধুসমূহ থাও এবং এতে সীমালংবন করো না, তা হলে তোমাদের উপর
আবার ক্লোধ দেবে আসবে এবং যার উপর আবার ক্লোধ দেবে আসে সে খাল হয়ে
যায়। (۸۲) আব বে ডগুরা করে, সৈমান আসে এবং সংকর্ত্ত করে অভঃপর সংপর্কে অটো
পাকে, আমি তাঁর ধৃতি অবশ্যই করাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন ফিরাউন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপর ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মূসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করলাম যে, আমার (এই) বাসাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে যিসর থেকে) রাখিয়োগে (বাইরে) নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও—যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সমুদ্রে (লাঠি থেরে) তক পথ নির্মাণ কর (অর্থাৎ লাঠি শারতেই তক পথ হয়ে যাবে)। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করো না (কেননা, পশ্চাদ্বাবন করলেও পশ্চাদ্বাবনকারীরা সফল হবে না।) এবং অন্য কোন প্রকার (উদাহরণত ঢুবে যাওয়ার) ভয়ও করো না। বিরং নির্জয়ে ও নিচিস্তে পার হয়ে যাবে। লিদেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাদেরকে রাখিয়োগে বের করে নিয়ে গেলেন। সকালে যিসরে ঝবর ছড়িয়ে পড়ল।] অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্বাবন করল। (এদিকে আল্লাহর ওয়াদে অনুযায়ী বনী ইসরাইল সমুদ্র পার হয়ে গেল। সামুক্রিক পথগুলো তখনও তদবহায়ই ছিল, যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَأَنْرُكَ الْبَخْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُنَاحٌ مُفْرَغُونْ ফিরাউনীরা ব্যক্তার মধ্যে অঞ্চলকাণ্ড চিন্তা না করে এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে এসে গেল) তখন (চতুর্দিক থেকে) সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি জমা হয়ে) তাদেরকে যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল (এবং সবাই সলিলসমাধি লাভ করল)। ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভাস্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং سِنْ بِكُمْ أَلْسِنْ الرَّئَسْ—ভাস্তপথ এজন্য যে, ইহকালেরও ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই খাংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি হয়েছে। কেননা, তারা জাহানার্থী হয়েছে; যেমন আয়াতে আছে أَنْجُلُوا إِلَى فِرْعَوْنَ أَشْدَى الْمَدَابْ ফিরাউনের পশ্চাদ্বাবন ও সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ভাবের পর বনী ইসরাইলকে আরও অনেক নিয়ামত দান করা হয়; উদাহরণত তওরাত এবং মান্না ও সালওয়া দান করা। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাইলকে বললাম ৩) হে বনী ইসরাইল, (দেখ,) আমি (কি কি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শক্তির কবল থেকে উদ্ভার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গম্বরের কাছে তোমাদের উপকারার্থে) তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আসার (অর্থাৎ যেখানে আসার পর তওরাত দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ উপত্যকায়) আমি তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি (এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উক্তম (হালাল হওয়ার কারণে শরীয়তদ্বারে উভয় এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে ইত্তরণতভাবেও উভয়) বস্তুসমূহ ধাও এবং এতে (অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘন করো না। [উদাহরণত অবৈধভাবে উপার্জন করো না (দুরের) অথবা খেয়ে উনাহে লিঙ্গ হয়ো না।] আহলে তোমাদের উপর আমার ক্ষেত্র নেমে আসবে। যার উপর আমার ক্ষেত্র নেমে আসে, সে সম্পূর্ণ নেতৃত্বাবৃদ্ধ হয়ে যায়। (পক্ষান্তরে এটাও অর্থব্য যে) যে (কুকুর ও গুলাক থেকে) তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর (এ পথে) কায়েম (ও) থাকে (অর্থাৎ দ্বিমান ও সৎকর্ম অব্যাহত রাখে) আমি একপ লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীলও। (আমি

এই বিষয়বস্তু বনী ইসরাইলকে বলেছিলাম। কেননা, নিয়ামত শরণ করানো, কৃতজ্ঞতার আদেশ, শুনাহে নিষেধ, পুরুষের ওয়াস এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শনও ধর্মীয় নিয়ামত বিশেষ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—يَখْنَ مَسْتَ وَمِنْهَا مُؤْسِى—
ফিরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙে দিল এবং মূসা ও হারুন (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাইল ট্র্যাক্যবন্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফিরাউনের পচাঙ্কাবন এবং সামনে পথিগণ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মূসা (আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিচিত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে উক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদিক থেকে ফিরাউনের পচাঙ্কাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই ‘হাদীসুল-ফুতুনে’ উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তুপ জয়াট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে উক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সুরা শু'আরায় বলা হয়েছে : **فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ بِالطَّوْبِ الْمَظْبِينَ** বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির পাচীরকে আল্লাহ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুচিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরপ করা হয়েছিল।—(কুরুতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাইলের কিছু অবস্থা : তাদের সংখ্যা ও ফিরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তফসীরে রহল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আ) রান্তির সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাইল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ইদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবর্তীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সতর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরিজ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহর কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হ্যরত ইউসুফ (আ)-এর আমলে বনী ইসরাইল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফিরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সতর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদিক থেকে

সৈম্যদের এই সম্বাদ এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাইল ঘোড়ে গেল এবং মুসা (আ)-কে বলল : أَلْمَدْرُكْرُونْ : অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা (আ) সাজ্জনা দিয়ে বললেন : آمَّا رَبِّنَا سَيِّدِنَا : আমার সাথে আমার প্রাণস্বর্গীয়া আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সবুজের কাষ্ঠি আরঙ্গেন এবং তাতে বারটি শোক এসব সঢ়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। কিন্তু তার সৈম্যবাহিনী সেখানে পৌছে এই বিশ্বাসুর দৃশ্য দেখে হতভয় হয়ে গেল যে, সবুজের কুকে এই বাজা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু হিমাঞ্চল সগরে সৈম্যদেরকে বলল : এগুলো সব আবার প্রতাপের শীলা। এর কারণে সবুজের প্রবাহ তক হয়ে বাজা তৈরি হয়ে গেছে। একবার বলে তৎক্ষণাত সে সামনে অগ্নির হয়ে নিজের বোঝা সবুজের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈম্যবাহিনীকে পচাতে আসার আদেশ দিল। যখন কিন্তু তার সৈম্যবাহিনীসহ সমুদ্রক পথের মধ্যস্থানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে ঝাইল সা, তখন আল্লাহ কানালা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সবুজের সকল অংশ পরম্পর মিলিত হয়ে গেল ফَشَّبُهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا شِئْتُمْ। —(রহল-মারাফা)

وَعَمِّنْ نَأْكُمْ جَانِبَ الطَّورِ الْأَيْمَنِ
কিন্তু উম্মেন্টাকুম জানিব তেরুর আইমেন
হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাইলকে প্রতিশ্রূতি দিলেন যে, তারা তুর পর্যটের সক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মুসা (আ)-কে তঙ্গোত্ত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাইল ব্যাং তাঁর বাক্যালাপের সৌরাৰ প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَى
এটা কবিতার উটো, যখন বনী ইসরাইল সবুজ পার হওয়ার পর সামনে অগ্নির হয় এবং তাদেরকে একটি পরিবৃত শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অসম্মত করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীব্র নামক উপত্যকার আটক করা হয়। তারা চালিল বাহু পর্যট এই উপত্যকা থেকে বাইয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। এই সাতি সংৰেও মুসা (আ)-এর বকরতে তাদের উপর অবীর্বালও মানা রকম নিয়ামত বর্ণিত হচ্ছে থাকে। ‘মাল্লা’ ও ‘সালওয়া’ হিল এসব নিয়ামতেরই অব্যাক্তম যা তাদের আহারের অন্য দেওয়া হচ্ছে।

وَمَا أَعْجَلْتُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى ⑩ قَالَ هُوَ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثْرِي
وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ⑪ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَّبَاقْتُمْ
مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلْتُهُمُ السَّامِرِيُّ ⑫ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ
غَضِبْتَكَ أَسْفًا ⑬ قَالَ يَقُولُ الْمَيْعُودُ كُوْرَبِكُمْ وَعَدَ احْسَنَا ⑭ فَطَالَ

عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْرًا رَّدْتُمْ أَنْ يَعْلَمَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
 فَاخْلُفُوهُمْ مَوْعِدِهِمْ ⑥ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدًا لَّعْ بَلِّكُنَا وَلِكُنَا حِسْنَانَا
 أَوْ زَارَ أَمْنَنْ زِينَةَ الْقَوْمِ فَقَنَ فِيهَا فَكَثُرَلَكَ الْقَوْمُ السَّامِرِيُّ ⑦ فَأَخْرَجَ
 لَهُمْ عِجْلًا جَسَدُ الْهَمَّ حُوَارٌ فَقَالُوا أَهْذِنَ الْهَمَّ وَاللَّهُ مُؤْمِنُ مُكْبِرٍ ⑧ أَنَّا
 يَرُونَ الْأَيْمَمَ يُبَعِّمُ الْيَمَمَ قَوْلَاهُ دَلَّيْلُكَ لَهُمْ هَرَاؤُ لَانْفَصَاءُ ⑨

(৭৫) এই স্থানে, তোমার সম্মানকে পেছনে কেনে দূরি করা করতে হবে ? (৭৬) তিনি বললেন : এই জো আমর আবার পেছনে আপনাই এবং হে আবার পাশনকর্তা, আপি আবাসায়ের জোমার আপনে এবং, বাটে দূরি সমুক্ত হও। (৭৭) বললেন : আপি তোমার সম্মানকে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামৈরী তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছে। (৭৮) অতঃপর মূলা তার সম্মানের কাছে কিরে গেলেন দৃঢ় ও অনুভূত অবস্থার। তিনি বললেন : হে আবার সম্মান, তোমাদের পাশনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উচ্চম প্রতিষ্ঠান দেননি ? তবে কি প্রতিষ্ঠানির সম্মতাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা দেখেছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পাশনকর্তার ক্ষেত্র দেখে আসুক, যে কারণে তোমরা আবার সাথে কৃত ওয়াদা করলে ? (৭৯) তারা বলল : আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা দেখাইয়ে ডেক করিমি; কিন্তু আবাদের উপর কিমাটনীদের অশক্তারের বোকা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিকেপ করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামৈরীও নিকেপ করেছে। (৮০) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরি করে দের করল একটা সো-বল-একটা টেক, যার মধ্যে গরুর শব্দ হিল। তারা বলল : এটা তোমাদের উপাস্য এবং মুসারাও উপাস্য, অতঃপর মূলা ঝুলে গেছে। (৮১) তারা কি দেখে দা যে, এটা তাদের কোন কথার উভয় দের না এবং তাদের কোন কৃতি ও উপকার করার ক্ষমতাও নাথে না ?

তৎসীরের সাথ-সংক্ষেপ

[আল্লাহ তাঃমালা ব্যবন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মূসা (আ)-কে তুর পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্মানের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ দিলেন।—(ফতুহ-মানান) মূসা (আ) আগের আতিশয্যে সবার আগে একা চলে গেলেন এবং অন্যরা বহানে রয়ে গেল ; তুর পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আল্লাহ তাঃমালা মূসা (আ)-কে জিজেল করলেন :। হে মূসা, তোমার সম্মানের পূর্বে তোমার দ্রুত আসার কারণ কি সংঘটিত হলো ? তিনি (নিজ ধারণা অনুযায়ী) বললেন : এই তো

তারা আমার পেছনে আসছে। আমি (সবার আগে) আপনার কাছে (অর্থাৎ যেখানে আপনি বাক্যালাপের ওয়াদা করেছেন) তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি (অধিক) সহজ হন। (কেননা, আদেশ পালনে তুরা করা অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।) তিনি বললেন : তোমার সম্মানেরকে তো আমি তোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তাদেরকে সামেরী পথপ্রট করে দিয়েছে **فَأَخْرَجَ لَهُمْ مَجَلًا**-বলে এ কথা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। **فَإِن** বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সহজযুক্ত করেছেন। কারণ প্রত্যেক কাজের স্তর তিনিই। নতুন এ কাজটি আসলে সামেরীর, যা **أَخْلَمُ الْسَّامِرِيِّ** বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে।) মোটকথা, মূসা (আ) (যেয়াদ শের হওয়ার পর) ঝুঁঁক ও ক্ষুক হয়ে সম্মানের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন : হে আমার সম্মান, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উন্নত (ও সত্তা) ওয়াদা দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে একটি বিধি-বিধানের প্রস্তুত দেব, এই প্রস্তুত জন্য তোমাদের অপেক্ষা করা জরুরী ছিল) তবে কি তোমাদের উপর দিয়ে (নিসিট যেয়াদের চাইতে অনেক) বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে পিলেছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত উদ্ভাবন করে নিয়েছে) ? না (নিরাশ না হওয়া সত্ত্বেও) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্ষেত্র নেমে আসুক, এ জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা [অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন নতুন কাজ করব না এবং আপনার প্রতিনিধি হাজন (আ)-এর আনুগত্য করব] শক্ত করলে ; তারা বলল : আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা খেঁজায় শক্ত করিনি ; (এর অর্থ এক্ষেপ নয় যে, কেউ জোর-জবরে তাদের দ্বারা একাজ করিয়ে নিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মুক্ত মনে প্রথমে যে অভিযত অবস্থন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ আমাদের জন্য সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববর্তী অভিযত অর্থাৎ তওহীদ অবস্থন করিনি ; বরং অভিযত বদলে গেছে ; যদিও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। সেমতে পরে বলা হচ্ছে) কিন্তু আমাদের উপর (কিবর্তী) সম্মানের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্রিমভাবে) নিষ্কেপ করে দিয়েছি। এরপর সামেরীও এমনিভাবে (তার অলঙ্কার) নিষ্কেপ করেছে। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাহিনীর এভাবে উপসংহার টেনেছেন,) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য তৈরি করে বের করে আনল একটি গো-বৎস একটি অবয়ব (গুণবলী থেকে মুক্ত), যাতে একটি (অর্থহীন) শব্দ ছিল। (এর সম্পর্কে বোকা) লোকেরা বললঃ এটা তোমাদের এবং মূসারও মাবুদ (এর ইবাদত কর) মূসা তো তুলে গেছে (ফলে আল্লাহর তালাশে তুর পর্বতে চলে গেছে। আল্লাহ্ তাদের এই বোকামি প্রসূত দৃষ্টিতার জওয়াবে বলেন : তারা কি দেখে না যে, এটা (পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার উন্নত দিতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (এমন অকর্মন্য বস্তু খোদা হবে কিন্তুপে ; সত্য মাবুদ পয়গবরদের যাধ্যমে বাক্যালাপ অবশ্যই-করেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যখন মূসা (আ) ও বনী ইসরাইল ফিরাউনের পশ্চাদ্বাবন ও সমুদ্র থেকে উকার পেরে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাইল বলতে লাগল : তারা যেমন উপস্থিত শু ইন্দ্রিয়ধ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোম আল্লাহ বানিয়ে দাও। মূসা (আ) তাদের বোকাখিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন : তোমরা তো নেহাতই মূর্খ ! এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় খৎস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপত্তা সম্পূর্ণ বাতিল।

اِنْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنْ هُؤُلَاءِ مُتَّبِرُ مَثَاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔

তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপত্তা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোয়া রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চালিশ দিন করে দেওয়া হলো। মূসা (আ) বনী ইসরাইলসহ তুর পর্বতের দিকে বওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে মূসা (আ)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রাইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাথে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অপ্রে পৌছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোয়া রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারান (আ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাইল হারান (আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারাও অন্তিবিলম্বে তুর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাইল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আ)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

وَمَا افْجَلَكَ عَنْ قُوَّمٍ
يَا مُوسَى هَذِهِ مُؤْسِى

তুরা করা সম্পর্কে মূসা (আ)-কে অপ্র ও তার রহস্য ও মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তুর পর্বতের নিকট পৌছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাইল যে গো-বৎস পূজায় লিঙ্গ হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উক্তেশ্য। (ইবনে-কাসীর) কৃত্তল মা'আলীতে কাশাফাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই তুরা করার জন্য ছশিয়ার করা যে, নবুয়াতের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আলা উচ্চিত ছিল। তাঁর তুরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং তুরা করার কাজের ও নিষ্পা করা হয়েছে যে, পয়গস্বরগণের মধ্যে এই জ্ঞাতি না থাকা বাস্তুনীয়। 'ইন্তিসাফ'

এইর বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে বাকি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; বেহুল শৃঙ্খল (আ)-এর ঘটনায় আস্ত্রাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অয়ে রেখে জুমি সবার পশ্চাতে থাক।
وَأَتْبِعْ أَنْجَارَهُمْ ।

আস্ত্রাহ তা'আলা উক্তিপূর্ব অপ্রের জওয়াবে মূসা (আ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরব করালেনচ আঘার সম্মানায়গ পেছনে পেছনে আয় এসেই গেছে। আমি একটু ভুল করে এসে পেছি ; কারণ নির্দেশ পালনে অঙ্গে অঙ্গে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সজুষিত কারণ হয়ে থাকে। তখন আস্ত্রাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাইলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভৃত করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে হিল ? : কেউ কেউ বলেন : সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আ)-এর প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আ) যখন বনী ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে যিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারণ মতে সে বনী ইসরাইলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন : এই পারম্য বংশোদ্ধৃত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হ্যরত ইবনে আকাস বলেন : সে গো-বৎস পূজাকারী সম্মানয়ের লোক ছিল। কোমরপে মিসরে পৌছে সে বনী ইসরাইলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। (কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে : সে ভারতবর্ষের জনেক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই : সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হ্যরত ইবনে আকাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জনশ্রুত করে তখন ফিরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাইলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফিরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে কীয় পুত্রহত্যার ভয়ে জীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আস্ত্রাহ তা'আলা জিবরাইলকে শিশুর হিকায়ত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করালেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাধু এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিঙ্গ হলো ও বনী ইসরাইলকে পথভৃত করল। জনেক কবি এই বিষয়বস্তুটিই এ ক'টি হয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন :

إذا المرء لم يخلق سعيد انتهزت
عقل مربية و خاب المؤمل
فموسى الذى رباه جبريل كافر
وموسى الذى رباه فرعون مؤمن

কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তি ও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মুসাকে ইসরাইল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মুসাকে অভিশঙ্গ কিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহর রাসূল হয়ে গেল।

أَمْ يَعْدِكُمْ رِبُّكُمْ وَعَدًا حَسْنًا — কুরআন ও সূরা তোয়া-হা এসে জাতিকে সমোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাইলকে নিয়ে তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌছার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহ্য্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাইলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

أَفَلَا عَلَيْكُمُ الْفَهْرُ — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুনীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে তিনি পথ অবলম্বন করেছ।

أَمْ أَرَيْتُمْ أَنْ يُحْلِلَ عَلَيْكُمْ غَصَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ — অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ঝুঁত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই ; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই বেছায় পালনকর্তার গ্রহণ ডেকে আনছ।

فَالْأُولَاءِ سَلَّمَ — শব্দটি শীমের যবর এবং শীমের পেশবোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে ই-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় বেছায় লিঙ্গ হই নি ; বরং সামেরীর কাছ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহ্য্য, তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও তিউহায়ন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করে নি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিঙ্গ হয়েছে। অঙ্গের তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে :

وَلَكُنَّا حُمُّلَنَا أَوزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ — শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে এবং পাপরাশিকে বোঝা হয়। **وَزَرَ** শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে কিরাউনের কওমকে বোঝালো হয়েছে। বনী ইসরাইল ইদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরৎ দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। 'হাদীসুল ফুজুম' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হয়রত হারুন (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হঁশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিলঃ এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদ্ধকরণ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে মিক্ষেপ করা হয়।

যা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ১৭

କାଫିରଦେର ମାଲ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ କଥନ ହାଲାଲ ? । ଏଥାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଯି ଯେ, ସେବ କାଫିର ମୁସଲିମ ବାଟ୍ରେ ଆଇନ ଆନ୍ୟ କରେ ବସବାସ କରେ ଏବଂ ସେବ କାଫିରରେ ସାଥେ ଜାନ ଓ ମାଲେର ନିରାପଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କିତ କୋନ ଚୁକ୍ତି ହୁଯା, ତାଦେର ମାଲ ତୋ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ହାଲାଲ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ସେବ କାଫିର ଇସଲାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିବ୍ରୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାଦେର ସାଥେ କୋନ ଚୁକ୍ତି ଓ ହୟନି-ଫିକାହ୍-ବିଦଦେର ପରିଭାଷାର ଯାଦେରକେ 'କାଫିର, ହରବୀ' ବଲା ହୁଯା, ତାଦେର ମାଲ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ହାଲାଲ । ଏମତାହ୍ସ୍ରାୟ ହାରନ୍ (ଆ) ଏହି ମାଲକେ ଉତ୍ସର୍ଗ ତଥା ପାପ କେନ ବଲଲେନ ଏବଂ ତାଦେର କବଜା ଥେକେ ବେର କରେ ଗର୍ତ୍ତ ନିଷ୍କେପ କରାର ଆଦେଶ କେନ ଦିଲେନ ? ଏଇ ଏକଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ତଫସୀରବିଦଗଣ ଲିଖେଛେ ଯେ, କାଫିର ହରବୀର ମାଲ ଯଦିଓ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ହାଲାଲ; କିନ୍ତୁ ତା ଗନ୍ମିମତର ମାଲେର (ୟୁଦ୍ଧଲଙ୍କ ମାଲେର) ମତରେ ବିଧାନ ରାଖେ । ଇସଲାମପୂର୍ବ-କାଳେ ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ସମ୍ପର୍କେ ଏ ଆଇନ ଛିଲ ଯେ, ତା କାଫିରଦେର କବଜା ଥେକେ ବେର କରେ ଆନା ଜାଯେଯ ଛିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ତା ବ୍ୟବହାର କରା ଓ ଭୋଗ କରା ଜାଯେଯ ନାହିଁ । ବରଂ ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ଏକତ୍ର କରେ କୌନ ଟିଲା ଇତ୍ୟାଦିର ଉପର ରେଖେ ଦେଓଯା ହତୋ ଏବଂ ଆସମାନୀ ଆଶନ (ବଜ ଇତ୍ୟାଦି) ଏସେ ତା ପ୍ରାସ କରେ ଫେଲତ । ଏଟାଇ ଛିଲ ତାଦେର ଜିହାଦ କବୁଲ ହେଉଥାର ଆଲାମତ । ପକ୍ଷାଭ୍ରରେ ଯେ ଗନ୍ମିମତର ମାଲକେ ଆସମାନୀ ଆଶନ ପ୍ରାସ କରତ ନା, ସେଇ ମାଲ ଜିହାଦ କବୁଲ ନା ହେଉଥାର ଲକ୍ଷଣରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହତୋ । ଫଳେ ଏକଥିମାଲକେ ଅନୁଭ ମନେ କରେ କେଉଁଇ ତାର କାହେ ଥେତ ନା । ରାସ୍‌ଲେ କରୀମ (ସା)-ଏର ଶରୀଯତେ ସେବ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଓ ରେଯାତ ଦେଓଯା ହେଁଥେ, ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ ହାଲାଲ କରେ ଦେଓଯାଓ ଅନ୍ୟତମ । ସହିତ ମୁସଲିମେର ହାଦୀମେ ଏକଥା ଶ୍ପଟଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଥେ ।

ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କିବତୀଦେର ସେବ ମାଲ ବନୀ ଇସରାଇଲେର ଅଧିକାରଭୂତ ଛିଲ, ସେଗୁଲୋକେ ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ସାବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଁଥେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ସେଗୁଲୋ ଭୋଗ କରା ବୈଧ ଛିଲ ନା । ଏ କାରଣେଇ ଏହି ମାଲକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାର ହେଁଥେ ଏବଂ ହସରତ ହାରନ୍ (ଆ)-ଏର ଆଦେଶେ ସେଗୁଲୋ ଗର୍ତ୍ତ ନିଷ୍କିଳ୍ପ ହେଁଥେ ।

ଜର୍ମାନୀ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ : କିନ୍ତୁ ଫିକାହ୍-ଦୃଷ୍ଟିଭାବିତେ ଇମାମ ମୁହାମଦ ପ୍ରଶ୍ନିତ ସିଯାର ଓ ତାର ଟୀକା ସୁରଖ୍ସୀ ଥାଏ ଏ ବ୍ୟାପାରେ ଯେ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଥେ, ତା ଅତ୍ୟକ୍ତ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ସତ୍ୟାଖ୍ୟୀ । ତା ଏହି ଯେ, କାଫିର ହରବୀର ମାଲଓ ସର୍ବାବହ୍ସ୍ରାୟ ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ହୁଯା ନା; ବରଂ ଯଥାରୀତି ଜିହାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମେ ତରବାରିର ଜୋରେ ଏହି ମାଲ ଅର୍ଜନ କରା ଶର୍ତ । ଏକାରଣେଇ ସୁରଖ୍ସୀ ଥାଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମେ ଅଧିକାରଭୂତ କରାକେ ଶର୍ତ ସାବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଁଥେ । କାଫିର ହରବୀର ଯେ ମାଲ ଯୁଦ୍ଧର ମାଧ୍ୟମେ ଅର୍ଜିତ ହୁଯା ନା, ତା ଗନ୍ମିମତର ମାଲ ନାହିଁ; ବରଂ ଏକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାୟାସଲଙ୍କ ମାଲ ବଲା ହୁଯା । ଏକଥି କେତେ ଯଦିଓ କୋନ ଜିହାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ; କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ୍ରମେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ମାଲଓ ଅନାୟାସଲଙ୍କ ମାଲେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହୁଯେ ହାଲାଲ ।

ଏଥାନେ କିବତୀଦେର କାହୁ ଥେକେ ନେଓଯା ଅଲ୍-କାରପାତି ଯୁଦ୍ଧଲଙ୍କ ମାଲ ନାହିଁ; କାରଣ ଏଥାମେ କୋନ ଜିହାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଯ ନି ଏବଂ ଅନାୟାସଲଙ୍କ ମାଲଓ ନାହିଁ; କାରଣ ଏଗୁଲୋ ତାଦେର କାଜ

থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাইলের মালিকানায় দিতে সম্ভত ছিল না। তাই ইসলামী শরীয়তের আইনেও এই ঘাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইক্বা থেকে মদীনায় হিজরত করতে অনুমতি করেন, তখন আরবের কাফিরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদারদের পিষ্টাস করত এবং তাঁকে 'আবীন' (বিশ্বষ্ট) বলে সর্বোধন করত। রাসূলে করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সম্ভুল তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হ্যরত আলী (রা)-এর হাতে সোপন্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই মালকে গনীমতের ঘাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরপে করলে তা মুসলমানদের ঘাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশঁস্ত উঠত না। **وَاللَّهُ أَعْلَم**

অর্থাৎ অমরা এসব অলংকারপাতি নিষ্কেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতুনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হ্যরত হারুন (আ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিষ্কেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবাস্তুর নয়।

فَكَذَّلَ الْقَوْمَ السَّامِرِيَّ হাদীসে ফুতুনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারুন (আ) সব অলংকার গর্তে নিষ্কেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিষ্কেপ করে দিল, তখন সামেরী হাতের মুঠি বজ্জ করে সেখানে পৌছল এবং হারুন (আ)-কে জিজেস করল : আমিও নিষ্কেপ করব ! হারুন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিষ্কেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারুন (আ)-কে বলল : আমার ঘনোরাঙ্গা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিষ্কেপ করব—নভুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারুন (আ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিষ্কেপ করল, তা অলঙ্কারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাইল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিশ্বয়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাইলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। ঘোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারুন (আ)-এর দোয়ার ব্রহ্মকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্তুপ এই মাটি নিষ্কেপের এবং হারুন (আ)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে সাগল। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাইলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিষ্কেপ করতে প্ররোচিত করেছিল,

અને એ વિષયનું આપણે હો, સે અનુભાવી પરિયોગથી ગો-બદ્દેસર મૃત્તિ તૈરિ કરી નિર્ણયિત નિયું આપે કરી રહ્યું ના । ઉપરોક્ત આચિ નિજેશ્પેર પર તાતે પ્રાપ્ત સંબંધિત હતું । (એમનું જોગાડેલું કૃત્યાની ઇતિહાસી એહે કર્ત્વિત હયોહે । કિન્તુ ઇસરાઈલી જોગાડેલું નિયોજ કરેલું નિયોજ કર્યા કરી ના । તબે જોગાડેલું નિયોજ કર્યા કરી ।

—**أَرْبَعَةُ سَادِسَيْنَ**—અર્બાણ સાદેસીની એવી અનુભાવી હતી એકટિ ગો-બદ્દેસર અનુભાવ કરી કરે રહ્યું, આપે પરાવું અનુભાવ રહ્યું । ————— (અબ્દુલ) શબ્દ સૂટે કોન હેઠાં અનુભાવીની અનુભાવ હો, એંટે અનુભાવ ત હોય હીં—તાતે પ્રાપ્ત હ્યું ના । તબે નિયોજ એવી અનુભાવી હતી એવી અનુભાવ નેણ કરીનું । અનિકાંશ તફસીરબિદેરનું ઉત્કી એવેટે કર્ત્વિત હતી હો, આપે આપ હ્યું ।

—**أَرْبَعَةُ سَادِسَيْنَ**—અર્બાણ સાદેસીનાં ગો-બદ્દેસર મેદે સામેરી ઓ તાર નાચિયા અનુભાવ કરી એંટે જોગાડેલું એવું મૂલ્ય હોયા । નિયું મૂલ્ય નિયોજ હયે એવું જોગાડેલું હોયા । એ પરંતુ એવી જોગાડેલું અનુભાવ અનુભાવ કર્ત્વિત હલો । મૂલ્ય (આ)-એ જોય મેદે અની અનુભાવ પેશ કરોલિનું । એરપર :

—**أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَا يَرْجِعُ الْبَيْمَ قُولًا وَ لَا يَكُلُّ لَهُمْ حَسَارًا وَ لَا نَنْفَتْ**—બાકો તાદેર નિર્મુક્તિ ઓ પરાવાયિની અનુભાવ કરી હતોહે હો, બાકો એવી એકટિ ગો-બદ્દેસર જીવિત હયે ગરુદ મન અનુભાવ કરીયે હોયા, જોએ એવી અનુભાવીને એકથી જો ચિંતા કર્યા ઉચિત હ્યું હો, એર સામે અનુભાવ કર્ત્વિત હશે । એ હેઠે ગો-બદ્દેસર તાદેર કથાર કોન અન્યાાબ દિતે પારે ના એવું જોગાડેલું ઉપરાં અનુભાવ કર્ત્વિ કર્યાર કર્મતા રાખે ના, સે કેન્દ્રે તાકે અનુભાવ હોય દેખાવ નિર્મુક્તિના પેશને કોન મૃત્તિ આહે કિ ?

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونٌ مِّنْ قَبْلٍ يَقُولُ إِنَّمَا فِتْنَتُنَا بِإِنَّنَّ رَبِّكُمْ
 الرَّحْمَنُ فَإِنْ شَاءَ عُوْنَى وَ أَطْبَعَ عَوْمَرِي ⑩
 قَالُوا إِنَّا نَبْرَأُ عَلَيْهِ عَرْكَفِينَ
 حَتَّىٰ يَرْجِمَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ⑪
 قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذَا يَرَيْتَهُمْ
 ضَلَّوْا لَا إِذَا تَتَبَعَنَّ مَا فَعَلَيْتُمْ أَمْرِي ⑫
 قَالَ يَكْتُمُونَ لَا كَلَّخُنَ
 بِلِعْبِيٰ وَ لَا بِرَأْيِيٰ ⑬
 إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَوْلَى تَرْكَتَ بَيْنَ يَمِنِي
 إِسْرَائِيلَ وَ لَمْ تَرْقِبْ قَوْمِي ⑭

(১০) হাতল কানেরকে পূর্বেই বিশেষভাবে উচ্চ আবাস করে, কোষাগ্রহে এই গো-বৎস বাবা পরীক্ষার মিলভিত্তি রয়েছে এবং কানেরকে প্রদর্শনকৰ্ত্তা আবাস। কানেরকে তোমরা আবাস অনুসরণ কর এবং আবাস আসেন ক্ষেত্রে তুম। (১১) আবাস কলন। মৃত্যু আবাসের কাছে কিন্তু না আসা পর্যবেক্ষণ অনুসরণ কর সত্ত্বেই অনুসৃত হয়ে থাকে সমস্ত ধোকা। (১২) মৃত্যু বলদেশ ও হাতল, দুর্মি বৎস কানেরকে প্রদর্শন করতে দেখলে, কানের তোমাকে কিন্তু সিদ্ধুন্ত করল (১৩) আবাস প্রদর্শন অনুসরণ করা দেখলে? করে দুর্মি কি আবাস আবাস আবাস করেছে? (১৪) কিন্তু বলদেশ ও হাতল অনুসরণ করে, আবাস শুঙ্খ ও মাথার চূল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আপনকে করলাম হে, দুর্মি করবে। দুর্মি বদী-ইসরাইলের মধ্যে বিজেতা সৃষ্টি করেছে এবং আবাস করা আবাসে কুরব নি।

তৎক্ষণীরের সার-সংক্ষেপ

তানেরকে হাতল [(আ) মৃত্যু (আ)-এর ক্ষেত্রে আবাস] পূর্ণেই বিশেষভাবে উচ্চ আবাস সম্পদায়, তোমরা এই (অর্থাৎ গো-বৎসের) কানের অনুসরণ প্রদর্শন করে (অর্থাৎ এই পূজা কোনোরূপই সুরক্ষ হতে পারে না। এটি ক্ষেত্রে প্রদর্শন)। এবং কানেরকে (প্রতিকরণ) পালনকর্তা দম্ভায়র আদ্ধার (—ও গোপনের না)। অন্তর্ভুক্ত কোষাগ্রহ (ধৰ্মের ব্যাপারে) আবাস পথে চল এবং (এ সম্পর্কে) আবাস আসেন যেনে তার (অর্থাৎ আবাস করা ও কাজের অনুসরণ করা) কানে উভয় দিক ও অন্যান্য দিকে পর্যবেক্ষণ করে (যেটি কিন্তু না আসেন, এইই (পূজার) সাথে সর্বলোক অবিজ্ঞ হয়ে থাকে কর্তব্য)। কোষাগ্রহ, কানে হাতল (আ)-এর উপদেশ কানে চুলল না। অবলেশে মৃত্যু (আ) ক্ষেত্রে কলন এবং প্রথমে কণ্ঠযাকে সরোথম করলেশে, যা উপরে বর্ণিত হচ্ছে। একস্থানে কানে (আ)-কে সরোথম করে। বলদেশ ও হাতল, বৎস দুর্মি দেখাবে হে, কানে (নিম্নে) প্রদর্শন করে পেছে, তখন আবাস কাছে চলে আসতে তোমাকে কিন্তু সিদ্ধুন্ত করল। (অর্থাৎ তখন আবাস কাছে তোমার চলে আসা উচিত হিল, যাতে কানে পুজোপূর্ণ বিশেষ সম্পর্ক হয়, দুর্মি কানের কাজকে অগুহন কর। এছাড়া এমন বিশেষজ্ঞীয়ের সাথে কর দেনি সম্পর্ক করা যাব, ততই ভাল)। দুর্মি কি আবাস আবাস আবাস করেছে? (আমি অনুসরণ করে, কুরুক্ষেত্রে সরবরাহ প্রদর্শন করো না। দুর্মিকানীয়ের সাথে সম্পর্ক আ মাঝ এবং পৃথক হয়ে আছে। এই ব্যাপকভাবে অস্তর্জুত)। হাতল (আ) বলদেশ ও হে আবাস অনুসরণ (অর্থাৎ আবাস ভাই), দুর্মি আবাস শুঙ্খ এবং আবাস চূল ধরো না (এবং আবাস তার উপর কাঁক)। কোষাগ্রহ কাছে চলে না আসার কারণ হিল এই হে) আমি আপনকে করলাম হে, (আমি তোমার কাছে রওয়ানা হলে আবাস সাথে তাজ্জ্বাত রওয়ানা হবে, যাকে গো-বৎস পূজার শৈক্ষণ হয় নি। কলে বদী ইসরাইল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কানের গো-বৎস পূজার সিদ্ধান্তকানীয়া আবাস সাথে থাকবে এবং অন্যরা এর পূজারই অবিজ্ঞ হয়ে থাকবে। এবজেবহার) দুর্মি বলবে ও দুর্মি বদী ইসরাইলের মধ্যে বিজেতা সৃষ্টি করেছে (গো-কোষ কোষ কেবল সহ-অবস্থানের চাইতে অধিক অতিক্রম হয়। কেবল দুর্মিকানীয়া এবলি জাঁচ পেতে সিস্টেমেতে দুর্মি

বাঢ়িয়ে যেতে থাকে ।) এবং তুমি (আমার) আদেশকে ফর্জাদা দাও নি । (আমি তোমাকে সংকারের আদেশ দিয়েছিলাম । অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে যে, আমি তো তোমাকে সংকারের আদেশ দিয়েছিলাম ; কিন্তু তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ ।)

আলুয়গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাইলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারুন (আ) মূসা (আ)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন ; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিনি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল । একদল হারুন (আ)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভুট্টা মনে করল । তাদের সংখ্যা বার হাজার বর্ণিত আছে ।—(কুরুতুবী) অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল । তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল শীকার করল, মূসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব । অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যে ভাবেই হোক এ পছন্দ ত্যাগ করব না । উভয়দলের বক্তব্য অবর্ণ করে হারুন (আ) সমন্বন্ধে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন ; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল ।

মূসা (আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাইলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে । এরপর তাঁর খলীফা হারুন (আ)-কে সম্মোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসমৃষ্টি প্রকাশ করলেন । তাঁর শৃঙ্খল ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন : তুমি বখন দেখলে যে, বনী ইসরাইল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিঙ্গ হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন ?

মূসা (আ) এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা (আ)-এর কাছে তুর পর্বতে চলে যাওয়া । কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের একপ অর্থও করেছেন যে, তারা বখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের যুকাবিলা করলে না কেন ? কেননা আমার উপস্থিতিতে একপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম । তোমারও একপ কর্য উচিত ছিল ।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারুন (আ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে । তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল । হারুন (আ) এই কাঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আ)-কে নরম করার জন্য ‘হে আমার জননীতনয়’ বলে সম্মোধন করলেন । এতে কাঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল । অর্থাৎ আমি তো তোমার আতা বৈ শক্ত নই । তাই আমার শয়র শুনে নাও । অতঃপর হারুন (আ) একপ শুধু বর্ণনা করলেন : আমি আশংকা করলাম যে, তোমরা ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে

তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় বলে আমাকে সংকারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আবি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। কারণ একপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলক্ষ করবে এবং ঈমান ও তওঁহীদে ফিরে আসবে। কোরআন পাকের অন্যত্র হারুন (আ)-এর ওয়ারের মধ্যে এ কথা ও রয়েছে :
أَنْ أَرْبَعَةِ بَنী ইসরাইল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেমন অন্যদের মুকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওয়রের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভৃষ্টতার সাথী হিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আয়াকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুক্তে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাঝ বার হাজার বনী ইসরাইলই আমার সাথে থাকত ; অবশিষ্টেরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারম্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাক্ষুণ্য পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওয়র শুনে মূসা (আ) হারন (আ)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্বাতা সামেরীর খবর নিলেন। কোরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, মূসা (আ) ইয়রত হারন (আ)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিষ্ঠক ইজতিহাদী ভল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়সাচরন্তের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক ৩ এ ঘটনায় মুসা (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উচ্চত পরিস্থিতিতে হারান (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কর্মের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে মুসা (আ)-এর কাছে চলে আসা সম্ভত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপৰপক্ষে হারন (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিক্ষেপ অনুসারে ছিল এই যে, তাগ
করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাইল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা
লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সংজ্ঞায় পথ বিদ্যমান ছিল যে, মূসা (আ) ফিরে
এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ইয়ান ও তওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার
সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে ন্যূনতা ও একজনে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের
উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ইয়ান ও তওহীদে
প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতা এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন
সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে ন্যূনতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী
জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমব্ধার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র।
কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইয়ামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য
সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে ভুলাইগার অথবা নাফরমান বলা যায়
না। মূসা (আ) কর্তৃক হারন (আ)-এর চূল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে
আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্ষেত্রের প্রতি ক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা

আমার পূর্বে তিনি হাজ্জন (আ)-কে প্রকাশ্য স্থলে লিখ মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওয়ার জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিলাতের দোয়া করেন।

قَالَ فَيَا خَطْبُكَ يَسَّاً مِرْعَىٰ ⑥ قَالَ بَصَرُتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرْ وَا بِهِ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِيٰ ⑦
قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَامْسَاسَ وَإِنَّكَ
مُوْعِدَ اللَّهِ تَخْلِفَهُ وَانْظُرْ إِلَى الْهَكَالِذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَارِفَةً لَنَحْرِقْنَاهُ
لَمْ لَنْسِغْنَاهُ فِي الْيَمِّنْسَفَا ⑧ إِنَّا هُكْمُ اللَّهِ الَّذِي لَآللَّهِ إِلَّا هُوَ
وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ⑨

(১৫) মুসা বললেন : হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি ? (১৬) সে বলল : আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নিচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই ব্যবহাই দিল। (১৭) মুসা বললেন : দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তি রাখিল বৈ, তুই বলবি : ‘আমাকে স্পর্শ করো না’ এবং তোর জন্য একটি নিদিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যক্তিকর্তব্য হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা একে জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্রি করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। (১৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যক্তি অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিবর তার জ্ঞানের পরিধিতৃক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর মুসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং বললেন : তোমার কি ব্যাপার হে সামেরী ? (তুমি এ কাও করলে কেন?) সে বলল : এমন বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় নি। (অর্থাৎ হ্যবুত জিবরাইল ঘোড়ায় চড়ে যেদিন সাগরপারে অবতরণ করেন—সভ্বত মু'মনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে খৎস করার উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন ; তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাইল মুসা (আ)-এর কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন যে, আপনি তুর পর্যতে গমন করুন—সেদিন সামেরী তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর) পায়ের নিচ থেকে এক মুঠি (মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আগন্ত-আগন্ত একথা জাগত হলো যে, এতে জীবনের অভাব থেকে থাকবে এবং যে জিনিসের উপর নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে

যাবে।) সুতরাং আমি এই শৃঙ্খলা (এই গো-বৎসের অবয়বে) নিষ্কেপ করলাম। আমার মনে
তাই ভাল লেগেছে এবং পদ্ধতিটি ঠেকেছে। যুসা বললেন : ব্যস, তোর এই (পার্থিব)
জীবনে এই শান্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই বলবি : আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর
জন্য (এটা শান্তি ছাড়াও) আরও একটি ওয়াদা (আল্লাহ তা'আলার আবাবের) আছে, যা
টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন আবাব হবে)। তুই তোর মাসুদের প্রতি শক্ত কর, যার
ইবাদতে তুই অটল হিলি ; (দেখ) আমরা একে জ্ঞালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এর
ডস্কে) সাগরে বিক্ষিণ্ণ করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে। তোমাদের
প্রকৃত মাসুদ তো কেবল আল্লাহ, যিনি ব্যক্তিত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সব বিষয়
তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

आनुवादिक आठव्यं विषय

(অর্ধং অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি) এখানে
জিবরাইল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত
এই যে, যেদিন মৃসা (আ)-এর মুজিয়ায় ভূমধ্যসাগরে উক্ত রাস্তা হয়ে যাব, বর্ণী ইসরাইল
এই রাস্তা দিয়ে সমৃদ্ধ পার হয়ে যাব এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিয়ন্ত্রিত হয়,
সেদিন জিবরাইল ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ঘটনাছলে উপস্থিত হিলেন। বিড়ীয় রেওয়ায়েত
এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মৃসা (আ)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর
জন্য জিবরাইল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাকে দেখেছিল, অন্যেরা
দেখেনি। ইবনে আবুসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী বর্ষ
জিবরাইলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জন্ম তাকে গতে নিকেপ করলে
জিবরাইল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্য আগমন করতেন। কলে সে জিবরাইলের
পরিচিত ও খনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। —(বারান্স কোরআন)

فَقَبَضْتُ قِبْضَةً مِنْ أَنْرَالْرُسُولِ رَسُولِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ
বাসুল বলে এখানে আস্তাহর প্রেরিত জিবরাইলকে
বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাইলের
ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই
মাটি ভুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি ভুলে নিল। ইবনে আবাসের রেওয়ারেতে একথা
বর্ণিত হয়েছে : القى فى روعه انه لا يلقبها على شيء فيقول كن كذا الا كان
আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে,
অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন : সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের
এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনভিবিলছে সবুজ
বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে।
(কামালায়ন) তফসীর কল্পনা মাঝানীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেরী এবং বিশিষ্ট ও
নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ারেতে বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিলক্ষে
আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উধাপন করা হয়েছে, সেগুলো
খণ্ডন করা হয়েছে। (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিয়ানল কোরআন)।

ମା'ଆରେଫଳ କୁରାଆନ (୬୪) — ୧୮

এরপর বনী ইসরাইলের স্থগীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিষ্কেপ করল। আল্লাহর কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাত্তা রূপ করতে শাগল। হাদীসে ফুতুনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হাজন (আ)-কে বলেছিল : আমি মুঠির ভিতরে বস্তু নিষ্কেপ করব ; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার অনোবাষ্ঠা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হজন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিষ্কেপ করল। তখন হাজন (আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের স্থোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মুসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাইলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

—فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَتَوَلَّ لِأَمْسَاسَ
এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সরাই তাঁকে ব্যক্তি করবে এবং কেউ তার কাছে দেখে রেখে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বল্য জন্মদের নয়ন সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্বৰত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাইলীর জন্য মুসা (আ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্বৰপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধে ক্ষয়ং তার সন্তার আল্লাহর কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্বন্দন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মুসা (আ)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জুরাকান্ত হয়ে যেত। —(মা'আলিয়) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভাস্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিংকার করে বলত : **أَلْمَسْ** অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক : নহল মা'আলী গ্রন্থে বাহুরে ঝুঁইতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মুসা (আ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। —(বয়ানুল কোরআন)

‘**أَنْتَرْفَنَ**’ (অর্থাৎ আমরা একে আগনে পুঁজিয়ে দেব।) এখামে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগনে পোড়ানো হবে কিরুপে ? কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু-দণ্ড হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর বক্রপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসসঞ্চল হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জনাই করে পুঁজিয়ে দেওয়া এবং

বর্ণ-রৌপ্যের গো-বদন হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘষে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া (দূরের মনসুর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো। (কৃত্তল মা'আনী) অলৌকিকভাবে দক্ষ করাও অবাঞ্ছর নয়। —(বয়ানুল কোরআন)

كَذَلِكَ نَفْصُلُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْيَاءِ مَا قَلْ سَبِقَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ مِنْ لَدُنِنِي ذِكْرًا ﴿١﴾
 مِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزِرًا ﴿٢﴾ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَلْلًا ﴿٣﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَخَشِّ الْجُرْمِينَ يَوْمَئِنَ
 زِرْقًا ﴿٤﴾ يَتَغَاضَ فَتَوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَيْثَمُ إِلَّا عَشْرًا ﴿٥﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
 يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْثَمُ إِلَيْهِمَا وَيَسْتَوْنَكُمْ عَنِ
 الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفَهَا رِيْسَقًا ﴿٦﴾ فَيَذْرُهَا قَاعًا صَفَصَفًا ﴿٧﴾ لَا تَرَى فِيهَا عَوْجًا
 وَلَا أَمْتَأْ ﴿٨﴾ يَوْمَئِنَ يَتَبَعَّونَ الدَّاعِي لَا عَوْجَهُ لَهُ وَخَسَعَتِ الْأَصْوَاتُ
 لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمِعُ الْأَهْمَسًا ﴿٩﴾ يَوْمَئِنَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ
 أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلًا ﴿١٠﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١﴾ وَعَنْتِ الْوِجْهَ لِلْجِيْشِ الْقَيْمَرِ وَقَدْ خَابَ مَنْ
 حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصِّلْحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفَ ظُلْمًا وَلَا
 هَضْمًا ﴿١٣﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَقْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ
 لَعَنْهُمْ يَتَقَوَّنُ أَوْ يَحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١٤﴾ فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا
 تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضِي إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زَادَنِي عِلْمًا ﴿١٥﴾

(১৯) এমনিভাবে আমি শূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি।
 আমি আমার কাছ থেকে আগনাকে দান করেছি পড়ার শুষ্ক। (১০০) বে এ থেকে মুখ

কিন্তব্যে সেবে, সে কিয়ামতের দিন বোৰা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল ধৰকবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোৰা তাদের জন্য অব হবে। (১০২) হেদিল শিখাই ফুঁকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অগৱার্থীদেরকে সববেত করব শীল চক্ৰ অবহান। (১০৩) তারা চুপিসারে পরম্পরারে বলাবলি করবে ; তোমরা যাজ্ঞ দশ দিন অবহান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে, তা আমি ভাসোড়াৰে জানি, তাদের যথে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অঙ্গুশারী সে বলবে ; তোমরা যাজ্ঞ একদিন অবহান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুন ; আমার পালমকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিকিঞ্চ করে দিবেন। (১০৬) অভিঃশৰ পৃষ্ঠাদীকে মসৃণ সমজনকুমি করে ছাঢ়বেন। (১০৭) ফুমি তাতে বোঝ ও টি঳া দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকাৰীৰ অঙ্গুশৰণ করবে, যাৰ কথা এমিক-সেদিক হবে যা এবং দয়াৱৰ আত্মাহৰ ভৱে সব পক্ষ কীৰ্ত হয়ে যাবে। সুতৰাং মৃদু ওজন ব্যক্তিত ফুমি কিছুই হবে না। (১০৯) দয়াৱৰ আত্মাহ বাকে অনুমতি দেবেন এবং কাৰ কথাৰ সহৃষ্ট হবেন সে হাতো কাৰও সুপারিশ দেহিল কোন উপকাৰে আনবে না। (১১০) তিনি জানেৰ যা কিছু তাদেৰ সাৰমে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জান যাবা আৰুত কৰতে পাবে না। (১১১) সেই চিৰঞ্জীৰ চিৰহারীৰ সাৰমে সব মুখ মজল অবস্থিত হবে এবং সে বাৰ্ত হবে যে মুলুমেৰ বোৰা বহন কৰবে। (১১২) যে, ইমানদার অবহান সংকৰ্ত্ত সম্পাদন কৰে, সে মুদুৰ ও কতিৰ আশকো কৰবে না। (১১৩) এহমিভাবে আমি আৱৰ্তী তাৰার কোৱালান নাবিল কৰেছি এবং এতে মাৰাভাৰে সতৰ্কৰাণী ব্যক্ত কৰেছি, যাতে তাৰা আত্মাহকীক হয় অথবা তাদেৰ অভৱে চিতাৰ খোৱাক খোগাব। (১১৪) মণিকাৰ অধীক্ষৰ আত্মাহ মহান। আপনার প্রতি আত্মাহৰ ওহী সমূৰ্খ হওয়াৰ পূৰ্বে আপনি কোৱানে এবং পৰেৰ ব্যাপারে তাত্ত্বাহক্ষা কৰবেন না এবং বলুন ; হে আমাৰ পালমকর্তা, আমাৰ জাল বৃক্ষি কৰলুন।

তৎসীরেৰ সাৰ-সংক্ষেপ

(পূৰ্বীগৱে সম্পর্ক ; সূৰা তোৱা-হায় আসলে ক্ষণহীন, রিসালত ও পৰকালোৱ ঝৌলিক বিষয়াদি বৰ্ণিত হয়েছে। এই বৰ্ণনা পৰম্পৰার যথে পৱণহৱদেৱ ঘটনাবলী এবং মুসা (আ)-এৰ কাহিনী বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হয়েছে। প্রসঙ্গতমে মুহাম্মদ (সা)-এৰ রিসালতও সপ্রমাণ কৰা হয়েছে। সেই রিসালতে মুহাম্মদী সপ্রমাণেৱ অংশ বিশেষ আলোচ্য আৱাতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, একজন উৰ্ধী মৰীৰ মুখে এ ঘটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া রিসালত, মৰুয়ত ও ওহীৰ প্ৰমাণ। কোৱানই এসবেৰ উৎস। কোৱানেৰ বৰঞ্জ প্ৰসঙ্গে পৰকালোৱও কিছু বিবৰণ এসে গৈছে।)

[আমি দেমন মুসা (আ)-এৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰেছি] এহমিভাবে আমি পূৰ্বে যা ঘটেছে, তাৰ সংবাদও আপনাৰ কাছে বৰ্ণনা কৰি (যাতে নৰুয়তেৰ প্ৰমাণাদি বৃক্ষি পেতে থাকে। আমি নিজেৰ কাছ থেকে আপনাকে একটি নৰীহতনামা দান কৰেছি; (অৰ্থাৎ কোৱান এতে উপৰোক্ত সংবাদাদি আছে। অলৌকিকতাৰ কাৰণে এই কোৱান নিজেও অতঙ্কুষ্টিতে নৰুয়তেৰ প্ৰমাণ। এই নৰীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে (অৰ্থাৎ এৰ

বিষয়বস্তু মেনে দেওয়া থেকে) মুখ কিরিয়ে দেবে, সে কিয়ামতের দিন (আবাবের) তারা বোঝা বহন করবে; তারা তাতে (অর্থাৎ আবাবে চিরকাল থাকবে এবং এই বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের অন্য মন্দ বোঝা হবে। যেদিন শিখায় ফুক দেওয়া হবে (ফলে মৃত্যু জীবিত হবে যাবে এবং আমি সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কার্যক)-দেরকে (কিয়ামতের মাত্রে) মীল-চক্ষ অবস্থায় (বিশীরণে) সমবেত করব (বীজাণ ইঙ্গু চোখের শূন্যতার ফলে। তারা সন্তুষ্ট হয়ে) পরম্পরে চুপিসারে কথা কলবে (এবং একে অপরকে বলবে) তোমরা (করতে) যাও দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই যে, আবাবা এসে কক্ষাম করবে পর পুনরায় জীবিত হবে না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভাব অমাপিত হয়েছে। জীবিত না হওয়া তো দুরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও তো হলো না। আবাবা এত ক্ষমত জীবিত হয়ে দেছি যে, মনে হব মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতঙ্ক ও পেরেগামীই একপ মনে হওয়ার কারণ। এর সামনে কবরে অবস্থানের সময় খুবই কম হবে হবে। আল্লাহ হস্তেন) যে (সময়) সম্পর্কে তারা বশাবলি করে, তা আমি তালিকাবে জানি (যে, তা কর্তৃতুর) বলে তাদের এই যে অপেক্ষাকৃত সঠিক সে বলবেং না, তোমরা মাত্র একমাত্র (করতে) অবস্থান করেছ। (তাকে সঠিক কলার কারণ এই যে, এই দিবসের দৈর্ঘ্য ও আতঙ্কের দিক দিয়ে একাই সত্ত্বের অধিক নিকটবর্তী। সে জ্ঞাবহতার হজু সম্মান উপলক্ষ করেছে। কাজেই তার অভিমত প্রথমোক্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম। এর কথা সম্পূর্ণ নির্দল—এটা হলো উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সমরসীমার দিকে দিয়ে বর্ণিত উভয় পরিমাণই তুল এবং বজাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সা) কিয়ামতের অবস্থা তবে] তারা (অর্থাৎ কেট কেট) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে (যে, কিয়ামতে এদের কি অবস্থা হবে।) অতএব আপনি বলুনঃ আমার পাশনকর্তা এগলোকে (চূর্ণ-বিচূরণ করে) সম্মুখে উঠিয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সম্ভতল মাঠ করে দেবেন, যাতে তুমি (হে সরোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও (পাহাড় ছিলো ইত্যাদির) উচ্চতা দেখবে না। সেই দিন সবাই (আল্লাহর) আহ্বানকারীর (অর্থাৎ শিখায় ফুকরত কেরেশতার) অনুসরণ করবে (অর্থাৎ সে শিখার আওয়াজ তারা সবাইকে কবর থেকে আহ্বান করবে। তখন সবাই বের হয়ে পড়বে)। তার সামনে (কারণ) কোন বক্তা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন পরিষ্কারদের সামনে বক্ত হয়ে থাকত—বিশ্বাস ছাপন করত না, কিয়ামতে ফেরেশতার সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বক্তা করতে পারবে না।) এবং (আতঙ্কের আতিশয্যে) আল্লাহর সামনে সব শব্দই শীঘ হয়ে যাবে। অতএব (হে সরোধিত ব্যক্তি) তুমি হাশমের মাঠের দিকে চুপে চুপে চোলার পদশব্দ ব্যক্তিত অন্য কিছু (আওয়াজ) তুমবে না। (হয় এ কারণে যে, তখন তারা কথাই বলবে না ; তবে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আস্তে আস্তে কথা বলবে। না হয় এ কারণে যে, তারা খুবই শীঘবরে কথা বলবে, যা একটু দূর থেকেও শোনা যাবে না।) সেদিন (কারণ) সুপারিশ (কারণ) উপকারে আসবে না ; কিন্তু (পয়গঢ়ার ও নেক লোকদের সুপারিশ) এমন ব্যক্তির (উপকারে আসবে) যার জন্য (সুপারিশ করার জন্য) আল্লাহ তা'আলা (সুপারিশকারীদেরকে) অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য (সুপারিশকারীর) কথা পছন্দ করবেন। (অর্থাৎ সুমিন ব্যক্তি। সুপারিশকারীদেরকে মুঘিনের জন্য সুপারিশ

করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে সুপারিশকারীর কথা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ না করা। এ আয়াতে আপত্তিকারী কাফিরদেরকে তার প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সুপারিশ থেকেও বাধিত থাকবে।) তিনি (আল্লাহ্) জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্ঞান আয়ন্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃষ্টজীব জানে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন না; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং সৃষ্টজীব জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃষ্টজীব সুপারিশের যোগ্য ও আয়োগ্য হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি সুপারিশকারীদেরকে দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের জন্য এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।) এবং (সেদিন) সব মুখ্যগুল সেই চিরজীব, চিরহ্লাসীর সামনে অবনমিত হবে (এবং সব অহঙ্কারী ও অবিষ্কারী অহঙ্কার ও অবিষ্কাস খতম হয়ে যাবে) এবং (এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূপ হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে একেপ পার্থক্য হবে যে) সে ব্যক্তি (সর্বতোভাবে) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (অর্থাৎ শিরক) নিয়ে আসবে আর যে ইমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করেছে, সে (পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন অবিচার ও ক্ষতির অশাঙ্কা করবে না যেমন আবলনামায় কোন গুলাহ বেশি লিখে দেওয়া অথবা কোন সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ সওয়াব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না—একথা বলা উদ্দেশ্য। কারণ সওয়াব প্রাপ্তি হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে যুলুম ও অবিচার কাফিরদের সাথেও করা হবে না। তবে তাদের সৎকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন যুলুম নয়। বরং তাদের কাজ ইমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন উদ্ধিষ্ঠিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিকারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাখিল করেছি। (যার ভাষা সুম্পত্তি)। আমি এতে (কিয়ামত ও আয়াবের) সতর্কবানী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফলে, এর অর্থ ফুটে উঠেছে; উদ্দেশ্য এই যে, আমি সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু পরিকার বর্ণনা করেছি) যাতে তারা (শ্রোতারা এর মাধ্যমে পুরোপুরি) তার পায় (এবং অন্তিবিলুপ্তি বিষ্কাস স্থাপন করে অথবা সম্পর্ণ ভয় না পেলেও এই কোরআন দ্বারা তাদের কিছুটা বোধেদয় হয়) সভিকার অধীন্তর আল্লাহ্ মহান (যিনি এমন উপকারী কালাম নাখিল করেছেন।) আর (উপরোক্ষিত সৎকর্ম করা ও উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপ্রয় আদের প্রতি যত্নবান হওয়াও আপনার দায়িত্ব। তন্মধ্যে একটি এই যে, আপনার প্রতি এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন (পাঠে) তৎপর হবেন না। (কারণ এতে আপনার কষ্ট হয়। জিবরাইলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই সাথে করতে হয়। অতএব একেপ করবেন না এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। মুখ্য করানো আমার

কাজ। এবং আপনি (মুখ্য হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই দোয়া করুন : হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান স্বরণ ধাকার, যে জ্ঞান অর্জিত হয়নি তা অর্জিত হওয়ার, যে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয়, তা অর্জিত না হওয়াকেই উভয় শু-উপর্যোগী মনে করার এবং সব জ্ঞানে সুবৃক্ষির দোয়া শামিল রয়েছে। অতএব যুক্তি এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে। মোটকথা এই যে, মুখ্য করার উপায়াদির মধ্য থেকে তুরা পাঠ করার উপায় বর্জন করুন এবং দোয়া করার উপায় অবলম্বন করুন।
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَأَتَيْنَاكَ مِنْ لُدْنًا ذِكْرًا বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْر বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহু করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা কোরআন তি঳াওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিকা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্রসমূহের উচ্চারণ শুন্দ না করা, শুন্দ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অ্যতো পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় শুনাহ। কিয়ামতের দিন এই শুনাহ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও শুনাহকে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يَنْفَعُ فِي الْمُسْرَفِ হয়রত ইবনে উমর (রা) বলেন : জনেক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করল : (ছবি) কি ? তিনি বললেন : শিং। এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, শিং এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত বৰুণ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

سَهْلٌ হাদীসে হয়রত ইবনে আবুস থেকে বর্ণিত আছে যে, শহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাইল কোন আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিতীয় কষ্ট হতো—আয়াতকে জিবরাইলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবর্তীর্ণ আয়াতসমূহ মুখ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়—এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখ্য করিয়ে দেব। তাই জিবরাইলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহবা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে একটা

দোষা করে থাবেন — رَبُّ زِينَتِيْ عَلِمْ — হে আমার পাশনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবজীর্ণ হয়েছে, তা অরণ রাখা, যে অংশ অবজীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তত্ত্বাবধান এই দোষার অঙ্গভূত।

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ ادْمَنْ قَبْلُ فَنِسِيٍّ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَوْمًا ⑩٦ وَإِذْ قَلَنا
لِلْمَلِكِيَّةِ اسْجُلْ وَالْأَدْمَرْ سِجْدٍ وَالْأَلْأَبْلِيسَ مَأْبِي ⑩٧ فَقُلْنَا يَا ادْمَنْ
هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلَزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُنَا كَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَشَفَقَ ⑩٨ إِنَّ لَكَ
الْأَنْجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي ⑩٩ وَإِنَّكَ لَا تَظْمُؤُ فِيهَا وَلَا تَضْعِي ⑩١٠ فَوْسُوسَ
إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ ⑩١١ قَالَ يَا ادْمَنْ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلِدِ وَمُلْكِ لَا
يُبْلِي ⑩١٢ فَأَكْلَمْنَهَا فَبَدَأْتُ لَهُمَا سَوَا نَهْمَاهَا وَطَفِقَ أَيْخِصِفِنْ عَلَيْهَا
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ذَوَعَصَى ادْمَرْ بَهْ فَغَوَى ⑩١٣ ثُمَّ أَجْبَيْتُهُ رَبَّهُ فَتَابَ
عَلَيْهِ وَهَدَى ⑩١٤ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جِيَعًا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوًّا فَلَمَّا
يَا تَيْنِكُمْ مِنْ هَذِهِ ⑩١٥ لَفِنْ أَتَبَعَ هُدَى إِلَيَّ فَلَادِيَضَلَّ وَلَا يَشْفَقِ ⑩١٦
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ⑩١٧ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْگَا وَنَحْشَرَةً يُوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَى ⑩١٨ قَالَ رَبِّ لَوْ حَشْرُتِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ⑩١٩
قَالَ كَذِلِكَ أَتَتْكَ أَيْتَنَا فَنَسِيْتَهَا ⑩٢٠ وَكَذِلِكَ الْيَوْمَ تَنْسِي ⑩٢١ وَكَذِلِكَ
نَجِزِي مِنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِأَيْتِ رَبِّهِ ⑩٢٢ وَلَعْنَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ⑩٢٣

(۱۱۵) আমি ইতিগুর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভূলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (۱۱۶) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : তোমরা আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস বাজীত সবাই সিজদা করল। সে অসান্দ করল। (۱۱۷) অতঃপর আমি বললাম : হে আদম, এ তোমার ও তোমার জ্ঞান শক্ত,

সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় । তোমাদেরকে জান্নাত থেকে ; তাহলে তোমরা কটে পতিত হবে : (১১৮) তোমাকে এই দেরা হলো যে, তুমি এজে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বহুবীণ হবে না । (১১৯) এবং তোমার পিপাস্তাৎ হবে না এবং ঝোঁটেও কষ্ট পাবে না । (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমুদপা দিল, বলল ও হে ভাস্তুম, আমি কি তোমাকে বলে দের অনন্তকাল জীবিত ধার্ম বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা ? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল উক্ত করল, তখন তাদের সামনে তাদের গুরুত্বাল্পন খুলে গেল এবং তার জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র ধারা নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে শুরু করল । আদম আর পালনকর্তা আকে মনোরীত করলেন, তার প্রতি যন্মোবোগী হলেন এবং তাকে সুপথে অনন্তন করলেন । (১২৩) তিনি বললেন : তোমরা উভয়েই এখান থেকে একলাঙ্ঘে নেমে যাও । তোমরা একে অপরের শক্তি । এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদ্যমেত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথজষ্ট হবে না এবং কটে পতিত হবে না । (১২৪) এবং যে আমার শরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন আজ অবহৃত উদ্বিষ্ট করব । (১২৫) সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন আজ অবহৃত উদ্বিষ্ট করলেন ? আমি তো চক্ষুস্থান ছিলাম । (১২৬) আস্তাহ বললেন : এমনিভাবে তোমরা কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো তুলে গিয়েছিলে । তেমনিভাবে আজ তোমাকে তুলে যাব । (১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস হ্রাপন না করে । আর পরকালের শাস্তি কর্তৃরজ্ঞ এবং অনেক হ্রাস ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ইতিপূর্বে (অর্থাৎ অনেকদিন আগে) আদম (আ)-কে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম (একটু পরেই তা বর্ণিত হবে) । অতঃপর তার পক্ষ থেকে পাকিলতি (ও অসাবধানতা) হয়ে গিয়েছিল এবং আমি (এই নির্দেশ পালনে) তার মধ্যে দৃঢ়তা (ও অবিচলতা পাইনি) । (এর বিবরণ জান্নাত হলো) শরণ কর যখন আমি ফেরেশ্তাগণকে বললাম ও তোমরা আদমের সামনে (অভিবাদনের) সিজদা কর । তখন ইবলীস ব্যক্তি সবাই সিজদা করল । সে অঙ্গীকার করল । অতঃপর আমি (আদমকে) বললাম : হে আদম, (শরণ রাখ,) এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর (এ কারণে) শক্ত (যে, তোমাদের ব্যাপারে বিতাড়িত হয়েছে) । সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয় (অর্থাৎ তার কথায় এমন কোন কাজ করো না, যার কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্ঠত হও ।) তাহলে তোমরা (জীবিকা উপার্জনের ব্যাপারে) কষ্টে পতিত হবে । (তোমার স্ত্রীও কষ্টে পড়বে ; কিন্তু বেশির ভাগ কষ্ট তোমাকেই ভোগ করতে হবে আর) এখানে জান্নাতে তো তোমাদেরকে এই (আরাম) দেওয়া হলো যে, তুমি কখনও ক্ষুধার্ত হবে না (যদরূপ কষ্ট হবে অথবা তা উপার্জনে বিলম্ব ও পেরেশানী হবে ।) এবং উলঙ্ঘ হবে না (যে কাপড় পরিবে না কিংবা প্রয়োজনের সময় থেকে বিলম্ব পাবে) এবং তোমরা সিপাসিতও হবে না (যে, পানি মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ১৯

পাখে না কিংবা দেরীতে পোওয়ার কারণে কষ্ট হবে) এবং রৌপ্যক্লিষ্টও হবে না। (কেননা জান্মাতে, রোম নেই এবং গৃহও সুরক্ষিত আছেন্হল। কিছু জান্মাত থেকে দের হয়ে পূর্বীতে পেলে এ সমস্ত বিপদাপদের ক্রূরীন হবে। সুতরাং এসব বিবরের অতি শক্ত রেখে শুধু হৃশিরার ও সজাগ থাকবে।) অতএব শরতাম তাদেরকে কুমজ্জ্বল দিল। সেই বলল : হে আদম, আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনের (বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন) বৃক্ষের কথা বলে দেব। এটি আহার করলে চিরকাল শক্তি ও আনন্দিত থাকবে।) এবং এখন রাজগৃহের কথা, যাতে কখনও দুর্বলতা আসবে না। অতএবে (তার কুমজ্জ্বল পক্ষে) উভয়েই (মিষিঙ্ক) বৃক্ষের ফল আহার করল, তখন (অর্থাৎ আহার করতেই) তাদের সামনে তাদের লজ্জাহৃত খুলে গেল। এবং তারা (দেহ আবৃত করার জন্য) উভয়েই (বৃক্ষের) পক্ষ (দেহে) জড়াতে লাগল। আদিয় তার পালনকর্তার অবাধ্য হলো, ফলে সে (জান্মাতে চিরকাল বাসবাসের মক্ষ অর্জনে) আতিতে নিপত্তি হলো। এরপর (যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল, তখন) তার পালনকর্তা তাকে (আরও অধিক) মনোনীত করলেন, তার প্রতি (মেহেরবানীর) দৃষ্টি দিলেন এবং সৎপথে সর্বদা কায়েম রাখলেন। (ফলে এমন তুলের আয় পুনরাবৃত্তি হয়নি। নিষিঙ্ক বৃক্ষ আহার করার পর) আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমরা উভয়েই জান্মাত থেকে নেয়ে যাও (এবং দুনিয়াতে তোমাদের সংস্কাৰণ-সন্তুতি)। একে অপরের শক্ত হবে। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিসাবেত (অর্থাৎ রাসূল অথবা কিতাব) আসে, তখন যে আমার হিসাবেত অনুসরণ করবে, সে (দুনিয়াতে)-পথচারী হবে না এবং (পরকালে) কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার উপদেশের প্রতি বিশ্ব হবে, তার জন্য (কিয়ামতের পূর্বে এবং করবে) সংকীর্ণ জীবন হবে। এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অঙ্গ অবস্থায় (কবর থেকে) উত্থিত করব। সে (বিশ্বিত হয়ে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অঙ্গ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো (দুনিয়াতে) চক্ষুশ্বান ছিলাম। (আমি এখন কি অপরাধ করলাম?) আল্লাহ বললেন : (তোমার যেহেন শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে (তোমা ধারা কাজ হয়েছে এই যে, তোমার কাছে পয়গম্বর ও উলামায়ে দীনের মাধ্যমে) আমার নির্দেশাবলী এসেছিল, তখন তুমি এগুলোর প্রতি খেয়াল করনি। এমনিভাবে আজ তোমার প্রতি খেয়াল করা হবে না। (এই শাস্তি যেহেন কর্মের সাথে সহজ রেখে দেয়া হয়েছে) এমনিভাবে আমি (প্রত্যেক) সে ব্যক্তিকে (কর্মের অনুকূল) শাস্তি দেব, যে (আনুগত্যের) সীমালংঘন করে এবং পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করে না। বাস্তবিকই পরকালের আবাব কঠোরভূত এবং অধিক হাস্তী। (এবং শেষ নেই। অতএব এই আবাব থেকে আত্মরক্ষার আধার চেষ্টা করা প্রয়োজন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ণাপন সম্পর্ক : এখান থেকে হয়রত আদম (আ)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা-হিজর ও কাহুকে বর্ণিত হয়েছে। সরলেখে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলীসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে কাহিনীর সম্পর্ক তফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সমচাইতে উজ্জ্বল ও অমলিন উচ্চি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে ৩ ﴿كُلَّ نَفْسٍ عَلَيْكَ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ এতে মাসুলুমাহ (আ)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবৃত্যতের প্রয়াগ ও আপনার উত্তরকে ইশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী প্রয়গস্থরদের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মূসা (আ)-এর বিত্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিকে দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হ্যবরত আদম (আ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উত্তরে মুহাম্মদীকে ইশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শক্তি। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শক্তি সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও উজ্জ্বলমূলক পরামর্শের জাল বিত্তার করে তাদেরকে পদবৃত্তিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জালাত থেকে ঘর্জে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জালাতের পোশাক হিনিয়ে মেয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রভ্যাবর্তন এবং ভূলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রিসালত ও নবৃত্যতের উচ্চমর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমুজগা থেকে মানব মাঝেরই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আজ্ঞারক্ষার জন্য যথসাধ্য ঢেঠা করা উচিত।

وَصَيْنَا أَمْرِنَا عَبْدَنَا إِلَى أَمْ مِنْ قَبْلِ فَتْسِنِي وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا
শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।—(বাহরে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আ)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অথবা কোন অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জালাতের সব বাগবাণিচা ও দিয়ামত তোমাদের জন্য অবাবিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শক্তি। তার কুমুজগা মেমে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আ) এসব কথা ভূলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকেতের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে জন্ম ও নিয়ন্ত্রণ। আর কুমুজগা মেমে নিলে তোমাদের অর্থ ভূলে যাবারা, অসবধান হওয়া এবং—এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্য সংকেতকে দৃঢ় করা। এই শব্দব্যবহার দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা স্বদয়ব্যবহার করার পূর্বে এ কথা জেনে মেয়া জাহুনী যে, আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবসামী প্রয়গস্থরদের অন্যত্যম হিলেন এবং সব প্রয়গস্থ তন্মাহ থেকে পরিষ্কারেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আ) ভূলে পিশ হয়ে পড়েন। ভূলে যাওয়া সামুদ্রে ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে আপেই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হালীসে বলা হয়েছে : ﴿رَفِعَ عَنْ أَمْنِ النَّفَّالِ وَالنَّسْبَانِ﴾ অর্থাৎ আবার উত্তরের জন্মাহ স্বল্পবণ্ট যাক করে দেওয়া হয়েছে। কোরআন পাক বলে : ﴿يَكْفِيَ اللَّهُ نَفْسَهُ أَوْ سَفَّهَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাত্মিত কাজের আদেশ দেন না; কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা

এ জগতে প্রমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল খেকে বাঁচতে পারে। পয়গঞ্জরগণ আল্লাহু তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। অদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না ? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের ঘোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরুষকারযোগ্য হয়ে থাকে। হয়রত জুনাইদ বাগদাদী (র) এ, কুথাটিই এভাবে বলেছেন **حسنات البار - سينات المقربين** অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহ গণ্য করা হয়।

আদম (আ)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবৃত্ত ও বিসালতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গঞ্জরদের কাছ থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কতক আলিমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গুনাহ নয়। কিন্তু আদম (আ)-এর উচ্চ ঘর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহু তা'আলা তাকে ভৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

عزم عزم
বিভীষিত শব্দ ব্যবহৃত করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আ)-এর স্থিতি
তথ্য সংকলনের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে
দৃঢ়সংকলন হওয়া। আদম (আ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকলন
করে রেখেছিলেন; কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকলনের দৃঢ়তা ক্ষণ হয় এবং ভুল
তাকে বিচ্যুত করে দেয়। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

আল্লাহু তা'আলা আদম (আ)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্মাতে ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অঙ্গীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল : আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। আগ্নি মাটির ভুলনায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরণে তাকে সিজদা করবঃ এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্মাত থেকে বহিষ্ঠত হলো। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্য জান্মাতের সব বাগবাণিচা ও অকুরাত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। সরকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে (অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সুরা বাকারা ও সুরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল ধূকা সম্পর্কে আল্লাহু তা'আলার বাণী বর্ণনা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন : দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার) শক্ত। যেন অপকৌশল ও ধোকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বৃদ্ধ না করে। এরপ করলে এর পরিপতিতে তোমরা জান্মাত থেকে বহিষ্ঠত হবে। অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্মাত

থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। শব্দটি شفافٌ শব্দটি شفافٌ থেকে উত্তৃত। এর অর্থ দ্বিধা-এক পারলোকিক কষ্ট অপরটি হলো ইহলোকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বর দূরের কথা, কোন সরকর্মপরায়ণ সুসলমানের জন্যও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র)-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : هُوَ مِنْ يَا كَلْ مِنْ كَسِيدِيَهُ অর্থাৎ এখানে এর অর্থ হাতে খেটে আহাৰ্ত উপার্জন করা। --(কুরতুবী) এখানে স্থানের ইস্তিও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষা দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়তে জান্নাতের এমন চারটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের পৃষ্ঠা বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ মধ্যে অধিক শুল্কপূর্ণ ; অর্থাৎ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও রামছান। আয়তে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্ৰম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিকৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সত্ত্বত এই ইস্তিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমনসব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব-জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমুদণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন-জান্নাত থেকে বহিকৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরপ হলে পৃথিবীতে এসব নিয়তপ্রয়োজনীয় সামগ্ৰী কঠোর পরিশ্ৰমের মাধ্যমে উপার্জন কৰতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বৰ্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে ﴿كُلُّ شَدَّدَ فِي أَرْضِهِ﴾ শব্দের মৰ্ম। ইমাম কুরতুবী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাইল জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন : যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তৃন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। জিবরাইল এসব কাজের পূজ্ঞতিও আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আ) রুটি তৈরি করে থেকে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নিচে গড়িয়ে গেল। আদম (আ) অনেক পরিশ্ৰমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাইল বললেন : হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির পৃথিবীতে এমনি পরিশ্ৰম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

জ্ঞানী ভৱণ-পোৰ্ট কলা বামীৰ দায়িত্ব ১ আয়তের শুল্কতে আল্লাহু তা'আলা আদম (আ)-এর সাথে হাওয়াকেও সহোধন করে বলেছেন : عَدُولُكَ وَلِرَجُلِ فَلَادِيْخِرِ جَفْكَمَاً অর্থাৎ শয়তান তোমারও শক্ত এবং তোমার জ্ঞানও শক্ত। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিকৃত করে না দেয়। কিন্তু আয়তের শেষে ﴿فِي أَرْضِهِ﴾ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে জ্ঞানে শরীক করা হয়নি। নতুনা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী ﴿كُلُّ شَدَّدَ فِي أَرْضِهِ﴾ বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা থের করেছেন যে, জ্ঞান জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ করা বামীৰ দায়িত্ব। এসব সামগ্ৰী উপার্জন কৰতে গিয়ে যে পৰিশ্ৰম ও কষ্ট স্বীকার কৰতে হয়, তা এককভাবে বামী কৰবে। এ কারণেই ﴿كُلُّ شَدَّدَ فِي أَرْضِهِ﴾ একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইস্তিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে

অব্দতরশের পর জীবন-ধারণের অনোজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট বীকার করতে হবে, তা আদম (আ)-কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও অনোজনীয় সামগ্রী সঞ্চয় করা তার সারিয়তি।

যাই চারটি বন্ধু জীবন ধারণের অনোজনীয় সামগ্রীর মধ্যে থেকে : কুরতুবী বলেন এ আবাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, কুরি যে গ্রহাঙ্গনীয় ব্যৱভাব বহন করা সামীর দিকায় শুরাজিব, তা চারটি বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয় বান্ধ ও বাসস্থান। সামী এর বেশি কিছু ক্ষীকে সিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুভূত—অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আবাদ জানা গেল যে, কুরি জন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বন্ধুই তার দায়িত্বে শুরাজিব হবে; হেম পিতামাতা অঙ্গক্ষণ্ঠ ও অপারক হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু অসম্ভুক্ত এ সম্পর্কিত বিশ্বরণ উল্লিখিত রয়েছে।

أَنْ جَيْرَمْ بَلْ تَجْسِعْ فِيْهَا فَلْتَمْدَى وَلْ تَمْلَى! জীবন ধারণে অনোজনীয় এই চারটি মৌলিক বন্ধু আল্লাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। “আল্লাতে কুখ্যা লাগে না” —এতে সন্দেহ হকে পারে যে, যতক্ষণ কুখ্যা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের আদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিগাসার্ট না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির আদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উন্নত এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাতে কুখ্যা ও পিগাসার কষ্ট তোগ করতে হবে না। বরং কুখ্যা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিগাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিশ্ব হবে না। এছাড়া আল্লাতী রঞ্জিত মন যা চাবে, তৎক্ষণাত তা পাবে।

إِنْ أَدْمَرْيَهُ فَفَوْسُونَ إِنْ لِلشَّيْطَانِ
তা'আলা যখন আদম (আ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিবেদ করে দিয়েছিলেন এবং হাঁশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশ্মন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, তোমাদেরকে জালাত থেকে বহিক্ত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ধোকা বুবতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও শুনাই। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই শুনাই কিন্তু পে করলেন; অথচ সাধারণ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরণ প্রত্যেক হেট-বড় শুনাই থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাকারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে আদম (আ) সম্পর্কে অথবা ও পরে ফ্লো মালি বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আ)-এর এই এই কর্ম শুনাই ছিল না; কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহর নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য আঙ্গিকোশ ও ক্ষমতার ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। ফ্লো শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, জীবন কিছি ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং দুই, পথভ্রষ্ট অথবা

গাফিল হওয়া । কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এ স্থলে অধম অর্থই অবলম্বন করেছেন । অর্থাৎ আদম (আ) জানাতে যে সুখ-ব্যবহৃত তোৎ করছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল ।

প্রয়োগবিদের সম্মতে একটি জনকী নির্দেশ তাদের সম্বলের হিকায়ত । কাজী আবু বকর ইবনে আবারী আহকামুল কোরআন থেকে ইজ্যাদি শব্দ সম্মতে একটি উরুজপূর্ণ উচ্চি করেছেন । উচ্চিটি তাঁর জানায় এই—

لَا يجُوز لِأَهْدِنَا الْيَوْمَ أَنْ يَغْبِرْ بِذَلِكَ عَنْ أَدَمَ إِلَّا إِذَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَشْنَاءِ
قُولِهِ تَعَالَى عَنْهُ أَوْ قَوْلِ نَبِيٍّ فَامَّا إِنْ يَبْتَدِي ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ فَلِيَسْ
يَجَانِزَ لَنَا فِي أَبَائِنَا الْأَدِينِ الْيَنَا الْمَمَاثِلِينَ لَنَا فَكِيفَ فِي أَبِيتَنَا الْأَقْوَمِ
الْأَعْظَمِ الْأَكْرَمِ النَّبِيِّ الْمَقْدُومِ الَّذِي عَذْرَهُ اللَّهُ سَبِّحَنَهُ وَتَعَالَى وَنَابَ
عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ—

আজ আমাদের কারণে জন্য আদম (আ)-কে অবাধি বলা জায়েয় নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদিসে এরপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয় । কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয় নয় । এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাহিতে অগ্রগত্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহু তাজালার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহু থার তওয়া কবূল করেছেন এবং কর্ম ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্য কোন অবস্থাতেই এরপ বাক্য অয়োগ করা জায়েয় নয় ।

এ কারণেই কুশায়রী আবু মছর বলেন । কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আ)-কে তুলাহপার, পদ্মুষ্ঠ বলা জায়েয় নয় । কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রাসূল সম্মতে এরপ ভাবা অয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উন্মের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে । তাই কোরআনী আয়াত ও হাদিসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয় ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্মতে এরপ ভাবা ব্যবহার করার অনুমতি নেই ।—(কুরতুবী)

أَنْبَطَاهُ جَنِينًا

অর্থাৎ জানাত থেকে নেয়ে যাও উভয়েই । এই সঙ্গে আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে । এমতাবস্থায় “أَنْبَطَكُمْ لِبِعْضِ عَدُوٍّ”-এর অর্থ সুল্পট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শত্রুদের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে । যদি বলা হয় যে, শত্রুদানকে তো এর পূর্বেই জানাত থেকে অবিকার করা হয়েছিল, কাজেই এই সঙ্গে তাকে শরীক করা অবাস্থা ; তাহলে এটা হতে পারে যে, এসবের আদম ও হাওয়াকে সঙ্গে করা হয়েছে । এমতাবস্থায় পারম্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান-সন্ততির পারম্পরিক শত্রুতা । বলা যাইল্য, সন্তানদের পারম্পরিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে ।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
(সা)-এর মোবারক সন্তাও ইতে পারে, যেমন অন্য জোয়াতে 'رَسُّوْلُ' বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কোরআনের তিলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুষ্ঠান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; তার পরিগাম এই : فَإِنْ لَهُ مَعْيِنَةً ضَلَّكَ وَتَخَرَّهُ يَوْمَ الْقِبْلَةِ
অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অক্ষ অবস্থায় উদ্ধিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কিয়ামতে হবে।

কাফির ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার দ্বন্দ্বপঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফির ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুমিন ও সৎকর্মপ্রায়বণগণও এর সম্মুখীন হন ; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্বিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বৃথারী ও অন্যান্য সব হাদীস প্রাপ্তে সাদ প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলেন : পয়গম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালামুসীবত সবচাইতে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে ত্রুরের সৎকর্মপ্রায়প ও শুলী ইয়, সেই অনুধারী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফির ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য ইতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিকার ও নির্মল জগতের এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিশহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে ঢাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বায়ুযারে হ্যারত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বয়ং مَعْيِنَةً
এর ডফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগৎ বোঝানো হয়েছে। —(মাযহারী)

হ্যারত সাইদ ইবনে জুবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ একপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে আঝে তুষ্টির শুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাঢ়িয়ে দেয়া হবে। —(মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থসম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শাস্তি তাদের ভাগ্যে জুটিবে না। সদাসৰ্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশংকা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামংজ্ঞী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয় ; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের হ্রিতা ও নিষিদ্ধতা ব্যক্তিত অঙ্গিত হয় না।

أَفَلَمْ يَهْدِ لِهِمْ كَوَا هَلْكَنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسِكِنِهِمْ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَذَّاتٍ لَا يُؤْلِي النَّى ۝ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً

وَاجْلٌ مُّسْتَيٰ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسِيمَ حَمْدَارِبِكَ قَبْلَ طَلْوَعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۝ وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيلِ فَسِيمَ وَاطْرَافَ النَّهَارِ
لَعْلَكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَسْتَدِّنَ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًاٰ مِنْهُمْ
زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الَّذِي نَيَّا لِنَفْتَنَهُمْ فِيهِ ۝ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقِي ۝
وَأَمْرَاهُلَكَ بِإِلْصَالِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۝ لَا تَسْكُنَ رِزْقًاٰ مَخْنَنْ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا يَاتَّيْنَا يَابِيَّةً مِنْ رَبِّهِ ۝
أَوْلَمْ تَأْتِهِمْ بِيَشْهَدَةٍ مَا فِي الصُّحْفِ الْأَوَّلِ ۝ وَلَوْا نَّا أَهْلَكَنَهُمْ
بِعَدَّا بِمِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا سَبَبَنَا لَوْلَا أَرْسَلَتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبَعَ
إِيْتَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْرُجَ ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا
فَسْتَعْلَمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمِنْ اهْتَلَىٰ

(১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে খৎস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করল না? নিষ্ঠয় এতে বৃক্ষিমানদের জন্মে নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আগন্তুর পালনকর্তার পক থেকে পূর্ব সিঙ্কান্ত এবং একটি কাল নিসিট না থাকলে শাস্তি অবশ্যজাবী হবে বেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে দৈর্ঘ্য ধারণ করুন এবং আগন্তুর পালনকর্তার সপ্রশংস পরিবর্তন ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পরিব্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন জাতির কিছু অংশে ও দিবাভাগে, সম্বৰ্ধ তাতে আপনি সম্মত হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যবর্ণনা ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর ধৃতি দৃষ্টি নিষেকে করবেন না। আগন্তুর পালনকর্তার দেয়া রিয়িক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আগন্তুর পরিবারের লোকদেরকে নামাবের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আগন্তুর কাছে কোন রিয়িক চাই না। আমিই আগন্তুরকে রিয়িক দেই এবং আল্লাহভীকৃতার পরিণাম পাত। (১৩৩) এরা বলে : সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নির্দর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি শ্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী অঙ্গসমূহে

অহে ? (১৩৫) যদি আমি এন্দেরকে ইতিশূর্বে কেন শাস্তি দারা থাকল করতাম, তবে এরা বলত ? হৈ আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন বাসৃজ প্রেরণ করলেন না কেন ? তাহলে তো আমরা অশুভাক্ষিত ও হৈব ইন্দোর পূর্বেই আপনার সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলফাম। (১৩৬) বলুন, এতেকেই প্রশ্নাদে তো আছে, সুতরাং তোমারও প্রশ্নানে হৈবে থাক। অন্তর জড়িবাটে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সৎ পথ পাঠ হৈবে।

তৃষ্ণীরের সার-সংক্ষেপ

(এ অভিযোগকারীগুলি যারা মুখ কেরানো থেকে বিরত হচ্ছে না, তবে এন্দের কি এ থেকেও হিন্দায়েত হলো না যে, আমি এন্দের পূর্বে অনেক আমর সম্মানকে (এই মুখ কেরানোর কারণেই আমাৰ দ্বাৰা) খাস কৰেছি। তাদের (কিন্তু সংখ্যাকে) বাসৃজিতে এৱাও বিচৰণ কৰে (বেলমা, মুকোবাসীদের সিদ্ধিৰা যাগৱার পথে কোন কেন্দ্ৰ বাস্তুবাণীও সম্মানের বাসৃজি পক্ষত)। এতে (অর্থাৎ উপৰিবিত্ত লিঙ্গে) তো মুক্তিযাপনের (বেঙ্কার) জন্য (মুখ কেরানোর অভ্যন্তর পর্যাপ্ত) প্রয়োগ হৈবে। (এন্দের উপর তৎক্ষণিক আমাৰ না আসাৰ কারণে এৱা মনে কৰে যে, এন্দের ধৰ্ম সিদ্ধীৰ নয়। এবং বৰ্জন এই যে) আপনার পালনকর্তাৰ পক্ষ থেকে একটি কৰ্ম পূৰ্ব থেকে বলা না হয়ে থাকলু (তা এই যে, কোন কোন উপকারিতাৰ কারণে তাদেৱকে সময় দেয়া হৈবে)। এবং (আমাৰেৰ জন্য) একটি কাল নিন্দিত না থাকলো (এবং সেই সময়কাল হচ্ছে কিছীমত্তেৰ নিম্ন)। তাদেৱ কুকুৰ ও মুখ কেরানোৰ কারণে) আমাৰ অবগুজাবী হয়ে যেত। (মোটকো এই যে, কুকুৰ তো আমাৰই ঢায় ; কিন্তু একটি অস্তুৱায়েৰ কারণে আমাৰে বিৰতি হচ্ছে। কাজেই তৎক্ষণিক আমাৰ না আসাৰ কারণে তারা যে নিজেদেৱকে সত্যপণী মনে কৰে, এটা ভুল। এখানে সময় দেয়া হচ্ছে হেঢ়ে দেয়া হয়নি।) সুতৰাং (আমাৰ ধৰ্ম নিষ্ঠিত, তৎসম) আপনি তাদেৱ (কুকুৰ যিহিত) কথাৰ্বার্তায় সৰবৰ কৰুন (এবং “আল্লাহুব্যাপ্ত শক্তি” এই নীতিৰ কারণে তাদেৱ প্রতি যে ক্রোধ হয়, তা এবং আমাৰে বিলুপ্তেৰ কারণে মনে যে অহিংসা হয়, তা বৰ্জন কৰুন)। এবং আপনাৰ পালনকর্তাৰ প্ৰশংসা (ও কৃত) সহকাৰে (তাৰ) পৰিতা পাঠ কৰুন—(এতে নামাযও এন্দে গৈছে।) সূর্যোদয়েৰ পূৰ্বে (যেমন ফজলেৰ নামায), সূর্যাস্তেৰ পূৰ্বে (যেমন যোহুৰ ও আসৱেৰ নামায) এবং রাত্রিকালেও পাঠ কৰুন (যেমন মাগৱিব ও এশাৰ নামায)। এবং দিনেৰ উক্ততে ও শেষে (পৰিতা পাঠ কৰাৰ জন্য তুলত দানেৰ উছেল্পে পুনৰায় বলা হচ্ছে। ফলে তুলত দানেৰ উছেল্পে ফজল ও মাগৱিবেৰ উক্তেখণ্ড পুনৰায় হয়ে গৈছে।) যাতে আপনি (সওয়াৰ পালনকাৰীৰ কারণে) সম্মুক্ত হন। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি সত্ত্বিকাৰ মাঝুদেৱ দিকে দৃষ্টি দিবছ বাসৃজ—মাঝুদেৱ চিঞ্চা কৰবেন না।) আপনি এ বন্ধুৰ প্রতি দৃষ্টি নিশ্চেপ কৰবেন না, (বেলম এ পৰ্যন্ত কৰেন নি) যা আমি কাফিৱেৰ বিজ্ঞ সম্মানকে (উপাহৰণত ইহুনী, প্ৰিয়ান ও মুশৰিকদেৱকে) পৰীক্ষা কৰাৰ জন্য (নিছক) পাৰ্থিব জীবেনৰ সৌন্দৰ্যবৱপ দিয়ে আৰেছি। (উদ্দেশ্য) অন্যদেৱকে শোনানো যে, নিষ্পাপ নবীৰ জন্যও ইখন এটা নিবিজ, অহত তাৰ মধ্যে পাপেৰ সংক্ৰান্ত নেই, তখন যারা নিষ্পাপ নয় তাদেৱ জন্য এ বিকলে যত্নবান

হওয়া কিন্তু জরুরী হবে না। পরীক্ষা এই যে, কে অনুগ্রহ বীকার করে এবং কে অবাধ্যতা করে) আপনার পালনকর্তার দান (যা পরকালে পাওয়া যাবে) অনেক উপে উৎকৃষ্ট ও অধিক হাস্থি (কখনও ক্ষয় হবে না। সামুদ্রিক এই যে, তাদের মূখ ফেরানোর প্রতিও জ্ঞানে করবেন না এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের প্রতিও দৃষ্টি দেবেন না। সবজগোর পরিণাম আয়াব।) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে (অর্ধাং পরিবারের সোকদেরকে অথবা মুদ্রিনদেরকে)-ও নামায়ের আদেশ দিন এবং নিজেও এতে অবিচল থাকুন। (অর্ধাং এ বিষয়টি হচ্ছে অধিক ঘনোয়োগদানের যোগ্য) আমি আপনার ধারা (এমনিভাবে অন্যদের ধারা) এবন জীবিকা (উপার্জন করাতে) চাই না যা জরুরী ইবাদতের পথে বাধা হয়ে যায়। (জীবিকা তো আপনাকে এবং এমনিভাবে অন্যদেরকে) আমি দেব। (অর্ধাং আসল উদ্দেশ্য উপার্জন নয়—ধর্ম ও ইবাদত। উপার্জনের তথমই অনুমতি অথবা আদেশ আছে, যখন তা জরুরী ইবাদতে বিপ্র সৃষ্টি না করে) আক্ষাৎজীবিকার পরিণাম পত। (তাই আমি এবং এমাত্র, ইত্যাদি নির্দেশ দেই। এবং অভিযোগকর্তাদের কিছু অবস্থা ও উক্তি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের আরও একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।) তারা (হস্তকারিভাবল্পত) বলে : রাসূল আমাদের কাছে (নবুয়তের) কোন নিমর্ণন আলফ্যন করে না কেন? (উত্তর এই যে) তাদের কাছে কি পূর্ববর্তী এহসস্যুহের বিষয়বস্তু পৌছে নি? (এতে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কোরআন ধারা পূর্ববর্তী এহসস্যুহের ভবিষ্যাধারীর সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কাছে কি কোরআন পৌছে নি, পূর্ব থেকেই যার খ্যাতি রয়েছে? এটাই নবুয়তের পর্যাণ দলিল।) যদি আমি তাদেরকে কোরআন আসার পূর্বে (কুকুরের কারণে) কোন আগদ ধারা ধর্ষণ করতাম। এবং এরপর কিয়ামতের দিন আসল শাস্তি দিতাম। তবে তারা (ওয়র পেশ করে) বলতঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে কোন রাসূল (দুনিয়াতে) কেন প্রেরণ করেন নি? তাহলে আমরা (এখানে নিজেরা) হয় এবং (অপরের দৃষ্টিতে) অগমানিত হওয়ার পূর্বেই আপনার বিধানবাসী মেলে চলতাম। (সুতরাং এখন এই ওয়রেরও অবকাশ রইল না। তারা যদি বলে যে, এই আয়াব কবে হবে, তবে) বলুনঃ আমরা সবাই প্রতীক্ষা করছি, অতএব (কিছুদিন) আরও প্রতীক্ষা করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা (ও) জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে (মঞ্জিলে) মকসুদ পর্যন্ত পৌছে গেছে (অর্ধাং এই ফয়সালা সজুরই মঙ্গল পর অথবা হাশবের পর প্রকাশ হয়ে পড়বে)।

ଆମ୍ବାଦିକ ଆତମ୍ୟ ବିଷୟ

মক্কাবাসীরা ইমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। এক, আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি জঙ্গেপ করবেন না, বরং সবর করবেন। দুই, আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। **فَسَبِّعْ بِخَمْدِرِبَكَ** বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শক্রদের নিপীড়ন থেকে আস্তরক্ষার প্রতিকার দৈর্ঘ্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভালমদ কোন মানুষ শক্রমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শক্র রয়েছে। শক্র যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে ; যদিও তা যৌবিক গালিগালাজী হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিস্ত না থাকলে পচাতেই করে। তাই শক্র অনিষ্ট থেকে আস্তরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। এক. সবর ; অর্থাৎ বীয় প্রতিক্রিয়ে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপ্ত না হওয়া। দুই. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়, সে যতই শক্রিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শক্র কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আয়াবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উভ্যে হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে ; তখন শক্র অনিষ্টপ্রসূত ক্ষেত্রে ও ক্ষেত্রে আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **أَرْبَعْ بِخَمْدِرِبَكَ** অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সম্মুচ্চির জীবন যাপন করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও শুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বাস্তুর আল্লাহর নাম নেয়ার অথবা ইবাদত করার তত্ত্বাত্ত্বিক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তত্ত্বাত্ত্বিক দানের ফলশুভ্রতি।

এই **سَبْعْ بِخَمْدِرِبَكَ** শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর মেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত, 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামায, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলে যোহর ও আসরের নামায এবং 'নাতাল আল্লাল' বলে রাত্রিকালীন সব নামায মাগরিব, এশা, তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাল আল্লাল বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র ইওয়ার আশামত নয়, বরং মু'মিনের জন্য আশংকার বস্তু ৪৫: ৫০ এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্মোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে উত্থতকে পথপদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐর্ষ্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থির চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি অক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধৰ্মসীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থির চাকচিক্য থেকে বহুগে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফির ও পাপাচারীদের বিলাসবৈড়ব, ধনবাট্যাতা ও জাঁকজমক সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত, তখন এদের হাতে এসের নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নির্বেদিতপ্রাপ্ত ইমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বত্তা কেন? হয়রত উমর ফারুক (রা)-এর মত মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে করীম (সা) তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হয়রত উমর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতার দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হয়রত উমর কান্না ঝোঁখ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কঠে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, পারস্য ও রোম সন্তাটিগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আপনি সমগ্র সৃষ্টি জীবের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাঘন্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হে খান্তাব-তনয়, ভূমি এখন পর্যন্তও সদেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছে! এদের ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোন অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আয়াবই আয়াব। মু'মিনদের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহ্যিক, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) পার্থির সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম-আয়েশের সামগ্ৰী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তাঁর ছিল। কোন সময় পরিশ্রম ও চেষ্টাচরিত্র ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাত তা কক্ষী-মিসকীনদের মধ্যে বর্তন করে দিতেন এবং নিজে আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ان أخواف ما أخاف علّكم ما بفتح الْأَنْبَابِ لِمَنْ مِنْ زُمْرَةِ الدَّنَبِ تَهْجَزْ دُنْيَاكُمْ এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশংকা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমদের সামনে খুলে দেয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) উত্থতকে এ সংবাদও দিয়েছের যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-ব্যাসনের প্রাচুর্য ছবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয় ; বরং তয় ও আশংকার বিষয়। এতে লিঙ্গ হয়ে তোমরা আল্লাহর শরণ ও তাঁর বিধানাবলী থেকে গাফিল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামায়ের আদেশ ও তার রহস্য : **وَأَمْرٌ أَمْلَكَ بِالصَّلَاةِ** : এই অর্থে আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিস এবং নিজেও এর উপর অবিচল ধ্যান। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। এক. পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং দুই. নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পুরোপুরী অব্যাহত রাখার অন্যও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও বজ্ঞনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যিক। কেননা, পরিবেশ ডিনুরূপ হলে মানুষ ব্যভাবত নিজেও অঙ্গস্তার শিকার হয়ে যায়।

ଶ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତି ଓ ସମ୍ପର୍କଶୀଳ ସବାଇ ଶବ୍ଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏଦେର ଦ୍ୱାରାଇ ଯାମୁଖେର ପରିବେଶ ଓ ସମ୍ବାଦ ଗଠିତ ହୁଏ । ଏ ଆମାତ ଅବର୍ତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟମୁଖ୍ୟ (ସା) ପ୍ରତ୍ୟହ କଜରେର ନାମାଧେର ସମୟ ହୟରତ ଆଜୀ ଓ ଫାତେମା (ରା)-ଏର ଘୂରେ ଗୟନ କରେ ନାମାଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମୁଖ୍ୟ ମହାନ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼, ନାମାଧ୍ୟ ପଡ଼) ବଲାତେନ ।—(କୁର୍ରତୁବୀ)

ধনকুবের ও রাজগ্রাজাদের ধনের ও জাকজমকের উপর যখনই হয়ত ওরওয়া ইবনে যুবায়িরের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে উন্নতেন। হয়ত উমর ফারাক (রা) যখন রাত্রিকালে তাহাঙ্গুদের অন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে উন্নতেন।—(কুরআনী)

যে ব্যক্তি সামাধ ও ইবাদতে আস্তপিলোগ করে, আস্তাহু তার বিষিকের ব্যাপার সহজ
করে দেন : **لَهُمْ أَن يَرْكِعُوا** অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি
নিজের ও পরিবারবর্গের বিষিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জ্ঞানে সৃষ্টি করুন। বরং এ
কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে খেলেছি। কেবলমা, বিষিক উপর্যুক্ত করা প্রকৃতপক্ষে
মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশির মধ্যে যাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে
এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু বীজের ভিতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং
তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আস্তাহু
তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিষাবত ও আস্তাহু
সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপর্যুক্ত ইওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আস্তাহুর ইবাদতে
মশংগুল হয়ে যায়, আস্তাহু তা'আলা এই পত্রিশৈলের ঘোষণা ও তার জন্যে সহজ ও হালকা
করে দেন। তি঱মিয়ী ও ইবনে মাজা ইয়েরত আবু হুরায়হার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন
যে, **فَاسْتَعْلَمْ** (সা) বলেন :

يقول الله تعالى يا اين ادم تفرغ لعيادتى املاء هيدرك غنى واسد

- فقرک وان لم تفعل ملاععت صدرک شفلا ولم اتسد فقرک -

ଆମ୍ବାଟୁ ତା'ଆମା ବଲେମ ୫ ହେ ଆମ୍ବ ସତ୍ତାନ, ଜୁମି ଏକାଷ୍ଠିତେ ଆମାର ଇବାଦତ କର, ଆମି ଧରେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ତୋମାର ବକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦେବ ଏବଂ ତୋମାର ଅଭାବ ମୌଳନ କରନ୍ତି । ଯଦି ତୁମି ଏହିପାଇଁ ନା କର, ତରେ ତୋମାର ବକ୍ଷ ଚିତ୍ତ ଓ କର୍ମବ୍ୟକ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦେବ ଏବଂ

তোমার অভাব মোচন করব না (অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভসামসাও ততই বেড়ে যাবে । কলে সর্বদা অভাবযুক্তই থাকবে) ।

ইব্রাহিম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একথা বলতে গ্রহণ করি :

مَنْ جَعَلَ هُمُومَهُ مِمَّا وَاحَدَهُمُ الْمَعَادُ كَفَاهُ اللَّهُ هُمْ دُنْيَاهُ وَمَنْ

تَشَعَّبَتْ بِالْهُمُومِ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يَبْلُغْ اللَّهُ فِي أَىٰ أُورْبَيْهِ هُلْكَ -

যে শক্তি তার স্বত্ত্ব চিহ্নাকে এক ছিদ্র জন্মাও পরবর্তীতে ছিদ্রটি পরিষ্কৃত করে আল্লাহ তাজ্জ্ঞান করার সম্ভাবনা আপন ছিদ্রের মধ্যে (পুরুষ পুরুষের মধ্যে) । পুরুষের যে শক্তি সংসার চিহ্নার বহুবৃদ্ধি করতে চাবে তাকে আবশ্য করতে হবে, তাঁর কুল চিহ্নার মধ্যে কোন অটিলতার ধৰ্ম হয়ে যাক, সে বিদ্যমে আল্লাহ তাজ্জ্ঞান একটুকু প্ররওয়া করেন না । (ইবনে কাসীর)

بِئْتَةَ مَسَانِيِ الْمَسْجِفِ الْأَوَّلِ অর্থাৎ, ইন্জীল ও ইব্রাহিমী সহিকা ইত্যাদি খোদামী এবং সর্বকান্তেই পের সবী মুহায়দ মোতক্রম (সা)-এর নবৃত্তি ও বিশালতের সাক্ষা দিয়েছে । এতের বিদ্যমান অবিকাশীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি ?

فَسَتَطَعَّمُونَ مِنْ أَصْنَابِ الْمَرَاطِ السَّوْيِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى
অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ তাজ্জ্ঞান প্রত্যেককে যুখ দিয়েছে, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে সাবি করতে পারে । কিন্তু এই সাবি কোন কাজে আসবে না । উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহর কাছে পুরুষ ও বিশুদ্ধ । আল্লাহর কাছে কোম্প্যাক্ট বিশুদ্ধ, তার সরুল কিয়ামতের মিস প্রত্যেকেই পেরে যাবে । তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে আস্ত ও পথজ্ঞ হিসেবে এবং কে বিশুদ্ধ ও সরুল পুরুষ হিসেবে ।

اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيْ إِلَيْهِ إِلَيْكَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

وَلَا مُلْجَأَ وَلَا مِنْجَاءَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ -

আল্লাহর জন্যই সকল প্রসঙ্গে, যিনি ১৪ বিলহজ ১৩৯০ হিজরী রোজ বৃহস্পতি বার দুপুর বেলায় আমাকে সুরা তোরা-হা সমাখ্য করার তৎক্ষণীক প্রদান করেছেন । মহিমময় আল্লাহ তাজ্জ্ঞান কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাকে কোরআনের অবশিষ্ট অংশেরও তফসীর সম্পর্ক করার তৎক্ষণীক প্রদান করেন । আল্লাহ তাজ্জ্ঞান কাছেই সকল ধর্মাবলম্বন সাহায্যের জন্য আরণকেই এবং তারই উপর একান্তে নির্ভরশীল থাকি ।

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءَ

সূরা আশিয়া

মঙ্গল অবস্থার্তা, ১১২ আয়াত, ৭ কর্ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ رَبَّكَ لِلنَّاسِ حِسَابٌ هُوَ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعَرِّضُونَ ①

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ فَهُنَّ بِالْأَسْمَاعَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ② لَا هِيَةَ

قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ

السِّحْرُ وَأَنْتُمْ تُبَصِّرُونَ ③ قُلْ رَّبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثٌ أَحْلَامٌ بَلْ افْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ

فَلَيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أَرْسَلَ إِلَّا لَنَا ⑤ مَا مَنَّتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرِيبٍ إِهْلَكْنَاهُ

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ⑥ وَمَا أَرْسَلْنَا بِكَ إِلَّا دِرْجًا لَا نُؤْخِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلَّوْا

أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑦ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ

الظَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ⑧ ثُمَّ صَدَ قَبْلَهُمُ الْوَعْدُ فَانْجِيْهِمْ وَمَنْ شَاءَ

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ⑨ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑩

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে।

(১) যানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী ; অধিঃ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন

উপদেশ আসে, তারা তা খেলার হলে অবশ্য করে। (৩) তাদের অক্ষয় থাকে খেলার মত। যাদিয়ারা গোপনে পরামর্শ করে, 'সে তো তোমাদেরই মত একজন আনুষ ; এমতাবছার দেখে-তনে তোমরা তাঁর আদুর কবলৈ কেন পড় ?' (৪) পরগবর বললেন : সতোমঙ্গল ও ভূমগলের সব কথাই আমার পালনকর্তা আসেন। তিনি সরকিনু প্রোসেন, সরকিনু আসেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে : অশীক বঁপ ; না—সে বিশ্বা উভাবন করেছে, না সে একজন করি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আনয়ন করবে, বেমন নিদর্শনের আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে বেলুব জলপদ আমি খৎসে করে দিয়েছি, তারা বিশ্বাস জ্ঞান করেনি ; এবল এরা কি বিশ্বাস জ্ঞান করবে ? (৭) আপনার পূর্বে আমি আনুষই ঘেরণ করেছি, তাদের কাছে আমি ওই পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না ঝাল, তবে বারা প্রশ্ন কাটে, তাদেরকে জিজেন কর। (৮) আবি তাদেরকে এমন দেহধীরিণি করিবি যে, তারা আব্য করব করত না এবং তারা চিরহারিণি হিস না। (৯) অতঃপর আমি তাদেরকে দেরা আমার প্রতিশূলিতি পূর্ণ করলাম। সুতরাঃ তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাটিরে দিলাম এবং খল করে দিলাম সীমান্তবন্ধনীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিটাৰ অবতীর্ণ করেছি ; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোৰ না ?

তৎসীমের সার-সংক্ষেপ

এসব (অবিদ্যাসী) আনুষের হিসাবের সময় তাদের নিকটে এসে গেছে অর্থাৎ কিয়ামত জন্মে অথবা মিকটবর্তী হলে) এবং তারা (এখনও) অবনোয়েগিতায় (ই পড়ে) আছে (এবং তা বিশ্বাস করা থেকেও তাঁর অন্য অধৃতি নেওয়া থেকে) মুখ কিরিয়ে রেখেছে। (তাদের গাফিলতি অস্ত্র পড়িয়েছে যে) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন মতুর (তাদের অবহানুযায়ী) উপদেশ আসে, (সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে) তারা তা কোভুকজলে অবস করে ; তাদের অস্তর পোড়া থেকেই এনিকে) মসোয়োগী হয় না। অর্থাৎ জাগিয় (ও কাহিনি)-রা (পরম্পরে) গোপনে গোপনে পরামর্শ করে (যুদ্ধসংযোগের ভয়ে নয় ; কারণ মর্যাদ কফিরুর দুর্বল হিস না ; বরং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত করে একে নিচিক করে দেওয়ার অন্য) সে [অর্থাৎ সুহাবদ (সা)] নিছক তোমাদের মত একজন (মামুলি) আনুষ (অর্থাৎ বৰী বয়)। সে যে চিত্তাকর্ষক ও ইন্দোনুষ্ঠক কাজাম শোনায়, তাকে অলৌকিক মনে করো না। এবং এ অলৌকিকচর্চ কারণে তাকে বৰী বলে ধারণা করো না। কেননা এটা অকৃতপক্ষে আদুলিয়িত কালাম !) অতএব (অতদসন্দেশ) তোমরা কি আদুর কথা শোনার অন্য (অন্য কাছে) যাবে, অথচ জেমরা (এ বিজ্ঞাপি শুব) জান (বোৰ)। পয়গবর (অওয়াব আদেশ পেলেন এবং তিনি আদেশ অনুযায়ী জওয়াবে) বললেন : আমার পালনকর্তা নভোমঙ্গল ও ভূমগলের সব কথা (প্রকাশ হোক কিংবা অপ্রকাশ্য) তালোভাবে আনেন এবং তিনি সর্বজ্ঞতা ও সর্বজ্ঞত। (অতএব তোমাদের এসব কুমুরী কথাবার্তাও আনেন এবং তোমাদেরকে শান্তি দেবেন। তারা সত্য কালামকে ওধু জাদু বলেই ক্ষান্ত হয় নি ;) বরং তারা আরও বলে, (এই কোরআন) অশীক কল্পনা মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) —২১

(বাস্তবে চিন্তাকর্ষকও হয়) বরং (তদুপরি) সে (অর্ধাং পয়গম্বর) একে (ইচ্ছাকৃতভাবে মন থেকে) উদ্ভাবন করেছে (ব্যক্তির কল্পনায় তো মানুষ কিছুটা অক্ষম, ক্ষমার্থ ও সংশয়ে পতিতও হতে পারে। এই মিথ্যা উদ্ভাবন তখন কেরেআনেই সীমিত নয়) বরং সে একজন কবি। (তার সব কথাবার্তা এমনি রকম মনগঢ়া ও কাল্পনিক হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, সে রাসূল নয়; অথচ রাসূল হওয়ার জোর দাবি করে।) অতএব সে কোন (বড়) নির্দর্শন আনুকূল; যেখন পূর্ববর্তীদেরকে রাসূল করা হয়েছিল (এবং তারা বড় বড় মু'জিয়া জাহির করেছিলেন। তখন আমরা তাকে রাসূল বলে মেনে নেব এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। তাদের একধা বলাও একটি বাহামা ছিল। তারা তো পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও মানত না। আঞ্চাহ তা'আলা জওয়াবে বলেন ।) তাদের পূর্বে যেসব জনপদবাসিগণকে আমি খৎস করেছি (তাদের ক্ষরযায়েশী মু'জিয়া জাহির হওয়া সত্ত্বেও) তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন তারা কি (এসব মু'জিয়া জাহির হলে পরে) বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এমতাবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করলে আবাব এসে যাবে। তাই আমি এসব মু'জিয়া জাহির করি না এবং কোরআনজুল্ফী মু'জিয়াই উদ্ধেষ্ট। রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ এই যে, রাসূল মানুষ হওয়া উচিত নয়। এর জওয়াব এই যে) আপনার পূর্বে আমি কেবল মানুষকেই পরিগণ্য করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। অতএব (হে অবিশ্বাসী সম্পন্নায়) তোমরা যদি না জান, তবে কিভাবীদেরকে জিজেল কর। (কেননা তারা যদিও কাফির, কিন্তু মুত্তাওয়াত্তির সংবাদে বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত-নয়। এছাড়া তোমরা তাদেরকে যিত্ত মনে কর। কাজেই তোমাদের কাছে তাদের সংবাদ বিশ্বাসজোগো হওয়া উচিত।) আর (এমনিভাবে রিসালত সম্পর্কে তাদের সন্দেহের অপর পিঠ ছিল এই যে, রাসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এর জওয়াব এই যে) আমি রাসূলদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করি নি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না (অর্ধাং ফেরেশতা করি নি) এবং (তারা যে আপনার ওকাতের অপেক্ষায় আনন্দ উদ্ভাবন করছে যেমন অন্যজন আঞ্চাহ বলেন نَتَرْبِصُ بِرَبِّ الْمَنْتَنْ [মায়ালোম], এই শুকাতও নবুয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা) তারা (অতীত পয়গম্বরগণও) চিরহাস্তী ছিলেন না। (সুতরাং আপনারও শুকাত হলে মনে নবুয়াতের মধ্যে কি অভিযোগ আসতে পারে? মৌটকথা, পূর্ববর্তী রাসূলগণ বেমন ছিলেন, আপনিও তেমনি। তারা যেখন আপনাকে মিথ্যারোপ করে, তেমনি তাদেরকেও তখনকার কাফিররা মিথ্যারোপ করেছে।) অতঃপর আমি তাদের সাথে যে শুয়াদা করেছিলাম (যে, মিথ্যারোপকারীদেরকে আবাব দ্বারা খৎস করব এবং তোমাদেরকে ও মু'মিনদেরকে রক্ষা করব; আমি) তা পূর্ণ করলাম অর্ধাং তাদেরকে এবং যাদেরকে (রক্ষা করার) ইচ্ছা ছিল, (আবাব থেকে) রক্ষা করলাম এবং (আবাব দ্বারা) সীমালঘনকারীদেরকে খৎস করে দিলাম। (অতএব এদের সতর্ক হওয়া উচিত। হে অবিশ্বাসী সম্পন্নায়, এই মিথ্যারোপের পর তোমাদের শুপর ইহকালে ও পরকালে আবাব আসা বিচ্ছিন্ন নয়; কেননা) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিভাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য (থেছেষ্ট) উপদেশ রয়েছে। (এমন উপদেশ প্রচার সত্ত্বেও) তোমরা কি বোঝ না (এবং মেনে চল না) ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আবিয়ার ফার্মত : ইবনে মাসউদ বলেন : সূরা কাহফ, মারইয়াম, তোয়া-হা ও আবিয়া এই চারটি সূরা প্রথম ভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপার্জন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হিষাবত করি।—(কুরতুবী)

অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরম্পরাগতেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

يَهُ مَا كُنْتُ مَرِيًّا يَوْمَ تُرْكَ الْعَوْنَى إِنَّمَا يَنْهَا الْمُجْرِمُونَ
যে যাকি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে, যখন বয়সের শেষ সীমা অজ্ঞানা, তখন প্রতিমৃত্যুর প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশংকার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে সব গাফিলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হবে এই হিসেবের দিনকে ভূলে না বসে। কেননা, একে ভূলে যাওয়াই যাবতীয় অর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذُكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَمَّدٌ أَلَا إِسْتَمْعُوهُ وَمَمْ يَلْعَبُونَ لَا فِيْهِمْ قُلُوبُهُمْ
যারা পরকাল ও কবরের আয়াব থেকে গাফিল এবং তর্জন্য প্রত্যুত্তি ইহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অভিরিক্ষ বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসছলে ঝবণ করে। তাদের অঙ্গের আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত ঝবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি ঘনোযোগ দেয় না এবং এক্ষেপ অর্থও হতে পারে যে, ব্যং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা ইঙ্গ-আয়াত করতে থাকে।

أَفَتَأْتُونَ السَّمْرَ وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ
অর্থাৎ তারা পরম্পরে আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে : এই সোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আয়াদের মতই মানুষ—কোন ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার রূপা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহর যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টাতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফিরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে জানু আব্দ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা জানু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচারক নয়। এই কথাবার্তা ঘোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই হিল যে, মুসলমানরা তামে কেললে তাদের এই নির্বৃক্ষিতাপ্রসূত ধোকাবাজি জনসমক্ষে ফীস করে দেবে।

—যেসব বল্পে মানসিক অথবা শয়তানী কর্তৃতা শুধির থাকে, সেগোকে আল্লাম রাখা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ ‘আলীক করুন’ করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা পথে কোরআনকে জানু বলেছে; এরপর আরও অহসর হয়ে বলতে উচ্চ করেছে যে, এটা আল্লাহর বিকল্পে মিথ্যা উত্তাবদ ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে উচ্চ করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিশূলভ করুন আছে।

—অর্থাৎ সে বাঞ্ছিবকই নথি ও রাসূল হলে আবাদের ফরয়ায়েশী বিশেষ মু'জিয়াসমূহ প্রদর্শন করুক। উচ্চাবৃত্তে আল্লাহ তা'আলা বলেন : পূর্ববর্তী উত্তরদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাদের আকাশিত মু'জিয়াসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস হ্রাস করে নি। প্রার্থিত মু'জিয়া দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আধাৰ আৱা অৰ্থ করে দেওয়াই আল্লাহর আইন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমানাবৰ্ত্তে আল্লাহ তা'আলা এই উত্তরকে আবাবের ক্ষম থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাকিসদেরকে প্রার্থিত মু'জিয়া প্রদর্শন করা সমুচ্চিত নয়। অঙ্গপুর্ণ বাকে (এ দিকেই ইশ্বাৰা রাখেছে যে, তারা কি জাত্যা মু'জিয়া দেখলৈ বিশ্বাস হ্রাস কৰবে) অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে একপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মু'জিয়া প্রদর্শন করা হয় না।

—এখানে مُنْذَنْ أَمْلُ الدُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَلْمٍ (যাদের শরণ আছে) বলে তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস হ্রাস করেছিল, তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। উচ্চেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী পয়গমবরণ মানুষ হিলেন—না কেরেশতা হিলেন, এ কথা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে তওরাত ও ইঞ্জীলের আলিমদের কাছ থেকে জেমে নাও। কেননা, তারা সবাই জানে যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গমবরণ মানুষই হিলেন। তাই এখানে مُنْذَنْ دُكْرِ أَمْلُ দারা সাধারণ কিভাবধারী ইহুনি ও খ্রিস্টান অর্থ নিশেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই এই ব্যাপারের সাক্ষাদাতা। তফসীরের সাব সংক্ষেপে এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মাস'আলা ৪ তফসীরে কুরআনীতে আছে এ আল্লাত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান জানে না, একপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলিমদের অনুসরণ করা। তারা আলিমদের কাছে জিজেস করে তদনুযায়ী আমল করবে।

কোরআন আববদের জন্য সহান ও গৌরবের বলু : نَبِيٌّ كِتَابَ اَرْبَهْ কোরআন অর্থ কোরআন এবং যিকের অর্থ এখানে সহান, গৌরব ও ধ্যাতি। উচ্চেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আববীতে ক্ষমতাৰ কোরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সহান ও চিহ্নায়ী সুব্যাক্তিৰ বলু। একে যথোর্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্বাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, অল্লাহ তা'আলা আকিবদেরকে কোরআনের ব্যবকলতে সময় বিধের উপর প্রাধান্য বিস্তোরকারী ও বিস্তৃতি করেছেন। অগ্রহাণী তাদের সহান ও সুব্যাক্তিৰ কক্ষ বেঝেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আববদের হ্রাসগত, গোপ্যগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং অধু কেবলজনের ব্যবকলতে সহান হয়েছে। কোরআন না হলে আইন সংবর্ত আবব জাতিৰ নাম উচ্চারণকারীও কেউ প্রাক্ত না।

وَكُمْ قَصَّهَا مِنْ قَرِيْبٍ كَانَتْ طَالِسَةً وَأَشَّانَابِعَدْ هَا قَوْمًا أَخْرَىٰ ۝
 فَلَمَّا أَحْسَنُوا بِإِسْنَادٍ إِذَا هُمْ مِنْهَا يُرْكَضُونَ ۝ لَا تَرْكَضُوا وَارْجِعُوهُ إِلَىٰ
 مَا أَتَرْفَلْتُمُ فِيهِ وَمَسِكِكُمْ لَعْنَكُمْ قَسْلُونَ ۝ قَالُوا يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
 ظَلَمِينَ ۝ كَيْفَ أَلْتَ تِلْكَ دُعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا لِأَخْمَلِينَ ۝

(১১) আমি কর্ত জনপদের কর্ম সামন করেছি যার অধিবাসীরা হিল পাণী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। (১২) অতশ্চর যখন আমা আবাবের কল্প টের পেল, তখনই তারা লেখাস থেকে পদারম করতে লাগল। (১৩) পদারম করে আ এবং কিয়ে ছাস, বেখাসে তোমরা বিলাসিকার মত হিলে ও কেওয়াদের আবাসন্তুহে; সত্যত কেউ তোমাদেরকে হিজেব করবে। (১৪) তারা বলল : হায়, দুর্ভোগ আবাদের, আমরা অবশ্যই পাণী হিলায। (১৫) আবেগ রই আর্তনাম যখন সবর হিল, শেব পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে মিলায বেল কর্তৃত খস্য ও নির্বাপিত আমি।

তৎসীরের সময়-সংজ্ঞেণ

আমি আমের জনপদ, মেন্দোর অধিবাসীরা মালিম (অর্থাৎ কাকিম) হিল, করে করে দিয়েছি এবং আদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। অতশ্চর যখন অধিবাসী-আবাবের আবাব আসতে দেখল, তখন জনপদ থেকে পদারম করতে লাগল (করতে আবাবের করল থেকে বেঁচে যায়। আক্ষাত্ তাঁজালা বলেন :) পদারম করো আ এবং মিলাদের বিলাস সামগ্রী ও বাসগৃহে ফিরে ঢল। সত্যত কেউ তোমাদেরকে হিজেব করবে (যে, তোমাদের কি হয়েছিল :) উদ্দেশ্য হলো, ইঞ্জিতে আবেগ নির্বাজিকাঞ্চসৃত ধৃতিকর কর্তৃত করন্তে হিলিয়ার করা যে, যে সামগ্রী ও বাসগৃহ নিয়ে তোমরা গর্ব করতে এখন সেই আক্ষীগত নেই, বাসগৃহও নেই। এবং কেন সহাবৃক্তিশীল যিন্তের নাম-বিদ্যাবাণু-সেই।) তারা (আমের নামিল ইওয়ার সবর) বলল : হায় আবাদের দুর্ভোগ, আমরা অবশ্যই মালিম হিলায। আবের এই আর্তনাম অবিস্কু হিল, শেব পর্যন্ত আমি তাদেরকে এমন (সেক্সামুন) করে মিলায বেল কর্তৃত খস্য অপরা নির্বাপিত আমি।

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

কোন কোন তৎসীরবিদদের অভে আলোচ্য আমাভদ্রন্তুহে হাতুরা ও কালীবা জনপদসম্মূহকে খস্ব করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আক্ষাত্ তাঁজালা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার বাব এক মেডোবাদেত অনুবাসী মুসা ইবনে মিলা এবং এক রেওয়ারেত অনুবাসী ও আরব বলা হয়েছে। উভারব দায় হলে তিনি মাদইয়ানবাসী

শায়ায়ির (আ) নম, অন্য কেউ। তারা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জন্মেক কাফির বাদশাহ বৃথতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বৃথতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বশী ইসরাইল বিপর্যাপ্তি হলে তাদের উপরও বৃথতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিকার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর অধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও শামিল থাকবে।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَبِينٌ ⑥ لَوْا رَدَنَانْ تَتَخَذُ
 لَهُوَ الْأَتَخَذُ نَهْ مِنْ لَدُنْنَا قَيْمَانْ كَثَافِعِلِينَ ⑦ بَلْ نَعْذِنْ فُبِالْحَقِّ عَلَى
 الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ أَهْفَقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنْ مَنْ يَصْفُونَ ⑧ وَلَهُ
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عَنْهُ لَا يَسْتَكِبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
 وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ⑨ يَسِيحُونَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْرُونَ ⑩ أَمْرَانْ تَخْذُنْ وَأَ
 إِلَهَةَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَتَشْرِفُونَ ⑪ لَوْكَانْ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
 لَفَسَدَنَا فَسَبِّحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصْفُونَ ⑫ لَا يُسْكَلُ
 عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلِعُونَ ⑬ أَمْرَانْ تَخْذُنْ وَأَمْنَ دُونِهِ إِلَهَةٌ
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مِنْ مَعِي وَذِكْرُ مِنْ قَبْلِي ⑭
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَا حَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ⑮ وَمَا أَرْسَلْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآللَّهُ إِلَّا أَنَا
 فَإِنْدُونِ ⑯ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادَ
 مُكَرَّمُونَ ⑰ لَا يَسِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ⑱ يَعْلَم

مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يَشْعُونَ لِالْأَلْمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ
خَشِيتِهِ مُشْفِقُونَ ④٧ وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلَئِكَ
نَجْزِيْهُ جَهَنَّمَ كَذِلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ④٨

(১৬) আকাশ, পুরিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ঝীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিলি। (১৭) আমি যদি ঝীড়া-উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই তা করতাম, যদি আমাকে করতে হতো। (১৮) বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিষ্কেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যার মতক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাত নিষ্ঠিত হয়ে থায়। তোমরা যা বলছ, তার জন্যে তোমাদের দুর্ভোগ। (১৯) নভোমগল ও ভূমগলে যারা আছে, তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সামিধে আছে তারা তাঁর ইবাদতে অবহৃত করে না এবং অলসতাও করে না। (২০) তারা রাজসিন তাঁর পথিকৃ ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না। (২১) তারা কি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি উপাস্য ধৃঢ় করেছে যে, তারা তাদেরকে জীবিত করব? ? (২২) যদি নভোমগল ও ভূমগলে আল্লাহ ব্যক্তিত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে খৎস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আগশের অধিপতি আল্লাহ পরিজ্ঞ। (২৩) তিনি যা করেন, তত্ত্বান্বকে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (২৪) তারা কি আল্লাহ ব্যক্তিত অন্যান্য উপাস্য ধৃঢ় করেছে? ? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গিনের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে। (২৫) আগনীর পূর্বে আমি বে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যক্তিত অন্য কোন উপাস্য নেই। সূত্রাং আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলল: দয়াময় আল্লাহ সত্তান ধৃঢ় করেছেন। তার জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সর্বানিত বাস্ত্ব। (২৭) তারা আগো বেঢ়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তার আদেশেই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পাঠাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা তখন তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তার স্বরে তীত। (২৯) তাদের মধ্যে বে বলে যে, তিনি ব্যক্তিত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহানামের শান্তি দেব। আমি রাজিষ্যদেরকে এভাবেই প্রতিষ্ঠল দিয়ে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি বে অবিভীয়, আমার সৃষ্টি বন্ধুই তার প্রমাণ। কেননা) আকাশ, পুরিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা আমি ঝীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিলি। (বরং এতদোর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে, তন্মধ্যে বড় রহস্য হচ্ছে আল্লাহর উওহীদের প্রমাণ।) যদি ঝীড়া

ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଆମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହତୋ, (ଯାର ମଧ୍ୟେ କୋନ ଉତ୍ତେଷ୍ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା—ତୁ ଚିତ୍ତବିନୋଦନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାକେ) ତବେ ବିଶେଷଭାବେ ଆମାର କାହେ ଯା ଆହେ, ତାକେଇ ଆମି ତା କୁରତାୟ (ଉଦ୍ଦାହରଣତ ଆମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ଵର ତୃପ୍ତିବୀର ଅତ୍ୟକ୍ରମର୍ଥ) ଯଦି ଆମାକେ କରାନ୍ତେ ହତୋ । (କେନନା କୌଡ଼ାକାରୀର ଅବହୂର ସାଥେ କୌଡ଼ାର ଯିଲ ଥାକା ଆବଶ୍ୟକ । କୋଥାର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭା ଏବଂ କୋଥାର ନିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ । ତବେ ତୃପ୍ତିବୀ ଅନିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାର ଅନ୍ୟେ ଅପରିହାର୍ୟ ହେଁଯାର କାରଣେ ସାଥେ ସାଥେ ଯିଲ ଥାଏ । ସଥିନ ଯୁକ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣ ଓ ସକଳ ଧର୍ମବଳସୀଦେର ଏକମତ୍ୟେ ତୃପ୍ତିବୀଓ କୌଡ଼ା ହତେ ପାରେ ନା, ତଥିନ ନିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ଯେ ହତେ ପାରେ ନା—ଏତେ କାରଣ ବିଷିତ ଥାକ୍ଷ ଉଚିତ ନାହିଁ । ସ୍ଵତରାଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟଙ୍କ ହଲୋ ଯେ, ଆମି କୌଡ଼ାଛଲେବ ଅନର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି କରିଲି ।) ବନ୍ଦ (ସତ୍ୟକେ ପ୍ରମାଣ ଓ ଯିଥ୍ୟାକେ ବାତିଲ କରାର ଅନ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛି,) ଆମି ସତ୍ୟକେ (ଯାର ପ୍ରମାଣ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ) ଯିଥ୍ୟାର ଉପର (ଏତାବେ ପ୍ରବଳ କରି, ଯେବେଳ ମନେ କର ଯେ, ଆମି ଏକେ ତାର ଉପର) ନିକେପ କରି । ଅତିଥିର ସତ୍ୟ ଯିଥ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ରକ ଚାରି କରେ (ଅର୍ଥାଂ ଯିଥ୍ୟାକେ ପରାତ୍ମତ କରେ ଦେଇ) ସ୍ଵତରାଂ ତା (ଅର୍ଥାଂ ଯିଥ୍ୟା ପରାତ୍ମତ ହେଁୟ) ତତ୍କଳୀନ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଁୟ ଯାଇ (ଅର୍ଥାଂ ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ଥେକେ ଅର୍ଜିତ ତୃପ୍ତିବୀଦେର ପ୍ରମାଣାଦି ଶିରକେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁତ୍ତପାତ କରେ ଦେଇ ଏବଂ ବିଶେଷିତ ଦିକେର ସଞ୍ଚାରନାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା । ତୋମରା ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷିତାଲୀ ପ୍ରମାଣ ଥାକା ସମ୍ବେଦନ କରିବ,) ତୋମାଦେର ଅନ୍ୟ ଦୂର୍ଭେଗ, ତୋମରା (ସତ୍ୟର ବିରକ୍ତେ) ଯା ମନ୍ଦାଙ୍ଗୀ କଥା ବଲଛ ତାର କାରଣେ । (ଆଜ୍ଞାତ୍ ତା'ଆଲାର ଶାନ ଏହି ଯେ,) ନଭୋମତ୍ୱ ଓ ଭୂମତ୍ୱେ ଯାରା ଝରେଇଛେ, ତାରା ତା'ର (ମାଲିକାନାଧୀନ) ଆର (ତାଦେର ମଧ୍ୟେ) ଯାରା ଆଜ୍ଞାହର କାହେ (ତୁବ ଦିଲ ଓ ନୈକଟ୍ୟଶୀଳ) ଝରେଇଛେ (ତାଦେର ଇବାଦତେର ଅବହୂ ଏହି ଯେ,) ତାରା ତା'ର ଇବାଦତେ ନଜାବୋଥ କରେ ନା ଏବଂ ଝାଣ୍ଡ ହେଁ ନା । (ବରଂ) ରାତଦିନ (ଆଜ୍ଞାହର) ପ୍ରବିରତା ସର୍ବନା କରେ, (କୋନ ସବ୍ୟା) ବିରାତ ହେଁ ନା । (ତାଦେର ସଥିନ ଏହି ଅବହୂ, ତଥିନ ସମ୍ଭାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବ କେନ କାତାରେ ? ସ୍ଵତରାଂ ଇବାଦତେର ଯୋଗ୍ୟ ଡିଲିଇ । ଅନ୍ୟ କେଉ ସଥିନ ଏହିଙ୍କ ନାୟ, ତଥିନ ତା'ର ଶରୀକ ବିଶ୍ଵାସ କରିବିରୁ ନିର୍ବିଜିତା । ତୃପ୍ତିବୀଦେର ଏହି ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବେଦନ ତାରା କି ବିଶେଷ ଆଜ୍ଞାତ୍ ସ୍ୟାତ୍ତିତ ଅନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେଇଲେ ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମନ୍ୟରେ ଯଥ୍ୟ ଥେକେ (ଯା ଆରା ନିକୃତିତର ଓ ନିରମଳେର ; ଯଥ୍ୟ ପାଥର ଓ ଧାତର ମୂର୍ତ୍ତି) ଯା କାଟିକେ ଜୀବିତ କରିବେ ; ଅର୍ଥାଂ ଯେ ବନ୍ଦ ପ୍ରମାଣେ ଦିତେ ପାରେ ନା । ଏହଙ୍କ ଅକ୍ଷମ କିନ୍ତୁପେ ଉପାସ୍ୟ ହେଁଯାର ଯୋଗ୍ୟ ହବେ ; ନଭୋମତ୍ୱ ଓ ଭୂମତ୍ୱେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାତ୍ ସ୍ୟାତ୍ତିତ ଅନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ହତୋ ତବେ ଉତ୍ତରାଇ (କରେ) ଧର୍ମ ହେଁ ଯେତ । (କେନନା, ବନ୍ଦବତ୍ତାଇ ଉତ୍ତରେ ସଂକଳନ ଓ କାଞ୍ଜ ବିରୋଧ ହତୋ ଏବଂ ପାରିଷ୍ଠରିକ ସଂଘର୍ଷ ହତୋ । ଏମତାବହୂର୍ମାୟ ଧର୍ମ ଅବଶ୍ୟକୀୟ ହିଲ । କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ଵନେ ଧର୍ମ ହେଁଯାନି । ତାଇ ଏକାଧିକ ଉପାସ୍ୟଙ୍କ ହତେ ପାରେ ନା ।) ଅତଏବ (ଏ ଥେକେ ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ ଯେ,) ତାରା ଯା ବଳେ, ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀକତ ବିଲେଇ । ଅର୍ଥଚ ତା'ର ଏମନ ମାହାତ୍ୟ ଯେ,) ତିନି ଯା କରେନ, ତତ୍ସମ୍ପର୍କେ ତା'କେ କେଉ ପଶୁ କରାନ୍ତେ ପାରେ ନା ଏବଂ ଅନ୍ୟଦେରକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରା ଯେତେ ପାରେ (ଅର୍ଥାଂ ଆଜ୍ଞାତ୍ ତା'ଆଲା ଜିଜ୍ଞେସ କରାନ୍ତେ ପାରେନ । ସ୍ଵତରାଂ ଯାହାଯୋ ତା'ର କେଉ ଶରୀକ ନେଇ । ଏମତାବହୂର୍ମାୟ ଉପାସ୍ୟଙ୍କ କେଉ କିନ୍ତୁପେ ଶରୀକ ହବେ ; ଏରପର ଜିଜ୍ଞେସ ଭଜିତ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁୟ,) ତାରା କି ଆଜ୍ଞାତ୍ ସ୍ୟାତ୍ତିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେଇଲେ । (ତାଦେରକେ) ବନ୍ଦନ : (ଏ ଦାବିର ଉପର) ତୋମରା ତୋମାଦେର ପ୍ରମାଣ ଆନ । (ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ଓ ଯୁକ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣେର

মাধ্যমে পিসক বাতিল করা হয়েছে। অতঃপর ইতিহাসগত প্রমাণের মাধ্যমে বাতিল করা হচ্ছে ১) এটা আমার সঙ্গীদের কিভাব (অর্থাৎ কোরআন) এবং আমার পূর্ববর্তীদের কিভাবে (অর্থাৎ কভারাত, ইঞ্জীল ও বুরুরে) বিদ্যবান রয়েছে। (এগুলো যে সত্য ও ঈশ্বর তা যুক্তি আৱা প্ৰমাণিত। অন্যগুলোৰ মধ্যে পৰিবৰ্তন হলেও কোৱাচে পৰিবৰ্তনেৰ সত্ত্বাবনা নেই। সুজোাঁ এসব কিভাবেৰ যে বিষয়বস্তু কোৱাচেৰ অনুৰূপ হবে, তা নিশ্চিতভাৱে বিশুদ্ধ হবে। তওঁহীনে বিষ্ণুসী হয়ে যাওয়াই উপুৰিতি প্ৰমাণাদিৰ দাবি ছিল, কিন্তু এৱগুলোও তাৰা বিষ্ণুসী হয়নি।) বৰং তাদেৱ অধিকাংশই সত্য বিষয়ে বিষ্ণুস কৰে নো। অতএব (এ কাৰণে) তাৰা (তা কৰুল কৰতে) বিশুদ্ধ হচ্ছে। (তওঁহীন কোৱ নতুন বিষয় নয় যে, তাৰ প্ৰতি পলায়নী মনোবৃত্তি ধৰণ কৰতে হচ্ছে; বৰং একটি পাটীম পথ। সেখতে) আপনাৰ পূৰ্বে আমি এমন কোন পথগুৰু পাঠাইনি, যাকে একপ ওহী প্ৰেৱণ কৰিনি যে, আমি ব্যক্তিত কোন উপাস্য (হওয়াৰ বোগা) নেই। সুজোাঁ আমাৰই ইবাদত কৰ। তাৰা (অর্থাৎ কভক মুশৰিক) বলে : (নাউয়ুবিহাহ) আল্লাহু তা'আলা (ফেরেশতামেৰকে) সজ্ঞান (জ্ঞানে) ধৰণ কৰেহেন। (তভাৰা, তওৰা) তিনি (এ খেকে) পৰিত্ব। তাৰা (ফেরেশতারা তাৰ সজ্ঞান নয়) বৰং (তাৰু) সমানিত বাবা। (এ খেকেই নিৰ্বোধদেৱ ধী ধী লেগেছে। তাদেৱ দাসত্ব, গোলামী ও শিষ্টাচাৰু একপ যে,) তাৰা আগে বেঢ়ে কথা বলতে পাৱে না (বৰং আদেশেৰ অপোক্ষায় থাকে) এবং তাৰা তাৰ আদেশেই কৰত কৰে। (বিশৰীত কৰতে পাৱে না। কেনো, তাৰা জানে যে,) আল্লাহু তা'আলা তাদেৱ সহৃদ ও পঞ্চাঙ্গেৰ অবহৃতি (ভালভাৰে) জানেন। কাজেই তাৰ যে আদেশ হচ্ছে এবং বখন হচ্ছে, রহস্য অনুযায়ী হচ্ছে। তাই তাৰা কাৰ্যত বিৱোধিতা কৰে না এবং কথা বলায় আগে বাঢ়ে নো। তাদেৱ শিষ্টাচাৰ একপ যে,) যাৱ জন্যে সুপারিশ কৰাৰ ইষ্য আল্লাহু তা'আলাৰ আছে, তাৰা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাৰণ সুপারিশ কৰতে পাৱে না। তাৰা আল্লাহু তা'আলাৰ কীভাৱে থাকে। (এ হচ্ছে তাদেৱ দাসত্ব ও গোলামীৰ বৰ্ণনা। এৱগুলো আল্লাহু তা'আলাৰ ইবাদত ও প্ৰসূত বৰ্ণিত হচ্ছে যদিও উভয়েৰ সারমৰ্ম কাছাকাছি। (অর্থাৎ তাদেৱ মধ্যে যে (মেনে দেওয়াৰ পৰ্যায়ে বলে যে, আল্লাহু ব্যক্তিত আমিই উপাস্য, তাকে আমি আহসানামেৰ পাতি দেৰ। আমি যালিয়দেৱ এভাৰেই পাতি দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ তাদেৱ উপৰ আল্লাহু পূৰ্ব আধিপত্য আছে, যেমন অন্যান্য সৃষ্টি জীবেৰ উপৰ আছে এমতাৰহার তাৰা আল্লাহুৰ সজ্ঞান বিৱোধে হতে পাৱে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং অন্যান্য আৱাস ও আৱাস নামে যোগাযোগ কৰিব। পূৰ্ববর্তী আল্লাহু তা'আলাৰ অন্যত্বেৰ অন্তৰ্ভুক্ত সবকিছুকে কীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি কৰিনি। পূৰ্ববর্তী আল্লাহু তা'আলাৰ অন্যত্বেৰ অন্যপদকে ধৰণ কৰাৰ কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আমাতে ইশারা কৰা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং অন্যত্বেৰ সবকিছুৰ সৃষ্টি যেমন বড় বড় ওকৰতপূৰ্ণ রহস্য ও উপকারিতাৰ উপৰ নিৰ্ভৰনীল, তেমনি অন্যপদসমূহকে ধৰণ কৰাৰ সাক্ষাৎ রহস্যেৰ অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এজাৰে ব্যক্ত কৰা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্ৰ সৃষ্টি বস্তু সৃজনে আমাৰ পূৰ্ব পক্ষি অকুৱত জ্ঞান ও বিচক্ষণতাৰ বেসৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন মা'আরেফুল কুৱাচ (৬ষ্ঠ) — ২২

দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বলু অনর্থক ও ক্রীড়াছলে সৃষ্টি করেছি ?

—**شَدِّيْدٌ شَدِّيْدٌ لَعْبٌ** ধাক্ক থেকে উত্তৃত । বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে লুপ বলা হয় ।

—(রাসীব) যে কাজের পেছনে কোন শুল্ক অথবা অঙ্ক লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে **لَهُو** বলা হয় । ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ (সা) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপন্তি উপাগন করে এবং তওহীদ অঙ্কীকার করে । প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নির্দর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না । সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বলু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে । তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয় । সামান্য চিঞ্চাভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্টি জ্বগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টিকর্মে হাজারো রহস্য লুকায়িত আছে । এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী । কবি বলেন :

هَرَكِاهِهِ كَهْ ازْ مِنْ روْبَدْ

وَحْدَهُ لَهُ شَرِيكَ لَهُ كَوْبَدْ

অর্থাৎ : মাটি থেকে উৎপন্ন প্রত্যেকটি ঘাস 'ওয়াহিদাহ সা শরীকা লাহ' বলে থাকে । অর্থাৎ **لَهُو** অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াছলে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল ? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বলু ঘৰাই হতে পারত ।

আরবী ভাষায় **لَهُ** শব্দটি অবাস্তুর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয় । এখানেও **لَهُ** শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ধ্বজগৎ-ও অধঃজগতের সমস্ত আচর্যজনক সৃষ্টি বলুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি প্রতটুকুও বোঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না । এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না । আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং-তামাশা ও ক্রীড়ার যে কেন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়—আল্লাহ তা'আলার মাহাঞ্জ্য তো অনেক উর্ধ্বে ।

—**شَدِّيْدٌ شَدِّيْدٌ** শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম । এ অর্থ অনুযায়ীই উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে । কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : **لَهُو** শব্দটি কোন সময় জী ও সজ্ঞান-সন্তুতির অর্থেও ব্যবহৃত হয় । এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা । তারা হযরত ইস্মাইল ও ওয়ায়ির (আ)-কে আল্লাহর প্রত্যেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সজ্ঞানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম । **وَاللَّهُ أَعْلَمْ**

—**فَذَفَ — بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَبَدَمْبِقَةَ قَادِرٍ مُؤْرَأْمَقْ** শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা । এর অর্থ যে শব্দের অর্থ-মন্তকে আঘাত করা । আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অ্যাক্ষর বরুসমূহ

আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টি জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিও এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মোরা হয়, ফলে মিথ্যার মণ্ডিক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْرِئُنَّ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِنُنَّ
অর্থাৎ আমার যেসব বাস্তু আমার সামনিধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতা), তারা সদাসর্বদা বিরামিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ বর্তাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দু'টি বিষয় অস্তরায় হতে পারে। এক. কারও ইবাদত করাকে নিজের পদব্যৰ্থাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা ; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামিহীনভাবে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের ইবাদতে এ দু'টি অস্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদব্যৰ্থাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে :

يُسْبَّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ
অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময় অলসতা করে না।

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন : আমি কাঁবে আহ্বানকে প্রশ্ন করলাম : তসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই ? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ পাঠ করা কিন্তু সম্ভবপর হয়। ? কাঁব বললেন : প্রিয় আত্মপূজু, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে খাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি ? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমদের খাস গ্রহণ করা ও প্রশংসন করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অস্তরায় ও বিষ্ণ সৃষ্টি করে না। — (কুরআনী, বাহরে মুহীত)

أَمْ أَنْخَذُوا الْهُنَّةَ مِنَ الْأَرْضِ مُمْبَشِرُونَ
এতে মুশারিকদের অর্বাচীনতা কম্বেকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এক. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে শিয়েও পৃথিবীত সৃষ্টি জীবকেই উপাস্য করেছে। এটা তো জৰুর জগতের ও আকাশের সৃষ্টি জীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হেয়। দুই. যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। সৃষ্টি জীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ও থাকা একান্ত জরুরী।

‘র’ কান ফِيْهَا الْهُنَّةُ এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত অমাগের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শান্তের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই

আল্লাহ থাকলে উভয়েই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবহুর উভয়ের নির্দেশবালী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণত্বে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অব্যজনণ সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অব্যজনণও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যাভাবী। যখন দুই আল্লাহর নির্দেশবালী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নভাবে হবে, তখন এর ফলপ্রতি পৃথিবী ও আকাশের খৎস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অব্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবহুর উভয়ের পরম্পরবিরোধী নির্দেশ করাপে অবোজ্য হবে। যদি একজন পরামৃত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি পশু করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরম্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ আরি করালে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উভয় কালায় শান্তের কিতাবদিতা বিত্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়েই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অব্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে সা পাবে, তবে এতে জড়িয়া হবে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ বরাসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহ্য, বরাসম্পূর্ণ সা হয়ে আল্লাহ হওয়া যায় সা। সত্ত্বত পূর্ববর্তী^{وَمِنْ يُسْتَأْلِفُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَأْلِفُونَ} আল্লাতেও এ দিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় বোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারণ অধীন নন, যাকে জিজেস করার অধিকার কারণ নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যভাবে অপরকে জিজেস করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহর পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

^{فَمَا ذَرَ نَكْرُ مَنْ مُعِيَ وَذَرَ نَكْرُ مَنْ قَبْلِي} এর এক অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, বলে কোরআন এবং ডক্র মন পূর্ববর্তী এবং বোকানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উভয়ের উত্তরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি এই বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কারণ ইবাহত শিখা দেয়া হয়েছে? উত্তরাত ও ইঞ্জিলে পরিবর্তম সাধিত হওয়া সহ্যেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিকার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাট্টকে শপথক করে বিত্তীর উপাস্য ধরণ করে। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের একটি অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানবালী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কিসসা-কাহিনী জীবিত আছে।

^{وَمِنْ يَسْتَقْنُعُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ} অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সত্ত্ব হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে একস ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেঞ্জে কোন কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের বেলাক কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না

বাস্তুর অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্ট্রা-আলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সহজ করে না। এ থেকে আরও জান দেখ যে, মজলিসে বলে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং বে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, আর কথার জন্ম অপেক্ষা করা উচিত। অথবেই অন্যের কথা বলা শিফ্টারের পরিণতি।

أولم ير الظّيْن كُفَّر وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارْتِقَافَتْقَهَمَكَ
وَجَعَلْنَا مِنَ السَّاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَفْلَاكَ يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ
مِنْ وَاسِيٍّ أَنْ تَرِيدُهُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَاهَاجَاسِبُلًا لِعَلَّهُمْ يَصْنَدُونَ ۝
وَجَعَلْنَا السَّاءَ سَقَماً حَفُوظًا وَهُمْ عَنِ اتِّهَامِهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَهُوَ الْغَنِيُّ
خَلَقَ الْيَلَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَرْئَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبُحُونَ ۝

(৩০) কাকিনা কি জেবে দেখে না যে, আকাশঘনলী ও সূর্যবীর মুখ বজ হিল, অতশ্চ আমি উভয়কে শুলে দিলাই এবং আপনার সুরক্ষা আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিদ্যাস ছাপন করবে না ? (৩১) আমি পুরিবাতে তারী বোকা রেখে দিয়েছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পুরিবী শুকে না পড়ে এবং তাতে ধৰ্ষণ পথ রেখেছি, যাতে তারা পথথাক হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছান করেছি ; অথচ তারা আমার আকাশই নির্মলনাবলী থেকে মুখ কিরিবে নাথে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন যাই ও দিম এবং সূর্য ও চন্দ্ৰ। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচলন করে।

তফসীরের সার-অক্ষেপ

কাফিলরা কি আনে না যে, আকাশ ও পৃথিবী (পূর্বে) বন্ধ ছিল (অর্থাৎ আকাশ থেকে
বৃষ্টি হতো না এবং মুষ্টিকা থেকে ফসল উৎপন্ন হতো না। একেই 'বন্ধ' বলা হয়েছে;
যেমন আজও কোন স্থানে অথবা কোনকালে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং মুষ্টিকা থেকে ফসল
না হলে সে স্থানে অথবা সেকালের দিক দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীকে বন্ধ বলা হয়।)
অতঃপর আমি উভয়কে (বীর কুদরতে) খুলে দিলাম। (ফলে আকাশ থেকে বৃষ্টি এবং
মুষ্টিকা থেকে বৃক্ষ গজানো উক হয়ে গেল। বৃষ্টি আরা তখন বৃক্ষগাঁও হয় না; বরং
আমি (বৃষ্টির) পানি থেকে প্রত্যেক শাবিবান বন্ধ সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত
প্রাণীর অঙ্গে ও ইমিতে পানির প্রভাব অনন্তিকার্য প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে;
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تُنْهَىٰ عَنِ الْأَرْضِ بِمَمْلُوكٍ فَمَنْ
يُنْهَىٰ فَمَنْ كُلَّبَ فَمَنْ تَرَكَ فَمَنْ تَرَكَ فَمَنْ

(বীয় কুদরতে) পৃথিবীতে পাহাড় এ জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে হেলতে না থাকে এবং আমি তাতে (পৃথিবীতে) প্রশঞ্চ পথ করেছি, যাতে তারা (এগুলোর মাধ্যমে) গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। আমি (বীয় কুদরতে) আকাশকে (পৃথিবীর বিপরীতে তার উপরে) এক ছাদ (সদৃশ) করেছি, যা (সর্বপ্রকারে) সুরক্ষিত (অর্থাৎ পতল, তেজে যাওয়া এবং শয়তানের সেখানেই পৌছে আকাশের কথা শোনা থেকে সুরক্ষিত)। কিন্তু আকাশের এই সুরক্ষিত হওয়া চিরহায়ী নয়—নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।) অর্থাৎ তারা (আকাশছিত) নির্দশনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (অর্থাৎ এগুলো নিয়ে চিন্তা তাৰমা ও গৱেষণা করে না।) তিনি এমন (সক্ষম) যে, তিনি রাতি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্ৰ সৃষ্টি করেছেন (এগুলোই আকাশছিত নির্দশনাবলী। সূর্য ও চন্দ্ৰের মধ্যে) প্রত্যেকই নিজ নিজ কক্ষপথে (এভাবে বিচরণ করে যেন) সাঁতার কাটছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَوْلَمْ يَرَى الْجِنُّ كَفَرُوا — এখানে روبت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

رَبِّ — أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَبَّنِيَّا فَقَسَّا مَعًا — এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি ও ফল কোন কাজের ব্যবহাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তুরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বৃক্ষ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বৃক্ষ হওয়া' ও 'খুলে দেয়ার' অর্থ কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উকি বর্ণিত আছে। তব্যাত্যে সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ তফসীরবিদগণ যে, উকি গ্রহণ করেছেন, তা-ই তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে; অর্থাৎ বৃক্ষ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃক্ষ ও মাটির ফসল বৃক্ষ হওয়া এবং খুলে দেয়ার অর্থ এতদুভয়কে খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি হ্যরত ইবনে আববাসের দিকে ইশারা করে বললেন : এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি যে উমর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হ্যরত ইবনে আববাসের কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত রূপে ও পৃষ্ঠার বসে কি বোঝানো হয়েছে ? হ্যরত ইবনে আববাস বললেন : পূর্বে আকাশ বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষ বর্ণণ করত না এবং মাটিও বৃক্ষ ছিল, তাতে বৃক্ষ তক্ষলতা ইত্যাদি অংকুরিত হতো না। আস্থাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃক্ষ এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর নিয়ে হ্যরত ইবনে উমরের কাছে গেল। হ্যরত ইবনে উমর তফসীর উনে বললেন : এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আববাসকে কোরআনের বৃক্ষপতি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আববাসের

বর্ণনাসমূহকে দ্রুতাহসিক উদ্যয় মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ বৃচ্ছিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি র্তেও ও নির্ভুল তফসীর করেছেন।

র্তুল মা'আনীতে ইবনে আবুসের এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনবির, আবু মু'আবিম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন।

ইবনে আতিয়া আউরী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এই তফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রশংসন রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞের জিনি। পরবর্তী আয়াতে যে **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا** বলা হয়েছে, এর সাথে উপরোক্ত তফসীরের দিকে দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তফসীরই ঘৃণ করা হয়েছে। কুরআরী একে ইকরামার উক্তি ও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় ; অর্থাৎ **وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْرِ** এই তফসীর ঘৃণ করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিজাবিদদের মতে অধূ মানুষ ও জীবজগতেই প্রাণী ও আজ্ঞাওয়ালা নয় ; বরং উদ্দিদ এমন কি জড় পদার্থের যথেও আজ্ঞা ও জীবন প্রয়োগিত আছে। বলা বাহ্য। এসব বন্ধু সৃজন, আবিকার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাসীর ইমাম আহমদের সনদ ধারা হয়েরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয করলাম ; “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রযুক্তি এবং চক্ৰ শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বন্ধু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন : “প্রত্যেক বন্ধু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।” এরপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন : “আয়াকে এমন কাজ বলে দিন, যা করে আমি জানাতে পৌছে যাই। তিনি বললেন : **افشِ السَّلَامَ وَاطْعِمِ الظَّعَلَمَ وَصُلِّ الْأَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّبِيلِ وَالنَّسَسِ - نِيَامَ**

• **ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ**

অর্থাৎ ব্যাপক হারে সাক্ষাৎ কর (যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়), আহার করাও (হাদীসে, একেও ব্যাপক সাক্ষাৎ হয়েছে। কাফির ফাসিক প্রত্যেককে আহার করাসেও সত্ত্বার পাওয়া যাবে।) আজ্ঞারতার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাতে যখন সবাই নিম্নায়ন থাকে, তখন তুমি তাহাজুদের সামায পড়। একপ করলে তুমি নির্বিজ্ঞে জানাতে প্রবেশ করতে পারবে।

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَابِسًا أَنْ تَسْتِكَنَّ بِهِمْ আরবী ভাষায় অব্বির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর মুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বেরোঁ রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভাস্তুসম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অব্বির নড়াচড়া না করে।

পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর তারপায় বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের অঙ্গের কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার অভ্যন্তরে এখানে নেই। তফসীরে করীর অ্যথ এছে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে শিখে পারেন। তফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা নবমের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (ر) -ও এ সম্পর্কে অন্যরী আলোচনা করেছেন।

কুলুন ফলক বৃত্তাকার বৃক্ষকে এটা বলা হয়। এ কারণেই সূরা কাটার চরকর আগামো পেশ চামড়াকে ফর্সেল ফলক বলা হয়। (আহল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও ফলক বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হচ্ছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিচার কিছু বলা হয় নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। যদিশূন্য সম্পর্কিত সামাজিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক শিখে যদিশূন্যে অবস্থিত।

এই আরাতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ সূর্যে একটা অঙ্গীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর অবজ্ঞা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ ۖ ۖ أَفَإِنْ مِنْ فَهُمْ
 الْخَلِدُونَ ۚ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَآءِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
 فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تَرْجِعُونَ ۚ ۚ وَإِذَا رَأَكُوكُ الدِّينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَعْذِذُونَ
 إِلَّا هُزُوا ۖ أَهْدَى الدِّينِ يَدْكُرُوهُنَّ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ
 كَفِرُونَ ۚ ۚ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُرِيكُمْ أَيْقُنْ فَلَا تَسْتَعِجِلُونَ ۚ ۚ
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۚ لَوْيَعْلَمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ التَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ
 وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۚ ۚ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْثَةٌ فَلَيَهُمْ فَلَا يَسْتَطِعُونَ
 سَرَّهَا ۖ وَلَا هُمْ يَنْظَرُونَ ۚ ۚ وَلَقَدْ أَسْتَهْزَئُ بِوَلِيلٍ مِنْ قَبْلِكَ

فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ⑥٥ قُلْ
 مَنْ يَحْكُمُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
 مُعِرِضُونَ ⑥٦ أَمْ لَهُمْ أَلْهَةٌ تَسْعَهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يُسْتَطِيعُونَ
 نَصْرًا أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ يَصْحِحُونَ ⑥٧ بَلْ مَتَعْنَا هُوَ لَا إِذَا بَاءُهُمْ
 حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُرُورُ ۚ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا
 مِنْ أَطْرَافِهَا دَأْفُومُ الْغَلِبُونَ ⑥٨ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرْكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ
 الصُّمُ الدَّعَاءَ إِذَا مَا يُنذِرُونَ ⑥٩ وَلَئِنْ مَسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ
 رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَّ إِنَّا كُنَّا ظَلَمِينَ ⑦١٠ وَنَصْرُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطُ
 لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ
 مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ⑦١١

(৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতনাঃ আপনার যৃত্য হলে তারা কি চিরঝীব হবে? (৩৫) অত্যেককে যৃত্যর দ্বাদ আবাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মৃল ও তাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা হাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবদেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারাই তো 'রহমান'-এর আলোচনার অধীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ দ্বয়াপর্য, আমি সজুরই তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শৈত্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই উয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফিররা ঐ সময়টি জানত, যখন তারা তাদের সবুথ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না! (৪০) বরং তা স্বাস্থে তাদের উপর অতিরিক্তভাবে, অতিপর তাদেরকে তা হতভুজি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করা মাঝেরফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৩

হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্লে ঠাট্টাকারীদের উপরই আপত্তি হয়েছে। (৪২) বলুন : 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে ফিকাশত করবে রাতে ও দিনে ? বরং তারা তাদের পাশনকর্তার স্মরণ থেকে সুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যক্তিত তাদের এমন দেবদেবী আছে, যারা তাদেরকে রক্ষা করবে ? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার সুকাবিলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে ভোগসভার দিয়েছিলাম, এসবকি তাদের আয়ুকালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে ? (৪৫) বলুন : আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি ; কিন্তু বধিদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না। (৪৬) আপনার পাশনকর্তার আয়াবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাল্লী ছিলাম'। (৪৭) আমি কিরামতের দিন স্যামবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি মূল্য হবে না। যদি কোন কর্ম তিলের দানা পরিমাণে হয়, আমি তা উপস্থিত করব। এবং হিসাব প্রণের জন্য আমিই যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিররা আপনার ওফাতের কথা ভেবে আনন্দ-উদ্ঘাস করে। কারণ, তারা বলত **رَبِّيْنَ بِرَبِّ الْمُنْفَعِنَ**—আপনার এ ওফাতও নবুয়তের পত্রিপত্তী নয়। কেননা,) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। (আল্লাহ বলেন : **وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ**) আপনার পূর্বে যেমন পয়গ়ারদের মৃত্যু হয়েছে এবং এতে তাদের নবুয়তে কোন অঁচ লাগেনি, তেমনি আপনার ওফাতের কারণেও আপনার নবুয়তে কোনৰূপ সন্দেহ করা যায় না। সারকথা এই যে, নবুয়ত ও ওফাত উভয়ই এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হতে পারে।) অতঃপর যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কি তারা চিরজীবী হয়ে থাকবে ? (শেষে তারাও মরবে। কাজেই আনন্দিত হওয়ার কি যুক্তি আছে ? উদ্দেশ্য এই যে, আপনার ওফাতের কারণে তাদের আনন্দ যদি নবুয়ত বাতিল হবার উদ্দেশ্যে হয়, তবে **لَا**—আয়াতটি এর জওয়াব। পক্ষান্তরে যদি ব্যক্তিগত আক্রেশ ও শক্ততাৰূপ হয়, তবে **مُتَّ**—আয়াতটি-এর জওয়াব। মোটকথা, আপনার ওফাতের অপেক্ষায় থাকা সর্বাবস্থায় অনর্থক। মৃত্যু তো এমন যে) জীব মাত্রই মৃত্যুৰ স্থাদ আমাদান করবে। (আমি যে তোমাদেরকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়েছি, এর উদ্দেশ্য শুধু এই যে) আমি তোমাদেরকে মন ও ভাস্ত দারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করে থাকি। ('মন' বলে মেয়াজবিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ দারিদ্র্য ইত্যাদি এবং 'ভাস্ত' বলে মেয়াজের অনুকূল বিষয় যেমন স্বাস্থ্য, ধনাচ্যুত ইত্যাদি বোকানো' হয়েছে। এই অবস্থাগুলোই মানবজীবনে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়। এসব অবস্থার কেউ ঈমান ও ইবাদতে কায়েম থাকে এবং কেউ কুফর ও গুনাহে লিঙ্গ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা কি কি কর্ম কর, তা দেখার জন্যাই জীবন দান করেছি।) আর (এই জীবন শেষ হলে পর) আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

(এবং প্রত্যেককে তার উপর্যুক্ত শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং শুল্কত্বপূর্ণ বিষয় তো মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাই হলো প্রতিদান দিবস। জীবন তো সাময়িক ব্যাপার। এর জন্যই তাদের গর্বের শেষ নেই এবং তারা পয়গবরের শুকাতের কথা তেবে আনন্দ-উদ্ঘাস করে। এই শুণহ্যায়ী জীবনে ঈমানের দৌলত উপার্জন করা তাদের দ্বারা হলো না যা তাদের উপকারে আসত। তা না করে তারা সীয় আমলনামা তমসাচ্ছন্দ এবং পরকালের মনযিল দুর্গম করে চলেছে।) আর (এ অবিখ্যাসীদের অবস্থা এই যে) সেই কাফিররা যখন আপনাকে দেখে, তখন শুধু আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (এবং পরম্পরে বলে) : এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের (মন্দ) আলোচনা করে। (সুতরাং আপনার বিকল্পে তো দেবতাদেরকে অঙ্গীকার করারও অভিযোগ রয়েছে) এবং তারা (বয়ং) দয়াময় আল্লাহর আলোচনা অঙ্গীকার করে। (সুতরাং অভিযোগের বিষয় তো প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যক্রমই। কাজেই তাদের উচিত ছিল নিজেদের অবস্থার জন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। তারা যখন কুফরের শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়বস্তু শোনে : যেমন পূর্বে **بِعْدَ** বাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন যিথ্যারোপ করার কারণে বলতে থাকে, শাস্তিটি তাড়াতাড়ি আসে না কেন ? এই তুরা-প্রবণতা সাধারণত মানুষের মজাগত বৈশিষ্ট্যও বটে, যেন) মানুষ তুরা-প্রবণই সৃজিত হয়েছে। (অর্থাৎ তুরা ও দ্রুততা যেন মানুষের গঠন-উপাদানের অংশ বিশেষ। এ কারণেই তারা দ্রুত আঘাত কামনা করে এবং বিলম্বকে আঘাত না হওয়ার প্রয়োগ মনে করে। কিন্তু হে কাফির সম্পদায়, এটা তোমাদের ভূল। কেননা, আঘাতের সময় নির্দিষ্ট আছে। একটু সবর কর) আমি সত্ত্বরই (আঘাত আসার পর) তোমাদেরকে আঘাত নির্দর্শনাবলী (অর্থাৎ শাস্তি) দেখাব। অতএব আঘাতে তুরা করতে বলো না। (কারণ, সময়ের পূর্বে আঘাত আসে না এবং সময় হলে তা পিছু হটে না।) তারা (যখন নির্ধারিত সময়ে আঘাত আসার কথা শোনে, তখন রাসূল ও মুসলমানদেরকে) বলে : এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে ? যদি তোমরা (আঘাতের সংবাদে) সত্যবাদী হও, (তবে দেরী কিসের ? শীত্র আঘাত আনা হয় না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এই মহাবিপদ সম্পর্কে তারা অবগত নয় বিধায় এমন নির্ভর্তাবার কথাবার্তা বলছে) হায়, কাফিররা যদি ঐ সময়টি জানত, যখন (তাদেরকে চতুর্দিক থেকে দোষবের অগ্নি বেষ্টন করবে এবং) তারা সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ তাদের সাহায্যও করবে না (অর্থাৎ এই বিপদ সম্পর্কে অবগত হলে এমন কথা বলত না। তারা যে দুনিয়াতেই জাহানামের আঘাত চাইছে তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী জাহানামের আঘাত আসা জরুরী নয়।) বরং সে অগ্নি তাদের উপর অতর্কিংভাবে আসবে অতঃপর তাদেরকে হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা ফেরাতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (যদি তারা বলে যে, এই আঘাত পরকালে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কারণে যখন দুনিয়াতে হয় না, তখন দুনিয়াতে এর কিছুটা নয়না তো দেখাও, তবে তর্কক্ষেত্রে যদিও নয়না দেখালো জরুরী নয়, কিন্তু এমনিতেই নয়নার সঙ্কানও দেয়া হচ্ছে। তা এই যে,) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর ঠাট্টাকারীদের উপর ঐ আঘাত পতিত হলো, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত (যে, আঘাত কোথায় ? সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, কুফর আঘাতের কারণ। দুনিয়াতে না

হলেও পরকালে আযাব হবে। তাদেরকে আরও) বলুন : কে তোমাদেরকে রাতে ও দিনে দয়ামুর আল্লাহু থেকে (অর্থাৎ আল্লাহুর আযাব থেকে) হিফায়ত করবে ? (এই বিষয়বস্তুর কারণে তওহীদ মেনে নেওয়া জরুরী ছিল, কিন্তু তারা এখনও তওহীদ মানে নি।) বরং তারা (এখন পূর্ববৎ) তাদের (শুক্র) পালনকর্তার শরণ (অর্থাৎ তওহীদ মেনে নেয়া) থেকে মুখ কিরিয়ে রাখে। (হ্যা, আমি مَنْ يُكَفِّرْهُمْ এর ব্যাখ্যার জন্য পরিষ্কার জিজ্ঞেস করি যে,) আমি ব্যক্তিত তাদের কি এমন দেবতা আছে, যারা (উপরিখ্রিত আযাব থেকে) তাদেরকে রক্ষা করবে ? (তারা তাদের কি হিফায়ত করবে, তারা তো এমন অক্ষম ও অপারক যে) তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করার শক্তি রাখে না। (যেমন কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে দিতে শুরু করলেও তারা তা প্রতিরোধ করতে পারে না। কোরআন বলে وَإِنْ يُسْتَبْلِمْ بُلْبُلًا সুতরাং তাদের দেবতা তাদের হিফায়ত করতে পারে না) এবং আমার মুকাবিলায় তাদের কোন সঙ্গীও হবে না।) (তারা যে এসব উজ্জ্বল প্রমাণ সন্দেশ সত্যকে কবূল করে না, এর কারণ দাবি অথবা প্রমাণের অট্টি নয়); বরং (আসল কারণ এই যে) আমি তাদেরকে ও তাদের বাপদাদাকে (দুনিয়ায়) অনেক ভোগসংগ্রহ দিয়েছিলাম, এমন কি তাদের উপর (এ অবস্থার) দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। (তারা পুরুষানুক্রমে বিলাসিতায় যন্ত ছিল এবং খেয়েদেয়ে তর্জন-গর্জন করছিল। উদ্দেশ্য এই যে, তারাই গাফিল ছিল; কিন্তু শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত হংশিয়ারি সন্দেশে এতটুকু গাফিলতি উচিত নয়। এখানে একটি হংশিয়ারির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তা এই যে) তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) দেশকে (ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে) চতুর্দিক থেকে অনবরত সংকুচিত করে আনছি। এরপরও কি তারা (আশা রাখে যে, রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) জয়ী হবে ? (কেননা অভ্যন্তর ইঙ্গিত এবং আল্লাহর প্রমাণাদি এ বিষয়ে একমত যে, তারা বিজিত ও ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হবে—যে পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহুর আনুগত্য থেকে মুখ কিরিয়ে না নেয় এবং ইসলামের সাহায্য বর্জন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সতর্ক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এতদসন্দেশ যদি তারা মূর্খতা ও হঠকারিভাবশত আযাবেরই ফরমায়েশ করে, ভবে) আপনি বলে দিন : আমি তো কেবল ওইর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি (আযাব আসা আমার সাথের বাইরে। দাওয়াতের এই তরীকা ও হংশিয়ারি যদিও যথেষ্ট ; কিন্তু) এই বধিদের যথন (সত্যের দিকে ডাকার জন্য আযাব দারা) সতর্ক করা হয় তখন তারা ডাক শোনেই না। (এবং চিন্তাভাবনাই করে না বরং সেই আযাবেই কামনা করে। তাদের সাহসিকতার অবস্থা এই যে) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে তবে (সব বাহাদুরী নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং) বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ ! আমরা অবশ্যই পাপী ছিলাম। (ব্যস, এতটুকু সাহস নিয়েই আযাব চাওয়া হয়। তাদের এই দুষ্টিগির পরিপ্রেক্ষিতে তো দুনিয়াতেই ফয়সালা করে দেওয়া উচিত ছিল।) কিন্তু আমি অনেক রহস্যের কারণে প্রতিষ্ঠিত শাস্তি দুনিয়াতে দিতে চাই না; বরং পরকালে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি। সেখানে) কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব (এবং সবার আমল ওয়ন করব)। সুতরাং কারও

উপর বিদ্যুমাত্রও যুক্ত হবে না, (যদুম না হওয়ার ফলে) যদি (কারও কোন) কর্ম তিসের দানা পরিমাণও হয়, তবে আমি তা (সেখানে) উপস্থিত করব (এবং তাও ওয়ল করব) এবং হিসাব প্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। (আমার ওয়ল ও হিসাব প্রহণের পর কারও হিসাব-কিতাবের প্রয়োজন থাকবে না। বরং এর ভিত্তিতেই সব ফয়সালা হয়ে যাবে। সুতরাং সেখানে তাদের দুষ্টমিরও উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শান্তি প্রদান করা হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الظَّاهِرُ
পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুশ্লিষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফির ও মুশরিকদের বিভিন্ন দার্বি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হয়রত ইসা (আ) অথবা ওয়ায়ার (আ)-কে আল্লাহর অংশীদার অথবা ক্ষেত্রে জোধ ও হয়রত ইসা (আ)-কে আল্লাহর সজ্ঞান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে জোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলস্বরূপে মকার মুশরিকরা রাস্তালাই (সা)-এর দ্রুত কামনা করত ; যেহেন কোন আরাতে আছে (আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দুটি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীত্রেই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে ? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওকান হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না ; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত ঝীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেন নি ? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুয়তের ও রিসালতে কোন ঝটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধে অপরাধারণা ক্রিয়ে করা যায় ? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীত্র মৃত্যু বাবা তোমরা তোমাদের জোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও যরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে ?

اَكْرَبُ عَدْ وَجَائِيْ شَادِمَانِيْ نِبِيْسْت
کے زندگانی مانیز جاود انسی نیست

(শর্ক মারা গেলে খুশি হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, আমাদের জীবনও অমর নয়।)

মৃত্যু কি ? : এরপর বলা হয়েছে, كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَتُ الْمَوْتَ
অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে অত্যেক বলে পৃথিবীত জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব-এর অস্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যানুসন্ধি মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাদের সব হ্রগ্নির জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন : যেরেশতা এবং জান্নাতের হ্র ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহিরূত। — (রহস্য মাজানী) আলিমদের সর্বসম্মত মতে আল্লার দেহ পিঙ্কর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি

গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নুঁড়ানী দেহকে আস্তা বলা হয়। এই আস্তা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়েম আস্তার স্তরপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।—(রঙ্গল
মা 'আনী)

شہدِ ایجمنٹ شہدِ ایجمنٹ پاওয়া যায় যে, প্রত্যক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আস্তাদন করার বাকপদ্ধতিটি একেপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহ্য, দেহের সাথে আজ্ঞার যে নিরিডি সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ্ঞা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক বামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাঙ্গদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহ ওয়ালা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আজ্ঞার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপাত্রে থাকলে তার জন্য ছেট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোন কোন আল্লাহ ওয়ালা সংসারের দৃংখ্য-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্থ করেছেন। বলা হয়েছে ام محبت (ভালবাসার কারণে তিক্তগ মিষ্ট হয়ে যায়।) কবি বলেন :

غم چه استاده توبرد رما

اندر ایار مایکرولاد رما

মাওলানা কুমী বলেন :

رنج راحت شدجو مطلب شدیزرك
گرد گله توتیائی چشم گرگ

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা ৪ : **وَبِنَلُوكْمٌ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ** অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিকল্প বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থিতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিকল্প বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাস-ব্যসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হ্যারত উমর (রা) বলেন :

অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম ; কিন্তু যখন সূখ ও আরাম আয়েশে লিঙ্গ হলাম, তখন সবর করতে পারলাম না । অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না ।

তুরাপ্রবণতা নিষ্পন্নীয় : حَلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ — শব্দের অর্থ তুরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা শক্তি-দৃষ্টিতে নিষ্পন্নীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতাকালপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : وَكَانَ الْإِنْسَانُ مَحْلُولاً

মানুষ অত্যন্ত তুরাপ্রবণ । হয়েরত মুসা (আ) যখন বনী ইসরাইল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তুর পর্বতে পৌছে যান, তখন সেখানেও এই তুরাপ্রবণতার কারণে তাঁর অতি রোম্প প্রকাশ করা হয় । পয়গহর ও সংকুম্ভপরায়ণদের সম্পর্কে “ভাল কাজে অঘগামী ধাকাকে” প্রশংসনীয়জৰপে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা বাহ্যিক, এটা তুরাপ্রবণতা নয় । কারণ, এটা সময়ের পূর্বে কোন কাজ করা নয় ; বরং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সৎ ও পুণ্য কাজ করার চেষ্টা ।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে তুরাপ্রবণতা । স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা একপ ডঙ্গিতেই ব্যক্ত করে । উদাহরণত কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে : লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে ।

سَوْرِكُمْبَاتِيْ
এখানে ত. প্রিয়ান্তি (নির্দশনাবলী) বলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সতত সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জিয়া ও অবস্থা বোঝানো হয়েছে ; —(কুরুতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নির্দশনাবলী স্পষ্টজৰপে প্রকাশ পেয়েছিল । পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো ।

— وَنَصَعَ السَّوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ :
شব্দটি ميزان موازين
কিয়ামতে আমলের ওয়ন ও দাঁড়িপাঞ্চা : এর বহুচন । অর্থ ওয়নের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাঞ্চা । আয়াতে বহুচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওয়ন করার জন্য অনেকগুলো দাঁড়িপাঞ্চা স্থাপন করা হবে । প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাঞ্চা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওয়ন করার জন্য ভিন্ন দাঁড়িপাঞ্চা হবে । কিন্তু উদ্দতের অনুসরণীয় আলিঙ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাঞ্চা একটিই হবে । তবে বহুচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাঞ্চাই অনেকগুলো দাঁড়িপাঞ্চার কাজ দেবে । কেননা আদম (আ) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে তাদের সঠিক সংখ্যা আল্টাহু তা'আলাই জানেন । তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাঞ্চায়ই ওয়ন করা হবে । কিন্তু শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার । অর্থাৎ এই দাঁড়িপাঞ্চা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওয়ন করবে —সামান্যও বেশ-কম হবে না । মুস্তাদরাকে হয়েরত সালমান (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন আমল ওয়ন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাঞ্চা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওয়ন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে । —(মাযহারী)

হাফেয় আবুল কাসেম লালকায়ির হাদীস গ্রন্থে হয়েরত আলাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দাঁড়িপাঞ্চায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে । যদি সৎকাজের পাঞ্চা ভারী হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেনঃ অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে । সে আর কোনদিন ব্যর্থ হবে না । হাশেরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে । পক্ষান্তরে অসু কাজের পাঞ্চা ভারী হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবেঃ অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে । সে আর কোনদিন কার্মিনাব হবে

না । উপরোক্ত হাফেয় হ্যায়কা (রা) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাত্রায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—হ্যবত জিবরাইল (আ) ।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী হ্যবত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিম্বামতের দিনও কি আপনি আপানার পরিবারবর্গকে শরণ দ্রাঘবেন ? তিনি বলেনঃ কিম্বামতের তিন জায়গায় কেউ কাউকে শরণ করবে না । এক, যখন আমল ওয়ন করার জন্য দাঁড়িপাত্রার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ-অনুভ ফলাফল না জ্ঞান পর্যবেক্ষণ কারণ কথা কারণ কথাগুলো আসবে না । দুই, যখন আমলনামাসমূহ উজ্জীব করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে—এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যবেক্ষণ কারণ কথাই কারণ মনে ধাকবে না । ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আয়াবের লক্ষণ হবে । তিনি পুলসিরাতে খঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যবেক্ষণ কেউ কাউকে শরণ করবে না ।—(মায়হারী)

وَإِنْ كَانَ مُتْقَلَّاً حَبَّةً مِنْ خَرْدُلٍ أَتَبْنَا بِهَا
অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওয়ন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওয়নের অস্তর্ভূত হয় ।

আমল কিন্তু ওবন করা হবে : হাদীসে বেতাকাহ-র ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের সিখিত আমলনানা ওয়ন করা হতে পারে । পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপ্রয়োগ যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওয়ন করা হবে । বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই । কোরআনের অজ্ঞতা আয়াত এবং অনেক হাদীস এরই সমর্থন করে ।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরিয়ী হ্যবত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, জনেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বসে বলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার দুটি ক্রীতদাস আমাকে যিখ্যাবাদী বলে, কাঙ্গ-কারবার কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে । এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি । আমার ও এই গোলামদেরের ইনসাফ কিভাবে হবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তাদের নাকরমানী, কারচুপি এবং উক্তজ্য ওয়ন করা হবে । এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওয়ন করা হবে । তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপার মিটমাট হয়ে যাবে । পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ গণ্য হবে । আর যদি অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান শ্রেণি করা হবে । লোকটি এ কথা ভলে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না ছুঁড়ে দিল । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করানি ওَنَصَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং লোকটি আরব করল । এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিক্ষিত লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই ।—(কুরুতুবী)

وَلَقَدْ أتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الْفِرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَ الْمُتَّقِينَ ⑥
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ⑦
 وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرَّكٌ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا نَنْذِرُ لَهُ مُنْكِرُونَ ⑧

(৪৮) আমি মূসা ও হারুনকে দান করেছিলাম মীরাংসাকারী এই, আলো ও উপদেশ, আল্লাহু সীফদের জন্য— (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কিয়ামতের ভয়ে শক্তি। (৫০) এবং এটা একটা বর্ণকরণ উপদেশ, যা আমি নাখিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অঙ্গীকার কর ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (আগনার পূর্বে) মূসা ও হারুন (আ)-কে ফরাসালার, আলোর এবং মুস্তাকীদের জন্য উপদেশের বন্ধ (অর্থাৎ তওরাত) দান করেছিলাম, যারা (মুস্তাকীগণ) না দেখে তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং (আল্লাহকেই ভয় করার কারণে) কিয়ামতকে (গ) ভয় করে (কেননা, কিয়ামতে আল্লাহর অসমৃষ্টি ও শান্তির ভয় রয়েছে)। তাদেরকে যেমন আমি কিভাব দিয়েছিলাম, তেমনি) এটা (অর্থাৎ কোরআনও) একটা কল্যাণময় উপদেশ (এই যা আমি নাখিল করেছি) অতএব (কিভাব নাখিল করা আল্লাহর অভ্যাস এবং কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ, তা প্রয়াণিত হওয়ার পরও) তোমরা কি (এক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ হওয়ার বিষয়টি) অঙ্গীকার কর ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই তিনটি শুণই তওরাতের ফরান। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, অর্থাৎ অস্তরসমূহের জন্য আলো এবং অর্থাৎ মানুষের জন্য উপদেশ ও হিদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন : ফরান বলে আল্লাহু তা'আলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মূসা (আ)-এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফিরাউনের মত শক্তির পূর্বে তিনি সালিত-পালিত হয়েছেন, যোকাবিলার সবচেয়ে আল্লাহু তা'আলা ফিরাউনকে লালিত করেছেন, এরপর ফিরাউনী সৈন্যবাহিনীর পক্ষাঙ্গাবনের সময় সমুদ্রে বাত্তা সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল সমাধি লাভ করে। এমনিভাবে পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে আল্লাহু তা'আলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। নব্বি ও মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে তাঁর পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে ফরান তওরাত নয়—অন্য কোন বিষয়।

মাঝেমুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ২৪

وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عِلْمِينَ ④ إِذْ
 قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكْفُونَ ⑤
 قَالُوا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عِلْمِينَ ⑥ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
 وَابْنَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑦ قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ
 الظَّالِمِينَ ⑧ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي
 فَطَرَهُنَّ ۚ وَإِنَّ أَعْلَى ذِلِّكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ ⑨ وَقَاتَلَهُ لَا يُكَدِّنَ
 أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ⑩ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَيْرًا
 لَهُمْ لَعْنَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ⑪ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا إِلَّا هُنَّ
 الظَّالِمِينَ ⑫ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَيَّبَذِكْرَهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ⑬
 قَالُوا فَأَنْوَابِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعْنَهُمْ يَشَهِّدُونَ ⑭ قَالُوا إِنَّ
 فَعَلْتَ هَذَا إِلَّا هُنَّ^{يَا إِبْرَاهِيمُ} ⑮ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ هَذَا كَيْرُهُمْ هَذَا
 فَسَأَلُوهُمْ أَنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ⑯ فَرَجَعُوا إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَوْا إِنَّكُمْ
 أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ⑰ ثُمَّ نِكْسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا هُوَ لَاءٌ
 يَنْطِقُونَ ⑱ قَالَ افْتَعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا
 يَضُرُّكُمْ ⑲ إِفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⑳
 قَالُوا حَرَقَةٌ وَانْصُ وَالْهَمَّتْكُمْ أَنْ كُنْتُمْ فَعِلْدِينَ ㉑ قُلْنَا يَنْسَرُ

كُوْنِي بِرَدًا وَسَلِمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَأَسَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ
 الْأَخْسَرِينَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
 لِلْعَلَمِينَ ۝ وَهَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ طَوَّعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا
 صَلِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
 فِعْلَ الْغَيْرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَكَانُوا الْإِكْوَةَ ۝ وَكَانُوا النَّاعِذِينَ ۝

- (৫১) আমি ইতিপূর্বে ইবনাহীমকে তাঁর সৎপুত্র দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর সম্পর্কে সম্মত পরিজ্ঞাত আছি। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্পদাঙ্গকে বললেনঃ ‘এই মৃত্যুগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে আছ?’ (৫৩) তাঁরা বলল : আমরা আমাদের বাপদাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন : তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপদাদারাও। (৫৫) তাঁরা বলল : তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করছ, না তুমি কৌতুক করছ (৫৬) তিনি বললেন : না, তিনিই তোমাদের পাশনকর্তা যিনি নভোমগল ও ভূমগলের পাশনকর্তা, তিনি এভলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পঢ় প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মৃত্যুগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবহা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর তিনি সেভলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের অধ্যানচি ব্যঙ্গীত ; যাতে তাঁরা তাঁর কাছে অভ্যাবর্তন করে। (৫৯) তাঁরা বলল : আমাদের উপাস্যদের সাথে একপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিয়। (৬০) কৃতক লোকে বলল : আমরা এক মুরককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবনাহীম বলা হয়। (৬১) তাঁরা বলল : তাকে জনসমকে উপস্থিত কর, যাতে তাঁরা দেখে। (৬২) তাঁরা বলল : হে ইবনাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে একল ব্যবহার করেছ? (৬৩) তিনি বললেন না, এদের এই অধ্যানই তো এ কাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তাঁরা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তাঁরা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল : লোকসকল ; তোমরাই বে-ইনসাব। (৬৫) অতঃপর তাঁরা খুঁকে গেল অস্তক নত করে ; ‘তুমি তো জান যে, এয়া কথা বলে না।’ (৬৬) তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারণ করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ ব্যঙ্গীত যাদের ইবাদত কর, তাদের জন্যে। তোমরা কি বোৰ না?’ (৬৮) তাঁরা বলল : একে পুঁজিয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি

তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম : হে অমি, তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল
ও নিরাপদ হয়ে যাও।' (৭০) তাঁরা ইবরাহীমের বিকলে কর্ম আটকে চাইল, অতঃপর
আমি তাদেরকে সর্বাধিক অক্ষতি করে দিলাম। (৭১) আমি তাকে ও শূভকে উকার করে
সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, বেখালে আমি বিশ্বের জন্য কল্যাণ হোবেছি। (৭২) আমি
তাকে দান করলাম ইসহাক ও গুরুকারহস্তপ দিলাম ইয়াকুব এবং প্রত্যেককেই সংকর্ষগ্রন্থায়ণ
করলাম। (৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার শির্ষে অনুসারে পথ প্রদর্শন
করতেন। আমি তাদের প্রতি শুধী করলাম সংকর্ষ করার, নামাব কার্যের করার বাকাত দান
করার। তাঁরা আমার ইবাদতে ব্যাপৃত ছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি ইতি (অর্থাৎ মূসার যমানার) পূর্বে ইবরাহীম (আ)-কে (উপযুক্ত) সুবিবেচনা
দান করেছিলাম এবং আমি তাঁর (জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকার্তা) সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত
ছিলাম। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত কামেল পুরুষ ছিলেন। তাঁর ঐ সময়টি অবরুদ্ধীয়) যখন তিনি
তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে (মৃত্যুপূর্বোক্ত লিঙ্গ দেখে) বললেন : এই (বাজে) মৃত্যুগুলো
কী, যাদের পূজারী হয়ে তোমরা বসে আছ? (অর্থাৎ এগুলো ঘোটেই পূজা করতে দেখেছি।
(তাঁরা জানী ছিল। এতে বোঝা যায় যে, এরা পূজার যোগ্য।) ইবরাহীম (আ) বললেন :
নিচর তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ (এদেরকে পূজনীয় মনে করার ব্যাপারে)
প্রকাশ্য আন্তিমে (লিঙ্গ) আছ ; (অর্থাৎ বরং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছেই এদের
পূজনীয় হওয়ার কোন প্রয়োগ ও সনদ নেই। তাঁরা এ কারণে আন্তিমে লিঙ্গ। আর তোমরা
প্রমাণহীন, আন্ত কুসংস্কারের অনুসরণ করে আন্তিমে লিঙ্গ হয়েছ। তাঁরা
ইতিপূর্বে এমন কথা শোনেনি। তাঁই আচর্যবিত্ত হলো এবং) তাঁরা বলল : তুমি কি
(নিজের মতে) সত্য ব্যাপার (মনে করে) আমাদের সামনে উপস্থিত করছ, না (এমনিতেই)
কৌতুক করছ? ইবরাহীম (আ) বললেন : না (কৌতুক নয় ; বরং সত্য কথা)। শুধু আমার
মতেই নয়—বাস্তবেও এটাই সত্য যে এরা পূজার যোগ্য নয়। তোমাদের (সত্যিকার)
পালনকর্তা (যিনি ইবাদতের ঘোগ্য) তিনি, যিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের পালনকর্তা।
তিনি (পালনকর্তা ছাড়াও) সবাইকে (অর্থাৎ এই মৃত্যুগুলো সহ আকাশ ও পৃথিবীর
সবকিছুকে) সৃষ্টি করেছেন। আমি এর (অর্থাৎ এই দাবির) পক্ষে প্রমাণও রাখি। (তোমাদের
ন্যায় অস্ত অনুকরণ করি না।) আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের এই মৃত্যুগুলোর দুর্গতি
করব ব্যর্থন তোমরা (এদের কাছ থেকে) চলে যাবে (যাতে তাদের অক্ষমতা আরও বেশি
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা এ কথা জেবে যে, সে একা আমাদের বিকলে কি করতে পারবে
হয়তো এ-সিকে জঙ্গেপ করল না এবং সবাই চলে গেল।) যখন (তাদের চলে যাওয়ার
পর) তিনি মৃত্যুগুলোকে কুড়াল ইত্যাদি ধারা জঙ্গে-চুরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তাদের
প্রধানটি ব্যজীত। [এটি আকারে অথবা তাদের দৃষ্টিতে সংবান্ধিত হওয়ার দিক দিয়ে বড়

ছিল। ইবরাহীম তাকে রেহাই দিলেন। এতে একপ্রকার বিজ্ঞপ্তি উদ্দেশ্য ছিল যে, একটি আনন্দ ও অন্যগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া থেকে যেন ধারণা জন্মে যে, হয়তো সেই অন্যগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। সুতরাং প্রথমত এই ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। এরপর যখন তারা চূর্ণকারীর অনুসন্ধান করবে এবং প্রধান মূর্তির প্রতি সন্দেহও করবে না, তখন তাদের পক্ষ থেকে এর অপারকতারও সীকারোভি হয়ে যাবে এবং প্রমাণ আরো অপরিহার্য হবে। সুতরাং পরিণামে এটা জন্ম করা এবং সক্ষ্য অপারকতা প্রমাণ করা। মোটকথা, এই উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) প্রধান মূর্তিকে রেহাই দিয়ে অবশিষ্ট সবগুলো তেক্ষে দিলেন।] যাতে তারা ইবরাহীমের কাছে (জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) অভ্যাবর্তন করে। (এর পর ইবরাহীম জওয়াব দিয়ে পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত করতে পারেন। মোটকথা, তারা পূজায়ওপে এসে মূর্তিগুলোর কর্মণ দৃশ্য দেখল এবং) তারা (পরম্পরে) বলল : আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এরূপ (ধৃষ্টাপূর্ণ) আচরণ কে করল ? নিচয় সে বড় অন্যায় করেছে। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বোক্ত কথা **لَكَبِدْنَاهُ** যাদের জানা ছিল না, তারাই এ প্রশ্ন করল। হয়তো তারা তখন বিতর্কে উপস্থিত ছিল না। কারণ, বিতর্কে সবারই উপস্থিত থাকা জরুরী নয় অথবা উপস্থিত থেকেও তারা শোনেনি এবং কেউ কেউ শুনেছে। [দুরের মনসূর) তাদের কঠক (যারা পূর্বোক্ত কথা জানত তারা) বলল : আমরা এক যুবককে এই মূর্তিদের সম্পর্কে (বিজ্ঞপ্তি) সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়। (অতঃপর) তারা (সবাই কিংবা যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা) বলল : (তাহলে) তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর। যাতে (সে সীকার করে এবং) তারা (তার সীকারোভিত্তির) সাক্ষী হয়ে যায় (এভাবে প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে শাস্তি দেয়া যায়। ফলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। মোটকথা, ইবরাহীম সবার সামনে আসলেন এবং তাঁকে) তারা বলল : হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্য মূর্তিদের সাথে এ কাও করেছ ? তিনি (উত্তর) বললেন : (তোমরা এই সংজ্ঞানা মেনে নাও না কেন যে, আমি এ কাও) করিনি, বরং তাদের এই প্রধানই তো এ কাজ করেছে। (যখন এই প্রধানের মধ্যে কারক হওয়ার সংজ্ঞানা থাকতে পারে, তখন এই ছোটদের মধ্যে বাকশক্তিশীল হওয়ার সংজ্ঞানও হবে।) অতএব তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর, যদি তারা বাকশক্তিশীল হয়। (পক্ষান্তরে যদি প্রধান মূর্তির কারক হওয়া এবং ছোট মূর্তিগুলোর বাকশক্তিশীল হওয়া বাতিল হয়, তবে তাদের অক্ষমতা তোমরা সীকার করে নিলে। এমতাব্দায় উপাস্য মেনে নেয়ার কারণ কি?) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং (পরম্পর) বলল : আসলে তোমরাই অন্যায়ের উপর আছ। (এবং ইবরাহীম ন্যায়ের উপর আছে। যারা এমন অক্ষম তারা বিজ্ঞপ্তি উপাস্য হবে)। অতঃপর (শজ্জায়) তাদের মন্তব্য সত হয়ে গেল। [তারা ইবরাহীম (আ)-কে পরাজয়ের সুরে বলল :] হে ইবরাহীম, তুমি তো জান যে এই মূর্তিরা (কিছুই) বলতে পারে না। (আমরা এদেরকে কি জিজ্ঞেস করব ! তখন) ইবরাহীম (তাদেরকে খুব ভৎসনা করে) বললেন : (আফসোস, এরা যখন এমন, তখন) তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না! ধিক, তোমাদের জন্মে (কারণ, তোমরা সত্য পরিস্কৃত হওয়া সত্ত্বেও যিথ্যাকে আঁকড়ে আছ।) এবং তাদের জন্মেও আল্লাহ

ব্যক্তীত যাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? ইবরাহীম (আ) মৃত্তি ভাঙ্গার কথা অঙ্গীকার করলেন না। তবে কাজটি যে তাঁরই, তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ তাঁ বক্তব্যের জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আরও তুক্দ হলো। কারণ,

جوجت فماندجفا جوئے را
بے پرخاش درهم کشد روئے را

অর্থাৎ সামর্থ্যবান মূর্খ জওয়াব দিতে অক্ষম হলে আকৃমণে প্রবৃত্ত হয়। এই নীতি অনুযায়ী। তারা (পরম্পরে) বলল : একে (অর্থাৎ ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে মার এবং তোমাদের উপাস্যদের (তার কাছ থেকে) প্রতিশোধ নাও। যদি তোমরা কিছু করতে চাও (তবে এ কাজ কর, নতুন ব্যাপার সম্পূর্ণ রসাতলে যাবে। মোটকথা, সবাই সম্মিলিতভাবে এর আয়োজন করল এবং তাঁকে জুলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। তখন) আমি (অগ্নিকে বললাম : হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের পক্ষে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (অর্থাৎ পুড়ে যাওয়ার মত উত্তুণ্ড হয়ে না এবং কষ্টদায়ক পর্যায়ে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে না, বরং মৃদুমূল্য বাতাসের মত হয়ে যাও। সেমতে তাই হলো) তারা তাঁর অনিষ্ট করতে চেয়েছিল (যাতে তিনি ধৰ্মস হয়ে যান), অতঃপর আমি তাদেরকে বিফল মনোরথ করে দিলাম। (তাদের উদ্দেশ্য সিঙ্ক হলো না, বরং উল্টা ইবরাহীমের সত্যতা আরও অধিকতর প্রমাণিত হয়ে গেল।) আমি ইবরাহীমকে ও (তাঁর ভাতুশ্পুত্র) মৃতকে (সে সম্প্রদায়ের বিপরীতে ইবরাহীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কোরআনে আছে ﴿أَمْ لَنُوطِّنَّ مَنْ لَنُوطِّنَّ﴾ এ কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁরও শক্ত এবং অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট ছিল।) এই দেশের দিকে (অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে) পৌছিয়ে (কাফিরদের অনিষ্ট থেকে) উক্তার করলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (জাগতিক কল্যাণও, কারণ সেখানে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ফলফুল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলে অন্য লোক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এছাড়া ধর্মীয় কল্যাণও ; কারণ, বহু পয়গম্বর সেখানে বিরাজিত হয়েছেন। তাদের শরীয়তসমূহের কল্যাণ দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবরাহীম আল্লাহর নির্দেশে সিরিয়ার দিকে হিজরত করলেন।) এবং (হিজরতের পর) আমি তাকে (পুত্র) ইসহাক ও (পৌত্র) ইয়াকুব দান করলাম এবং প্রত্যেককে (পুত্র ও পৌত্রকে উচ্চস্থরের) সংকর্মপ্রায়ণ করলাম। (উচ্চস্থরের) সংকর্ম হচ্ছে পবিত্রতা, যা মানুষের মধ্যে নবীদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অর্থ এই যে, প্রত্যেককে নবী করলাম।) আর আমি তাদেরকে নেতৃ করলাম (যা নবুয়তের অপরিহার্য অঙ্গ)। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করত (যা নবুয়তের কর্ণীয় কাজ); আমি তাদের কাছে প্রত্যাদেশ করলাম সৎ কাজ করার, (বিশেষত) নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার ; (অর্থাৎ নির্দেশ দিলাম যে, এসব কাজ কর।) তারা আমার (ধূর) ইবাদত করত। (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা আমার (ধূর) ইবাদত করত।) অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা উত্তমরূপে পালন করত। সুতরাং বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, أَوْ حَيَّنَا إِلَيْهِمْ صَلَاحِينْ

فِيْلَ الْخَيْرَاتِ بَلْ وَلِلْكَبِيرِ لَنَا عَابِدُونَ^۱ بَلْ كَرْمَنَتِ الْمُرْتَأَرِ دِيكَهِ إِنَّهُمْ يَهُدُونَ^۲ بَلْ أَنَّهُمْ يَهُدُونَ^۳

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে অশু হয় যে, ইবরাহীম (আ) তাদের কাছে (আমি অসুস্থ)-এর ওয়ার পেশ করে তাদের সাথে তাদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মৃত্তি ভাঙার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রাত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোজাখুজির কি প্রয়োজন ছিল? অথবেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ অনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সত্ত্বত তাঁর কথার দিকে কেউ জঙ্গেপ করে নি এবং ভুলেও যায়। (বয়ানুল কোরআন) এটাও সত্ত্বপূর্ব যে, যারা খোজাখুজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাই বলেন : ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেন নি ; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মৃত্তি ভাঙার ঘটনা ঘটলে যখন খোজাখুজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে। —(কুরআন)

فَجَعَلْتُمْ جَذَانًا—بَلْ شَكَّاً—إِنَّهُمْ جَذَانٌ^۱ এর বহুচন। এর অর্থ যেও। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) মৃত্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডিত করে দিলেন।

أَرْثَاهُ تَحْدُو بَدْ مُرْتَجِي لَهُمْ^۲ অর্থাৎ তাঁর মৃত্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মৃত্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় মান্য করত।

لَعْلَمَ اللَّهُ بِرِجْعَنَ^۱ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সংজ্ঞাবনা আছে। এক এই দুই সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ একপ্রাণী হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মৃত্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই কলী বলেন, সর্বনাম দ্বারা (প্রধান মৃত্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে আসে যখন সবতলো মৃত্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মৃত্তিকে

আন্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, একপ কেন হলো ? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ।

ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়—কৃপক অর্থে হিল, এ বিষয়ের বিজ্ঞানিত আলোচনাঃ قَالَ بْلَغَكُبِرْمَ مَذَا فَاسْتَوْلَمْ إِبْرَاهِيمَ (আ)-কে তাঁর সম্পদায়ের লোকেরা ঘেফতার করে আনল এবং তাঁর শীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল : তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি ? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন : না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে । যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর । এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আ) নিজে করেছিলেন । সুতরাং তা অশীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যিক বাস্তববিবরণী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যাবে । আল্লাহর সোন্ত হ্যন্ত ইবরাহীম (আ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উৎর্ধে । এ অপ্লের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন । তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথ্য বহানুল কোরআনে যে সভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল । অর্থাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তির করে থাকবে । ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিবরণী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না ; যেমন কোরআনে আছে অনَّ كَانَ لِرَحْمَنِ وَلَا فَاتَ أَوْلُ الْعَابِرِينَ (অর্থাৎ রহমান আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বশ্রদ্ধে তার ইবাদতকারীদের তালিকাভূক্ত হতাম । কিন্তু নির্মল ও দ্যুর্ধীন সওয়াব বাহরে মুহীত, কুরতুবী, ঝরল মা'আনী ইত্যাদি গ্রহে উল্লেখ করা হয়েছে । তা এই যে, এখানে ইবরাহীম (আ) যে কাজ হচ্ছে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্মত করা হয়েছে । কেননা, এ মূর্তিটি ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ করতে উদ্বৃদ্ধ করেছিল । তাঁর সম্পদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত । সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । উদাহরণত যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে । কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ ।

ইহরাত ইবরাহীম (আ) কার্যত মূর্তি ভাস্তাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্মত করেছিলেন । রেওয়ায়তে রয়েছে যে, মূর্তি ভাস্তার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকগাত্রেই ধারণা করে যে সেই এ কাজ করেছে । এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্মত করেছেন । বলা বাহ্য্য, এটা কৃপক ভঙ্গি । আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি (أَبْتَ الرَّبِيعِ الْبَقَاءِ) (অর্থাৎ বস্তুকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে ।) এর দৃষ্টান্ত । উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা । কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্মত স্থাপন করা হয়েছে । একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না । এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে

সম্ভব করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই ঝুপক ভঙ্গি অবশ্যম করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ঝুক হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাবুল আলামীন আল্লাহু তা'আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরণে মেনে নেবেন?

হিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসংগত ছিল যে যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই অঙ্গুপ হতো, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্ভব করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে যাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে : **فَاسْتَوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَلِقُونَ** মোটকথা, কোনুকুপ দ্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত উজ্জিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আ) ঝুপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্ভব নির্দেশ করেছেন। একপ করা হলে তাতে কোনুকুপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। তথ্য এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্ভব করার ঝুপ : এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : **إِنْ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ أَرْثَارِ إِبْرَاهِيمَ (আ)** তিন জায়গা ব্যক্তিত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। (বুধারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দুটি মিথ্যা থাস আল্লাহর জন্য বলা হয়েছে। একটি **بِلْ فَعْلَةٍ كَبِيرِهِمْ** আয়তে আয়তে বলা হয়েছে। তৃতীয়টি ঈদের দিন সম্মানের কাছে ওয়র পেশ করে। (**أَمْ سَقِيمُ**) (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্তুর হিফায়তের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আ) স্তুর হ্যরত সারাহসহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কল্যাণ স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে ধাকলে সে একপ করত না। ইবরাহীম (আ)-এর স্তুর এই জনপদে শৌচার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌছিয়ে দিলে সে হ্যরত সারাহকে প্রেক্ষতার করিয়ে আনল। প্রেক্ষতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল এই মহিলার সাথে তোমার আল্লায়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আ) জালিমের কবল থেকে আস্তরক্ষার জন্য বলে দিলেন : সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু অতদস্ত্রেও সারাহকে প্রেক্ষতার করা হলো। ইবরাহীম (আ) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ২৫

ভাত্তে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সান্তুর প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় আরাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহর ছক্কুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার একপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাক। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শান্তের পরিভাষায় ‘তওরিয়া’। এর অর্থ দ্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। যুলুম থেকে আজ্ঞারক্ষার জন্য ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলা বাহ্য, এটাই তওরিয়া। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের ‘তাকায়ুহ’ থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিষয়। তাকায়ুহ মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুল্ক ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না বরং তওরিয়া ছিল। তবু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। **فَلِمْ يَرْفَعَ الْقُرْبَانَ** এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মৃত্তি ভাঙ্গার কাজটিকে ঝুপক অর্থে বড় মৃত্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। **أَنْتَ سَمِيعٌ** বাক্যটিও অন্তর্দ্ধুর। কেননা, **أَنْتَ سَمِيعٌ** (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তাভিত্তি ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই ‘আমি অসুস্থ’ বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই “তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্য ছিল” এই কথাগুলো বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন শুনাহের কাজ ছিল না। নতুনা শুনাহের কাজ আল্লাহর জন্য কয়ার কোন অর্থই হতে পারে না। শুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো অকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন ব্যক্তি হয়ে থার মিহিদ অর্থ হতে পারে-একটি মিথ্যা ও অপরটি শুল্ক।

ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশ্বারদ পাকাত্তের পবিত্রদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোষ ইবরাহীম (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরিপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিক্ষার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি বস্তানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগ্ন সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এক্সপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবৃদ্ধিতার ও বক্রবৃদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধৰ্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, ‘তিনটি মিথ্যা’ বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা ব্যয়ৎ হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মুসা (আ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ)-এর ভূলকে عصى و غوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আয়ীমত ত্যাগ করে ক্রমসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গব্রহ্মদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশেরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গব্রহ্মদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গব্রহ্ম তাঁর কোন ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ(সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডয়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ হাদীসে বর্ণিত ঐ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে শুয়ুর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে তৎক্ষণাৎ তথা ‘মিথ্যা’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক্সপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এক্সপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মুসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে মুহািতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গব্রহ্ম সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়াতে, কোরআন শিক্ষা

অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায় ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা মাঝায়ে ও ধূঁটা বৈ নয় ।

উপর্যুক্তি হাদীসে একটি উচ্চত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আদল থাটি করার সূচিতা : হাদীসে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উপর্যুক্তি তিনটি মিথ্যার বধ্য থেকে দুটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য হিল ; কিন্তু ইয়েরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে একপ বলা হয় নি । অথচ ত্রীর আবক্ষ রক্ষা করাস্ত সাক্ষাৎ দীনের কাজ । এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরআনীতে কাহী আবু বকর ইবনে আবাবী থেকে একটি সূচ তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে । ইবনে আবাবী বলেন : তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে একপ না বলার বিষয়টি সংকর্মপ্রায়ণ ও গুরুদের কোম্পন ক্ষেত্রে দিয়েছে । যদিও এটা দীনেরই কাজ হিল, কিন্তু এতে ত্রীর সঠিত ও হেরেমের হিকায়ত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত হিল । এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে *فِي اللَّهِ (আল্লাহর জন্য)* এবং *لِلَّهِ (আল্লাহর জন্য)*-এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে । কেবল, আল্লাহ তা'আলা বলেন : *اللَّهُ أَكْبَرُ الْمُسَالِسُ* (খাটি ইবাদত আল্লাহর জন্যই) ত্রীর সঠিত রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অর্থবা জন্য কারণ হলো নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো । কিন্তু পয়গম্বরদের মাহাত্ম্য সবার উপরে । তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে ।

ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে মসজিদের অগ্নিকুণ্ড পুল্মোদ্যানে পরিণত হওয়ার ব্রহ্মণঃ যারা মু'জিয়া ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অঙ্গীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপরিজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছে । আসল কথা এই যে, যে শুণ কোন বন্ধুর সন্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বন্ধু থেকে পৃথক হতে পারে না—সর্বনশান্তের এই নীতি একটি বাতিল ও অমানহীন নীতি । সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে কোন বন্ধুর সন্তার জন্য কোন শুণ অপরিহার্য নয় । বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রক্রিয়া করা জরুরী, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী ; কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—মুক্তিসন্তত নয় । দার্শনিকগণও এর যুক্তিসন্তত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে নি । এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যন্ত, তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন । এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভব্যতা নেই । আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রক্রিয়ন কাজ করতে শুরু করেন ; অথচ অগ্নিসন্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি শান্তি থাকে ; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহর নির্দেশে স্থীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষাণ করে থাকে । পয়গম্বরদের নবৃত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব মু'জিয়া প্রকাণ করেন, সেগুলোর সারাভর্ম তাই । এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমুরদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন : ফুই শীতল হয়ে থা । ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল । যদি *أَبْرُون* (শীতল) শব্দের অঙ্গে *وَسَلَامٌ* (মিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি

হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। সুহ (আ)-এর সলিল সমাধিশাঙ্ক সম্পদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে : ﴿أَغْرِقُوا فَانْخَلُّوا﴾^১ অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

অর্থাৎ সমগ্র সম্পদায় ও নবজ্ঞদ সর্বিস্তভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জালানী কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রচলিত করতে থাকে। ক্ষেত্র পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচূর্ণী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ)-কে এই জুলুস অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সহস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য ভাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শরতান ইবরাহীম (আ)-কে ‘মিনজানিকে’ (এক প্রকার নিক্ষেপণ ষষ্ঠ) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিস্থূলে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দুলোক ও ডুলোকের সমন্ত সৃষ্টি জীব চীৎকার করে উঠল : ইয়া রব, আপনার সোন্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য ইবরাহীম (আ)-কে জিজেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন : আল্লাহ তা‘আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাইল (আ) বললেন : কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপহিত আছি। উভয় হলো : প্রয়োজন তো আছে ; কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। —(মাযহারী)

—مَنْتَنَا يَا نَارَكُونِيْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ابْرَاهِيمَ—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে সংক্ষিপ্ত অগ্নিই ছিল না ; বরং বাতাসে ক্রগাঞ্চরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যিক অগ্নি সত্ত্বার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। ইবরাহীম (আ)-কে যেসব বৃশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভূষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বললেন : এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবনে তা ভোগ করিনি। —(মাযহারী)

অর্থাৎ ইবরাহীম ও লৃতকে আমি নবজ্ঞদের অধিকারভূক্ত দেশ (অর্থাৎ ইয়াক) থেকে উদ্ভার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য ফল্যাণের আবাস স্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গঘরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গঘর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুব্রহ্ম আবহাওয়া, নদমদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উষ্ণিদের

অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

—**أَرْثَاءً** আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহার্ক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে **وَلَفِت** বলা হয়েছে।

دُلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَيْدَنَهُ مِنَ الْقَرِيَّةِ الْأَلْتَى كَانَتْ تَعْمَلُ
 الْخَبِيرَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَسِقِينَ ﴿٦٨﴾ وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا
 إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ⑥

(৭৪) এবং আমি লৃতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তাঁরা মন্দ ও নাফরমান সম্পদায় ছিল। (৭৫) আমি তাঁকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং লৃত (আ)-কে আমি (পয়গম্বরদের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। (তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুঁয়েথুন।) এছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তাঁরা অভ্যন্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শুঁশে মুণ্ড, গেঁক লম্বা করা, কবুতর-বাজি, তিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্তু পরিধান। (রহুল মা'আনী) নিচ্য তাঁরা মন্দ ও পাপাচারী সম্পদায় ছিল। আমি লৃতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ যাদের প্রতি রহমত হয়, তাদের) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। (কেননা) নিঃসন্দেহে সে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মশীলদের একজন ছিল (উচ্চস্তরের সৎকর্মপ্রায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, পবিত্র, যা পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লৃত (আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদূম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাইল (আ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লৃত (আ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অঙ্গত রেখে দেওয়া হয়েছিল। —(কুরআনী)

খীট-খবান এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্মেরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে

বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকেই خبائث বলা হয়ে থাকলে তাও অবাস্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ চাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। কৃত্তল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয় । **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَنُوحًا إِذَا دِيَ مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجِدْنَا لَهُ فَنْجِينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيمِ ⑭ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيْتَنَا إِنَّهُمْ كَانُوا
 قَوْمًا سَوْءً فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ⑯

(৭৬) এবৎ স্বরূপ কর্মন নৃহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহবান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবৎ আমি তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অঙ্গীকার করেছিল। নিচয়, তাঁরা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবৎ নৃহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা কর্মন, যখন এর (অর্থাৎ ইবরাহিমী আমলের) পূর্বে তিনি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ প্রহণ কর্মন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট কাফিরদের মিথ্যারোপ ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো নৃহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিচয় তারা ছিল বুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এর অর্থ ইবরাহীম ও নৃত (আ)-এর পূর্বে হওয়া । পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নৃহ (আ)-এর যে আহবানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নৃহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : **رَبُّ لَا تَنْزَلْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ** **الْكَافِرِينَ دَيَارِ**। অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, পৃথিবীর বৃকে কোন কাফির অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নৃহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনোরূপেই তাঁর উপদেশ মানল

না, তখন তিনি আল্লাহ'র দরবারে আরয করলেন অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ ঘটন করুন।

(مَهْ كَبِيرٌ) كرب عظم — فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
জাতির বন্যার নির্মজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় এই জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নৃহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَدَاؤْدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنِمٌ
الْقَوْمُ هُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ⑭ فَلَا يَفْعَلُونَ
أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ذَوَسَخْرَنَ أَمَعَ دَاؤْدَ الْجِبَالَ يُسِّحِّنَ وَالظَّيْرَطَ
وَكُنَّا فَعِلِّيْنَ ⑮ وَعَلِمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُحْصِّنُكُمْ
مِنْ بَأْسِكُمْ هُ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكُوْنَ ⑯ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ
عَاصِفَةَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكَنَا فِيهَا هُ وَكُنَّا بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِمِيْنَ ⑰ وَمِنَ الشَّيْطِيْنِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْلُوْنَ
عَمَلًا دُوْنَ ذَلِكَ هُ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِيْنَ ⑱

(৭৮) এবং স্বরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্তিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মত ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পশ্চীমমূহরে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তাঁরা আমার পবিত্রতা ও মহিমা দ্বোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ণ নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা মুক্তে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি ক্রতজ্জ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো এই দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কড়ককে, যারা তাঁর জন্য ডুরুরিয়ে কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।

তফসীলের সার-সংক্ষেপ

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে শরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আঙুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেত্রে) কিছু লোকের মেষপাল রাত্তিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা যা (মোকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। [অর্থাৎ দাউদের ফয়সালাও শরীরত্বিবরণী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল একপং শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তারা মূল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেত্রের মালিককে মেষপাল দিয়েছিলেন। আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরকা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাৱ দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষপাল ক্ষেত্রে মালিকদেরকে দেওয়া হোক। তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মেষপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেত্রে যত্ন নেবে। যখন ক্ষেত্রে ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌছে যাবে, তখন ক্ষেত্র ও মেষপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যুপণ করা হোক। এই আপোসরকা কার্যকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত। (দুরুরে মানসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুল্ক হলে অপরটি অশুল্ক হবে। তাই كَلَّا أَتَبْلُغُكُمْ مِمَّا يَعْمَلُونَ (যোগ করা হয়েছে) এবং এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও অতিন্ন মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার বর্ণনা হলে : আমি পর্বতসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ পাঠের সাথে) তারা (ও) তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূহকেও ; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে جِبَالٌ أَوْبَيْ مَفَعَةٍ وَالْطَّيْرُ কেউ যেন এতে আচর্যবোধ না করে। কেননা, এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমতাবস্থায় এসব মুজিয়ায় আচর্যের কি আছে ? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) জন্য বর্ষনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুক্তে) একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকৰ করবে (না) কি ? আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বাযুকে, তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। [অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বাযুর মাধ্যমে হতো। দুরুরে মনসুরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পারিষদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। এরপর বাযুকে ডেকে আদেশ করতেন। বাযু সবাইকে উঠিয়ে অলংকৃণের মধ্যে এক এক মাসের দুরত্বে পৌছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি।

(সুলায়মানকে এসব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমৃদ্ধে) দুর্বলির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তাঁর কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল; কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—**أَبْدِيَّةً نَفَشَ شَدَّهُ فِيهِ عَنْ الْقَوْمِ**—**أَبْدِيَّةً نَفَشَ شَدَّهُ فِيهِ عَنْ الْقَوْمِ**

—**فَهُمْنَا مَا سَلَّمَانَ**—**فَهُمْنَا مَا سَلَّمَانَ**

শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যিত মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহু তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা' সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভাস্তু ছিল না; কিন্তু আল্লাহু তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহুর কাছে তা পছন্দনীয় সাধ্যন্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হ্যরত ইবনে আবাস, কাতাদাহ ও যুহুরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন: দুই ব্যক্তি হ্যরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে ঢোকা ও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সেক্ষেত্রে বিবাদী বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হ্যরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ কর্তব্য। (কেননা, ফিকাহ্র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হ্যরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হ্যরত সুলায়মান (আ) বললেন: আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান (আ) বললেন: আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত্র ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাবাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হ্যরত দাউদ

(আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন : বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি ? এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল ? যদি হ্যরত দাউদ (আ) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা ? —(অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা।

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্ভসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েয়ই নয় ; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচূত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্বত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয় নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ঝীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয় বরং উত্তম। হ্যরত উমর ফারক (রা) আবু মুসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্মতি একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকৃতনী সমদসহ বর্ণনা করেছেন। —কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িত্বা সুরখসী মবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : হ্যরত দাউদ (আ) ও হ্যরত সুলায়মান (আ) উভয়ের রায় ব্রহ্ম স্থানে বিশুদ্ধ। এর বরুপ এই যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) (আ) যা বলেছিলেন, তা অকৃতপক্ষে মোকদ্দমার রায় ছিল না ; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পক্ষ। কোরআনে "وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দিতীয় পক্ষই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। —(মাযহারী)

হ্যরত উমর ফারক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিচারকসূলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শক্ততার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলিমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্রোহও দূর হয়ে যায়। (—মুসিনুল হক্কাম)

মুজাহিদের এই উকি অনুযায়ী দাউদ (আ) (আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় তঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি ; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপোস-রফার একটি পহ্লা উজ্জ্বাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরম্পর বিবেচী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি তত্ত্ব হবে, না কোন একটিকে ভাস্ত বলা হবে ; এ হলে কুরআনী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরম্পরবিবেচী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভাস্ত ও অশুক্র সাবত করা হবে ; এ ব্যাপারে আচীনকাল থেকেই আলিমগণের উকি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরম্পরবিবেচী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে : وَكُلَا أَنْتَهَا حَكِمًا وَعَلَيْهَا فَفَهْمَنْتَهَا مَسْلَيْتَانْ এতে হ্যরত দাউদ (আ) ও হ্যরত সুলায়মান (আ) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হ্যরত দাউদ (আ) (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সত্য ছিল এবং সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের হলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রাতৃ হয় তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ فَفَهْمَنْتَهَا مَسْلَيْتَانْ এতে বিশেষ করে হ্যরত সুলায়মান (আ) (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্থ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে—একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বাসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগুলো এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের ব্রহ্মণও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাবিক মতবিবেচনের মতই। কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপর্যুক্ত হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা যুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্ত্বার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের উনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রাতৃ, তাদের এ উকির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্সমা

করা হবে অথবা তার অনুসারীরা শুনাইগার হবে—এরপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীলে কৃতৃপক্ষে এ সম্পর্কে বিজ্ঞানিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারও জন্ম অন্যের জন্ম অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলেকি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্মুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে ; যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর শরীরতের ফয়সালা আমাদের শরীরতেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ যতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেতুর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারও জন্ম অপরের ক্ষেত্রে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্মুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংহিত করেছেন। মুয়াজ্ঞা ইমাম মালিক এ বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আয়েবের উল্লী এক ব্যক্তির বাগানে চুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাম্লুল্লাহ (সা) ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রের হিফায়ত করা মালিকদের দায়িত্ব। হিফায়ত সঙ্গেও যদি রাত্রিবেলায় কারও জন্ম ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্মুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে। ইয়াখ আয়ত আবু হানীফা ও কুফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্মুর সাথে রাখাল অথবা হিফায়তকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্মু কারও ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করে, তখন জন্মুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্মুর সাথে মালিক অথবা হিফায়তকারী না থাকে, জন্মু ব্যাপোনিত হয়ে কারও ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আয়মের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, অর্থাৎ জন্মু কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্মুর মালিক ক্ষতিপূরণ দিবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্য মালিক অথবা রাখাল জন্মুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্মুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেত্রে জন্মু ছেড়ে না দেয়, জন্মু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহণ করতে হবে না। বারা ইবনে আয়েবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকূলের তসবীহ : **وَسْخُرْنَا مَعْ دَاؤْ الْجِبَالِ يُسْبَحْنَ وَالْطَّيْرَ وَكُلُّا فَاعْلَمْنَ** হযরত দাউদ (আ) (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক শুণাবলীর শব্দে সুমধুর কঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবৃত্ত পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক শুণ এবং পক্ষীকূল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীর ইওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জিয়া। মু'জিয়ার জন্যে পক্ষীকূল ও পর্বতসমূহের শব্দে ঝীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রচ্ছেক

অচেতন বস্তুর মধ্যে ঘূঁজিয়া হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্ত্ব এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবারে কিরামের মধ্যে হ্যারত আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কষ্টব্রুরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলগ্রাহ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন : 'আগ্রাহ তা'আলা তাঁকে হ্যারত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কষ্টব্রই দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলগ্রাহ (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আর করলেন : আপনি শুনছেন—একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর ব্রহ্ম ও চিন্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুশ্ক করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পক্ষতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : وَعَلِمْنَا مَنْفَعَةً لِّبُوْسْ لِكُمْ—অন্ত জাতীয় সামগ্ৰীৰ মধ্যে যেগুলো পৰিধান কৰে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহাৰ কৰা হয়, অভিধানেৰ দিক দিয়ে তাকেই বসাস বলা হয়। এখনে লৌহবৰ্ম বোৰামো হয়েছে, যা যুক্ত হিকায়তেৰ জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে এইটা, অর্থাৎ আমি দাউদেৰ জন্য লোহা নৱম কৰে দিয়েছিলাম। এই নৱম কৰাৰ বিবিধ অৰ্থ হতে পাৰে। এক. তাৰ হাতেৰ স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নৱম হয়ে যেত, তিনি মোমেৰ ন্যায তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সৰু কৰতে পাৱতেন। দুই. আগনে লাগিয়ে নৱম কৰাৰ কৌশল তাকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কাৰখনাসময়ে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও প্রয়োজনগুলের কাজ :
আলোচ্য আয়তে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে
সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, **بَسْكُمْ مِنْ** : **أَرْثَاد** যাতে এই বর্ম
তোমাদেরকে যুক্তে সূতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হিকার্য্যত করে। এই প্রয়োজন থেকে
দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ
তা'আলা নিয়মাত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের
প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ, তবে জনসেবার
নিয়ত ধার্কা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। প্রয়োজন প্রকার শিল্প কর্ম
নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে ; যেমন দাউদ (আ) থেকে খ্যাত বপন ও
কর্তনের কাজ : বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে
শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা জননীর অত। তিনি নিজের সঙ্গানকেই দুধ পান করিয়েছেন
এবং লাভের ঘട্টে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার
নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই : তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব

উপকারণ সে লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিঙ্গ হয়ে যখন সুলায়মান (আ) (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতঙ্গ হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিরুণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

إِنَّمَا نَرْسِخُ عَلَى الْبَيْعَ عَاصِفٌ—وَسَخْرَنًا مَعَ دَارِي—
এই বাকাটি পূর্ববর্তী বাক্য এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়ায়ের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রশিদ্ধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে J (জন্য) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌছিয়ে দিত ; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। —(রহল মা'আনী, বায়াভাঈ)

তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) (আ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সাম্রাজ্য ও যুক্তান্তর এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সঙ্গা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সান্দিদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আ) (আ)-এর এই সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেরার স্থাগন করা হতো। এগুলোতে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে

আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) (আ) মাথা নত করে আল্লাহর ধিকর ও শোকের মশগুল ধাকতেন, ডান-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। — (ইবনে কাসীর)

এর শান্তিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ ।

১. **বর্ণনা** করা হয়েছে। এর অর্থ মূল বাতাস, যার দ্বারা খুলা ওড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরম্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সঞ্চিপন যে, এই বায়ু সন্তাগতভাবে প্রথর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আপ্তাহের কুদুরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, অবাহিত ইওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গসংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পার্থিয়ও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

একটি সূচী তরু : দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও অন্য পদার্থকে বশীভৃত করেছিলেন ; যথা পর্বত, সৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আ)-এর জন্য

দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীরে কর্মীর)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشْفَنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعْهُمْ رَاحِمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذُكْرًا لِلْعَيْدِينَ ﴿٢﴾

(৮৩) এবং স্বরগ কর্মন আইউবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলেছিলেন : আমি দৃঢ়কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দৃঢ়কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ কিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ করুণ।

তফসীরের সাম-সংক্ষেপ

এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা কর্মন, যখন সে (দূরায়োগ) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলল : আমি দৃঢ়-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কষ্ট দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কৃত করলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্ধাং ঘেসব সন্তান-সন্ততি নির্বোজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) কিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও অনুগ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে (গণনায়) তাদের মত আরও দিলাম (অর্ধাং পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান আরও দিলাম, নিজের ঔরসজ্ঞাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য অরণীয় হয়ে থাকার জন্য।

আমুষস্কিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আইউব (আ)-এর কাহিনী : আইউব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগ্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দূরায়োগ রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বস্তু-বাস্তব সব উৎসাহ হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অস্য মাঁআরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) —২৭

কোন কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থিত দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তৃণনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয় ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন :

আল্লাহ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলত পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর শরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে প্রিয়জন, বক্তু-বাক্তব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিষ্কেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দের্খাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়া বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। —(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকর্ত্তি সব নিঃশেষ হয়ে পিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আচর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে করীম (সা) বলেন : অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সমূর্ধীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সমূর্ধীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তাঁর ঈমানের দৃঢ়তাৰ পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্ষপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত ; তাঁর বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তব আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ তা'আলা আইউব (আ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবক্রে বিশিষ্ট তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ (আ)-কে শোকরের এমনি ব্রহ্মজ্ঞ সান করা হয়েছিল।) বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপরেয় ছিলেন। ইয়ামীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন : আল্লাহ যখন আইউব (আ)-কে অর্থকর্ত্তি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জ্ঞাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর শরণ ও ইবাদতে আরও বেশি আল্লানিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরয করেন : হে আমার পালনকর্তা ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহকৃত আমার অন্তরকে আচল্ল করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেয় ইবনে-কাসীর লিখেছেন : এই কাহিনী সম্পর্কে ওহ্ব ইবনে মুনাবেহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

আইটব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয় : হ্যরত আইটব (আ) সাংসারিক ধন-ধোলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাইস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হৃতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধী শ্রী লাইয়া একবার আরবও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহু তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন : আমি সতৰ বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহু তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনমতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়ঃসনসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিস্ত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অর্থ আল্লাহুর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অস্তর্ভুক্ত নয়)। অবশ্যে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করুন। বলা বাহ্য্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল—বেসবরী ছিল না। আল্লাহু তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন : প্রের্ণাপ্রাপ্তি (আমি তাঁকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন ক্লপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইটব (আ)-এর দোয়া কবূল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো : পায়ের গোড়ালি দ্বারা যাচিতে আঘাত করুন। যাচিতে পরিক্ষার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হ্যরত আইটব (আ) তদ্দুপই করলেন। বরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষতজর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিষেধের মধ্যে রক্তযাংস ও ক্ষেমণিত দেহে ক্রপাঞ্চরিত হয়ে গেল। আল্লাহু তা'আলা তাঁর জন্যে জাল্লাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জাল্লাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন। শ্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন ; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইটব (আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন ? কুকুর ও ব্যাস্ত কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে ? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শনে আইটব (আ) বললেন : আমিই আইটব। কিন্তু শ্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন : আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন ? আইটব (আ) আবার বললেন : সক্ষ করে দেখ, আমিই আইটব। আল্লাহু তা'আলা আমার দোয়া কবূল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হ্যরত ইবনে-আববাস বলেন : এরপর আল্লাহু তা'আলা তাঁর ধন-ধোলত

ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও । তখু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাঢ়তি সন্তানও দান করলেন । —(ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : হ্যরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল । পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই ঘৃত্যমুখে পতিত হয়েছিল । আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থিত দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং ঝীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে । একেই কোরআনে **وَمِنْهُمْ مُّعَمَّلٌ** বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে । শা'বী বলেন : এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম । —(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন : পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই জাত করলেন এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে । **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَاسْعِيْلَ وَادْرِيْسَ وَذَا الْكَفْلِ ۚ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ⑩
وَادْخَلْنَاهُمْ فِي سَاجِدَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِنَ الصَّابِرِيْعِيْنَ ⑪

(৮৫) এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী । (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম । তাঁরা ছিলেন সংকর্মপ্রাপ্ত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন । তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন (শ্রীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল । আমি তাঁদের (সবাই)-কে আমার (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম । নিচয় তারা পূর্ণ সংকর্মপ্রাপ্ত ছিলেন ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকিফল নবী ছিলেন, না শঙ্গী ? তাঁর বিশ্বয়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতছয়ে তিনজন ঘনীষ্ঠীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁদের মধ্যে হ্যরত ইসমাইল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে । কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে । ত্বীয়জন হচ্ছেন যুলকিফল । ইবনে কাসীর বলেন : তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বুদ্ধি যায় যে, তিনিও আল্লাহ'র নবী ছিলেন । কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না ; বরং একজন সংকর্মপ্রাপ্ত ওলী ছিলেন । তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত ইয়ামা' (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীকা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবন্দশাস্ত্র তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে । এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে

একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই : সদাসর্বদা রোয়া রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগাহিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অধ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল : আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হ্যরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সদাসর্বদা রোয়া রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্সা কর না? লোকটি বলল : নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হ্যরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন আবার সমাবেশকে সক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিচূপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দখায়মান হলো। তখন হ্যরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ শাতে সকল হয়েছে দেখে শয়তান তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল : যাও, কোনরূপ এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্বন্দ্বন তাঁর এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল : সে আমাদের বশে আসার পাই নয়। ইবলীস বলল : তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হ্যরত যুলকিফল বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোয়া রাখতেন এবং সারাবাত জাগ্ন থাকতেন। শুধু জিজ্ঞাসে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কে ? উত্তর হলো : আমি একজন বৃক্ষ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগভুক্ত তেরে পৌছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার স্বপ্নদারের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই যুলুম করেছে, এই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অভিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি যুকান্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃক্ষের জন্য অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে শাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? উত্তর হলো : আমি একজন বৃক্ষ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন : আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসসি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল : হ্যুম, আমার শরীর পক্ষ খুবই দুর্গতির। আগনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অঙ্গীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃক্ষের জন্য অপেক্ষা করতে শাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাঁর পাণ্ডা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় তুলতে শাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া

নাড়া না দেয়। বৃক্ষ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে বিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। মূলকিফল জাপ্ত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বক্স আছে এবং বৃক্ষ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে ? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন : তাহলে তুমি আল্লাহ'র দুশ্যম ইবনীম। সে স্বীকার করে বলল : আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবক্ষ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপ রাগাভিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাও করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হ্যরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। —(ইবনে-কাসীর)

মুসলিমে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে ; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে—আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই :

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে-উমর বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন : বনী-ইসরাইলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোন ফনাহু থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনেকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ঘাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুর্কুর করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাপতে লাগল ও কানা ঝুঁড়ে দিল। সে বলল : কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমার উপর কোন জোর-জবরদস্তি করছি ? মহিলা বলল : না, জবরদস্তি কর নি ; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন করিনি। এখন অঙ্গা-অন্টন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল অদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল : যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাতেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অনৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল : غُرَّ اللَّهُ لِكُفَلٍ অর্থাৎ আল্লাহ'র কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উন্নত করে লিখেন : এই রেওয়ায়েতটি সিহাহু সিস্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে আমাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে—যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি।

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হ্যরত ইয়াসা' নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সত্ত্বত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গত্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ'র তাঁ'আলা তাঁকে নবুয়তের পদে দান করেছিলেন।

وَذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ فَتَأْدِي
فِي الظُّلْمِتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبُّحْنَكَ تُلْتِ كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾ فَاسْتَجِئْنَاكَ وَنَجِئْنَاهُ مِنَ الْغَرِّ وَكَذَلِكَ

بُشِّيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾

(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন ; যখন তিনি হৃদ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধূত করতে পারব না । অতঃপর তিনি অক্ষকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ; তুমি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই । তুমি নির্দোষ আমি শুনাইগাম । (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুষ্ঠিত থেকে মুক্তি দিলাম ; আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি ।

তৃতীয়ের সার-সংক্ষেপ

এবং মাছওয়ালার (অর্ধাং হয়রত ইউনুস পয়গবরের) কথা আলোচনা করুন, যখন তিনি (বিশ্বাস হাপন না করার কারণে তাঁর সম্মানের উপর থেকে আয়াব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং তিনি (নিজের ইজতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না [অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজতিহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি ; কিন্তু যে পর্যবেক্ষণ আশা থাকে, সেই পর্যবেক্ষণ ওহীর অপেক্ষা করা পয়গবরগণের জন্য সমীচীন । এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাঁকে বিপদঘন্ট করা হয় । সেহতে পথিমধ্যে সমৃদ্ধ পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন । নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায় । ইউনুস (আ)-এর বুরাতে বাকি রইল না যে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয় নি । এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে । তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেন : আমাকে সমৃদ্ধ ফেলে দাও । তারা সম্ভত হলো না । লটারী করা হলো তাতেও তাঁরই নাম বের হলো । অবশ্যেই তাঁকে সমৃদ্ধ ফেলে দেয়া হলো । আল্লাহর আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল । (দুররে মনসুর) অতঃপর তিনি জমাট অক্ষকারের মধ্যে আহ্বান করলেন । এক অক্ষকার ছিল আছের পেটের, হিতীয় সমুদ্রে পানির ; উভয় গভীর অক্ষকার অনেকগুলো অক্ষকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অক্ষকার ছিল রাত্রি । (দুররে মনসুর) তুমি ব্যক্তিত কোম উপাস্য নেই (ঝটা তওহীদ) ; তুমি (সব দোষ থেকে) পবিত্র, (ঝটা পবিত্রতা বর্ণনা) আমি মিল্লাই দোহী । (ঝটা ক্ষমা প্রার্থনা) । এর উদ্দেশ্য আমার অস্তিত্বক করে এই সংক্ষিট থেকে মুক্তি দাও ।) অতঃপর

আবি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দুচ্ছিত্তা থেকে মুক্তি দিলাম। (এই কাহিনী সূরা সাফকাতে **نَبَّتَنَا فِي الْعَرَأَةِ** আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আবি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দুচ্ছিত্তা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিকিৎস্ত রাখা উপযোগী না হয়)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِنَّ الْمُؤْمِنَونَ
ইউনুস, সূরা আবিয়া, সূরা সাফকাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননুন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নুন' ও 'হত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুননুন ও সাহেবুল হতের অর্থ মাসওয়ালা। ইউনুস (আ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুননুনও বলা হয় এবং সাহেবুল হত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আ)-এর কাহিনী : তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে যুসেলের একটি জনপদ নাম্বুয়ার অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ইমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধাতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আয়াব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াবের কিছু কিছু চিহ্ন ফুটে উঠেছিল)। অনভিবিলবে তারা শিরক ও কুকুর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাস-বৃক্ষ-বনিভা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুর্পদ জন্ম ও বাচ্চাদেরকেও সাথে পিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি উঁক করে দেয় এবং কাকুতি মিলুতি সহকারে আক্ষয় আক্ষয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্মদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরঘোল করতে থাকে। আক্ষয় তা'আলা তাদের ঝাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিলতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আয়াব হটিত্তে দেন। এ দিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আয়াব আসার ফলে তার সম্পদায় বোধ হয় ধ্রংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জান্মতে পারলেন যে, আমৌ আয়াব আসেনি এবং তাঁর সম্পদায় সুষ্ঠু ও সিঙ্গাপুরে দিন ও জরান করছে, তখন তিনি চিত্তাবিত্ত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্পদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হজ্যা করার পথা প্রচলিত ছিল। (মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর প্রধনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তিনি সম্পদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে তিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সক্ষ করলেন। পরিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে দুবে যাওয়ার উপকৰণ হলো। মারিয়া হলুল যে, আয়েছিদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা দুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আয়েছিদের নামে

লটারি করা হলো। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অবৈকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে ভূতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম ইউনুস (আ)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। অদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অঙ্গ-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলাৰ পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমৃদ্ধ মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আবাব আসার তার প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহ্ তাঁর কারণে ছিল। পয়গম্বরদের সনাতন গ্রীষ্মি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিভ্রান্ত করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত একপ কোর ভাস্তি ছিল না, যা আল্লাহ্ তাঁর রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাটি তওবা ও কান্নাকাটি কৃত করে তাদের উপর থেকে আবাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজন্মে আল্লাহ্ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌছে যাওয়া যদিও উন্নাহ ছিল না; কিন্তু উভয় পদ্ধতি খেলাক অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্ তাঁর নৈকট্যশীলদের মর্তবী অনেক উর্ধ্বে। তাদের অভিজ্ঞ-জ্ঞান ধাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ঝটি হলেও তজন্মে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আ) আল্লাহ্ তাঁর রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরআনীতে কুশারবী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আবাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি রোষের এই মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৮

ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আয়ার দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল; যেমন পিতা অগ্রাঞ্চিত সম্ভানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

—**رَبِّ مُفَاهِمْ بَا** — অর্থাৎ কুকুর হয়ে চলে গেছেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবুস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। **رَبِّ** শব্দটিকে অর্থাৎ মাফিন্বালৰ মাফিন্বালৰ পালনকর্তার খাতিরে কুকুর হয়ে চলে গেছেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগাদ্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আসামত।—(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

—**فَقَدْرُ أَنْ لَنْ تَفْدِرَ عَلَيْهِ** — অভিধানের দিক দিয়ে শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি **فَقَدْر** ধাতু থেকে উদ্ভৃত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কানু করতে পারব না বলা বাহ্য, এরূপ ধারণা কোন পয়ঃস্তর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না; কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মেটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা **فَقَدْر** ধাতু থেকে উদ্ভৃত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা; যেমন এক আয়াতে রয়েছে : **إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ** অর্থাৎ আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশংস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাইদ ইবনে মুবায়ির, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের অতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউনুস (আ) মনে করতেন, উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনোরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ঝটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই; দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

—**إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ** — এর দোয়া অত্যক্তের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মক্কাদের জন্য মক্কুল : **وَكَذَلِكَ نُنْهِيَ الْمُؤْمِنِينَ** — অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস (আ)-কে দুষ্টিত্ব ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুন্মিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে ঘনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। **وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ** (সা) বলেন :

—**إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الْمُشْكِنَاتُ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الْمُشْكِنَاتُ** — মাছের পেটে কৃত ইউনুস (আ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কুবুল করবেন।—মায়হারী ।

وَزَكَرِيَّا اذْنَادِي رَبِّهِ مَرِبٌ لَا تَذْرُنِي فَرِدًا وَأَنْتَ خَيْرٌ
 الْوَرِثَيْنِ ۚ فَاسْتَجِنْنَا لَهُ ذَوَهَبَنَا لَهُ يَعْيَى وَاصْلَحْنَا لَهُ
 زَوْجَهُ طَانِهِمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا
 رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ۝

(৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া করুন করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহুইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর জীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তাঁরা সৎকর্মে বাঁপিয়ে পড়ত, তাঁরা আশা ও জীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা হিল আমার কাছে বিনীত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যাকারিয়া (আ)-এর (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস হবে না ; বরং এক সময় সেও খণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দ্বারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া করুন করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহুইয়া (পুত্র) এবং তাঁর জন্য তাঁর (বঞ্চ্য) জীকেও প্রসবযোগ্য করেছিলাম। (যে সমস্ত পয়গম্বরের কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হলো) তাঁরা সবাই সৎকর্মে বাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও জীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হ্যরত যাকারিয়া (আ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন ; কিন্তু সাথে সাথে ন্যৌন্তার জন্য ও বর্লে দিয়েছেন ; অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিস। এটা পয়গম্বরসূলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরদের আসল মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্ৰ৷চূড়াত হয়ে নয়।

তারা আগুন ও তর অর্ধাং সুখ ও দুঃখ সর্বাবহারই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। এর একটি অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও জীতি উভয়ের মাঝার্ঘানে থাকেন আল্লাহ তা'আলার কাছে করুন ও সওয়াবের আশা ও রাখে এবং সীয় শনাহ ও ক্ষতির জন্য ডয়ও করে। —(কুরআন)

وَالَّتِي أَحْصَنْتُ فِرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا
وَابْنَهَا أَيَّةً لِلْعَلَمِينَ ⑤١

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তাঁর কামপ্রভুত্বকে বশে প্রেরণে হিল, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রহ ঝুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নির্দেশন করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারহামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তাঁর সজীবত্বকে (পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে (জিবরাইলের মধ্যস্থতায়) আমার রহ ঝুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে স্বামী ছাড়াই তাঁর গর্ভ সঞ্চার হয়) এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্র [ইসা (আ)]-কে বিশ্ববাসীর জন্য (আমার কুদরতের) নির্দেশন করেছিলাম। [যাতে তাকে দেখে তানে তারা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেন; যেমন আদম (আ)।]

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ⑤٢
وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ الَّذِينَ أَرْجِعُونَ ⑤٣ فَمَن يَعْمَلُ مِنْ
الصِّلْحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفَّارَ لِسَعْيِهِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ كَيْبُونَ ⑤٤
وَحَرَمَ عَلَىٰ قَرِيْبَهُ أَهْلَكَنَاهَا أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑤٥ حَتَّىٰ إِذَا فِتَحْتُ
يَا جُوبٍ وَمَا جُوبٍ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدِيبٍ يَتَسْلُونَ ⑤٦ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ
الْحَقُّ فِيذَا هِيَ شَاهِدَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا يُلْنَا فَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلَمِينَ ⑤٧ إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبٌ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَهَا وَسِادُونَ ⑤٨

لَوْ كَانَ هُوَ لَاءُ الِّهَةِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ⑤
 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ
 لَهُمْ مِنْ أَنَا الْحُسْنَى لَا وَلِيَكُمْ عَنْهَا مِبْعَدُونَ ⑦ لَا يَسْمَعُونَ حِسِيسَهَا
 وَهُوَ فِي مَا أَشْتَهِتُ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ⑧ لَا يَمْحُرُنَّهُمُ الْفَزْعُ
 الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلِكَةُ هُنَّ اِيُّومُكُوَالِّيُّ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ⑨
 يَوْمَ نُطُوي السَّمَاءَ كَطْلِي السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهَا
 وَعَلَّ اعْلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فِي عِلْيَنَ ⑩ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
 الَّذِي كَرِّرَ اَنَّ الارْضَ يَرْثَهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ⑪

- (১২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সরাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বক্ষেত্রী কর । (১৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারম্পরিক বিষয়ে জেদ সৃষ্টি করেছে । প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । (১৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অঙ্গীকৃত হবে না এবং আমি তা শিখিবস্ব করে রাখি । (১৫) যে সব জনগণকে আমি ধৰ্ম করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে না আসা অবধারিত ; (১৬) যে পর্যন্ত না ইরাজ্জ ও মাঝুজকে বক্ষনযুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চজ্ঞ থেকে স্মৃত ছুটে আসবে । (১৭) অমোহ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফিরদের চক্র উচ্চে হিল হয়ে যাবে ; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর হিলাম ; বরং আমরা শনাহ্গারই হিলাম । (১৮) তোমরা এবং আশ্নাহ্র পরিবর্তে তোমরা ধাদের পূজা কর, সেগুলো দোষখের ইক্ষন । তোমরাই ভাতে ধৰেশ করবে । (১৯) এই মূর্তিগু যদি উপাস্য হতো, তবে জাহানামে ধৰেশ করত না । প্রত্যেকেই ভাতে চিরহায়ী হয়ে পড়ে থাকবে । (২০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শনতে পাবে না । (২১) ধাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা সোয়ৰ থেকে দূরে থাকবে । (২২) তারা তার ক্ষীণতর শব্দও কলবে না এবং তারা তাদের ঘনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে । (২৩) যদি তার তাদেরকে চিন্তাবিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে ; আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া

হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে গুটিরে নেব, বেহন তটানো হয় লিখিত কাগজগত। যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বাক্কাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বীপর সম্বন্ধ : এ পর্যন্ত পয়গন্ধরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুসন্ধিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি মূলনীতি সব পয়গন্ধরদের মধ্যে অভিন্ন। এগুলো তাদের দাওয়াতের ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গন্ধরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিশ্ববস্তু। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিম্না করা হয়েছে।)

লোকসকল, (উপরে পয়গন্ধরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা তোমাদের তরীকা (যা মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব।) —একই তরীকা (এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমৰ্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব আল্লাহর প্রস্তুত এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু তা হয়নি ; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে ; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি (এতে ভুলভাবে আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে—আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, দুনিয়ায় এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক। কেননা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আয়াব অথবা মৃত্যু দ্বারা) ধূংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসম্ভাব্যতার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয় ; বরং প্রতিশ্রূতি সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।) যে পর্যন্ত না (ঐ প্রতিশ্রূতি সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজুজ-মাজুজ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা ঝুঁক আছে,) মৃত্যু হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিকের কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (চিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্রূতি সময়) নিকটবর্তী হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষু বিক্ষারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায় আমাদের

দুর্ভাগ্য ; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে খলবে, একে তো তখন পাফিলতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং (সত্য এই যে,) আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে :) নিচ্য তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ, সবাই জাহানামের ইকন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গন্ধের ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে প্রহণ করেছিল, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা, তাদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত অন্তরায় আছে যে, তারা জাহানামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন দোষও নেই। **أَنَّ الْذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ آيَاتُنَا** আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বুঝার বিষয় যে,) যদি তারা (মৃত্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হতো, তবে তাতে (জাহানামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও কণ্ঠহীন নয় ; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং (হট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। (এ হচ্ছে জাহানামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহানাম থেকে (এতটুকু দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, তারা জানাতে থাকবে। জানাত ও জাহানামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে।) তারা তাদের আকাঞ্চিত বস্তুসমূহের মধ্যে চিরবসবাস করবে। তাদেরকে মহাত্মাস (অর্থাৎ কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তাবিত করবে না এবং (কবর থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে। (তারা বলবে :) আজ তোমাদের এই দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এ সম্বাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্লতা উন্নতোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের প্রাপ্তি ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে না—সবাই এর সম্মুখীন হবে। যেহেতু সৎ বাদামী খুব কম সময়ের জন্য এর সম্মুখীন হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল।) এই দিনটিও শরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম ফুঁৎকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেখন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজগুলকে গুটিনো হয়। (গুটিনোর পর নিচিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুঁৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভয়টি সত্ত্বপুর।) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় (প্রত্যেক বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (উপরে সৎ বাদামদেরকে যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি (সব আল্লাহর) অস্তিসমূহে (লওহে মাহফুয়ে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জানাতের) মালিক আমার সৎকর্মপরায়ণ বাদাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিচ্ছৃঙ্খল যে, এটা লওহে মাহফুয়ে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে বুঝা যায় যে, কোন আল্লাহর প্রত্যেক ওয়াদা থেকে বালি নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞতব্য বিষয়

وَحَرَامٌ عَلَى قُرْبَةِ أَمْكَنَاتِهِ أَنْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব' -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُونَ
বাকো অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রতিরিক্ষ। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধৰ্ম করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ হরাম শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে প্রক্রিয়া কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে গ্রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আয়াব দ্বারা ধৰ্ম করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী।—(কুরুতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বারা রক্ষা হয়ে যায়। মদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْتَ يَاجُونَ وَمَاجُونَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلْبٍ يَنْسَلُونَ
এখানে হ্যাতি অর্থ হ্যাতি শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার ছুঁড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরম্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন এবং জিজেস করলেন : তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ ? আমরা বললাম : আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন : যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধাৰ সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোৰা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও তেজে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

بَدْ شব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি—বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট হোট টিলা। সূরা কাহফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের

জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উচ্চলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

أَنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِنَ اللَّهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ—অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহু ব্যক্তি তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইক্ষন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাসন্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে অশু হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হ্যরত ইসা (আ), হ্যরত ওয়ায়র (আ) ও ক্ষেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীরে কুরআনুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হ্যরত ইবনে আবুবাস (রা) বলেন : কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞেস করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি জক্ষেপ করে না। লোকেরা আরয করল? আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন : আয়াতটি হলো এই :

أَنْكُمْ مَا تَفْتَحُونَ—এই আয়াত অবর্তীর হওয়ার পর কাফিরদের বিত্তুকার অবধি থাকেনি। তারা বলতে থাকে : এতে আয়াদের উপাস্যদের চরম অবয়ানলা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী অলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নাশিশ করল। তিনি বললেন : আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমৃচ্ছিত জওয়াব দিতাম। আগস্তুকরা জিজ্ঞেস করল : আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন : আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হ্যরত ইসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হ্যরত ওয়ায়র (আ) এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউয়ুবিল্লাহ) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহু তা'আলা—

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَ الْخَسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ—

আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল :

وَلَمَّا ضَرَبَ أَبْنَ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا فَوْكُمْ مِنْهُ بَصِدُونَ—অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টিতে পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্মাদায় শোরগোল আরঝ করে দেয়।

فَرَزَعَ اكْبِرَ—হ্যরত ইবনে আবুবাস বলেন : لَا يَحْزَنُهُمْ الْفَرَزَعُ الْأَكْبِرُ—ফ্রেজ আক্বির (মহাবাস) বলে শিঙার দ্বিতীয় ফুঁকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উদ্ধিত হবে। কারও কারও মতে শিঙার প্রথম ফুঁকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন : শিঙায় তিনবার ফুঁকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকার হবে আসের ফুঁকার। মারাবেয়ুল কুরআন (৬ষ্ঠ)— ২৯

এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع أكابر বলা হয়েছে। হিতীয় ফুঁকার হবে বজের ফুঁকার। এতে সব মানুষ যারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। ভূত্তীয় ফুঁকার হবে পুনর্মানের ফুঁকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মুসলিমে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি ধর্ষ থেকে হযরত আবু ছরায়নার একটি হাদীস উন্মুক্ত করা হয়েছে।—(যায়হাকী) **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

স্বতের অর্থ করেছেন **يَوْمَ نَطْرِي السَّمَاءَ كَطْلَى السِّجْلُ لِكُتُبِ**। সহের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রযুক্তও এই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রযুক্তও এই অর্থে পছন্দ করেছেন। কৃত শব্দের অর্থ এখানে **مَكْتُوبٌ** অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিদ্যমানসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাসীর, ঝর্ল মা'আনী) **سَجْل** সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অর্থাৎ কেরেশতার নাম। হাদীসবিদের কাছে এই রেওয়ায়েতে ধাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুধাবীতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়াবতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আকবাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়াবতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টি বন্ধসহ এবং সকল পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টি বন্ধসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা'আলার হাতে সরিষ্ঠার একটি দানা পরিমাণ হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرَّبِيعِ مِنْ بَعْدِ النَّفْرَانِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْبَأُهَا عِبَادِي

—**رَبِيعٌ** এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زبور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আকবাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে **نَزَّ** বলে তওরাত এবং **زَبُور** তওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর ঘনসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইন্জীল, যবুর ও কোরআন।—(ইবনে জরীর) যাহুদাক থেকে একপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেন : **ذَكَرٌ** বলে সওহে যাহুদ্য এবং **زَبُور** বলে পরগনারদের প্রতি অবতীর্ণ সকল আল্লাহর ঘন্ট বোঝানো হয়েছে। যাজ্ঞাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ঝর্ল মা'আনী)

সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে أَرْض (পৃথিবী) বলে আয়াতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আকবাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়ুর, ইকবায়া, সুন্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইয়াম রায়ী বলেন : কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে، **وَأَرْسَلْنَا إِلَيْنَا أَرْضًا تَنبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ**। এই পৃথিবীর মালিক

হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্মাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন-কাফির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্মাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অভিভূত নেই। ইসবে আবাসনের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী—অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্মাতের পৃথিবীও। (জান্মাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণ হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে ইন لِلَّهِ مِنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَيْهِ الْمَأْقَبَةُ অর্থাৎ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَقِينَ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং وَمَنْ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَقِينَ তত পরিগাম আল্লাহতীক্ষ্ণদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে وَمَنْ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَقِينَ মু'মিন ও সৎকর্মাদেরকে আল্লাহ জ্ঞান দিবেছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে : إِنَّمَا تَنْهَىُ عَنِ الْمُحَاجَاتِ নিচের আবির্দন আমার পরামর্শবর্ণনাকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ইমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভূত করেছিল। জগত্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহনী (আ)-এর যথানাম আবার এ পরিস্থিতির উক্তব হবে।—(জ্ঞান মাত্রামী, ইবনে কাসীর)

إِنَّ فِي هَذَا لِكْنًا لِقَوْمٍ عَيْدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِلنَّاسِ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيْكَ أَنَّمَا الْهُكْمُ إِلَّهٌ وَاحِدٌ فَهُوَ
أَنْتَ مُسِلِّمٌ ۝ فَإِنْ تَوَلَّ مِنْكُمْ فَأَذْنِنَّكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ۝ وَإِنْ أَدْرِيَ
أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ مِنَ الْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْثِرُونَ ۝ وَإِنْ أَدْرِيَ لَعْلَةً فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعًَ إِلَى
جِبِينَ ۝ قُلْ رَبِّ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ ۝ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الرَّسُّتَعَانُ
عَلَى مَا تَصْفُونَ ۝

(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্পদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ব্রহ্মপই প্রেরণ করেছি (১০৮) বলুন : আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একব্রহ্ম উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবৎ হবে ? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে বলে দিন : “আমি তোমাদেরকে পরিকারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর ! (১১১) আমি জানি না সত্ত্বত বিলবের মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ।’ (১১২) পয়গঢ়ির বলশেন ও হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়ায়ময় তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য আর্থনা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচয় এতে (অর্থাৎ কোরআনের অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত সূরায়) পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে, তাদের জন্য—যারা ইবাদতকারী। (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনুগত্যে বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হিদায়েত ; কিন্তু তারা হিদায়েত চায় না। তাই এর উপকারিতা থেকে বর্ণিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রাসূল করে) প্রেরণ করিনি ; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্রহ করার জন্য। সেই অনুগ্রহ এই যে, বিশ্ববাসী রাসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হিদায়েতের ফল ভোগ করবে। কেউ গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ। এতে এসব বিষয়বস্তুর বিশুল্কতা ক্ষুণ্ণ হয় না।) আপনি তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায়) বলে দিন : আমার কাছে তো (একব্রহ্মী ও অংশীবাদীদের পারম্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একই উপাস্য। সুতরাং (তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) এখনও তোমরা মানবে কি না? (অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও) অতঃপর যদি তারা (তা মানতে) বিমুখ হয়, তবে আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে) বলে দিন : আমি তোমাদের পরিকার সংবাদ দিয়েছি (এতে বিন্দুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তঙ্গীদ ও ইসলামের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি এবং অঙ্গীকার করলে শাস্তির কথাও পূরোপুরি বর্ণনা করেছি। এখন আমার উপর সত্য প্রচারের দায়িত্বও নেই এবং তোমাদেরও ওয়র পেশ করার অবকাশ নেই) এবং (যদি শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শাস্তি অবশ্য়াবী। কিন্তু) আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী, না দূরবর্তী। আজ্ঞাহু তা'আলা তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং যা তোমরা গোপনে বল, তাও জানেন। (আয়াবের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে ধোকা খেয়ে না। কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না (সেই উপকারিতা কি, হ্যাঁ, এতটুকু বলতে পারি যে, সম্বব (আয়াবের এই বিলম্ব)

তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (যে, বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশাস স্থাপন করবে) এবং এক (সীমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ (যে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আয়ারও বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ব্যাপারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ দীর্ঘ আয় ও সুযোগ সুবিধা দান একটি শান্তি। যখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা হিদায়েত হলো না, তখন) পয়গঞ্চ (সা) বলেন : হে আমার পালনকর্তা (আমার ও আমার সম্পদায়ের মধ্যে) ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) ন্যায়ের অনুকূল (হয়)। উদ্দেশ্য এই যে, কার্যত ফয়সালা করে দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা পূর্ণ করুন। রাসূল আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা যা বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা নাস্তানাবৃদ্ধ হয়ে যাবে) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার যোগ্য। (আমরা তোমাদের মুকাবিলায় এই দয়াময় পালনকর্তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَكْرِيٌّ—عَالَمُ—وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ—এর বহুবচন। মানব, জিন, জীবজর্স, উদ্ধিদ, জড় পদাৰ্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) সবার জন্যই রহমতবৃক্ষপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহর যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের সত্ত্বিকার ক্রহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই ক্রহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে ‘আল্লাহ’ আল্লাহ’ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর যিকর ও ইবাদত সব বস্তুর ক্রহ, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বস্তুর জন্য রহমতবৃক্ষপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : مَهْدَى رَحْمَةً—আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। (ইবনে আসাকির) হ্যরত ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন : أَنَا رَحْمَةٌ مَهْدَىٰ بِرْفَعٌ قَوْمٌ وَخَفْضٌ إِخْرِينَ অর্থাৎ আমি আল্লাহর প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহর আদেশ পালনকারী) এক সম্পদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্পদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিষিদ্ধ করার জন্য কাফিরদেরকে ইন্বল করা এবং তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। **وَاللَّهُ سَبَّحَةٌ وَتَعَالَى أَعْلَمُ**

سُورَةُ الْحِجَّ

سُرَا هِجَّ

মদীনার অবর্তীর্থ, ১০ ক্ষেত্র, ৭৮ আব্রাহাম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ
تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضِعٍ عَنِّهَا أَصْبَحَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ
حَمْلٌ حَمِلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرًا وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ وَلَكِنَّ

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

গুরু করুণাময় ও অসীম সরাসু আল্লাহর নামে তরক করাই।

(১) হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ডয় কর। নিচয় কিয়ামতের প্রকল্পে একটি তরকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্তৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়; বস্তুত আল্লাহর আয়াব সুকঠিন।

জকসৌরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ডয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত অবলম্বন কর। কেননা, নিচিতভাবেই কিয়ামতের ভূকল্পন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। (এর আগুন অবশ্যঙ্গী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আস্ফৱার চিঞ্চা এখনই কর। এর উপায় আল্লাহভূতীতি। অতঃপর এই ভূকল্পনের কঠোরতা বর্ণিত হচ্ছে ১) যেদিন তোমরা তা (অর্ধাং ভূকল্পনকে) প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (এই অবস্থা হবে যে,) প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (ভীতি ও আতঙ্কের কারণে) তার দুধের শিশুকে বিস্তৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ (দিন পূর্ণ ইওয়ার পূর্বেই) পাত করবে এবং তুমি (হে সরোধিত ব্যক্তি,) মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না (কেননা, সেখানে কোন নেশার বন্ধ ব্যবহার করার আশংকা নেই)। কিন্তু আল্লাহর আয়াবই কঠিন ব্যাপার (যার ভীতির কারণে তাদের অবস্থা মাতাল সদৃশ হয়ে যাবে)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ : এই সূরাটি মঙ্গায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ডিল্লি ডিল্লি মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আবুস খেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন : এই সূরাটি মিশ্র। এতে মঙ্গায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সংযোগ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আব্দ্য দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন : এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মঙ্গায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুক্তাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মৃহুকাম তথা সূস্পষ্ট ও কিছু মৃতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

سَفَرْ অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলে কর্তৃম
(সা) উচ্চেষ্টবরে এর তিলাওয়াত তরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কিরাম তাঁর আওয়াজ
তনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সর্বোধন করে বললেন : এই
আয়াতে উল্লিখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্ম দিন হবে তোমরা জান কি ? সাহাবায়ে-কিরাম
আরয করলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তাল জানেন। রাসূলল্লাহ (সা) বললেন : এটা
সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সর্বোধন করে বললেন : যারা
জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আ) জিজেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে?
উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানকই জন। রাসূলল্লাহ (সা) আরও বললেন : এই
সময়েই ঝাস ও ভীতির আতিশায়ে বালকবা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত
হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কিরাম এ কথা তনে ভীতবিহুবল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন : ইয়া
রাসূলল্লাহ ! আমাদের মধ্যে কে মৃত্যি পেতে পারে ? তিনি বললেন : তোমরা নিশ্চিহ্ন
থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং
একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিম ইত্যাদি প্রছে আবু
সাঈদ খুরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন
দুই সম্পদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।
একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্পদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সঙ্গপাদ এবং আদম
সঙ্গাদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে যারা গেছে, তাদের সম্পদায় (তাই নয়শত নিরানকই
এর মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে); তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি প্রছে এসব রেওয়ায়েত
বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন করে হবে : কিয়ামত তরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনর্বস্থিত
হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ
বলেন : কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের সর্বশেষ
আলামতদলপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে ; যথা (১)
— إِذَا رُجَّت (৩) — وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (২) إِذَا زُلِّتِ الْأَرْضُ زَلَّتِ الْهَا
— لার্প্স রঞ্জা ইত্যাদি। কেউ কেউ আদম (আ)-কে সর্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের

ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুৎপানের পর হবে। ধৰ্ম্মত সত্তা এই যে, উজ্জয় উভিতর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়ত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। **وَاللّهُ أَعْلَمُ**

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়তে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গৰ্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাতী মহিলারা তাদের দুঃখপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে একপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটক নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা একপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উথিত হবে এবং যারা স্তন্যদাতের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উথিত হবে।—(কুরআন)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنٍ
 مَرِيدٍ ③ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَإِنَّهُ يُضْلَلُهُ وَيُهْدِيهِ إِلَى
 عَذَابِ السَّعِيرِ ④ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَأْيِكُمْ مِنَ الْبَعْثَةِ
 فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
 مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرِّبُ فِي الْأَسْرَارِ حَامِرِ
 مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مَسْمَى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْأَلَ كُمْ
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفِّي وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدَى إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
 يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَمْراضَ هَامِدَةً فَإِذَا
 أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَسَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذُوْجٍ
 بِهِيجٍ ⑤ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑥ وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةً لَا رَبِّ فِيهَا لَا وَاللَّهُ

يَعْثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⑦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ ⑧ ثُمَّ فِي عَطْفِهِ لِيُضْلَلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمةِ عَذَابَ الْعَرِيقِ ⑨
 ذُلِكَ بِسَاقَةَ مَتَيْلَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ⑩

(৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে শিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোষধের আঘাতের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুদ্ধানের ব্যাপারে সন্দিক্ষ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্যিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জয়াট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাঙ্গতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গতিবিশিষ্ট যাসেশিষ্ট থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাত্ত্বগতে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিখ অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা বৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্ষ বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জ্ঞানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সম্ভান থাকে না। তুমি জীবিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে সৃষ্টি বর্ণন করি, যখন তা সতেজ ও শ্ফীত হয়ে যাব এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উচ্চিদ উৎপন্ন করে। (৬) এতে এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সরকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৭) এবং এ কারণে যে, কিরামত অবশ্যজাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, করবে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুদ্ধিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান, প্রয়াণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দের। তার জন্য দুনিয়াতে শাফ্তনা আছে এবং কিরামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আবাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, আল্লাহ্ বাবাদের প্রতি যুক্তুম করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং কতক মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সন্তা, গুণবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে) অজ্ঞানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ পথপ্রদৰ্শকের এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে যা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩০

তার প্ররোচনার জালে পড়ে যায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথভঙ্গ, তাকে প্রত্যেক শয়তানই পথভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখে)। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লিখে দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে), সে তাকে (সংপথ থেকে) বিপর্খগার্ভী করবে এবং দোষখের আবাবের দিকে পথ দেখাবে। (অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে) লোকসকল। যদি তোমরা (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সংজ্ঞায়তা) সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হও, তবে (পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাবাবনা কর, যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বিষয়বস্তু এই) আমি (প্রথমবার) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি (কেননা, যে খাদ্য থেকে বীর্য উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুর্টয় থেকে তৈরি হয়, যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) এরপর জমাট রক্ত থেকে (যা বীর্যে ঘনত্ব ও লালিমা দেখা দিলে অর্জিত হয়) এরপর মাংসপিণি থেকে (যা জমাট রক্ত কঠিন হলে অর্জিত হয়) কতক পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্টও হয়। (এরকম গঠন, পর্যায়ক্রমে ও পার্থক্য সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই যে,) যাতে আমি তোমাদের সামনে (আমার কুদরত) ব্যক্ত করি (এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার ব্যতিকূর্ত প্রমাণ। এই বিষয়বস্তুর একটি পরিশিষ্ট আছে, যদ্বারা আরও বেশি কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই যে;) আমি মাত্তগঞ্জে যা (অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইঞ্জা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (অর্থাৎ প্রসবের সময় পর্যন্ত) রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই না, তার গৰ্ভগাত হয়ে যায়)। এরপর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (জননীর গর্ভ থেকে) বাইরে আনি। এরপর (তিনি প্রকার হয়ে যায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন পর্যন্ত সময় দেই যাতে) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (এটা বিভীতি প্রকার) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিকর্মী বয়স (অর্থাৎ ঢাক্কাত বার্ধক্য) পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে এক বন্তু সম্পর্কে জানী হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন অধিকাংশ বৃক্ষকে দেখা যায় যে, এইমাত্র এক কথা বলার পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার। এসব অবস্থাও আল্লাহ তা'আলার মহান শক্তির নির্দর্শন। এ পর্যন্ত এক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। হে সর্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি ভূমিকে ওক (পতিত) দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উন্নিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ। অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উন্নিখিত কর্মসমূহের কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উন্নিখিত বন্তুসমূহের যা কিছু সৃষ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো) একারণে যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তা হয়ঁ সম্মূর্ণ (এটা তাঁর সভাগত পূর্ণতা) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন (এটা তাঁর কর্মগত পূর্ণতা।) এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (এটা তাঁর তরঙ্গত পূর্ণতা। এই তিনটির সমষ্টি উন্নিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা ত্রয়ের মধ্যে যদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে আবিষ্কার সম্ভব হতো না) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যজীবী। এতে সামান্যও সন্দেহ নাই। এবং কবরে যাবা আছে,

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরুৎস্থিত করবেন। (এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য। অর্থাৎ উল্লিখিত সৃষ্টিসমূহ প্রকাশ করার কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই ছিল যে, আমি কিয়ামত সংষ্চিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে চেয়েছিলাম। এগুলোর সভাব্যতা উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। সুতরাং উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টির তিনিটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে সবগুলোই কারণ। তাই **بِسْبِيَّ بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** সবগুলোর আগেই সংযুক্ত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিতর্ককারীদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টকরণ অর্থাৎ অপরাকে পথভ্রষ্ট করা সহ উভয় পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে) জ্ঞান (অর্থাৎ অগ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল কিতাব (অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দ্বারা প্রদর্শন করে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) আল্লাহর পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) বিপর্যাপ্তি করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঙ্ঘনা আছে। (যে ধরনের লাঙ্ঘনাই হোক। সেমতে কতক বিপর্যাপ্তি নিহত ও কয়েদী হয়ে লাভিত হয় এবং কতক সত্যপঞ্জীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হেয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জুলন্ত আত্মের আয়াব আহাদন করাব। (তাকে বলা হবে :) এটা তোমার স্বত্ত্বকৃত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই যে আল্লাহ (তাঁর) বাক্সাদের প্রতি যুদ্ধ করেন না (সুতরাং তোমাকে বিনা অপরাধে শান্তি দেওয়া হয়নি)।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতক্ষেত্র বিষয়

এই আয়াত কষ্টের বিতর্ককারী নথর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবজীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অঙ্গীকার করত। —(মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবজীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তাঁর হকুম এ ধরনের বদ্ব্যাসমূলক প্রচ্যোক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাত্রগৰ্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা : —এই আয়াতে মাত্রগৰ্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচলিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : মানুষের বীর্য চাল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সংস্থিত থাকে। চাল্লিশ দিন পর তা জন্মাট রক্তে পরিষ্ঠিত হয়। এরপর আরও চাল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসশিখ হতে যাব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে জাতে কুকুর মূল্যে দেয়। এ সময়েই তাঁর সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয় ১. তাঁর বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিষিক পাবে, ৩. সে কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে জাগ্যবাদ হবে, অ হতজগা। —(কুকুরবী)

ଆବଦୁଲ୍ଲାହ୍ ଇବନେ ମାସଉଦେରଇ ବାଚନିକ ଏବଂ ଇବନେ ଆବୀ ହାତେଯ ଓ ଇବନେ ଜଗାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅପର ଏକ ରେଣ୍ଡାଯାଯେତେ ଆରା ବଲା ହୟେଛେ ଯେ, ବୀର୍ ସଥନ କଥେକ ତର ଅତିକ୍ରମ କରେ ମାଂସପିଣ୍ଡେ ପରିଣାମ ହୟ, ତଥନ ମାନବ ସୃତିର କାଜେ ଆଦିଷ୍ଟ ଫେରେଶତା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଆଲାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ : ୧୦୦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାଂସପିଣ୍ଡ ଦାରୀ ମାନବ ସୃତି ଆପନାର କାହାଁ ଅବଧାରିତ କି ନା ? ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ୍ର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଉତ୍ସରେ ବଲା ହୟ ତବେ ଗର୍ଭାଶୟ ମେଇ ମାଂସପିଣ୍ଡକେ ପାତ କରେ ଦେଯ ଏବଂ ତା ସୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତର ଅତିକ୍ରମ କରେ ନା । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି ଜଗାର ମଧ୍ୟରେ ବଲା ହୟ, ତବେ ଫେରେଶତା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ, ଛେଲେ ନା କନ୍ୟା, ହତ୍ତାଗା, ନା ଭାଗ୍ୟବାନ, ବରସ କତ, କି କର୍ମ କରବେ ଏବଂ କୋଥାଯା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରବେ ? ଏମର ପ୍ରଶ୍ନର ଜଗାର ତଥନଇ ଫେରେଶତାକେ ବଲେ ଦେଯା ହୟ । (ଇବନେ କାସୀର) ଗର୍ଭ ଓ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦଦୟର ଏହି ତକ୍ଷୀର ହୟରତ ଇବନେ ଆବାସ ଥେକେବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । —କୁର୍ବାବୀ)

উপরিবিত হাদীস থেকে এই শব্দয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা কোন কোন তফসীরকারক এর এরপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুস্থায় ও সুস্থম হয়, সে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে তফসীরের সার সংক্ষেপে এই তফসীরই নেওয়া হয়েছে।

—**ଅର୍ଥାଏ ଅତୁପର ମାତ୍ରଗତି ଥେକେ ତୋମାଦେରକେ ଦୂର୍ବଳ ଶିତ୍ତର ଆକାରେ ବେର କରି । ଏ ସମୟ ଶିତ୍ତର ଦେହ, ଶ୍ଵରଗଣ୍ଡି, ଦୃଷ୍ଟିଶଙ୍କି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜାନ, ନଡାଚଢ଼ା ଓ ଧାରଣଶଙ୍କି ଇତ୍ୟାଦି ସବେଇ ଦୂର୍ବଳ ଥାକେ । ଅତୁପର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଗୁଲୋକେ ଶକ୍ତିଦାନ କରା ହୁଏ ଏବଂ ପରିଶେଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କିର ତତ୍ତ୍ଵରେ ପୌଛେ ଯାଏ । —ଏର ଅର୍ଥ ତାଇ । ଶବ୍ଦଟି ଏହି ଏର ବହୁବଚନ । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଉତ୍ସତିର ଧାରା ତତ୍କଷଣ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ଥାକେ, ଯତକ୍ଷଣ ତୋମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶଙ୍କି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ନା କରେ, ଯା ଯୌବନକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରା ହୁଏ ।**

—أَرْذُلُ الْعُمَرِ—সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বৃক্ষ, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে
ক্রটি দেখা যায়। গ্রাসূলে করীয় (সা) এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রম প্রার্থনা করেছেন।
সাঁদের বাচনিক নামায়ীতে বর্ণিত আছে—গ্রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেক দোয়া অধিক পরিমাণে
করতেন এবং সাঁদ (রা)-ও এই দোয়া তাঁর সম্মানদেরকে মুর্খ করিয়ে দিয়েছিলেন।
দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرِدَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ النَّقْرَبِ -

ଆମର ଶୁଣିର ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପର ତାର ବନ୍ଦସେର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତି ଓ ଅବହାଁ : ମୁଖ୍ୟମାନେ
ଆହୁମଦ ଓ ମୁସଲମାନେ ଆବୁ ଇଯାଲାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହ୍ୟାରତ ଆନାସ ଇବନେ ମାଲେକେର ବାଚନିକ ଏକ
ରେଣ୍ଡ୍‌ଯାସେତେ ଗାସୁଲୁଜ୍‌ହାଇ (ସା) ବଲେନ : ପ୍ରାଣବସ୍ତ୍ର ନା ହେତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନଦେର ସଂକର୍ମ
ପିତା-ମାତାର ଆମନନ୍ଦମାଯ ଲିପିବକ୍ଷ କରା ହୁଯ । କୋଣ ସନ୍ତାନ ଅସଂକର୍ମ କରିଲେ ତା ତାର

নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রাখিত হয় না। প্রাণবন্ধক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হিকায়ত ও তাকে শক্তি যোগাদোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চাঁপিশ বছর বয়সে পৌছে যায়, তখন আল্লাহু তাকে উল্লাদ ইওয়া, কৃষ্ট ও ধৰণকৃষ্ট এই রোগতয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহু তাঁ'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌছলে সে আল্লাহুর দিকে ঝুঁজুর তৎক্ষীক প্রাণ হয়। স্মর বছর বয়সে পৌছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহবত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহু তাঁ'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নবই বছর বয়সে আল্লাহু তাঁ'আলা তার অগ্রগতাতের সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফায়াত করুন করেন। তখন তাঁর উপাধি হয়ে যায় 'আবিনুল্লাহ ও আবিরুল্লাহু ফিল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। (কেননা, এই সয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে)। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওম'র' তথা নিকর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তাঁর আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গুনাহ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মুসলাদে আবু ইয়ালা থেকে উন্নত করে বলেন :

هذا حديث غريب جداً وفيه نكارة شديدة
অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আগতির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন :

وَمَعْ هَذَا رِوَايَةُ الْأَمَامِ أَحْمَدَ فِي سُنْدِهِ مُوقَفًا وَمَرْفُوعًا -
ইবনে হাসল হাদীসটিকে 'মওকুফ' ও 'মরফ' উভয় প্রকারে তাঁর ঘৰে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর মুসলাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসলাদে আবু ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে।
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। এখানে মুখ কিরিয়ে নেওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۝ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ أَطْمَانَ يَهُ
وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتنَةٌ ۝ افْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ تَحْسِرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَالْأُخْرَةَ ۝ ذِلْكَ
هُوَ الْخَسْرَانُ الْبَيِّنُ ۝ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ۝

**ذلِكَ هُوَ الْبَصْلُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُو الْمَنْصُرَ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ
لِبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِبِئْسَ الْعَشِيرُ ۝**

- (১১) যানুবের মধ্যে কেউ কেউ বিধাদস্তে অভিত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কার্যেম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবহায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ভাকে, সে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ভাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত (এমনভাবে) করে (যেমন কেউ কোন বন্ধুর) কিনারায় (দণ্ডয়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চল্পট দিতে প্রস্তুত থাকে)। অতঃপর যদি সে কোন (পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বাহ্যিক) হ্রিতা সাড় করে। আর যদি সে কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মুখ তুলে (কুফরের দিকে) চল্পট দেয়। (ফলে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায়। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (কোন কোন বিপদ দ্বারা ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশাই। পরকালের ক্ষতি এই যে, ইসলাম ও (আল্লাহর পরিবর্তে সে এমন কিছু ইবাদত করছে যে, (এটাই অক্ষম ও অসহায় যে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না (অর্থাৎ ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন উপকার করার শক্তি রাখে না। বলা বাহ্যিক, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় বন্ধুর ইবাদত করা ক্ষতিই ক্ষতি।) এটা চরম পথভ্রষ্টতা। (ধখু তাই নয় যে, তার ইবাদত করলে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয়। কেননা, সে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবর্তী। এমন কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও মন্দ (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়ই কারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থাতেই তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ—বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হ্যরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সজ্ঞান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত : এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত : এই ধর্ম মন্দ। এই

শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবঙ্গীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ইমানের এক ফিনারায় দখাইয়ান আছে। ইমানের পর যদি তারা পার্থিব সুখ ও ধনসম্পদ সাংত করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাব্রহ্মণ কোন বিপদাপদ ও পেরেশানীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظْهَرُ
 أَنَّ لَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيُمْلَدُ دِبَابِ إِلَى
 السَّمَاءِ ثُمَّ لِيُقْطَعُ ۖ فَلَيَنْظُرْ هَلْ يَدْهِبُنَّ كَيْدُهُمْ مَا يَعْبُرُ ۝ وَكَذَلِكَ
 أَنْزَلْنَاهُ آيَتِ بَيْنَتٍ ۛ وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۝

(১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে জাহাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বির্বরিলীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনই ইহকাল ও পরকালে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি ব্রহ্ম আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক ; এরপর কেটে দিক ; অতঃপর দেশুক তার এই কৌশল তার আক্রমণ দূর করে কিনা। (১৬) এমনিভাবে আমি সুন্দর আয়াতক্রমে কোরআন নাখিল করেছি এবং আল্লাহ-ই যাকে ইচ্ছা হিসাবেত করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (জাহাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে বির্বরিলীসমূহ প্রবাহিত হবে। (আল্লাহ যে ব্যক্তি অথবা জাতিকে কোন সওয়াব অথবা আয়াব দিতে চান, তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। কেননা,) আল্লাহ (সর্বশক্তিমান) যা ইচ্ছা করেন, করে যান। (সত্য ধর্ম সম্পর্কে যাদের বিতর্কের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী আয়াতে তাদের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে) যে ব্যক্তি (রাসূলের সাথে বিরোধ ও কলহ করে) যন্তে করে যে, (সে জারী হবে, রাসূলের প্রচারিত দীনের উন্নতি স্তুক করে দেবে এবং) আল্লাহ তা'আলা রাসূলের (ও তাঁর দীনের) ইহকালে ও পরকালে সাহায্য করবেন না, সে একটি ব্রহ্ম আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক (এবং আকাশের সাথে বেঁধে দিক)। এরপর এই ব্রহ্ম সাহায্যে যদি আকাশে পৌছতে পারে, তবে পৌছে এই উহী বক করে দিক। (বলা বাহ্য, কেউ এক্ষণ করতে পারবে না।) এমতাবহ্য চিন্তা করা উচিত যে,

তার (এই) কৌশল (যার বাস্তবায়নে সে সম্পূর্ণ অক্ষম) তার আক্রমের হেতু (অর্থাৎ ওহী) যত্নকৃত করতে পারে কি না। আবি একে (অর্থাৎ কোরআনকে) এমনিভাবে নাখিল করেছি (এতে আমার ইচ্ছা ও শক্তি ছাড়া কারও কোন দখল নেই।) এতে সুল্পষ্ঠ প্রমাণাদি (সত্য নির্ধারণে) আছে এবং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়েত দান করেন।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—منْ كَانَ يَظْلِمُ—
সারকথি এই যে, ইসলামের পথ রক্ষকারী শক্ত চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরপ শাহদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তখনই সম্বপ্র, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবৃত্যের পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বক্ষ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা যাকে নবৃত্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রক্ষ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবৃত্যের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বক্ষ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ওহী বক্ষ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বক্ষ করে দিক। বলা বাহ্য্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া আল্লাহ তা'আলাকে ওহী বক্ষ করতে বলা মোটেই সম্ভবপ্র নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রমের ফল কি? এই তফসীর হবচ দুরবে-মনসুর ঘটে ইবনে সায়দ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর।
(বায়ানুল-কোরআন—সহজকৃত)

কুরআনী এই তফসীরকেই আবু জাফর নাহহাস থেকে উদ্ভৃত করে বলেন : এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আবুস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরপ তফসীর করেছেন যে, এখানে,—
বলে নিজ গৃহের ছাদ
বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই : যদি কোন মূর্খ শক্ত কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রমের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তাঁর ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাসি নিয়ে ঘরে যাক।—(মাযহারী)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالظَّبِيرُونَ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسِ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُواۚ قَدْ إِنَّ اللَّهَ يُفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شُعْرٌ شَهِيدٌ ۝ أَلْمَ تَرَأَّنَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَاللَّهُ وَابْنُ
 وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۝ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۝ وَمَنْ يُهِنَّ اللَّهُ فَمَا
 لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ ۝

নিজস্ব

১৮

(১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশারিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহর অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্ম এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে সাহিত করেন, তাকে কেউ সশান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমান, ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও মুশারিক এদের সবার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন (কার্যত) ফয়সালা করে দেবেন (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন)। নিচিতই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে শুয়াকিফহাল।

হে সম্মোধিত ব্যক্তি ! তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে (নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী) সবাই বিনয়াবন্ত হয়—যারা আকাশমণ্ডলীতে আছে, যারা ভূমণ্ডলে আছে এবং (সব স্তুতি জীবের আনুগত্যশীল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ পর্যায়ের জ্ঞানবৃদ্ধির অধিকারী মানব সবাই আনুগত্যশীল নয় ; বরং) অনেক মানুষও (অনুগত ও বিনয়াবন্ত হয়।) এবং অনেক মানুষ আছে, যাদের উপর আয়াব অবধারিত হয়ে গেছে। (সত্য এই যে,) যাকে আল্লাহ হেয় করেন (অর্থাৎ হিদায়েতের তওঁফীক দেন না) তাকে কেউ সশান দিতে পারে না। আল্লাহ (নিজ রহস্য অনুযায়ী) যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফির, অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দেবেন। তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কোরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ইমানদারদের জন্য চিরস্তন ও অক্ষয় মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৩১

ସୁଖଶାନ୍ତି ଆହେ ଏବଂ କାଫିରଦେର ଜନ୍ୟ ଚିରହୃଦୟୀ ଆୟାବ । ହିତୀୟ ଆୟାତେ ଜୀବିତ ଆସ୍ତାଧାରୀ ଅଥବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଓ ଉତ୍ତିଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚି ଯେ ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲାର ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ, ତା'ସିଜଦାର: ଶିରୋନାମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ମାନବ ଜ୍ଞାତିର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଣନା କରା ହେଁଯେ । ଏକ, ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ ଫରମାବରଦାର, ସିଜଦାଯ ସବାର ସାଥେ ଶରୀକ । ଦୂରେ, ଅବାଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀ ସିଜଦାର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ । ଆୟାତେ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେଁଯାକେ ସିଜଦା କରା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଁଯେ । ତଫ୍ସିରେ ତାର ସଂକ୍ଷେପେ ତାର ଅନୁଧାଦ କରା ହେଁଯେ ବିନ୍ଦ୍ୟାବନତ ହୋଇ । ଫଳେ ସୃଷ୍ଟି ଜଗତେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିକାରେ ସିଜଦା ଏଇ ଅନୁର୍ଭୁତ ହେଁଯେ ଯାବେ । କେବଳା, ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ସିଜଦା ତାର ଅବହୁ ଅନୁଧାୟୀ ହେଁଯେ ଥାକେ । ମାନୁଷେର ସିଜଦା ହଛେ ଯାଟିତେ ମନ୍ତ୍ରକ ରାଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଦୂ ସିଜଦା ହଛେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଜନ୍ୟ ତାଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରା ହେଁଯେ, ତା ଯଥାଯଥ ପାଲନ କରା ।

ସମ୍ମର ସୃଷ୍ଟ ବନ୍ଦୂ ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ ହେଁଯାର ବନ୍ଦନପ : ସମ୍ମର ସୃଷ୍ଟିଜଗଂ ମ୍ରଟୀର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ । ସୃଷ୍ଟିଜଗତେର ଏହି ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଦୂରେ ଥିବାକାର । (୧) ସୃଷ୍ଟିଗତ ବ୍ୟବହାରପନାର ଅଧୀନେ ବ୍ୟାଧ୍ୟାମୂଳକ ଆନୁଗତ୍ୟ । ମୁମିଳ, କାଫିର ଜୀବିତ, ମୃତ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କେଉ ଏହି ଆନୁଗତେର ଆପତ୍ତା-ବହିର୍ଭୂତ ନନ୍ଦ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେବେ ସବାଇ ସମଭାବେ ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲାର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ । ବିଶ୍ୱ-ଚରାଚରେର କୋନ କଥା ଅଥବା ପାହାଡ଼ ଆଶ୍ଵାହର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟାତିରେକେ ଏତ୍ତୁକୁଣ୍ଡି ନଢ଼ାଇବା କରନ୍ତେ ପାରେ ନା । (୨) ସୃଷ୍ଟ ଜଗତେର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱ-ଇଚ୍ଛାଯ ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲାର ବିଧାନାବଳୀ ଥେବେ ଚଳା । ଏତେ ମୁମିଳ ଓ କାଫିରର ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ଆହେ । ଯାରା ଆନୁଗତ୍ୟଶୀଳ ଫରମାବରଦାର, ତାରା ମୁମିଳ ଏବଂ ଯାରା ଆନୁଗତ୍ୟ ବର୍ଣନ କରେଓ ଅଧୀକାର କରେ, ତାରା କାଫିର । ଆୟାତେ ମୁମିଳ ଓ କାଫିରର ପାର୍ଦ୍ଦକ୍ୟ ବର୍ଣନ କରା ହେଁଯେ । ଏତେଇ ବୁଝା ଯାଇ ଯେ, ଏଥାନେ ସିଜଦା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ବଲେ ତୁମ୍ଭୁ ସୃଷ୍ଟିଗତ ଆନୁଗତ୍ୟ ନନ୍ଦ ; ବରଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ ବୁଝାନୋ ହେଁଯେ । ଏଥାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଁଯେ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ ତୋ ତୁମ୍ଭୁ ବିବେକବାନ ମାନୁଷ, ଜିନ ଇତ୍ୟାଦିର ମଧ୍ୟେ ହତେ ପାରେ । ଜୀବଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତିଦ ଓ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟେ ବିବେକ ଓ ଚେତନାଇ ଦେଇ । ଏମତାବହ୍ୟ ଏତୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ କିଭାବେ ହେଁ । ଏଇ ଉତ୍ସର ଏହି ଯେ, କୋରାଅନ ପାକେର ବହୁ ଆୟାତ ଓ ବର୍ଣନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଆହେ ଯେ, ବିବେକ ଚେତନା ଓ ଇଚ୍ଛା ଥେବେ କୋନ ସୃଷ୍ଟ ବନ୍ଦୂରେ ମୁକ୍ତ ନନ୍ଦ । ସବାର ମଧ୍ୟେଇ କରିବେଶି ଏତୁଲୋ ବିଦ୍ୟମାନ ଆହେ । ମାନବ ଓ ଜିନ ଜାତିକେ ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲା ବିବେକ ଓ ଚେତନା ଏକଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁର ଦାନ କରିବେଲେ । ଏ କାରଣେଇ ତାଦେରକେ ଆଦେଶ ଓ ନିଷେଧେର ଅଧୀନ କରା ହେଁଯେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟ ବନ୍ଦୂ ମଧ୍ୟେ ଏତେକେ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ପରେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଚେନା ଯାଇ । କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ବିବେକ ଓ ଚେତନା ଏତେଇ ଅଳ୍ପ ଓ ଲୁକାଯିତ ଯେ, ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ତା ବୁଝାନେ ପାରେ ନା । କିନ୍ତୁ ତାଦେର ମ୍ରଟୀ ଓ ମାଲିକ ବଲେବେଳେ ଯେ, ତାରାଓ ବିବେକ ଓ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ । କୋରାଅନ ପାକ ଆକାଶ ଓ ଭୂମିକୁ ସମ୍ପର୍କେ ବଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ—ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଵାହ ତା'ଆଲା ଆସମାନ ଓ ସମୀନକେ ଆଦେଶ କରିଲେନ : ତୋମାଦେରକେ ଆୟାର ଆଜ୍ଞାବହ ହାତେଇ ହେଁ । ଅତଏବ ହେଁ ସେହୀଯ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କର, ନା ହୁଁ

বাধ্যতামূলকভাবেই অনুগত্য থাকতে হবে। উভয়ের আসমান ও যদীম আরয করল : আমরা বেছায ও খুণিতে আনুগত্য করলাম। অন্যত পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কোরআন পাক বলে : وَإِنْ مِنْهَا لَمْ يُبْلِغْ مَنْ خَشِبَ اللَّهُ^۱ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর তরে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারম্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টি বস্তু বেছায ও সজানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—এক. মুমিন, অনুগত ও সিজদাকারী এবং দুই. কাফির, অবাধ ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তত্ত্বকীক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন。 وَاللَّهُ أَعْلَمُ

هُنَّنِ خَصْمٌ اخْتَصَسُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعْتُ لَهُمْ
شَيْءٌ مِّنْ نَّارٍ إِنْ يُصْبِبُ مِنْ فُوقِ رَعْدِهِمُ الْعَيْمِ^(১) يَصْهَرُ بِهِ مَا فِي
بَطْوَنِهِمْ وَالْجَلَودُ^(২) وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّنْ حَدِيبَيْ^(৩) كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَعْيُدِ وَأَفِيهَا كَوَافِرُ وَذُو قَوْاعِدَابُ الْحَرِيقِ^(৪)
إِنَّ اللَّهَ يُنْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ^(৫) وَهُدُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنْ
الْقُولِ^(৬) وَهُدُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ^(৭)

(১৯) এই দুই বাসী-বিবাসী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফির, তাদের জন্য আগনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের আধাৰ উপর ঝুট্ট পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) কলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চৰ্য পলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা বখন্তি ব্যক্তিগত অতিষ্ঠ হয়ে জাহানাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে : সহনশাস্তি আবাদন কর। (২৩) নিচৰ যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং

সংকর্ম করে, আল্লাহু তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্বাচিত সমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মৃত্তা ধারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২৪) তারা পথপ্রদর্শিত হয়েছিল সৎবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহুর পথপানে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

إِنَّ الَّذِينَ أَمْلأُوا^۱ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছিল) এরা দুই পক্ষ, (এক পক্ষ মুমিন অপর পক্ষ কাফির। এরপর কাফির দল করেক প্রকার—ইহুদী, খ্রিস্টান, সাবেয়ী, অগ্নিগুজারী) এরা এদের পালনকর্তা সম্পর্কে (বিশ্বাসগতভাবে এবং কোন কোন সময় তর্কক্ষেত্রেও) মতবিরোধ করে। (এই মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতে এভাবে হবে যে,) যারা কাফির, তাদের (পরিধানের) জন্য আগনের পোশাক তৈরি করা হবে (অর্থাৎ আগন তাদের সমস্ত দেহকে পোশাকের ন্যায় ঘিরে ফেলবে) তাদের মাথার উপর তীব্র ফুট্স পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যদ্যরূপ তাদের পেটের বস্তুসমূহ (অর্থাৎ অস্ত্রসমূহ) ও চর্ম গলে যাবে। (অর্থাৎ এই ফুট্স পানির কিছু অংশ পেটের ভেতর ঢেলে যাবে। ফলে অন্ত এবং পেটের অভ্যন্তরস্থ সব অঙ্গ গলে যাবে। কিছু অংশ উপরে প্রবাহিত হবে। ফলে চর্ম গলে যাবে।) তাদের (মারার) জন্য সোহার গদা থাকবে। (এই বিপদ থেকে তারা কোন সময় মুক্তি পাবে না।) তারা যখনই (দোষখে) যন্ত্রণার কারণে (অস্ত্রির হয়ে যাবে এবং) সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে : দহন-শাস্তি (চিরকালের অন্য) তোমরা আবাদন করতে থাক (কখনও বের হতে পারবে না)। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহু তাদেরকে (জান্মাতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করবেন, যাদের তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণকংকন ও মোতি পরিধান করানো হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের। (তাদের জন্য এসব পুরুষার ও সম্মান এ কারণে যে, দুনিয়াতে) তারা কালেমায় তাইয়েবার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়েছিল এবং প্রশংসিত আল্লাহুর পথের পানে পরিচালিত হয়েছিল (এই পথ ইসলাম)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَذَانَ حَصْنَمَانِ اَخْتَصَمْرَا^۲ আয়াতে উল্লিখিত দুই পক্ষ হচ্ছে সাধারণ মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফির ; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সেই দুই পক্ষ সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে, যারা বদরের রংক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুক্তে অবর্তীণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হাম্যা, ওবায়দা (রা) ও কাফিরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফির পক্ষে তিনজনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হাম্যা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা গুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পায়ের কাছে প্রাণ ত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সপ্তু যোকাদের সম্পর্কে অবর্তীণ হয়েছে, তা বুধারী ও মুসলিমের হাদীস ধারা

প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যত এই হকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উচ্চতর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যে কোন যমানার উপর হোক না কেন।

জান্নাতীদের কংকন পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দৃষ্টিগোচর মনে করা হয়। উভর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি বাত্তস্ত্রযুক্ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পাচাঙ্কাবলে বের হয়েছিল। আল্লাহর হকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুতে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উচ্চার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ওয়াদী দেন যে, পারস্য সন্ত্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলক্ষ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হয়রত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সন্ত্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সুরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সুরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন : জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে—স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। —(কুরআনী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহ্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হয়রত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে : জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। —(মাযহারী)

ইমাম নাসায়ী হয়রত আবু হুয়ায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة ثم قال رسول الله ﷺ لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শব্দ পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বক্ষিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে হর্ষ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অভৎপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : এই বস্তুত্ত্বয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। —(কুরআনী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বক্ষিত থাকবে। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শব্দপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বক্ষিত হবে। —(কুরআনী)

অন্য এক হাস্তিসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :
مِنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ دَخْلُ الْجَنَّةِ
لِبْسُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبِسْهُ هُوَ -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে ; কিন্তু সে পরিধান করতে পারবে না। —(কুরআনী)

এখানে সম্মেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্তু থেকে বক্ষিত রাখলে তার মনে দৃঢ়থ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দৃঢ়থ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বক্ষিত করায়ও কোন উপকারিতা নেই। কুরআনী এর চর্চকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন : জান্নাতীদের স্থান ও ত্তরে বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের ত্তরে এবং কেউ নিম্ন ত্তরে থাকবে। ত্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছু পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। *وَاللَّهُ أَعْلَمُ*

হযরত ইবনে আকবাস বলেন : এখানে কালেমায়ে তাইয়েবা সা-ইলাহা ইলাহাহ বুঝানো হয়েছে। —(কুরআনী) বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرِدُ فِيهِ
بِالْحَاجَةِ بِظُلْمٍ ثُنِقُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
(৫)

(২৫) যারা কুকুরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, তাকে আমি প্রত্যুত্ত করেছি হামীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমজাবে এবং যে মসজিদে হামামে অন্যান্যভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আহাদন করাব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচয় যারা কাফির হয়েছে এবং (মুসলমানদেরকে) আল্লাহর পথে এবং মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয় (যাতে মুসলমানরা ওমরাহ প্রত পালন না করতে পারে ; অথচ হেরেম শরীফে কারও একচেটুয়া অধিকার নেই ; বরং) আমি একে সব মানুষের জন্য রেখেছি। এতে সবাই সমান-এর সীমানায় বসবাসকারীও (অর্থাৎ যারা হামীয়) এবং বহিরাগত (মুসাফির) ও, এবং যে কেউ এতে (অর্থাৎ হেরেম শরীফে) অন্যান্যভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আহাদন করাব।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে মুঝেন ও কাফির দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোন কোন কাফির এমনও আছে, যারা নিজেরা গোবরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানায় ছিল না। ফলে কোনোরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না। বরং এসব জ্ঞানগা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে (অর্থাৎ গোটা হেরেম শরীফে) কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করবে ; যেমন মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেয়া অথবা অন্য কোন ধর্মবিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি আহাদন করানো হবে ; বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে যুক্ত অর্থাৎ শিরকও মিলিত থাকে। মুক্তির মুশ্রিকদের অবস্থা উদ্ধৃপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিঙ্গ ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্ত ও সর্বকালে হারাম, চূড়ান্ত অপরাধ ও শান্তির কারণ ; কিন্তু যারা এরপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশেষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

سَبِيلُ اللَّهِ — يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (অ্যাল্লাহর পথ) বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই ; অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَصَدُوقُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : এটা তাদের দ্বিতীয় শুনাই। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে-হারাম' এই মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহর চতুর্পার্শে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেখন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে :

ତକ୍ଷାରେ ଦୂରରେ-ମନ୍ସୁରେ ଏ ହୁଲେ ହୟରତ ଇବନେ ଆକାଶ ଥିକେ ବର୍ଣନା କରା ହେଯେଛେ ଯେ, ଆୟାତେ ମସଜିଦେ-ହାରାମ ବଲେ ହେରେଯ ଶରୀଫ ବୁଝାନୋ ହେବେ ।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের তিক্রিকর্ম পালন করা হয়—যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দুর্বরের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার, সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুয়দালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তি বিশ্বের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কথনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উচ্চত ও ফিকাহবিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফিকাহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকাহবিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশ্বের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ত্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয়। ইয়রত উমর ফারক (রা) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে ভেঙ্গানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আজম আবু হানীফা (র) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত অনুযায়ী। (কুহল মা'আনী) ফিকাহ প্রস্তুত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবক্তব্য সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

—অভিধানে এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া।
এখানে 'ঐহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্র মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ ও আশ্লাহ্র নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হয়রত আতা বলেন : 'হেরেমে ঐহাদ' বলে এহ্রাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ—এমন কোন কাজ করাকে বনানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার

করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তৃল করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই শুনাই এবং আখ্যাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই, মুক্তির হেরেমে সৎ কাজের সওয়াব যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি পাপ কাজের আখ্যাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়। —(মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এন্ডপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়। কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক ইচ্ছা করলেই শুনাই লিখা হয়। কুরআনী এই তফসীরই হযরত ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশদ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হজ্জ করতে গেলে দু'টি তাঁবু স্থাপন করতেন—একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, যানুষ ক্লেধ ও অস্ত্রষ্টির সময় **كَلَوْاْ وَاللّٰهُ بَلِيَّ وَاللّٰهُ** অথবা **ইত্যাদি** যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে ‘**এলহাদ**’ করার শামিল।—(মাযহারী)

وَإِذْ بُوَانًا لِابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْعًا وَطَهْرٌ
 بَيْتِي لِلظَّاهِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكِعِ السُّجُودُ^(২৬) وَأَذْنُ فِي النَّاسِ
 بِالْحِجَّ يَا تُوْلِكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِيَّاتِينَ مِنْ كُلِّ فِيْجِ عَمِيقٍ^(২৭)
 لِيَشْهَدُ وَامْنَافَهُ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَوَاتِ اللَّهِ فِي أَيْمَانِ مَعْلُومٍ
 عَلَى مَارَازَفَهُو مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا
 الْبَلِيلَسَ الْفَقِيرَ^(২৮) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُ وَلِيَوْفُوا نَدْوَسَهُ
 وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ^(২৯)

(২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বাবুল্লাহর হান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পরিত্র রাখ তওয়াককারীদের জন্য, নামাযে দওয়ায়মানদের জন্য এবং কুরু-সিজদাকারীদের জন্য। (২৭) এবং যানুষের মাঝেরেফুল কুরআন (৬৭) — ৩২

হজ্জের জন্য ঘোষণা থাকার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তার দেওয়া চতুর্পদ জরু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দূর অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) এরপর তারা যেন দৈহিক যয়লা দূর করে দেয়, তাদের পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওয়াক করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ ঘটনা স্মরণ করুন) যখন আমি ইবরাহীম (আ)-কে কাবা গৃহের স্থান বলে দেই (কেননা, তখন কা'বাগৃহ নির্মিত ছিল না এবং আদেশ দেই) যে (এই গৃহকে ইবাদতের জন্য তৈরি কর এবং এই ইবাদতে) আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। (প্রকৃতপক্ষে একথা তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। বায়তুল্লাহ নির্মাণের সাথে শিরক নিষিদ্ধ করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায এবং এর তওয়াক থেকে কোন মূর্খ যেন একথা না বুঝে যে, এটাই মাবূদ।) এবং আমার গৃহকে তওয়াক করার এক কারণ এটাও যে, বায়তুল্লাহ-সিজদাকারীদের জন্য (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে) পবিত্র রাখ [এটাও প্রকৃতপক্ষে অপরকেও শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। ইবরাহীম (আ) দ্বারা এর বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গবনাই ছিল না।] এবং ইবরাহীম (আ)-কে আরও বলা হলো যে,) মানুষের মধ্যে হজ্জের (অর্থাৎ হজ্জ ফরয হওয়ার) ঘোষণা করে দাও। (এই ঘোষণার ফলে) তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ তোমার এই পবিত্র গৃহের আভিন্নায়) চলে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দূরত্বের কারণে পরিব্রান্ত) উটের পিঠে সওয়ার হয়েও, সে উটগুলো দূর-দূরান্ত থেকে পৌছবে। (তারা এজন্য আসবে) যাতে তারা তাদের (ইহলোকিক) কল্যাণের জন্য উপস্থিত হয়। (পারলৌকিক কল্যাণ তো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ; যদি ইহলৌকিক কল্যাণও উদ্দেশ্য হয়, যেন ক্রয়-বিক্রয়, কোরবানীর গোশত প্রাপ্তি ইত্যাদি, তবে তাও নিম্ননীয় নয়।) এবং (এজন্য আসবে, যাতে) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে (কোরবানীর দিন দশ থেকে বারই যিলহজ্জ পর্যন্ত) সেই বিশেষ চতুর্পদ জরুগুলোর উপর (কোরবানীর জরু যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ)-কে বলার বিষয়বস্তু শেষ হয়েছে। অতঃপর উহুতে মুহার্দীকে বলা হচ্ছে) তা থেকে (অর্থাৎ কোরবানীর জরুগুলো থেকে) তোমরাও আহার কর (এটা জাহেয এবং মুস্তাহাব এই যে,) দুঃখী অভাবগ্রস্তকেও আহার করাও। এরপর (কোরবানীর পর) তারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছিন্নতা দূর করে দেয় (অর্থাৎ ইহরাম শুলে মাথা মুণ্ডায়,) ওয়াজিব কর্মসমূহ (মানত দ্বারা কোরবানী ইত্যাদি ওয়াজিব করে থাকুক কিংবা মানত ছাড়াই হজ্জের যেসব ওয়াজিব কর্ম আছে, সেগুলো সব) পূর্ণ করে এবং এই নিরাপদ ও সংরক্ষিত গৃহের (অর্থাৎ বায়তুল্লাহর) তওয়াক করে। (একে তওয়াকে-যিয়ারত বলা হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর আগের আয়তে মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীকে প্রবেশের পথে বাধাদানকারীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর সাথে সম্পর্ক রেখে এখন বায়তুল্লাহর বিশেষ ফরাইলত ও মাহাঞ্জ বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের দুর্কর্ম আরও অধিক ফুটে উঠে।

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা : **وَأَذْبُونَا لِنَرَأِيْمْ مَكَانَ الْبَيْتِ** অভিধানে **بُلْ** শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়তের অর্থ এই : একথা উল্লেখযোগ্য ও শর্তব্য যে, আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। **بُلْ** শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আ)-কে পুঁথিরীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আ) ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতেন। নৃ (আ)-এর তুকানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয় : **أَنْ شَرِكْنَ بِنِ شَبْنَ** অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহ্য, হযরত ইবরাহীম (আ) শিরুক করবেন, একেপ কল্পনাও করা যায় না। তার মৃত্যি সংহার, মৃশিরিকদের মুকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরুক না করে। দ্বিতীয় আদেশ একেপ দেওয়া হয়, আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না ; কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ডে সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মৃত্যি হ্যাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মৃত্যির পুঁজা করত।—(কুরতুবী) এটাও সত্ত্বপূর্ব যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুকর ও শিরুক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আ)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ ইবরাহীম (আ) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসন্ত্বেও যখন তাকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই : **وَأَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْمَعْجَنْ** অর্থাৎ মানুষের অধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ্জ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে। —(বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরম্ভ করলেন ; এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রাণীর। ঘোষণা

শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে ? আল্লাহ তা'আলা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আ) মাকামে-ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবু কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডালে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন : ‘লোকসকল ! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।’ এই রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয় ; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়। যার যার ভাগে আল্লাহ তা'আলা হজ্জ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে **بِئْبَكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْقَ** বলেছে অর্থাৎ হাযির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আকাস বলেন : ইবরাহীমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হজ্জে ‘লাক্বায়কা’ বলার আসল ভিত্তি। —(কুরআনী, মাযহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আ)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে **إِنَّ رَجُلًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَسِيقٍ**, অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যক্ষ এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে ; কেউ পদত্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরাত্ম দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জল্লগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহর পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাদের উন্নতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা (আ)-এর পর যে সুনীর্ধ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মৃত্তিপূজায় লিঙ্গ থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত ছিল।

بِئْبَكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْقَ অর্থাৎ দূর-দূরাত্ম পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে **بِئْبَكَ** শব্দটি **بِئْ** ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই ; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় দ্বয়ং বিশ্য়কর যে, হজ্জের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটমা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেখন বিয়ে-শান্তি, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্নত দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তা'আলা হজ্জ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দরিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায়

ব্যয় করলে দরিদ্র ও অভাবপ্রত্তুতা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক ; তন্মধ্যে নির্মে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোন অংশে কম নয়। আবু হুয়ায়রার এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ'র জন্য হজ্জ করে এবং তাতে অশ্রীল ও গুসাহর কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মাঝের গর্ভ থেকে বের হয়েছে ; অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সে-ও জন্মপই হয়ে যায়। —(বুখারী, মুসলিম-মাযহারী)

বায়তুল্লাহ'র কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। হিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقْتَهُمْ مِّنْ بَهِبَةِ الْأَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ'র নাম উচ্চারণ করে সেই সব জন্মুর উপর, যেগুলো আল্লাহ' তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত ; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ'র যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্মুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কোরবানীর গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়মিত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বুকানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয় ; অর্থাৎ যিলহজ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। এর অর্থ ব্যাপক ; ওয়াজিব হোক কিংবা মৃত্যুবাহ সব রকম কোরবানী এর অস্তর্ভুক্ত।

إِنَّمَا فَكَلُونَ حَلَالًا مِّنْهَا এখানে ফ্লক্লুন শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয় ; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা ; যেমন কোরআনের وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْنَطِلُو! আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাস 'আলা : হজ্জের মওসুমে যঙ্গা মুয়ায়মায় বিভিন্ন প্রকার জন্মু যবেহ করা হয়। কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্মুর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে ; যেমন কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোন জন্মুর কোরবানী ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোন জন্মুর পরিবর্তে কোন্ ধরনের জন্মু কোরবানী করতে হবে, তার বিজ্ঞারিত বিবরণ ফিকার গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহুরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেন্ট কোন কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্মু কোরবানী করার কোরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কোরবানীকে 'দমে-জিনায়াত' (ক্রিটিজনিত কোরবানী) বলা হয়। কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কোরবানী করা জরুরী হয়, কোন কোন কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজের জন্য কোরবানী ওয়াজিব হয় না, তবে সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। অধমের বি঱চিত 'আহকামুল-হজ্জ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রিটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কোরবানী ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় ; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকীনদের হক। অন্য কোন ধর্মী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েয়

নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত। কোরবানীর অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর মাংস কোরবানীকারী নিজে, তার আঙ্গীয়-স্বজন, বস্তু-বাস্তব ধর্মী হলেও খেতে পারে; হানাফী, শালেকী ও শাফেয়ীদের মতে “তামাস্তু ও কেরানের” কোরবানীও ওয়াজিব কোরবানীর অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কোরবানীই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ প্রস্তুত দ্রষ্টব্য। সাধারণ কোরবানী এবং হজ্জের কোরবানীসমূহের গোশ্ত কোরবানীকারী নিজে ও ধর্মী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মুসলমান খেতে পারে। কিন্তু কমপক্ষে গোশ্তের তিনি ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকীনকে দান করা মুস্তাহাব। এই মুস্তাহাব আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে: **فَقِيرٌ أَبْشِرُوا بِأَسْسٍ وَأَطْعِمُوا بَاسْ** — الْبَاشْ أَفْقِيرٌ

উদ্দেশ্য এই যে, কোরবানীর গোশ্ত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মুস্তাহাব ও কাম্য।

لَيْقَنْتُمْ مِّنْ لِقَانِمُونَ

এর আভিধানিক অর্থ যয়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহুম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো কাটা, উপড়ানো, নখকাটা, সুগকি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে যয়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাঞ্ছ হলে দেহের যয়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহুম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে ইহুম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ একে করলে তাকে ক্রটি জনিত কোরবানী করতে হবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ক্রমের তৃতীয়টি : হজ্জের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রম কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকাহবিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রম অনুযায়ী হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব ইওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ক্রটিজনিত কোরবানী ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে সওয়াব ত্রাস পায়, কোরবানী ওয়াজিব হয় না। হয়রত ইবনে আবাসের হাদীসে আছে :

من قدم شيئاً من نسك أو اخره فليهرق دما

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনটিকে অগ্রে অথবা পচাতে নিয়ে যায়, তার উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাবীও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাইদ ইবনে জুবায়ির, কাতাদাহ, নখয়ী ও হাসান বসরীর মাযহাবও তাই। তফসীরে মাযহাবীতে এই মাস'আলার পূর্ণ বিবরণ ও বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া হজ্জের অন্যান্য মাস'আলাও বর্ণিত হয়েছে।

وَلَيُؤْفَنُ نَذْرُهُمْ — ন্যূনতর বছবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে আমি এ কাজ করব অথবা আগ্রাহ ওয়াস্তে আমার জন্য এ কাজ করা জরুরী, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা

ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি শুনাই ও নাজায়েখ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন শুনাই কাজের মানত করে, তবে সেই শুনাইর কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয় ; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফকারা আদায় করা জরুরী হবে। আবু হানীফা (র) প্রমুখ ফিকাহবিদদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত আভীয় হওয়াও শর্ত ; যেমন নামায, রোয়া, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোয়া, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিন্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়ত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাস 'আলা : স্বীর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মাযহারীতে এছলে নয়র ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে, যা খুবই শুন্তু পূর্ণ কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও জওয়াব : এই আয়তে পূর্বেও হজ্জের ত্রিয়াকর্ম, তথা কোরবানী ও ইহুরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে-যিয়ারত-এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে ; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ্জ, হজ্জ ছাড়াও, হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোন দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়তসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি ?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজ্জের দিন, হজ্জের ত্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজ্জের ত্রিয়াকর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজ্জের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সংকাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্ম কোরবানীর মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হয়রত ইবনে আকবাস এখানে মানতের অর্থ কোরবানীর মানতই করেছেন। হজ্জের বিধানের সাথে মানতের আরও একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়—এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েখ নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েখ হয়ে যায়, তেমনিভাবে হজ্জের ত্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই করয হয় ; কিন্তু হজ্জও ওমরার ইহুরাম বাঁধার কারণে সব ত্রিয়াকর্ম তার উপর করয হয়ে যায়। ইহুরামের সব বিধান প্রায়শ এমনি ধরনেই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, মূল মুগানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েখ কাজ নয় ; কিন্তু ইহুরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হয়রত ইকরামা (রা) এ স্থলে মানতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজ্জের ওয়াজিব কর্মসমূহ বুঝানো হয়েছে যেগুলো হজ্জের কারণে তার উপর জরুরী হয়ে যায়।

—وَلِيَطْوُفُوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ —এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যিয়ারত বুঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কক্ষের নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্জের

দ্বিতীয় রোকন ও ফরয়। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যিয়ারতের পর ইহুরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহুরাম খুলে যায়। —(রহুল মাঝানী)

ତକ୍ଷୀରେ-ମାୟହାରୀତେ ଏ ସ୍ଥଳେ ତୁଗ୍ରାଫେର ବିଜ୍ଞାରିତ ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହେଯେଛେ, ଯା ଶୁଦ୍ଧି ଶୁରୁତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ଧାବନଯୋଗ୍ୟ ।

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الْهُنَادِ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَحِلَّتْ
لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَقَّى عَلَيْكُمْ فَإِنْ جَعَلْتُمُوا الرِّجْسَ مِنَ
الْأَوْثَانِ وَاجْتَنَبْتُمُوا قَوْلَ الرَّزُّوْرِ ۝ حُنَفَاءُ اللَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ
يَهُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الظَّيْرُ
أَوْ تَهُوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٌ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَارِ
اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ نَّقْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمُ فِيهَا مَا نَافَعَ إِلَى أَجْلٍ مُّسَعًّى
ثُمَّ مَعِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

(৩০) এটা অবগত্যোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্য উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্য চতুর্পদ জন্ম হালাল করা হয়েছে। সূতরাং তোমরা মৃত্যুদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (৩১) আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সাথে শরীক সা করে ; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল ; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে হেঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিকেপ করল। (৩২) এটা অবগত্যোগ্য। কেউ আল্লাহর সাময়িক ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার জন্মদের

আল্লাহত্তিথিসৃত । (৩৩) চতুর্পদ জন্মসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে । অতঃপর এগলোকে পৌছতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ কথা তো হলো (যা ছিল হজ্জের বিশেষ বিধান।) এবং (এখন অন্যান্য সাধারণ বিধি-বিধান শোন, যাতে হজ্জ এ হজ্জ ছাড়া অন্যান্য মাস'আলাও আছে) যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলার সম্মানযোগ্য বিধি-বিধানকে সম্মান করে, তা তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে উত্তম । (বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন করা এবং বিধি-বিধান পালনে যত্নবান হওয়াও বিধি-বিধানের সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহর বিধি-বিধানের সম্মান তার জন্য উত্তম এ কারণে যে, এটা আয়ার থেকে মুক্তির উপকরণ এবং চিরহায়ী সুখের সামগ্রী ।) কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া, যা তোমাদেরকে (সূরা আল'আমের *مَنْ يُحْرِمْ أَوْحَى إِلَيْهِ فَيُبَأِ* আয়াতে) পড়ে শোনানো হয়েছে (এই আয়াতে হারাম জন্মসমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, উহা ব্যতীত অন্যান্য চতুর্পদ জন্মকে) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে । (এখানে চতুর্পদ জন্মদের হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার, কারণ এই যে, ইহুম অবস্থায় চতুর্পদ জন্মও নিষিদ্ধ । আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার মাধ্যমেই যখন ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সীমিত, তখন) তোমরা মৃত্যুদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক । (কেননা, মৃত্যুদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করা প্রকাশ্য বিদ্রোহ । এ হলো শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে এ কারণে হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা তাদের হজ্জের 'লাক্বায়কা'র সাথে শরীক হাশ্রিকা হোক । বাক্যটিও যোগ করে দিত ; অর্থাৎ সেই মৃত্যুগুলো ছাড়া আল্লাহর কোন শরীক নেই ; যেগুলো ব্যাং আল্লাহরই ।) এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক ; (বিশ্বাসগত মিথ্যা হোক ; যেমন মুশরিকদের শিরকের বিশ্বাস কিংবা অন্য প্রকার মিথ্যা হোক ।) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তার সাথে শরীক না করে এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে (তার অবস্থা এমন,) যেন সে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর পাখিরা তাকে টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল । একথাও (যা ছিল একটি সামগ্রিক নীতি) হয়ে গেল এবং (এখন কোরবানীর জন্মদের সম্পর্কে একটি জরুরী কথা শুনে নাও) যে ব্যক্তি আল্লাহর ধর্মের (উপরোক্ত) স্মৃতিসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তবে তার এই সম্মান আস্তরিকভাবে আল্লাহকে ভয় করা থেকে অর্জিত হয় । (স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে কোরবানী সম্পর্কিত ঘোদায়ী বিধানাবলীর অনুসরণ বুঝানো হয়েছে ; যবেহ করার পূর্বের বিধানাবলী হোক কিংবা যবেহ করার সময়কার হোক ; যেমন জন্মুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা কিংবা যবেহের পরবর্তী বিধানাবলী হোক ; যেমন কোরবানীর গোশ্ত খাওয়া না খাওয়া । যে কোরবানীর গোশ্ত যার জন্য হালাল, সে তা খাবে এবং যে কোরবানীর গোশ্ত যার জন্য হালাল নয়, সে তা খাবে না । এসব বিধানের কতিপয় ধারা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু এখন করা হচ্ছে । তা এই যে,) এগলো থেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য জায়েয (অর্থাৎ শরীয়তের নীতি অনুযায়ী চতুর্পদ জন্মগুলোকে মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩৩

কাঁবাৰ অম্য উৎসর্গ কৰা পৰ্যন্ত তোমৰা এগলো থেকে দুধ, সওয়াৰী, পৰিষহন ইত্যাদি
কাজ নিতে পাৰ। কিন্তু যথম এগলোকে কাঁবা ও হচ্ছ অথবা তোমৰার অম্য উৎসর্গ কৰা
হৈবে, তখন এগলোকে কাজে লাগানো আয়ো নহয়। এৱপৰ (অৰ্ধাৎ উৎসর্গিত হওয়াৰ
পৰ) এগলোৰ যবেহু হালাল হওয়াৰ ছান মহিমাৰিত গৃহেৰ নিকট (অৰ্ধাৎ সম্পূৰ্ণ হেণ্ডেম।
হেণ্ডেমেৰ বাইৰে ঘবেহু কৰা যাবে না)।

आमेरिक आठवा विधान

ପ୍ରାଚୀନ କ୍ଷମତା ବଳେ ଆଶ୍ରାହର ମିର୍ଦ୍ଦାରିତ ସମାନଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟାଦି ଅର୍ଥାଏ ଶରୀଯତେର ବିଧାନାବଳୀ ଦୁଆମୋ ହେଲେ । ଏହଳେର ସମାନ ତଥା ଏହଳେ ମଞ୍ଜିକିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ରମ କରା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେ ଶୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭେର ଉପାୟ ।

— أَمْلَأْتُ لَكُمُ الْأَنْسَامَ إِلَيْكُمْ —
বিলে উট, গুড়, ছাগল, মেৰ, দূধা ইত্যাদি
বৌকানো হয়েছে। এগুলো ইহুমাম অবস্থায়ও হালাল। । বাকে যেসব জনুর
বাতিল্য উপরে করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ যৃত জনুর,
যে জনুর উপর আলাদুর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিন্তু যে জনুর উপর অনেকের নাম
উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্ববহুয় হামাম-ইহুমাম অবস্থায় হোক কিন্তু ইহুমামের
বাহিরে।

এখন শব্দটি হাঁটু হিসেবের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা। ফাজিল্বের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা, যেকের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা—**فَاجْتَبِرُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْغَانِ** বাহুচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রত বলা হয়েছে। কারণ এয়া মানুষের অস্তরকে শিরকের অপবিত্রতা দাও পূর্ণ করে দেয়।

—এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল
ও মিথ্যাভূত। শিরক ও কৃফরের বিদ্বাস হোক কিংবা পারম্পরিক সেনদেল ও সাক্ষ
প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। মাসুম্মাহ (সা) বলেন : বৃহত্তম কর্তীরা গুণাদৃ এগুলো :
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ দেওয়া এবং
সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ কে বার বার উচ্চারণ
করেন।—(বুখারী)

— قَمْنِيْلُ شَعَانِر — এর বহুচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে বিষয়কে কোন বিশেষ মায়দার অর্থবা সম্বলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার শুভারণের পরিভাষায় বে যে বিধানকে সুসংজ্ঞান ইঙ্গীয় আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে ‘শায়ারে-ইসলাম’ বলা হয়। যাজের অধিকাংশ বিধান অনুপরই।

অর্থাৎ আলাহুর আলামতসমূহের প্রতি স্বাক্ষর প্রদর্শন আঙ্গুরিক
আলাহুজ্জিতির স্পর্শ। যার অন্তরে ভাকওয়া ও আলাহুজ্জিতি থাকে, সেই এগুলোর প্রতি
স্বাক্ষর প্রদর্শন করতে পারে। এগে বুখা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাধেই ভাকওয়ার
স্পর্শ। অন্তরে আলাহুজ্জিতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিসংক্ষিত হয়।

অর্থাৎ চতুর্পদ জন্ম থেকে দুধ, সওদারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্ব অকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য শুধু পর্যবেক্ষণ হালাপ, যে পর্যবেক্ষণ

একলোকে হেরেম শব্দীকে যবেহ করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ্জ অধিবী ওপরাকারী ব্যক্তি যবেহ করার জন্য যে জরু সাথে লিয়ে আয়, তাকে হানী বলা হয়। যখন কোন জরুকে হেরেমের হানী ইত্বার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ করা বিশেষ কোন অপারকতা ছাড়া আয়ে নয়। বদি কেউ উটকে হানী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জরু না থাকে এবং পারে হাঁটা তার জন্য পুরুই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে একল অপারকতার কারণে সে হানীর উটে সওয়ার হতে পারে।

(সহানিত গৃহ) بِيَتْ مَبْيَقٍ نَّمَّ مَحْلِبًا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (সহানিত গৃহ) বলে সম্পূর্ণ হেরেম বুআনো হয়েছে। হেরেম বায়তুল্লাহরই বিশেষ আভিষ্মা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে ‘যসজিমে-হারাম’ বলে হেরেম বুআনো হয়েছে। مَحْلِبٌ অর্থাৎ মেরাদ পূর্ণ ইত্বার স্থান। এখানে যবেহ করার জান বুআনো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হানীর জরু যবেহ করার জান বায়তুল্লাহর সন্নিকট অর্থাৎ সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বুখা পেল যে, হেরেমের ভিতরে হানী যবেহ করা জরুরী, হেরেমের বাইয়ে আয়ে নয়। হেরেম যিনার কোরবানগাহও হতে পারে, যেকা যুকারমার অন্য কোন জানও হতে পারে। — (জহল-যা'আনী)

وَلَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكَنًا يَنْكُرُوا السُّمَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِمْسَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرُ
الْمُخْدِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقْبِضِي الصَّلَاةِ ۖ دَوْمًا مَرْزَقُهُمْ يَنْفِقُونَ ۝
وَالْبُدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَارِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَإِذَا كُرِبُوا
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَزَ ۖ كَذَلِكَ سَعَرُونَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
شَكُرُونَ ۝ لَئِنْ يَنْأَلَ اللَّهَ لَحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ
يَنْأَلُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۖ كَذَلِكَ سَعَرَهَا لَكُمْ لَشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَاهَدِكُمْ ۖ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৩৪) আমি প্রত্যেক উচ্চতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর সেরা চতুর্পদ জন্ম যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং তাঁরই আজ্ঞাধীন থাক এবং বিনয়গণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহর নাম শরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে দৈর্ঘ্যধারণ করে এবং যারা নামায কার্যে করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কা'বার জন্য উৎসর্গিত উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যত্ব নির্দেশ করেছি। এতে তোমাদের জন্য যদ্যল রয়েছে। সুতরাং সারিবজ্ফভাবে যাধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাঞ্জা করে না তাকে এবং যে যাঞ্জা করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বর্ণিত্ব করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর পোশ্চত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না; কিন্তু পৌছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহুর ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শক করেছেন। সুতরাং সর্বকর্মশীলদের সুসংবাদ শনিয়ে দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে হেরেয-শরীফে কোরবানী করার যে আদেশ বর্ণিত হয়েছে, এতে কেউ যেন মনে না করে যে, আসল উদ্দেশ্য হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অকৃতপক্ষে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সশান ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যবেহকৃত জন্ম ও যবেহর স্থান এর উপায় মাত্র এবং স্থানের বিশেষত্ব কোন কোন রহস্যের কারণে। যদি এই বিশেষত্ব আসল উদ্দেশ্য হতো, তবে কোন শরীয়তেই তা পরিবর্তন হতো না। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তন সবারই জানা। তবে আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য, এটা সব শরীয়তে সংরক্ষিত আছে। সেমতে) আমি (যত শরীয়ত অভিক্ষিণ হয়েছে, তাদের) প্রত্যেক উচ্চতের জন্য কোরবানী নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুর্পদ জন্মদের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (সুতরাং এই নাম উচ্চারণ করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল)। অতএব (এ থেকে বুঝা গেল যে,) তোমাদের উপাস্য একই আল্লাহ (যাঁর নাম উচ্চারণ করে নৈকট্য লাভের আদেশ সবাইকে করা হতো)। সুতরাং তোমরা সর্বান্তকরণে তাঁরই হয়ে থাক (অর্থাৎ খাঁটি তওহীদপন্থী থাক, কোন স্থান ইত্যাদিকে আসল সশানাঈ মনে করে শিরকের বিন্দু পরিমাণ নামগন্ধ নিজেদের আমলে প্রবিষ্ট হতে দিও না।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা), যারা আমার এই শিক্ষা অনুসরণ করে] আপনি (আল্লাহর বিধানাবলীর সামনে) মন্তক নতকারীদেরকে (জাগ্রাত ইত্যাদির) সুসংবাদ শনিয়ে দিন। যারা (এই খাঁটি তওহীদের বরকতে) এমন যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর (বিধানাবলী, গুণাবলী, ওয়াদা ও সতর্কবাণী) শরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর ভীত হয় এবং যারা বিপদাপদে

সবৱ কৱে এবং যারা নামায কায়েম কৱে এবং যারা আমি যা দিয়েছি, তা থেকে (আদেশ ও তওঁকীক অনুযায়ী) বায় কৱে (অর্থাৎ খাটি তওঁহীন এমন বৱকতময় যে, এর বাদোলতে মানসিক, দৈহিক ও আর্থিক উৎকৰ্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। এমনিভাবে উপরে আল্লাহর নির্দেশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে কোন কোন উপকার স্বাত নিষিদ্ধ বলে জানা গেছে। এ থেকেও সন্দেহ কৱা উচিত নয় যে, কোরবানী আসল সঞ্চার্জ। কেননা, তা দ্বারাও আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য। বিশেষভাবে তাঁর একটি পত্র মাঝে। সুতরাং) কোরবানীর উট ও গরুকে (এমনিভাবে ছাগল-ভেড়াকে) আমি আল্লাহর (ধর্মের) সৃতি কৱেছি (এ সম্পর্কিত বিধানবলীর জ্ঞানার্জন ও আমল দ্বারা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ধর্মের সম্মান প্রকাশ পায়। আল্লাহর নামে উৎসর্গিত জন্মু দ্বারা উপকৃত ইওয়ার ব্যাপারে ক্রপক মালিকের মতামত অঙ্গাহ্য হলে তাঁর দাসত্ব এবং সত্যিকার মালিক আল্লাহর উপাস্যতা প্রকাশ পায় এবং এই ধর্মীয় রহস্য ছাড়া) এসব জন্মুর মধ্যে তোমাদের (আরও) উপকার আছে (যেমন পার্থিব উপকার নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো এবং পারলৌকিক উপকার সওয়াব।) সুতরাং (যখন এতে এসব রহস্য আছে, তখন) এগুলোর উপর দণ্ডয়মান অবস্থায় (যবেহ কৱার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ কৱ। (এটা শুধু উটের জন্যে বলা হয়েছে। কারণ, উটকে দণ্ডয়মান অবস্থায় যবেহ কৱা উভয়। কারণ এতে যবেহ ও আজ্ঞা নির্গমন সহজ হয়। সুতরাং এর ফলে পারলৌকিক উপকার অর্থাৎ সওয়াব অর্জিত হলো এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পেল। কেননা, তাঁর নামে একটি প্রাণের কোরবানী হলো। ফলে তিনি যে স্তুষ্টি এবং এটা যে সৃষ্টি, তা প্রকাশ কৱে দেয়া হলো।) অতঃপর যখন উট কাত হয়ে পড়ে যায় (এবং ঠাণ্ডা হয়ে যায়), তখন তা থেকে তোমরাও খাও এবং আহার কৱাও যে যাঞ্চা কৱে, তাকে এবং যে যাঞ্চা কৱে না, তাকে (এরা বাস্স ফির এর দুই প্রকার। এটা পার্থিব উপকারও।) এমনিভাবে আমি এসব জন্মুকে তোমাদের অধীন কৱে দিয়েছি (তোমরা দুর্বল এবং তাঁরা শক্তিশালী। অতদসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে এভাবে যবেহ কৱতে পার), যাতে তোমরা (এই অধীন কৱার কারণে আল্লাহ তা'আলার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কৱ। (এই রহস্য প্রত্যেক যবেহের মধ্যে—কোরবানীর হোক বা না হোক। অতঃপর যবেহের বিশেষভাবে যে আসল উদ্দেশ্য নয়, তা একটি যুক্তির মাধ্যমে বর্ণনা কৱা হচ্ছে যে, দেখ, এটা জানা কথা,) আল্লাহ তা'আলার কাছে এগুলোর গোশ্ত ও রজু পৌছে না ; কিন্তু তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া (নেকটের নিয়ত এবং আন্তরিকতা যার শাখা, অবশ্য) পৌছে। (সুতরাং এটাই আসল উদ্দেশ্য প্রয়াণিত হলো। উপরে **ট্রাক্ট মুস্তুর্নামা** বলে অধীন কৱার একটি সাধারণ রহস্য বর্ণনা কৱা হয়েছিল। অর্থাৎ কোরবানী হোক বা না হোক। অতঃপর অধীন কৱার একটি বিশেষ রহস্য অর্থাৎ কোরবানী ইওয়ার দিক দিয়ে বর্ণনা কৱা হচ্ছে ।) এমনিভাবে আল্লাহ এসব জন্মুকে তোমাদের অধীন কৱে দিয়েছেন, যাতে তোমরা (এগুলোকে আল্লাহর পথে কোরবানী কৱে) আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা কৱ এ কারণে যে, তিনি তোমাদেরকে (এভাবে কোরবানী কৱার) তওঁকীক দিয়েছেন। (নতুন আল্লাহর তওঁকীক পথপ্রদর্শক না হলে হয় যবেহের মধ্যেই সন্দেহ কৱে

এই ইবাদত থেকে বিকির থাকতে, না হয় অন্যের নামে যবেহ করতে।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি আভারিকম্ভাশীলদেরকে সুস্বাদ পরিয়ে দিন (পূর্বেকার সুস্বাদ আভারিকভার নামে সম্পর্ক হিল। এটা বিশেষ করে আভারিকভা সম্পর্কে।)

আনুবাদিক জ্ঞানব্য বিষয়

أَمْ جَعَلَنَا مُسْكِنَ
আরবী অবাব মন্দক ও মন্দক কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জন কেরবানী করা, মুই হজের তিলাকর্ম এবং তিস, ইবাদত। কোরআন পাকে বিস্তৃত হাবে এই পদ্ধতি তিস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আরাতে তিস অর্থে হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রযুক্ত এখাদে মন্দক এর অর্থ কোরবানী বিয়োহেন। আরাতের অর্থ হবে এই যে, এই উপরতে কোরবানীর বে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কেন মসুম আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উপরতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাফাদাহ বিভীর অর্থ নিয়েছেন। তাঁর অক্তে আরাতের অর্থ এই যে, হজের তিলাকর্ম যেমন এই উপরতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উপরতদের উপরও হজ ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরোক ভূতীর অর্থ ধরে আরাতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উপরতদের উপরও করব করেছিলাম। ইবাদতের পক্ষতিতে কিছু কিছু পার্বক্য সব উপরতেই হিল; কিছু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন হিল।

وَبَشِّرُ الْمُفْتَيَّبِينَ
আরবী অবাব খবত শব্দের অর্থ নিয়ড়মি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মিজেকে হের মনে করে। এ জন্যই কাফাদাহ ও মুজাহিদ -মুক্তিদের অর্থ করেছেন বিসর্গী। আমর ইবনে আউস বলেন : এমন লোকদেরকে মুক্তিদের বলা হয়, যারা অন্যের উপর মূল্য করে না। কেউ তাদের উপর মূল্য করলে তারা তাঁর প্রতিশোধ নেবে না। সুক্রিয়ান বলেন : যারা সুবে-সুঘর্ষে, বাজ্জল্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহর কর্মসূল ও তফসীরে সন্তুষ্ট থাকে, তাঁরাই মুক্তিদের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

وَجْلَتْ قَلْقَلَمْ
এর আসল অর্থ ঐ ভৱতীতি, যা কাহারও যাহাত্তের কারণে অবরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সরকর্মপ্রয়ারণ বাস্তবের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলায় বিকর ও নাম অবস্থা তাদের অস্ত্রে এক বিশেষ ভৈতি সংকার হয়ে থার।

وَالْبَذْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَمَائِيرِ الْ
পথ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে শমাইর বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানসমূহে পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

فَانْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا مَسْوَافَ
শব্দের অর্থ সারিমজ্জাবে। আবদ্দুল্লাহ ইবনে উসর এর তফসীর শসনে বলেন : অন্ত তিস পারে তুর দিয়ে দশারয়ান থাকবে এবং এক পা বৌধা থাকবে। উটের জন্য এই নিরয়। দশারয়ান অবস্থার উট কোরবানী করা সুন্নত ও উপর। অবশিষ্ট সব জন্মকে শোঙ্গা অবস্থায় যবেহ করা সুন্নত।

وَجَبَتْ إِرْهَبْ—إِنَّمَا وَجَبَتْ جُنُوبِهَا ; سَقَطَتْ بَاقِيَّةِ الْأَرْضِ—إِنَّمَا سَقَطَتْ سُرْعَةِ যেমন বাকপক্ষতিতে বলা হয় ; যেমন বাকপক্ষতিতে বলা হয় এখানে ফাইদা ও জবাবদি এখানে অর্থাৎ সুর্য চলে পড়েছে। এখানে আলুর আশ নির্গত ইউরো সুখামো হয়েছে।

فَانْوَسْعَتْ رَأْيَهَا يَا أَدَمَ—وَالْمُغْنِيَّ—وَالْمُغْنِيَّ
شَكَّرَةِ যাদেরকে কোরবানীর গোশ্ত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে ভাদেরকে
বলা হয়েছে। এর অর্থ দৃঢ়হৃ অভাবহৃত। এই আয়াতে তৎস্থলে
শক্রবর্যের ঘারা তার তফসীর করা হয়েছে। এই ফাই অভাবহৃত ফকিরকে বলা হয়, যে কারণ
কাছে ঘাঞ্জা করে না, পরিশ্রেষ্ঠ সন্দেশ বহুমে বলে থাকে এবং কেউ কিছু সিলে তাতেই
সমৃষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে এই ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশার অন্যত্র গমন
করে,—যুথে সওয়াল করুক বা না করুক।—(মায়হারী)

ইবাদতের বিশেষ পক্ষতি আসল উদ্দেশ্য নয় ; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই
আসল উদ্দেশ্য : —**نَنْبَيْلَنَ اللَّهُ لَحْمُهُ**—বাকে একধা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি
মহান ইবাদত ; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশ্ত ও রক্ত পৌছে না এবং কোরবানীর
উদ্দেশ্যও এতে নয় ; বরং আসল উদ্দেশ্য আলুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং
পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল
উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে ওঠাবসা করা, রোবার কুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য
নয় ; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহবেতবর্জিত
ইবাদত প্রাণহীন কাঠামো যাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরীয়তসমূহ কাঠামোও একারণে জরুরী
যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো পিসিটি করে দেওয়া
হয়েছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

**إِنَّ اللَّهَ يُدِيرُ فِيمُ عَنِ الَّذِينَ امْنَوْا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَانِ كَفُورٍ**

(৩৮) আল্লাহ সু'মিনদের থেকে শক্রদেরকে হাটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসবাদক
অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচৰ আল্লাহ তা'আলা (মুশ্রিকদের আধান্য ও নির্যাতদের শক্তিকে) সু'মিনদের
থেকে (সত্তরই) হাটিয়ে দেবেন (এরপর হজ ইজ্যাদি কর্তৃ তারা বাধাই দিতে পারবে না)।
নিচৰ আল্লাহ তা'আলা কোন বিশ্বাসবাদক কুফরকারীকে পছন্দ করেন না। (বরং একে পে
লোকদের পক্ষ তিনি অসমৃষ্ট। পরিণয়ে তিনি তাদেরকে পরামৃষ্ট এবং সু'মিনদেরকে জয়ী
করবেন)।

আনুষ্ঠিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হেরেম শরীক ও মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে এবং ওমরা আদায় করতে বাধা দিয়েছিল ; অথচ তাঁরা ওমরার ইহুরাম বেঁধে মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে গিয়েছিলেন । আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে এই ওয়াদা দিয়ে সাম্রাজ্য দেওয়া হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা সত্তরই মুশরিকদের শক্তি ভেঙ্গে দেবেন । ষষ্ঠ হিজরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল । এরপর থেকে উপর্যুপরি কাফির মুশরিকদের শক্তি দুর্বল ও তাঁরা মনোবলহীন হতে থাকে । অবশেষে অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজিত হয়ে যায় । পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে ।

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِإِنْهُمْ ظَلَمُواٰ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ④٩
 الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ دُرْخَمٌ
 اللَّهُ أَنَّاسٌ بَعْضُهُمْ بِعِصْمٍ لَهُمْ مَتْ صَوَامِعُ وَبَيْمٌ وَصَلَوَاتٌ
 وَمَسَاجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا سُمُّ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرَهُ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ ⑤٠ الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا
 الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑤١

(৩৯) যুক্তের অনুবতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে ; কারণ তাদের প্রতি অভ্যাচার করা হয়েছে । আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম । (৪০) যাদেরকে তাদের দুরবাঢ়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিকার করা হয়েছে তখন এই অপরাধে যে, তাঁরা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ । আল্লাহ যদি যানব জাতির একদলকে অপর দল ধারা প্রতিষ্ঠত না করতেন, তবে (ক্রিটানদের) নির্জন শির্জি, ইবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বন্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয় । আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে । নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর । (৪১) তাঁরা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তাঁরা নামাব কারেম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নির্বেথ করবে । প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর একত্রিতারভূক্ত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ পর্যন্ত বিভিন্ন উপকারিতার কারণে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না; কিন্তু এখন) তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সাথে (কাফিরপক্ষ থেকে) যুদ্ধ করা হয় ; কারণ তাদের প্রতি (ঘোর) অভ্যাচার করা হয়েছে। (এটা যুদ্ধ বৈধকরণের কারণ) এবং (এই অনুমতি প্রদানের অবস্থায় মুসলমানদের সংখ্যালভতা ও কাফিরদের আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কেননা) নিচয় আল্লাহু তাদেরকে জয়ী করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (অতঃপর মুসলমানগণ কিরণ নির্যাতিত হচ্ছে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে :) যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে অন্যায়ভাবে বহিকার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহু (অর্থাৎ তওহীদ বিশ্বাস করার কারণেই কাফিররা তাদের প্রতি নির্যাতনের শীঘ্ৰৱোলার চালায়। ফলে তারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অতঃপর জিহাদ বৈধকরণের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে :) আল্লাহু যদি (অনাদিকাল থেকে) মানুষের এক দলকে অপর দল ঘারা প্রতিহত না করতেন, (অর্থাৎ সত্যপক্ষদেরকে অসত্যপক্ষদের উপর জয়ী না করতেন) তবে (নিজ নিজ আমলে) স্থিতানন্দের নির্জন উপাসনালয়, ইবাদতখানা, ইহুদীদের ইবাদতখানা এবং (মুসলমানদের) মসজিদসমূহ বিপ্রস্তুত (ও নিশ্চিহ্ন) হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর মায় অধিক পরিমাণে অরণ করা হয়। (অতঃপর সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহরিকভাব সাথে জিহাদ করলে বিজয় দান করা হবে)। নিচয়ই আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহুর (দীনের) সাহায্য করে (অর্থাৎ আল্লাহুর কালেমা সমূলত করাই যুদ্ধের বাঁচি নিয়ন্ত হওয়া চাই)। নিচয়ই আল্লাহু তা'আলা পরাক্রমশালী (ও) শক্তিধর। (তিনি যাকে ইচ্ছা শক্তি ও বিজয় দিতে পারেন। অতঃপর জিহাদকারীদের ক্ষমিত বয়ান করা হচ্ছে :) তারা এমন যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নিজেরাও নামায কামের করবে, যাকাত দেবে এবং (অপরকেও) সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সব কাজের পরিণাম তো আল্লাহরই ইখতিয়ারভূক্ত। (সুতরাং মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা দেখে কিরণে বলা যায় যে, পরিণামেও তারা জন্মপই থাকবে ; বরং এর বিপরীত হওয়াও সম্ভবপর। সেমতে তাই হয়েছে)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশঃ মকায় মুসলমানদের উপর কাফিরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না-কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহত হয়ে না আসত। মকায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফিরদের যুদ্ধে অভ্যাচার দেখে তাদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) জওয়াবে বলতেন : সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। —(কুরআন)

যথন রাসূলে করীম (সা) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয় : **أَخْرِجُوهُنَّا نَبِيًّمٍ لِّبَلَكُنْ** । এই অর্থে এরা তাদের প্রয়গহরণকে বাহির করেছে। এখন তাদের ধর্ম অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যদীনায় পৌছার পর আলোচ্য আয়ত অবতীর্ণ হয়। এতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিমুক্তে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। —(কুরআন)

ଶିରମିଥୀ, ନାସାଗ୍ରୀ, ଇବନେ ଯାଜାହ, ଇବନେ ହାଇୟାନ, ହାକିମ ପ୍ରମୁଖେର ରେଓୟାଯେତେ ହୃଦରତ ଇବନେ ଆକାସ ବଲେନ : ଏଇ ଧର୍ମ ଆମାତ କାଫିରଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାପାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଲୋ । ଇତିପରେ ସତରରେ ଅଧିକ ଆୟାତେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ କରା ହେବିଲ ।

জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ هُنَّ
এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং
এটা যে নতুন নির্দেশ হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উচ্চত ও প্রয়োগেরদেরকেও
কাফিরদের মুকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই না করা হলে কোন মাঝারি
ও ধর্মের অভিভূত থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিক্ষম হয়ে বেটে।

—لَهُدْمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ تَصْلُوَاتْ وَمَسَاجِدْ—
বিগত যৰানাম যত ধর্মের ভিত্তি আস্থাহৰ পক্ষ
থেকে এবং শহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত
হয়ে কুফর ও শিরাকে পরিণত হয়েছে, সেইসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে
উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যৰানাম তাদের উপাসনালয়গুলোর স্থান ও সংরক্ষণ
ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি
কোন সংয়ৈক নবৃত্ত ও শহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না ; যেমন অগ্নিপূজারী অজুস অথবা
মুর্তিপূজারী হিস্ব। কেননা, তাদের ইবাদতখানা কোন সংয়ৈক স্থানাত্মক ছিল না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের সাথে মুক্ত ও জিহাদের আদেশ অবর্তীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। যুদ্ধ (আ)-এর আমলে দুলুত দুসা (আ)-এর আমলে এবং শেষ নবী (সা)-এর যমনায় মসজিদসমূহ বিধৃত হয়ে যেত — (করতবী)

কোথাও রাত্তীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহু তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাত্তীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উপরিধিত শুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যবহার করবে। এ কারণেই হয়রত উসমান গনী (রা) বলেন : ﴿نَّا مُقْبِلُونَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহু তা'আলা'র এই ইরশাদ কর্ম অন্তিম লাভ করার পূর্বেই কর্মাদের গুণ ও প্রশংসন কীর্তন করার প্রায়িল এবং পর আল্লাহু তা'আলা'র এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব করণ লাভ করেছে। চারজন খুলাকারে-রাশিদীন এবং মুহাজিরগণ আর্জুন্তিন আয়াতের বিষয় প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহু তা'আলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাত্তীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যতবাণীর অনুকরণ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, তারা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা সুচৃ করেন, সৎ কাজের ঘৰ্বর্তন করেন এবং মন কাজের পথ রূক্ষ করেন।

এ কারণেই আলিমগণ বলেন : এই আয়াত সাক্ষ দেয় যে, খুলাকারে-রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাত্তীব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিষয় এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সমুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুকরণ ছিল।—(রহফ-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নয়লের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহ্যিক, কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তফসীরবিদ যাহুদাক বলেন : এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহু তা'আলা রাত্তীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষয়তাসীন ধাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আনজাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খুলাকারে-রাশিদীন তাদের অবানায় আসজ্ঞায় দিয়েছিলেন।—(কুরআনী)

وَإِنْ يَكُنْ بُوكُ فَقْلُ كَلْبٌ قَبْلَهُمْ تَوْرُنُوْجٌ وَعَادٌ وَشُوْدٌ ⑩ وَقُومٌ
إِبْرِهِيمٌ وَقَوْمُ لُوطٍ ⑪ وَاصْحَابُ مَدْيَنٍ وَكَلْبٌ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفَّارِينَ
ثُمَّ أَخْذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكْيِيرُ ⑫ فَكَاهِنُ مِنْ قَوْيَةٍ أَهْلَكَنَّهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فَرِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرْوَشَهَا وَبِئْرٌ مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ ⑬ أَفَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي الْأَبْصَارُ وَلِكُنْ تَعْنِي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ⑭

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
 كَالْفِسْنَةِ مِنَ تَعْدُونَ ⑥ وَكَيْنَ مِنْ قَرِيبَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ
 ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْدُتُهَا ۝ وَإِلَى الْمَصِيرِ ⑦ قُلْ يَا إِنَّا إِنَّا
 لِكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑧ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑨ وَالَّذِينَ سَعَوا فِي أَيْتَنَا مُعِزِّزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْجَحِيمُ ⑩

(৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওমে নৃহ, আদ, সামুদ (৪৩) ইবরাহীম ও জুতের সম্প্রদায়ও। (৪৪) এবং যাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মুসাকেও। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে সুযোগ দিবেছিলাম এবং তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অবীকৃতির পরিণাম! (৪৫) আমি কত জনপদ খৎস করেছি এমতাবছার যে, তারা ছিল তনাহ্গার। এইসব জনপদ এখন খৎসভূপে পরিণত হয়েছে এবং কত কৃপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় ধোসাদ খৎস হয়েছে! (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সম্বরাদী জনগণ ও প্রবণশক্তিশালী কর্তৃর অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চুক্তি তো অঙ্গ হয় না; কিন্তু বক্ষিত অঙ্গরাই অঙ্গ হয়। (৪৭) তারা আপনাকে আশার ভূরাবিত করতে বলে; অথচ আশুদ্ধ কর্তৃব্যও তাঁর ওয়াদা ভজ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবছার যে, তারা তনাহ্গার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুন : হে লোকসকল! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট তাবাঘ সতর্ককারী। (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সংকর্ষ করেছে, তাদের জন্য আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক কুর্বী। (৫১) এবং যারা আশার আরাজসমূহকে ব্যর্থ করার জন্য চেষ্টা করে, তারাই দোষবের অধিবাসী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (অর্থাৎ বিতর্ককারীরা) যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে (আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা) তাদের পূর্বে কওমে নৃহ, আদ, সামুদ, ইবরাহীম ও জুতের সম্প্রদায় এবং যাদইয়ানের অধিবাসীরাও (নিজ নিজ পয়গবরকে) মিথ্যাবাদী বলেছে। এবং মুসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। (কিন্তু মিথ্যাবাদী বলার পর) আমি

কাফিরদেরকে (কিছুদিন) সুযোগ দিয়েছিলাম, (যেমন বর্তমান কাফিরদেরকে সুযোগ দিয়ে রেখেছি।) এরপর তাদেরকে (আঘাবে) পাকড়াও করলাম। অতএব (দেখ,) আঘার আঘাব কেমন ছিল! আমি কত জনপদ (আঘাব দ্বারা) খৎস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত। এসব জনপদ এখন ছাদের উপর পতিত দ্বৃপে পরিণত হয়েছে (অর্থাৎ জনমানব শূন্য। দ্বৃতাবত প্রথমে ছাদ ও পরে প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়। এমনিভাবে এসব জনপদ) কত পরিত্যক্ত কৃপ (যেন্তে পূর্বে আবাদ ছিল) ও কত সুদৃঢ় আসাদ (যা এখন ভগ্নস্তুপ—এসব জনপদে খৎস করা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিশ্রূত সময় আসলে এ যুগের মানুষকেও আঘাব দ্বারা পাকড়াও করা হবে।) তারা কি দেশভ্রমণ করে নি, যাতে তারা এমন হন্দয়ের অধিকারী হয়, যদ্বারা বুঝে এবং এমন কর্ণের অধিকারী হয়, যদ্বারা প্রবণ করে। বস্তুত (যদ্বারা বুঝে না, তাদের) চক্র তো অঙ্গ নয় ; বরং (বক্ষহিত) অঙ্গরই অঙ্গ হয়ে যায়। (বর্তমান কাফিরদেরও অঙ্গের অঙ্গ হয়ে গেছে; নতুনা পরবর্তী লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষা প্রহণ করত।) তারা (নবুয়তে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) আপনাকে আঘাব দ্বৰাবিত করতে বলে (আঘাব তাড়াতাড়ি না আসায় তারা প্রমাণ করতে চায় যে, আঘাব আসবেই না) অথচ আঘাহু কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না (অর্থাৎ ওয়াদার সময় অবশ্যই আঘাব আসবে।) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন (যেদিন আঘাব আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—তা দৈর্ঘ্যে অথবা কঠোরভাবে) তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। (সুতরাং তারা নেহাঁ নির্বোধ বলেই এমন ধরনের বিপদ দ্বৰাবিত করতে বলে।) এবং (উল্লিখিত জওয়াবের সারমর্ম আবার শুনে নাও যে) আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছিলাম এমতাবস্থায় যে, তারা নাফরমানী করত, অতঃপর তাদেরকে (আঘাবে) পাকড়াও করেছি। সবাইকে আঘাব কাছেই ফিরে আসতে হবে। (তখন পূর্ণ শান্তি পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন : হে লোকগণ, আমি তো তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (আঘাব আসা না আসার ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। আমি এর দাবিও করি নি।) সুতরাং যারা (এই সতর্কবাণী শোনে) বিশ্বাস ছাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও সন্তানজনক রূপ্য এবং যারা আমার আয়ত সম্পর্কে (অঙ্গীকার ও বাতিল করার) চেষ্টা করে, (নবীকে ও মু’মিনদেরকে) হারাবার (অর্থাৎ অক্ষম করার) জন্য, তারাই দোয়খের অধিবাসী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য : ۱۰۴۳۷
۱۰۴۳۸-۱۰۴۳۹-۱۰۴۴۰-۱۰۴۴۱-۱۰۴۴۲-۱۰۴۴۳-۱۰۴۴۴-
“۱۰۴۴۵-۱۰۴۴۶-۱۰۴۴۷-۱۰۴۴۸-۱۰۴۴۹-۱۰۴۴۱-۱۰۴۴۲-۱۰۴۴۳-۱۰۴۴۴-”
এই আঘাতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে।
“۱۰۴۴۵-۱۰۴۴۶-۱۰۴۴۷-۱۰۴۴۸-۱۰۴۴۹-۱۰۴۴۱-۱۰۴۴۲-۱۰۴۴۳-۱۰۴۴۴-”
বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা
সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবৃক্ষ-বৃক্ষ পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা
ওধূ প্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী
হাতেম কিভাবুন্ধাক্ষুরে মালেক ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন : আঘাহু তা’আলা মুসা
(আ)-কে আদেশ দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আঘাহুর
পৃথিবীতে এত ধোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি

ভেঙ্গে যায়।—(ক্লহল-মা'আনী) এই রেওয়ায়েতটি বিত্ত হলে এই ভয়গ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জান ও চক্ষুব্যানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য ।—**أَنْ يُوَمًا عَذَرَبَكَ كَالْفَ**—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার এক দিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বুঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে একেই (দীর্ঘ মনে হওয়া) শব্দ ধারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেক তফসীরকারক এখামে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাস্তাসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরিয়িরীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুয়ায়্যা (রা) বলেন : **إِنَّمَا يَعْلَمُ مُحَمَّدُ** (সা) একদিন নিঃবেশ মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, অধি তোমদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ মুরেশ সুসংবাদ দিছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃবেশ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মাযহারী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ইতীয় অর্থটি একদিন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

একটি সর্বেহ ও তার জওয়াব : সুরা মায়ারেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই :—**كَانَ مُفْدَارًا حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ**—এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কর-বেশ হবে, তাই এই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। ইতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে অক্তই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরম্পর বিরোধী হয়ে যায় ; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জওয়াব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল-কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نِبِيِّ إِلَّا ذَاتَتِي الْقَوْنِيَّةِ الشَّيْطَنُ
 فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَسْخَعُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ شَيْءٌ حُكْمُ اللَّهِ أَيْتَهُ وَإِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَا يَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرْضٌ وَالْقَاسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاقٍ بَعِيدٌ** ⑩

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ
 فَتُخَبِّئَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلْلَاتٍ إِنَّمَّا لِلَّهِ الْحُكْمُ مَوْلَانَا
 وَلَا يَرَاكُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْسَّاعَةُ
 بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهِمُ عَذَابٌ يَوْمَ عِقْيَمٍ ۝ الْمُلْكُ يَوْمَئِنَ اللَّهُ
 يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيمَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ ۝
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

(৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও মর্বী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু করানা করেছে, তখনই শরতান তাদের কর্তৃতাম কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতশ্চপর আল্লাহর দূর করে দেন শরতান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহর তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহর জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৩) এ কারণে যে, শরতান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাব্যৱস্থ করে দেন, তাদের জন্য, তাদের অঙ্গে রোগ আছে এবং ধারা পার্শ্বাণ দূসরে। উন্মাদগারিয়া দূরবর্তী বিরোধিতার লিঙ্গ আছে; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হচ্ছে; তারা যেন জানে যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য।' অতশ্চপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অঙ্গে যেন এর ধৃতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফিররা সর্বদাই সম্বেদ পোষণ করবে যে পর্বত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিন্নত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এসে দিবসের খাতি যা থেকে রক্তার উপায় নেই। (৫৬) মাঝক সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব ধারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সহকর্ম সম্পাদন করে তারা নিয়াবতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং ধারা কুর্বানী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে যিখ্যা বলে, তাদের জন্য লাল্লাকর পাঞ্চ রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা), এয়া যে শরতানের প্রোটোনাম আপনার সাথে তর্কবিত্তক করে, এটা সম্ভুল কিছু নয়; বরং আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল ও মর্বী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই (আল্লাহর বিধি-বিধান থেকে) কিছু আবৃত্তি করেছে, তখনই শরতান তাদের আবৃত্তিতে (কাফিরদের মনে) সন্দেহ (ও আপত্তি) প্রক্ষিপ্ত করেছে। (কাফিররা এসব

সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে পঁয়গঁয়ারদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا لِشَيَاطِينَ الْأَنْسَسِ وَالْجِنِّ يُوْحِنُ بِعَضُّهُمْ
إِلَى بَعْضٍ رُخْرُفَ الْقَوْلِ غَرُورًا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْحُونُ إِلَى أُولَئِنَّا
هُمْ -

অতঃপর আল্লাহু তা'আলা শয়তানের প্রক্ষিণ সন্দেহকে (অকাট্য জওয়াব ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা) নিচিক করে দেন। (এটা জানা কথা যে, বিশুদ্ধ জওয়াবের পর আপত্তি দূর হয়ে যায়।) এরপর আল্লাহু তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন (পূর্বেও প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু আপত্তির জওয়াব দ্বারা এই প্রতিষ্ঠা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।) আল্লাহু তা'আলা (এসব আপত্তি সম্পর্কে) জ্ঞানময় (এবং এগুলোর জওয়াব শিক্ষাদানে) প্রজ্ঞায়। (এই ঘটনা বর্ণনা করার কারণ এই যে) শয়তান যা প্রক্ষিণ কুরে, আল্লাহু তা'আলা তা'আলা তা' তাদের জন্য পরীক্ষাব্যৱস্থ করে দেন, যাদের অন্তরে (সন্দেহের) রোগ আছে এবং যাদের অন্তর (সম্পূর্ণই) পাষাণ যে, তারা সন্দেহ পেরিয়ে মিথ্যার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, দেখা যাক জওয়াবের পরও তারা সন্দেহের অনুসরণ করে, না জওয়াব হৃদয়ঙ্গম করে সত্যকে ধ্রুণ করে। বাস্তবিকই (এই) যালিমরা (অর্থাৎ সন্দেহকারীরা এবং মিথ্যায় বিশ্বাস পোষণকারীরা) সুন্দর বিরোধিতায় লিঙ্গ আছে। (কারণ, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা হঠকারিতাবশত তা কবুল করে না। পরীক্ষার জন্যই শয়তানকে কুমক্ষণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল) এবং (বিশুদ্ধ জওয়াব ও হিদায়েতের নূর দ্বারা এসব সন্দেহ এ কারণে বাতিল করা হয় যে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন (এসব জওয়াব ও হিদায়েতের নূরের সাহায্যে) দৃঢ় বিশ্বাস করে যে, এটা (অর্থাৎ নবী যা আবৃত্তি করেছেন) আপনার প্রতিপাদাকের পক্ষ থেকে সত্য, অতঃপর তারা যেন স্মীমানে সুন্দর হয়ে যায় এবং (দৃঢ় বিশ্বাসের বরকতে) তাদের অন্তরে যেন এর (আমল করার) প্রতি অধিক বিনয়ী হয়। নিচয় আল্লাহু তা'আলাই বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (এমভাবস্থায় তাদের হিদায়েত হবে না কেন? এ হচ্ছে যুমিনদের অবস্থা।) আর কাফিরদ্বাৰা সর্বদাই এ সম্পর্কে (অর্থাৎ পঠিত নির্দেশ সম্পর্কে) সন্দেহই পোষণ কৰবে (যে সন্দেহ শয়তান তাদের মনে প্রক্ষিণ করেছিল।) যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়ে (আয়াব না হলেও যার ভয়াবহতাই যথেষ্ট) অথবা (তদুপরি) এসে পড়ে তাদের কাছে অকল্যাণ দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের) শাস্তি। (বাস্তবে উভয়টিরই সমাবেশ হবে এবং তা হবে চৰম বিপদের কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আয়াব প্রত্যক্ষ না করে কুফর থেকে বিরত হবে না; কিন্তু তখন তা কল্পনায়ক হবে না।) রাজত সেদিন আল্লাহু তা'আলারই হবে। তিনি তাদের (কার্যকর) ফয়সালা করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন কৰবে এবং সৎকর্ম কৰবে, তারা সুখ-কাননে বাস কৰবে এবং যারা কুফরী কৰবে এবং আয়াব আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে, তাদের জন্য থাকবে লাল্লুনাকর শাস্তি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এথেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উকি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুশ্পষ্ট উকি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংক্ষারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নবুয়াতের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে—তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হয়েরত মুসা, সৈসা (আ) এবং শেখবনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা)। এবং যে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হয়েরত হাকিম (আ)। তিনি মুসা (আ)-এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী। কিন্তু যিনি নবী হবেন, তাঁর রাসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহ'র পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আর্গমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারাইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

—আয়াতে **شَدِّيْرَهُ أَنْبَتَهُ** (আবৃত্তি করে) এবং **فَرَأَهُ أَنْبَتَهُ شَدِّيْرَهُ** (আবৃত্তি করে) অর্থ: **অর্থাৎ আবৃত্তি করা।** আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে আয়াতের যে তফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও নির্মল। আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীত ঘষে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এছুলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা 'গারানিক' নামে খ্যাত। অধিক সংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মদ্বারাহীদের আবিষ্কার রলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ধর্তব্যও বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহ'র অকাট্য নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সম্বেদ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সম্বেদের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুশ্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সম্বেদ ও সংশয়ের ঘার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপ্ত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হলো। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

**وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُرُقْتُلُوا وَمَا تُوَالَى رِزْقَنَاهُ اللَّهُ
 رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرِّزْقِينَ ④٢٠** **لَيُدْخِلَنَّهُمْ**
مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ④٢١

(৫৮) যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা ঘরে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট ইতিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জানময়, সহনশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আল্লাহর পথে (অর্থাৎ দীনের হিফায়তের জন্য) নিজ গৃহ ত্যাগ করেছে (যাদের কথা পূর্ববর্তী **أَذْبَنْ أَصْرِحُوا مِنْ دِيَارِهِمْ** আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে) এরপর কাফিরদের মুকাবিলায় নত হয়েছে অথবা (এর্নিতেই স্বাভাবিক) মৃত্যুবরণ করেছে, (তারা ব্যর্থকাম ও বক্ষিত নয় ; যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা সাও করতে পারেনি ; কিন্তু পরকালে) আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট ইতিক দেবেন (অর্থাৎ জান্নাতের অগণিত মিয়ামত) এবং অবশ্যই আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট ইতিকদাতা। (এই উৎকৃষ্ট ইতিকের সাথে) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (ঠিকানা ও উৎকৃষ্ট দিবেন অর্থাৎ) এমন এক স্থানে দাখিল করবেন, যাকে তারা (খুবই) পছন্দ করবে। (এখন প্রশ্ন রইল যে, কোন কোন মুহাজির পার্থিব বিজয়, সাহায্য ও উপকারিতা থেকে কেন বক্ষিত হলো এবং কাফিররা তাদেরকে হত্যা করতে কিন্তু সক্ষম হলো ? কাফিরদেরকে আল্লাহর গঞ্জ দ্বারা ধ্বংস করা হলো না কেন ? এসব প্রশ্নের উত্তর এই যে) নিচয় আল্লাহ তা'আলা (প্রত্যেক কাজে রহস্য ও উপকারিতা সম্পর্কে) জানময়, (তাদের এই বাহ্যিক ব্যর্থতার মধ্যে অনেক উপকারিতা ও রহস্য নিহিত আছে এবং) অভ্যন্ত সহনশীল। (তাই শক্রদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শান্তি দেন না !)

ذلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِسْتِلٍ مَا عُوْقَبَ بِهِ ثُمَّ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصَرَنَّهُ
اللَّهُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ۝

(৬০) এ তো তনলে, যে ব্যক্তি নিশ্চীড়িত হয়ে নিশ্চীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ থাহে করে এবং পুনরায় সে নিশ্চীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিচয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ (বিষয়বস্তু) তো হলো, (এরপর শোন যে) যে ব্যক্তি (শক্রকে) তত্ত্বকুই নিশ্চীড়ন করে, যতটুকু (শক্রের পক্ষ থেকে) তাকে নিশ্চীড়ন করা হয়েছিল, এরপর (সমান সমান হয়ে যাওয়ার পর যদি শক্রের পক্ষ থেকে) সে অভ্যাচারিত হয়, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিচয় আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(কয়েক আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ময়লুম তথা অত্যাচারিতকে সাহায্য করেন ; وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ أَقْدِيرُ ; এক. যে শর্কর কাছ থেকে কোন প্রতিশোধই গ্রহণ করে না ; বরং ক্ষমা করে দেয় কিংবা চুপ করে বসে থাকে। দুই. যে শর্কর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যখন সমান হয়ে যায়, তখন বাদ বিস্তাদ শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ; কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে কিন্তু হয়ে শর্কর যদি পুনরায় তার উপর আক্রমণ করে বসে এবং আরও জুলুম করে, তবে এ ব্যক্তি ময়লুমই থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতে এই বিভীষণ প্রকার ময়লুমকে সাহায্য করারই ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবর করে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ; যেমন অনেক আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। وَلَمْ يَمْسِدْ وَغَفَرْ إِنْ (৩) وَإِنْ تَغْفِلُوا أَنْفَرْ لِتَغْفِلِي (২) فَمَنْ عَلَى وَأَمْلَحْ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ (১) উদাহরণত এসব আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে এবং ক্ষমা করতে ও সবর করতে বলা হয়েছে। কোরআন পাকের এসব নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ পছাই উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি শর্কর কাছ থেকে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সে এই উভয় পছাই ও কোরআনী নির্দেশাবলী পালন করে না। কাজেই সন্দেহ হতে পারত যে, সে বোধহয় আল্লাহর সাহায্য থেকে বর্ণিত হবে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِلْ وَعْدَهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তির উভয়পছাই বর্জন করার জটি ধরবেন না ; বরং সে পুনরায় অত্যাচারিত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الْيَوْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْيَوْلِ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ^{٦٥} ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُ
عُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ^{٦٦}
الْحُرْتَرَ أَنَّ اللَّهَ أَسْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ
مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيِيرٌ^{٦٧} لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ^{٦٨} الْمُتَرَانِ
اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُمْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَيْأَدْنَهُ إِنَّ اللَّهَ بِإِلْشَائِسِ

لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑥ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ۚ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ⑦

(৬১) এটা এ জন্য যে, আল্লাহু রাত্তিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্তির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহু সবকিছু তনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্চে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহু আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভৃগৃষ্ট সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে। নিচয় আল্লাহু সুস্কদর্ণী সর্ববিষয় খবরদার। (৬৪) নভোযঙ্গল ও ভৃগৃষ্টে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহই অভাবমুক্ত প্রশংসনার অধিকারী। (৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভৃগৃষ্টে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান সৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং আকাশকে হিয় রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যক্তিত ভৃগৃষ্টে পতিত না হয়। নিচয় আল্লাহু মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ও পুনরাবৃত্ত জীবিত করবেন। নিচয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা (অর্থাৎ ম'মিনদেরকে বিজয়ী করা) এজন্য যে, আল্লাহু তা'আলা (সর্বশক্তিমান। তিনি) রাত্তিকে (অর্থাৎ রাত্তির অংশ বিশেষকে) দিনের মধ্যে এবং দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশ বিশেষকে) রাত্তির মধ্যে দাখিল করে দেন। (এই নৈসর্গিক পরিবর্তন এক জাতিকে অন্য জাতির উপর বিজয়ী করে দেওয়ার মত বিপ্লবের চাইতে অধিক আশ্চর্যজনক।) এবং এ কারণে যে, আল্লাহু তা'আলা (তাদের কথাবার্তা ও অবস্থা) সম্যক শুনেন ও খুব দেখেন। (তিনি শুনেন ও দেখেন যে, কাফিররা যালিয় ও মু'মিনরা মহলুম। তাই তিনি সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাতও এবং তাঁর শক্তি সামর্থ্যও সর্ববৃহৎ এই সমষ্টিই কারণ দুর্বলদেরকে জয়ী করার।) এটা (অর্থাৎ সাহায্য) এ কারণেও (নিশ্চিত) যে, (এতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারও নেই। কেননা) আল্লাহু-তা'আলাই পরিপূর্ণ সত্ত্ব এবং আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, তারা সম্পূর্ণই অপদার্থ। (কেননা, তারা আপন সত্ত্বয় যেমন পরম্পরাপেক্ষী, তেমনি দুর্বল। এমতাবস্থায় তাদের সাধ্য কি যে, আল্লাহকে বাধা দেয়?) আল্লাহু তা'আলাই সবার উচ্চে, মহান। (এ বিষয়ে চিন্তা করলে তওঁহীদ যে সত্য এবং শিরক বাতিল, তা সবাই বুঝতে পারে। এ ছাড়া) তুমি কি জান না যে, আল্লাহু তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে ভৃগৃষ্ট সবুজ শ্যামল হয়ে যায়। নিচয় আল্লাহু তা'আলা অত্যন্ত মেহেরবান, সর্ববিষয়ে খবরদার। তাই বাস্তবের প্রয়োজন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে উপযুক্ত মেহেরবানী করেন।) যা কিছু আকাশ মণ্ডলে আছে এবং যা

কিছু ভূগঠে আছে, সব তাঁরই। নিচয় আল্লাহ্ তা'আলা অভাবমুক্ত, সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য। (হে সরোধিত ব্যক্তি!) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন পৃথিবীত্ত্ব বস্তুসমূহকে এবং জলযানগুলোকেও (ও), যা তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলমান হয় এবং তিনিই আকাশকে হ্রিণ রেখেছেন, যাতে ভূগঠে পতিত না হয়; কিন্তু যদি তাঁর আদেশ হয়ে যায়, (তবে সবকিছু হতে পারে)। বান্দাদের শুন্হ ও মন্দ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও এক্ষণ আদেশ করেন না। কারণ এই যে) নিচয় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাশীল, পরম দয়ালু। তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর (প্রতিশ্রূত সময়ে) মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় (কিয়ামতে) জীবিত করবেন। (এ সব নিয়ামত ও অনুগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে তওহীদ মেনে নেওয়া ও কৃতজ্ঞ হওয়া মানুষের উচিত ছিল ; কিন্তু) বাস্তবিকই মানুষ বড় নিমকহারাম। (ফলে এখনও কুফর ও শিরক থেকে বিরত হয় না। এখানে সব মানুষকে বুঝানো হয়নি। বরং তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা নিমকহারামিতে লিঙ্গ রয়েছে)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভূগঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এক্ষণ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সদ্বেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূগঠের পাহাড়, নদী, হিন্দুজ্ঞান, পশ্চপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর তরজমা “কাজে নিয়োজিত করা” দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তি ও আল্লাহ্ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিদায়ক হতো। কারণ, মানুষের ব্রতাব, আশা-আকাশকা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোন এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَّاهُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَاكِّعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ
 وَادْعُ إِلَىٰ سَبِّكَ طَائِقَ لَعَلِيٰ هُدًّيٰ مُسْتَقِبِيْهِ@ وَإِنْ جَدَ لَوْكَ
 فَقُلِّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ@ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

فِيْكُمْ كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ④٤٦ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِيْ كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ④٤٧ ۚ

(৬৭) আমি প্রত্যেক উদ্যতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা বেল এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহবান করুন। নিচয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন : তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমগলে আছে। এসব কিভাবে গিযিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যত শরীয়তধারী উদ্যত অতিক্রম হয়েছে) আমি প্রত্যেক উদ্যতের জন্য যবেহ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি ; তারা এভাবেই যবেহ করে। অতএব তারা (অর্ধাং আপত্তিকারীরা) বেল এ (যবেহর) ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (তাদের তো আপনার সাথে বিতর্ক করার অধিকার নাই ; কিন্তু আপনার অধিকার আছে। তাই) আপনি তাদেরকে প্রতিপালকের (অর্ধাং তাঁর ধর্মের) দিকে আহবান করুন। আপনি নিশ্চিতই বিশুদ্ধ পথে আছেন। (বিশুদ্ধ পথের পথিক ভাস্তু পথের পথিককে নিজের পথে আহবান করার অধিকার রাখে ; কিন্তু ভাস্তু পথিকের একুশ অধিকার নাই।) তারা যদি (এরপরও) আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন : আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন ! (তিনিই তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন। অতঃপর এরই ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে :) আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে (কার্যত) ফয়সালা করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। (এরপর এরই সমর্থনে বলা হয়েছে : হে সংশোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূ-মগলে আছে। (আল্লাহর জন্মে সংরক্ষিত হওয়ার সাথে এটাও) নিশ্চিত যে, (তাদের) এসব (কখনোর্তা ও অবস্থা) আমলনামায় ও লিপিত আছে। (অতএব) নিচয়ই (প্রমাণিত হলো) এটা (অর্ধাং ফয়সালা করা) আল্লাহর কাছে সহজ।

আবৃত্তিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كُلْ أَمْمَةً جَعَلْنَا مِنْكُمْ ۚ এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূলুর ৩৪ সং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে স্থলে কোরবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত

হয়েছিল। এজন্য সেখানে সহকারে বলা হয়েছিল। এখানে এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ যবেহ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বুঝানো হয়েছে এবং এটা একটা বহুমুখ বিধান। তাই এখানে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্ম সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলতঃ তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে জন্মকে তোমরা বহন্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্মকে আস্তাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃতজন্ম, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবর্তীণ হয়।—(জহল-মা'আনী) অতএব এখানে এর অর্থ হবে যবেহ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমৰ্ম এই যে, আস্তাহ তা'আলা প্রত্যেক উষ্টুত ও শরীয়তের জন্য যবেহের বিধান পৃথক প্রেরণেছেন। রাসূলে-করীম (সা)-এর শরীয়ত একটি বহুমুখ শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মুকাবিলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান ধারা করাও জারৈয নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও ব্যক্তিল চিন্তাধারার ধারা এর মুকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জারৈয হতে পারে? মৃতজন্ম হালাল নয়, এটা এই উষ্টুত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উষ্টুতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গবরণের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বৰ্দ্ধিতা—(জহল-মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট ছান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত পাকে। একারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে الحج مناسك বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ ছান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে।—(ইবনে-কাসীর) কামুসে শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে এ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলে ইবাদতের বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবুরাস থেকে এই দিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, জহল-মা'আনী ইত্যাদি থেকে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশারিক ও ইসলাম-বিদেবীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসে বিধান ছিল না। তারা তখন নিক যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিভাবে ধারা নতুন শরীয়ত ও কিভাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা, আস্তাহ তা'আলা প্রত্যেক উষ্টুতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিভাব দিয়েছেন। অন্য কোন উষ্টুত ও শরীয়ত আস্তাহুর প্রক থেকে মা'আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উষ্টুতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। মতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূর' ডাক্ষ

ରହିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନକେ 'ନାସେଥ' ତଥା ରହିତକାରୀ ମନେ କରା ହବେ । କାଜେଇ ଯିନି ନତୁନ ଶରୀଯତେର ବାହକ, ତୀର ସାଥେ କାଉକେ ତର୍କ-ବିତର୍କର ଅନୁମତି ଦେଓୟା ଯାଇ ନା । ଆୟାତେର ସରଶେଷ ବାକ୍ୟ -**فَلَا يَنْأِيَ زَعْكَ فِي الْأَمْرِ**- ଏର ସାରମର୍ଦ୍ଦଓ ତାଇ । ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନକାଳେ ଯଥନ ଶୈବନବୀ (ସା) ଏକାଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀଯତ ନିଯେ ଆଗୟନ କରେଛେ, ତଥନ ତୀର ଶରୀଯତେର ବିଧି-ବିଧାନ ନିଯେ ତର୍କବିତର୍କ କରାର ଅଧିକାର କାରାଓ ନେଇ ।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে
প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে
অবঙ্গীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল।
ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে—অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই
উভয় তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উদ্দতকে আলাদা
আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুক্তী খুটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন
পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক
করবে; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে
বলা হয়েছে : دُرْكَلِ مُسْتَقْبِلٍ مُّدْيٍ أَنْتَ إِلَيْهِ أَنْتَ لَعْلٌ أَنْتَ رَبُّكَ অর্থাৎ আপনি তাদের আপনি বা তর্কবিতর্কে
প্রভাবাবিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্ত্বের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল
থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ : উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত ঘনসৃষ্ট হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে ইয়েহু কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আঙ্গুহুর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মুসা ও ঈসা (আ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, ইয়েহু কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উস্তকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে ছাঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আঙ্গুহু তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। وَإِنْ جَاءَ لَكُمْ فَقْلُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ।

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ
بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ⑩ وَإِذَا تُشَلِّي عَلَيْهِمْ أَيْمَانَ

بِيَنْتَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُشْكِرُ مَا يَكَادُونَ يَسْطُونَ
 بِالَّذِينَ يَتَوَلَّنَ عَلَيْهِمُ اِيَّنَا اَقْلَ أَفَأَنْتُمْ كُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ
 اَنَّا رُطْ وَعَدَهَا اللَّهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ④٣ يَا اَيُّهَا
 اَنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَإِسْتَعِوا لَهُ اِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا هُوَ وَانْ يَسْلِبُوهُمْ
 اَلْبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِدُو هُوَ مِنْهُ ضَعْفُ الظَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ ④٤
 مَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقٌّ قَدْرٍ اِنَّ اللَّهَ لَقَوْيٌ عَزِيزٌ ④٥

(৭১) তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর পৃজ্ঞা করে, যার কোন সনদ নাইল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নাই। বর্তুত যাশিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুশ্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখেয়ুখে অসঙ্গোবের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারযুক্তি হবে ওঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা আগুন; আল্লাহ কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনহল। (৭৩) হে সোকসকল! একটি উপর্যুক্ত বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে থুন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পৃজ্ঞা কর, তারা কখনও একটি যাহি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর যাহি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু হিন্দিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহর যথাযোগ্য অর্থাদা বুঝেনি। নিচয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাজয়শীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা (যুশরিকরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যাদের (ইবাদতের বৈধতা) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোন দলীল (বীর কিতাবে) প্রেরণ করেননি এবং তাদের কাছে এর কোন (যুক্তিগত) প্রমাণ নেই এবং (কিয়ামতে যখন শিরকের কারণে যা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৩৬

তাদের শাস্তি হবে তখন) জালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না (অর্থাৎ তাদের কর্ম যে ভাল ছিল, এর কোন দলীলও কেউ পেশ করতে পারবে না এবং কার্যত কেউ তাদেরকে শাস্তির কবল থেকে বঁচাতে পারবে না। গোমরাই এবং সত্যপহীদের প্রতি শক্রতা পোষণে তাদের বাড়াবাড়ি এত বেশি যে,) যখন তাদের সামনে আগাম (ভাওয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কিত) সুন্পট আয়াতসমূহ (সত্যপহীদের মুখ থেকে) আবৃত্তি করা হয়, তখন তুমি কাফিরদের চোখে-যুৰে (আন্তরিক অসংজ্ঞারের কারণে) মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে (যেমন মুখমঙ্গল কুক্ষিত হওয়া, নাক সিটকানো, জুকুঞ্জল ইত্যাদি। এসব প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়) যেন তারা তাদের উপর (এখন) আক্রমণ করে বসবে, যারা আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করে। অর্থাৎ সর্বদাই আক্রমণের আশংকা হয় এবং মাঝে মাঝে হয়েও থায়। আপনি (মুশরিকদেরকে) বলেনঃঃ (তোমরা যে কোরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাক সিটকাও, তবে) আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা (অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা) মন্দ কিছুর সংবাদ দেবে? তা আগুন। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা নিকৃষ্ট ঠিকানা! (অর্থাৎ কোরআনকে সহ্য না করার ফল অসহনীয় দোষখ ভোগ। ক্রোধ, গোস্মা ও প্রতিশোধ দ্বারা তো এই বিরক্তি কিছুটা পুরিয়েও নাও। কিন্তু দোষখ ভোগের যে বিরক্তি, তার কোন প্রতিকার নেই। এরপর একটি জাজ্বল্যমান দলীল দ্বারা শিরক বাতিল করা হচ্ছেঃঃ) লোকসকল! একটি বিচির বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন (তা এই যে), তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, তারা (সামাজি) একটি মাছিই সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা সকলেই একত্রিত হয়। (সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তারা তো এমন অস্কুম যে,) মাছি যদি তাদের কাছ থেকে (তাদের বৈবেদ্য থেকে) কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে উহা থেকে তারা তা উদ্ধার (ও) করতে পারে না। ইবাদতকারী ও যার ইবাদত করা হয়, উক্তয়েই শক্তিহীন। (আফসোস,) তারা আল্লাহর যথাযোগ্য স্থান করেনি। (উচিত ছিল তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করা; কিন্তু তারা শিরক করতে উক্ত করেছে। অথচ) আল্লাহ তা'আলা পরম শক্তিধর, সর্বশক্তিমান। (সুতরাং ইবাদত খাচিতভাবে তাঁরই প্রাপ্য ছিল। যে শক্তিধর ও পরাক্রমশালী নয়, যার শক্তিহীনতা সুন্পট প্রমাণাদি দ্বারা জানা হয়ে গেছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপর্যুক্ত ও মূর্তিপূজার বোকাসুলত কানের ব্যাখ্যা : ﴿مَنْ يُرِبِّ مَلَائِكَةً﴾ এই শব্দটি সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুন্পট উপর্যুক্ত দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোকারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বন্ধুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিয়া এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিন্তু উক্তার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে

বলে তাদের মূর্খতা ও বোকাখি ব্যক্ত করা হয়েছে ; অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশি শক্তিহীন হবে । مَا فَدَرُوا اللَّهُ حَقُّ قَدْرُهُ । অর্থাৎ এই নির্বোধ নিম্নকহারামরা আল্লাহর ঘর্যাদা বুঝেনি । ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে । وَاللَّهُ أَعْلَمُ ।

اللَّهُ يَصُطِّفِي مِنَ السَّلِّكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ
الْأُمُورُ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُعُوبُوا سُبُّوا وَأَسْجَدُوا وَأَعْبَدُوا
رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ وَجَاهَهُدُوا فِي اللَّهِ
حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ۗ إِنَّمَّا أَبْيَكُمُ ابْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمِيقُ الْمُسْلِمِينَ ۗ
مِنْ قَبْلٍ وَّفِي هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونُوا
شَهِيدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكُوْةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مُوْلَكُكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

(৭৫) আল্লাহ কেরেণ্টা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন । আল্লাহ সর্বশ্রান্ত, সর্বদৃষ্ট । (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে । (৭৭) হে যুমিলগঢ, তোমরা করু কর, সিজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার । (৭৮) তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রম দীক্ষার কর যেভাবে শ্রম দীক্ষার করা উচিত । তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংক্রিতা আখ্যন্তি নি । তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কার্য থাক । তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান নেবেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হব এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও যানবমণ্ডলীর জন্য । সুতরাং তোমরা নামায কার্য কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর । তিনিই তোমাদের মালিক । অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (স্বাধীন । তিনি) রিসালতের জন্য (যাকে চান মনোনীত করেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে (যে ফেরেশতাদেরকে চান আল্লাহ্) বিধান (পর্যবেক্ষণের কাছে) পৌছানেওয়ালা (নিযুক্ত করেন) এবং (এমনিভাবে) মানুষের মধ্য থেকেও (যাকে চান সাধারণ মানুষের কাছে বিধান পৌছানেওয়ালা নিযুক্ত করেন । অর্থাৎ আল্লাহ্ র মনোনয়নের উপরই রিসালত ভিত্তিশীল । এতে ফেরেশতা ইওয়ার কোন বিশেষত্ব নেই ; বরং যেভাবে ফেরেশতা রাসূল হতে পারে, যা মুশরিকরাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে মানবও রাসূল হতে পারে । এখন প্রশ্ন রাইল যে, মনোনয়ন বিশেষ একজনকে কেন দান করা হয় ? এর বাহ্যিক কারণ রাসূলগণের অবস্থার বৈশিষ্ট্য (এবং এটা) নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (অর্থাৎ তিনি (সব ফেরেশতা ও মানুষের) ভবিষ্যৎ ও অঙ্গীত অবস্থাসমূহ (খুব) জানেন (অতএব বর্তমান অবস্থা তো আরও উভয়রূপে জানবেন । মোটকথা, সব দেখা ও শোনা অবস্থা তাঁর জানা । তন্মধ্যে কারও কারও অবস্থা এই মনোনয়নের পচাতে কাজ করেছে ।) এবং (প্রকৃত কারণ এর এই যে,) সব কাজ আল্লাহ্ তা'আলারই উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তিনি ব্যবস্থাপূর্ণ মালিক ও স্বাধীন কর্তা । তাঁর ইচ্ছা এককভাবে সরকিছুর অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে । এই ইচ্ছার জন্য কোন অগ্রাধিকারীর প্রয়োজন নেই । সুতরাং প্রকৃত কারণ আল্লাহ্ ইচ্ছা এবং এর কারণ জিজ্ঞেস করা অনর্থক । মানুষের মানুষের অর্থ তাই ; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে তাঁর কোন কর্মের কারণ জিজ্ঞেস করার অধিকার কারও নেই ।

এই সূরার উপসংহারে প্রথমে শাখাগত বিধান ও শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে । এবং ইবরাহীমী ধর্মে অটল ধাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এর প্রতি উৎসাহ দানের নিমিত্ত কতক বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে ।) হে মু'মিনগণ, (তোমরা মৌলিক বিধান মেনে নেওয়ার পর শাখাগত বিধানও পালন কর ; বিশেষত নামাযের বিধান । সুতরাং) তোমরা মক্ক কর, সিজদা কর এবং (সাধারণভাবে অন্যান্য শাখাগত বিধানও পালন করে) তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর ও সংকর্ম কর । আশা করা যায় যে, (অর্থাৎ ওয়াদা করা হচ্ছে যে,) তোমরা সফলকাম হবে । আল্লাহ্ র কাজে অঙ্গীত চেষ্টা কর, যেমন চেষ্টা করা উচিত । তিনি তোমাদেরকে (অন্যান্য উভয় থেকে) স্বতন্ত্র করেছেন । (যেমন **جَمِنَّا** ইত্যাদি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ।) এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংক্রীত রাখেননি । (হে মু'মিনগণ ! যে ইসলামের বিধি-বিধান পূরোপুরি পালন করার আদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই ইবরাহীমী মিল্লাত ।) তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম থাক । তিনি তোমাদের উপাধি 'মুসলমান' রেখেছেন পূর্বেও এবং এতেও (অর্থাৎ কোরআনেও), যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হয় এবং (রাসূলের সাক্ষ্যদানের পূর্বে) তোমরা একটি বড় মোকদ্দমায়, যার এক পক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিপক্ষ তাঁদের বিরোধী জাতিসমূহ হবে ; বিরোধী) লোকদের বিপক্ষে সাক্ষ্যদাতা হও (রাসূলের সাক্ষ্য স্বারা তোমাদের সাক্ষ্য সমর্থিত হবে এবং পর্যবেক্ষণের

পক্ষে ফয়সালা হবে।) সুতরাং (আমার বিধি-বিধান পুরোগুরি পালন কর। অতএব) তোমরা (বিশেষভাবে) নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং (অবশিষ্ট বিধানেও) আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর (অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে ধর্মের বিধি-বিধান পালন কর। আল্লাহ ব্যতীত অপরের সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি এবং প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতির দিকে ঝক্ষেপ করো না)। তিনি তোমাদের কার্যোক্তারকারী। (অতএব) তিনি কতই না উত্তম কার্যোক্তারকারী এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ أَمْتَوا أَرْكَعُونَ وَاسْجَدُونَ وَابْكَمُ
সূরা হজ্জের সিজদায়ে তিলাওয়াত :
সূরা হজ্জে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আয়ম আবু হামীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (র)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সিজদার সাথে কম্ক ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বুবা যায় যে, এখানে নামাযের সিজদা বুবানো হয়েছে, যেমন **وَاسْجَدُنِي وَارْكَعِي** আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সিজদা উদ্দেশ্য। (এই আয়াত তিলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : সূরা হজ্জ অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে তিলাওয়াত আছে। ইমাম আয়মের মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ ও হাদীসের কিভাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ — مُجَادِدَةٌ শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট দ্বীকার করা। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সংঘাত শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। **— حَقَّ جِهَادٍ**-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াক্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও গুরীয়তের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হ্যরত ইবনে আবাস বলেন : **— حَقَّ جِهَادٍ**-এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরকারকারীর তিরকারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

اعملو حُقُّ عَلِيهِ وَاعبُدوهُ حُقُّ عِبَادَتِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন : এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বুবানো হয়েছে এবং এটাই **حَقَّ جِهَادٍ**

অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী প্রযুক্তি এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

قد متم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد لهواه
تَوَمَّرَ رَجُلٌ جِهَادِ الْأَكْبَرِ فَقَالَ مَجَاهِدَةُ الْعَبْدِ لِهَوَاهِ
جِهَادِ الْأَصْغَرِ

অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিভির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তফসীরে-মায়হারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়ত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে রত ছিলেন, প্রতিভির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনও চালু ছিল ; কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রতিভির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রূপক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে-কামেলের সংস্রগ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিদ্যমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

উপরে মুহাম্মদী আল্লাহর মনোনীত উচ্চত : **إِنَّمَا يَحْرِرُ الرَّبْعَةَ وَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ أَنْكَارِكُمْ فَإِنَّمَا يَحْرِرُ الرَّبْعَةَ**— ইবনে আসকা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাইলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্য থেকে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্য থেকে আবাকে মনোনীত করেছেন।—(মুসলিম, মায়হারী)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। ‘ধর্মে সংকীর্ণতা নেই’—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ একস্থ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন শুনাহ্ নেই যা তঙ্গো করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আয়াব থেকে নিঃস্তি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উচ্চতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় শুনাহ্ ছিল, যা তঙ্গো করলেও মাফ হতো না।

হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন : সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কোরআন পাকে একে এসে আলাল শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উচ্চতকে এমন কোন বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন : সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এই ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্লাহবিল্লাহ পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কর্তৃত না পরিশ্রম দ্বীকার করতে হয় ; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুর্দুহ ও কঠিন। আন্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোন কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়,

তাকে কাজের-সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে কঠিন খোওয়া ও কঠিন তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে কঠিন লাভ করা সভ্যতাই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, কঠিন তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হয়রত কায়ী সানাউল্লাহু তফসীরে যাযহারীতে বলেন : ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, এ কথার তৎপর্য এক্ষণ্টও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উচ্চতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উচ্চতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কঠিন সহজ বরং আমন্দায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অঙ্গের সীমান্তের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে তারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হয়রত আমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : جعلتْ أَرْبَعَ نَارًا يَأْتِي مَنْ يَشَاءُ فِي الْمُصْلِحَةِ (আহমদ, নাসায়ী, হাকিম)

অর্থাৎ এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাত। এখানে অকৃতপক্ষে কুরাইশী মু'মিনদেরকে সরোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফর্মাতে শামিল হয় ; যেমন হাদীসে আছে : الناسَ تَبَعُّ لِفَرِيشِ فِي هَذَا الشَّانِ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعُّ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ أَرْبَعَ سব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কুরাইশীদের অনুগামী এবং কাফির কাফির কুরাইশীর অনুগামী। —(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন : আয়াতে সব মুসলমানকে সরোধন করা হয়েছে। হয়রত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সা) হচ্ছেন উচ্চতের আধ্যাত্মিক পিতা। যেমন তাঁর বিবিগণ ‘উস্মাহাতুল-মু’মিনীন’ অর্থাৎ মু'মিনদের মাতা। নবী করীম (সা) যে হয়রত ইবরাহীমের বংশধর, একথা সুন্পট ও সুবিদিত।

—অর্থাৎ হয়রত ইবরাহীমই কোরআনের পূর্বে উচ্চতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ‘মুসলিম’ নামকরণ করেছেন ; যেমন হয়রত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে : رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ —مِنْ ذِرْبَتَنَا أَمْ مُسْلِمَةَ لَكَ—কোরআনে মু'মিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হয়রত ইবরাহীম নন ; কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

—لِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) হাশরের ময়দানে সাক্ষ দেবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলা'র বিধি-বিধান এই উচ্চতের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উচ্চতে মুহাম্মদী তা'বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য প্রয়গস্থর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উচ্চতেরা অঙ্গীকার করে বসবে। তখন উচ্চতে মুহাম্মদী সাক্ষ দেবে যে, সব প্রয়গস্থরগণ নিশ্চিতকরণেই তাদের উচ্চতের কাছে আল্লাহ-

তা'আলার বিধানাবলী পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উপর্যুক্তদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উপর্যুক্ত মুহাম্মদীর অঙ্গিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিন্তু সাক্ষী হতে পারে ? উপর্যুক্ত মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে : আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল (সা)-এর মুখে এ কথা শনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কৃত্ত করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুধারী ইত্যাদি এছে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَأَقْبِلُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْرَةَ—উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেতে উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্ বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলীর মধ্যে এ হলো শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহু ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

—**أَرْدَأْ وَأَغْنِيْ مَسْمَوْبَاللَّهِ**—অর্ধাং সব কাজে একমাত্র আল্লাহ্ উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন : এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোষ্যা কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন : এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক ; যেমন এক হাদীসে আছে :

تَرَكْتُ فِيمْ كَمْ أَمْرَيْتُ لَنْ تَضْلُلُوا مَلْمَسْكَتْمَ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسَنَةَ

রসূলে—

আমি তোমাদের জন্য দু'টি বক্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু'টিকে অবলম্বন করে থাকবে ; পথভট্ট হবে না। একটি আল্লাহ্ কিতাব ও-অপরটি আমার সুন্নত।
—(মাযহারী)

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

সূরা আল-মু'মিনুন

মকাব অবতীর্ণ, ৬ রকু, ১১৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خَشِعُونَ ②

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكْوَةِ فَعِلُونَ ④

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ ⑤ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ اِيمَانُهُمْ

فِيهِمْ غَيْر مَلُومِينَ ⑥ فَمَنِ ابْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ⑦

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ⑧ وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوةِهِمْ

يُحَافِظُونَ ⑨ أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ⑩ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ⑪

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ⑫

পরম কর্মান্বয় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

- (১) মু'মিনগণ সকলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাবে বিনয়-স্ত্র, (৩) যারা অনর্থক কথা-আর্তায় নিশ্চিত, (৪) যারা যাকাত দাত করে থাকে (৫) এবং যারা নিজেদের বৌনাককে সংযত রাখে; (৬) তবে তাদের জী ও যাতিকামাত্তুক দাসীদের কেত্তে সংযত না রাখলে তারা ডিগ্রুভ হবে না। (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংবনকারী হবে। (৮) এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে ছঁশিয়ার থাকে (৯) এবং যারা তাদের নামাবসমূহের খবর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা শীতল ছায়াশয় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

সূরা মু'মিনুনের বৈশিষ্ট্য ও প্রেরিত : মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত উমর ফারক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হতো, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে যৌমাহির গুঞ্জনের ন্যায় আগুয়াজ খনিত হতো। একদিন তাঁর কাছে এমনি আগুয়াজ গুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্য থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) কিবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত শোরা পাঠ করতে লাগলেন :

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقِصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تَهْنِئْنَا وَأَعْطِنَا وَلَا تَخْرِمْنَا وَأَشْرِنَا -
وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِ عَنَّا وَأَرْضِنَا -

অর্থাৎ হে আল্লাহুল্লাহ আমাদেরকে দিও দাও—কর দিও না—আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—সাধিত করো মা'। আমাদেরকে দাও কর—বর্কিত করো মা। আমাদেরকে অন্যের উপর অগ্রাধিকার দাও—অন্যদেরকে দিও না এবং আমাদের প্রতি সতৃষ্টি থাক এবং আমাদেরকে তোমার সতৃষ্টিতে সমৃষ্টি কর। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এক্ষুণ্ণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ-যদি এই দশটি আয়াত পুরোপুরি পালন করে, তবে সে শোরা জান্মাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোক্তভিত্তি দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসারী তফসীর অধ্যায়ে ইয়াবীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র কিরণ ছিল? তিনি বললেন : তাঁর চরিত্র অর্ধাং হভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তি঳াওয়াত করে বললেন : এগুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচের সেইসব মুসলিমান (পরকালে) সকলকাম হমেছে, যারা (বিশ্বাস ও ক্ষক্ষকরণের সাথে সাথে নিম্নবর্ণিত ত্বরণবলী ছাড়া কৃণবিত্ত ; অর্ধাং তারা) নামাযে (ফরয হোক কিংবা নফল ইত্যাদি) বিনয়-ন্ত্র, যারা অনর্থক বিবরণি থেকে (উক্তিগত হোক ক্রিয়া কুর্যাগতভাবে হোক) বিরত থাকে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) তাদের আস্ত্রণক্ষি করে এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে (অবৈধ কামবাসনা চরিতার্থ করা থেকে) সংযত রাখে ; তবে তাদের স্তৰি ও (শ্রেণীবর্তসম্বন্ধ) দাসীদের ক্ষেত্রে (সংবত রাখে না)। কেবল, (এ স্বাপারে) তারা তিরকৃত হবে মা। হ্যা, যারা এগুলো ছাড়া (অন্যত্র কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে) ইচ্ছুক হবে, তারা (শ্রেণীবর্তের) সীমালংকুষকারী হবে। এবং যারা (গম্ভীর) আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি (যা কোন কাজ-কারবার প্রসঙ্গে করে কিংবা এমনিতেই প্রাপ্তিক পর্যায়ে করে) অনোরোগ থাকে এবং যারা তাদের (ফরয) নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান, তারাই উত্তরাধিকার-দাত করবে। তারা (সুষ্টিক) কিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে (এবং) তথ্য তারা চিরকাল ধাকবে।

আনুযায়ী জ্ঞানক্ষয় বিষয়

সাকল্য কি এবং কোথায় ও কিকাপে পাওয়া, যায় ? — (সাকল্য) শব্দটি কোরআন-ও-হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়ান ও

ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের লিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাহু পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(ব্যাখ্যা) এই শব্দটি দেশের সংক্ষিপ্ত জ্ঞেয়ি সুন্দরপ্রসারী অর্থবচ। কোম যদৃব এর চাইতে ক্ষেত্রে কোম কিছু কাছলাই করতে পারে না। বলা বাহ্য, একটি মনোবাহুত অপূর্ব না, যাকে এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জগতের কোম অবস্থার বাস্তিতেও আয়াতাধীন নয়। সুন্দরজ্ঞের অধিকারী বাস্তবাহ হোক কিন্তু অর্থন্ত রাজ্যে ও প্রযোগের হোক, জগতে অবাহিত কোন কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসন্ত জাতের হওয়া মাঝেই অবিজ্ঞে তা পূর্ণ হওয়া কারণ কল্প সহবপন নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসাম ও ধৰ্মসের ঘটক। এবং যে কোন বিশ্বের সম্মুখীন হওয়ার আশেক্ষা থেকে তো কেউ মৃত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেবল, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রদ্ধের আবাসস্থল এবং এর কোম করুর স্থানিত্ব ও হিসেব মেই। এই অবস্থা শিল্পস অন্য এক জগতে পাওয়া বায়, যার নাম আল্লাহ। সে কেবলই সামুদ্রের প্রত্যেক মনোবাহু সর্বকথ ও বিমা প্রতীকার অর্জিত হবে। **وَلَمْ يَأْتِ مُنْتَهٰى مِنْ**—অর্থাৎ তার বা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম কথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকই এ কথা বলতে বলতে সেখানে আবেশ করবে :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لِغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَخْلَقَ بَارِئَتِي مِنْ فِضْلِهِ

অর্থাৎ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আয়াদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং দীর কৃপায় আয়াদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বাহু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্মৃত। এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকই কিছু যা কিছু করি ও দৃঢ়ের সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আয়াদের দুঃখ দূর হলো। কোরআন পাক সূরা আলায় সাফল্য লাভ করার ব্যবহারে নিয়ে গোড়ে বলেছে : **فَإِذَا أَتَيْتَ أَنْجِلَيْمَ**—অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পৰিদ্রঢ় করা। এর সাথে সাথে আরও ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে, তার কাজ তখন দুনিয়া নিয়ে ব্যক্তিগত থাকা নয়। বলা হয়েছে : **لَمْ يَأْتِ مُنْتَهٰى**—অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর আধ্যাতিকার নিয়ে থাক ; অথচ পরকাল উত্তমও ; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাহু অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরজ্ঞানীও।

গোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও ব্যবস্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র আল্লাহতেই পাওয়া যেতে পারে—দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার পিক নিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে স্ফুরি লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা আল্লা তার আয়াদেরকে দাত করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা আল্লা সৈইসব সুযোগের সাফল্য দান করার উদ্দাদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাজ্জি গুণে উপরিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সভাব্য সাফল্য সবই এই উদ্দাদার আকর্ষণ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত শব্দে গুণাবিত মুমিনগণ কর্মকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাবে—এ কথা বোধগম্য, কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যিক কাফির ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোর। প্রতি যুগের পয়গম্বরগণ এবং তাদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সুম্পত্তি। দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীনই হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরিহিযগার সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফির ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তাই; অর্থাৎ মুমিন ও কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সঙ্ক্ষ অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের ঘট্টে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিগামের ওপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি শব্দে গুণাবিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিগামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি স্থান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়—এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ক্রত্বে ততই এর পক্ষে সাক্ষ পাওয়া যাবে।

আমাতে উল্লিখিত সাতটি শব্দ : সর্বপ্রথম শব্দ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা করে এখানে সেই সাতটি শব্দ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই :

প্রথম, নামাযে “খুশ” তথা বিনয়-নন্দি হওয়া। ‘খুশ’র আভিধানিক অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহু ছাড়া অন্য কোন কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা, অর্থাৎ অনর্থক নড়াচড়া না করা।—(বয়ানুল কোরআন) বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া ‘নামাযের মাকরহসমূহ’ শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে যাযহারীতে খুশ এই সংজ্ঞা হ্যরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশ সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হ্যরত মুজাহিদ বলেন : দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশ। হ্যরত আলী (রা) বলেন : ডানে-বামে, জৰুরে করা থেকে বিরত থাকা খুশ। হাদীসে হ্যরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : নামাযের সময় আল্লাহু তা'আলা বাস্তুর প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামায়ী অন্য কোন দিকে জৰুরে করে। যখন সে অন্য কোন দিকে জৰুরে করে, তখন আল্লাহু তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন।—(আহমাদ, নাসায়ী আবু দাউদ-মাযহারী) নবী করীম (সা) হ্যরত আনাসকে নির্দেশ দেন : সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখ এবং ডানে বামে জৰুরে করো না।—(বাযহাকী মাযহারী)

হয়েরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাঢ়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন : لَوْ خَضَعَ قَلْبُ هَذَا الْخَشَعَتْ جَوَارِدُهُ^۱ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিতা থাকত ।—(মায়ারী)

নামাযে খুশুর প্রয়োজনীয়তার স্তর : ইমাম পায়ঘালী, কুরতুবী এবং অন্য আরও কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাযে খুশ ফরয । সম্পূর্ণ নামায খুশ ব্যতীত সশ্রম হলে নামাযই হবে না । অন্যেরা বলেছেন : খুশ নিঃসন্দেহে নামাযের প্রাণ । খুশ ব্যতীত নামায নিষ্পাণ; কিন্তু একে নামাযের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশ না হলে নামাযই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরয ।

হয়েরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন : نَمَاءَيْ—শুন্দ হওয়ার জন্য খুশ অভ্যাসকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশ ফরয নয় ; কিন্তু নামায কব্ল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশ ফরয । তাবরানী 'মু'জামে-কবীরে' হয়েরত আবু দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : سَرْبَرَثَمَ^۲ যে বিষয় উচ্চত থেকে অন্তর্ভুক্ত হবে, তা হচ্ছে খুশ । শেষ পর্যট লোকদের ঘട্টে কোন খুশ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না ।—(বয়ানুল-কোরআন)

پُرْ مُّمِينَ فِي الْجَنَاحِيْ^۳—وَالَّذِينَ فِي
لِفْوٍ — وَالَّذِينَ فِي عَنِ الْأَغْوَى مُعْرِضُونَ^۴
এর অর্থ অনর্থক কথা অর্থবা কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই । এর
অর্থ উচ্চতার গুনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই ক্ষতি বরং বিদ্যমান । এ থেকে বিরত
থাকা ওয়াজিব । উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নতর । একে বর্জন করা
ন্যূনপক্ষে উচ্চ ও প্রশংসার্হ । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لَا مَنْ حَسِنَ اسْلَامَ الْمُرْءَ تَرَكَ^۵—
—يَعْنِي—অর্থাৎ 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত
হতে পারে ।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা
হয়েছে ।

তৃতীয় গুণ যাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা । পরিভাষায় মোট অর্থ-সম্পদের
একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত বলা হয় । কোরআন পাকে এই
শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও
উদ্দেশ্য হতে পারে । এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মকাব অবতীর্ণ । মকাব যাকাত
ফরয হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর ফরয করা হয়েছে । ইবনে কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের
পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মকাবেই ফরয হয়ে গিয়েছিল । সূরা মুয়ায়ারিল
মকাব অবতীর্ণ—এ বিষয়ে সবাই একমত । এই সূরারও الصَّلَاةُ^۶—এর সাথে
—الرُّزْুُ^۷—উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু সরকারি পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং
'নিসাব' ইত্যাদির বিজ্ঞারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয় । যাঁরা যাকাতকে
মদীনায় অবতীর্ণ বিধানবলীর ঘণ্টা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য তাই । যাঁরা বলেন
যে, মদীনায় পৌছার পরই যাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এ স্থলে 'যাকাত'
শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন । তফসীরের সার-সংক্ষেপেও এই
অর্থ নেওয়া হয়েছে । আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত

કોરાઓ પાકે ખેદાને ફરય યાકાતેર ઉટ્ટોથ કરા હૈ, સેખાને **لِرَكْلُو**—**إِنْجَانِي** શિરોનામે બર્ના કરા હૈ। એખાને શિરોનામ પરિવર્તિત કરે રહ્યા હૈ—**الرَّكْلُون**—**فَلَعْلَون**—**بَلَائِي** ઇચ્છિત કરે યે, એખાને પારિજાવિક અર્થ બુઝાનો હ્યાની। એજાડા **فَلَعْلَون**—**بَلَائِي** પર્બતી હત્તિસૂર્યભાવે (કાજ)-એ સાથે સંશોધારે। પારિજાવિક યાકાત ફુલ નાય ; બરં અર્થકઢી એકટા અંશ। **فَلَعْلَون** શબ્દ બારા એહી અંશ બુઝાતે સેલે બ્યાખ્યા તુ બર્નાની આલ્યા ના નિયે ટીપાર નેહિ। ગોટુકથા, આરાતે યાકાતેર પારિજાવિક અર્થ નેઓયા હલે યાકાત વૈ બુઝિનેર જન્ય અપવિહાર્ય ફરય, તો બર્નાર અપેક્ષ રાખે ના। પર્કાન્નાને યાકાતેર અર્થ આજાંદી નેઓયા હલે તાઓ ફરયાયે। કેનના, શિરક, રિયા, અહ્સાય, હિંસા, પ્રકાતી, સોંગ-સોલસા, કાર્પણ ઇંગ્લાન્ડિ થેકે નફસકે પરિવત રાખાકે આજાંદી બલા હૈય। એખલો સર હારામ તુ કદીરા તુનાનું। નફસકે એખલો થેકે પરિવત કરા ફરયા।

فَلَعْلَون **لِرَكْلُو** કોને હારામ થેકે સંયત રાખો : **وَالَّذِينَ مُمْلَأُوا بِرُحْمٍ حَافِظُونَ الْأَعْلَى** **فَلَعْلَون** **أَرْدَانِ** અર્થાં યારા જી વિધિ મોતાબેક કામપ્રબૃદ્ધિ ચરિતાર્થ કરા છાડા અન્ય કારા સાથે કોન અવૈધ પણ્ય કામવાસના પૂર્ણ કરતે પ્રવૃત્ત હૈય ના। આરાતેર શેવે બલા હયેછે : **فَلَعْلَون** **أَرْدَانِ** અર્થાં યારા શરીરભેર વિધિ મોતાબેક જીથબા દાસીદેર સાથે કામવાસના પૂર્ણ કરે, તારા તિરંકૃત હવે ના। એતે ઇચ્છિત આહે યે, એહી પ્રયોજનકે પ્રયોજનને સીમાય રાખતે હવે-જીવનેર લેખ્ય કરા યાબે ના। એટો એહી પર્વાયારેહ કાજ યે, કેટ એકુપ કરુલે સે તિરકુરયોગ્ય હવે ના। **وَالَّذِينَ**

અર્થાં **વિવાહિત** જી અથવા શરીરભેર સાથે કામવાસના પૂર્ણ કરા છાડા કામપ્રબૃદ્ધિ ચરિતાર્થ કરાર આવે કોન પથ હાળાં નય ; યેમનિ હારામ નારીકે વિવાહ કરાયાનું હિનાર હુક્મ વિદ્યાનાનું। જી અથવા દાસીર સાથે હારોય તુ નેફાસ અવહ્યા કિંદા અધારાબિક પણ્યા સહકાર જાણ અથવા કેનન, પુરુષ, કાલક, અથવા જીક-જાતુર સાથે કામપ્રબૃદ્ધિ ચરિતાર્થ કરા—એખલો સર વિવિધ તુ હારામ। અધિક સંખ્યાક તફસીરવિદેર એતે અસ્તુતું—**أَسْتَعْنُكَ** અર્થાં હત્તિસૂર્યાં એ અસ્તુતું।—(બયાનુલ કોરાઓ, કુન્ફુન્ની, બાહ્યન મુજીબ)

અન્ય કુણ અધિકાંત અસ્તાર્ણ કરા : **وَالَّذِينَ مُمْلَأُوا بِمَآનَاتِهِمْ وَعَمِدُهُمْ رَاعُونَ** 'આધાનાં' શહેર આતિધીનિક અર્થે એન પ્રાણેકાટિ વિવય શામિલ, યાર જીયાદુ કોન દ્વારિ બહલ કરે એંધ સે વિવયે કોન બાયિનું ઉપર આંદ્રા હૃદાનું તુલા કરા હૈય। એ અસ્થ્યા એકાર આહે વિવયા એ લાંબા અંત હત્યા સંદ્રભે એકે બહચને બયબહાર કરા હયેછે, યાંતે વાદતીર એવારે એ અસ્તુતું હત્યે યાય—**هَبْلُكُلُو**—**هَبْلُكُلُو** તુથા આંદ્રાનું ઇંક સંપર્કિત હોયક કિંદા હુક્માં-દીદાં તુથા બાદન એક સંપર્કિત હોયક। આંદ્રાનું હુક સંપર્કિત આધાનાં હૈયે શરીરભેર આસોલિત સકળ ફરય તુ આંદ્રિય બાદન એક વાદતીર હારાય તુ આંદ્રાનું વિવય થેકે આંદ્રાનું કરા। બાદન હુક સંપર્કિત આમાનજેઝ એટે અધિક

আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্গণ করা পর্যবেক্ষণ এর হিমগত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অপৰ্ণত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ ব্যবায়ধাত্বাবে সশ্পন্দ করা এবং মজুর ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসধাতকতা। এতে জানা গেল যে, আর্থান্তের হিমগতি ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুন্নত আলায়ার অর্থবহু। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ শৃঙ্খলা ৪ অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার বলতে প্রথমত বিপৰীক্ষিক চূড়ি বুঝায়, যা কেবল ম্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। একপ চূড়ি পূর্ণ করা করব এবং এর খেলাক্ষ করা বিশ্বাসধাতকতা, প্রত্যরূপ তথ্য হারাম। বিভীষণ প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়ার্দো বলা হয়। অর্থাৎ একত্রিকভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোন কলম করে দেওয়ার ওয়াদা করা। একপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে。الْأَرْبَعَةِ وَوَادِيَّاً এক প্রকার খণ্ড ; খণ্ড আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতিরেকে এক খেলাক করা চলাছে। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে ; কিন্তু একত্রিক ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। খর্পজাগরণতার প্রতিভাসিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যক্তিত এর খেলাক করা চলাছে।

সপ্তম শৃঙ্খলা নামাযে বজ্রবাস ইওয়া :—নামাযে যত্নবাস ইওয়ার অর্থ নামাযের পারদি করা এবং প্রত্যেক নামায মৌতাহাব ওয়াকে আদায় করা। (ক্রহল-মা'আলী) এখানে স্বল্পত স্বল্পটির বহুচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পীচ ওয়াকের নামায বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মৌতাহাব ওয়াকে পারদি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুল্কতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নতু ইওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে স্বল্পটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নকল হোক—নামায মাত্রেই আগ হচ্ছে বিনয়-নতু ইওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি শুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বাদ্দার হক এবং এতদসংগ্রহে সর বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে বাকি এসব শুণে গুণাবিত হয়ে যায় এবং এতে অটল ধাকে, সে কামেল ম'মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয় প্রশিখানযোগ্য যে; এই সাতটি শুণ শুনও করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইবিত আছে যে, নামাযকে নামাযের মত পারদি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট শুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أَوْفِكْ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْنَسَ— উল্লিখিত শব্দে গুণাবিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব শব্দে গুণাবিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। **فَدَافِعْ**। বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ مِنْ سَلَّةٍ مِنْ طِينٍ ⑭ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَكَبِّينَ ⑮ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَنَخْلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْعَةً فَنَخْلَقْنَا
**الْمُضْعَةَ عِظِيمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لِحَمَّا تَشَمَّ أَشَانَهُ خَلْقًا أَخْرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ
أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ⑯ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمِنُونَ ⑰ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
تَبْعُثُونَ ⑱ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَابِيقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ⑲
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يُقْدِرُ رِفَاسِكَتُهُ فِي الْأَرْضِ ⑳ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ
هُنَّا لَقِدْ رَوْنَ ⑳ فَإِنْ شَاءَنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٌ مِنْ تَخِيلٍ وَأَعْنَابٌ مِنْ
فَوَأِكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونُ ㉑ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ
تَبَتُّ بِالْدُّهُنِ وَصَبِيجٌ لِلَّا كَلِينَ ㉒ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ
نُسْقِيْكُمْ مَسَائِيْ بَطْوِنَهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونُ ㉓ ـ**

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ مُحْمَلُونَ ㉔

(১২) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে উক্তবিদ্যুক্তিপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি উক্তবিদ্যুক্তে জমাট রক্তক্রগে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অঙ্গ সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অঙ্গকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি; অবশেষে তাকে এক নজুনক্রগে দাঁড় করিয়েছি। নিম্নগতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহু কত কল্যাণময়!

(১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুদ্ধিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সঞ্চারণ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সহকে অব্যবধান নই। (১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি ; এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি (১৯) অতঃপর আমি তা হারা তোমাদের জন্য বেঙ্গুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং এই বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও ব্যাঙ্গল উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্য চতুর্পাদ জলসমূহের মধ্যে চিন্তা করার দিক্ষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদয়স্থিত বস্তু থেকে পার্ক করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতকক্ষে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলখালে তোমরা আরোহণ করে ঢলাফেলা করে থাক।

তফসীরের সাক্ষ-সংক্ষেপ

(প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে) আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (অর্থাৎ খাদ্য) থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ প্রথমে মাটি, অতঃপর তা থেকে উদ্ভিদের শক্তিমে খাদ্য অর্জিত হয়)। এরপর আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি, যা (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) এক সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ গর্ভশয়ে) অবস্থান করেছে (তা খাদ্য থেকে অর্জিত হয়েছিল।) অতঃপর আমি বীর্যকে জমাট রূপ করেছি। এরপর জমাট রূপকে (মাংসের) পিণ্ড করেছি। এরপর আমি পিণ্ডকে (অর্থাৎ পিণ্ডের কতক অংশকে) অঙ্গ করেছি। এরপর অঙ্গকে মাইস পরিধান করিয়েছি। (ফলে অঙ্গ আবৃত হয়ে গেছে। এরপর (অর্থাৎ এসব বিবরণের পর) আমি (তাতে রুহ নিষ্কেপ করে) তাকে এক নতুনরূপে দাঁড় করিয়েছি।—যা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ঝুঁটই স্বতন্ত্র ও ডিম্ব। কারণ, ইতিপূর্বে একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যে সব বিবর্তন হচ্ছিল, এখন তা একটি প্রাণবিশিষ্ট জীবিত মানুষে পরিণত হয়েছে।) অতএব শ্রেষ্ঠতম কারিগর আল্লাহ কত মহান। (কেননা, অন্যান্য কারিগর আল্লাহর সৃজিত বস্তুসমূহে জোড়াভালি দিয়েই কোন কিছু তৈরি করতে পারে। জীবন সৃষ্টি করা বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলারই কাজ! বীর্যের উপর উল্লিখিত বিবরণসমূহ এই ক্রমানুসারেই 'কানূন' ইত্যাদি চিকিৎসা প্রদেশে বর্ণিত আছে। এরপর মানুষের সর্বশেষ পরিণতি ফানার কথা বর্ণিত হচ্ছে।) অতঃপর তোমরা (এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনার পর) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। (অতঃপর পুনরুদ্ধান বর্ণিত হচ্ছে :) অতঃপর তোমরা কিয়ামতের দিন পুনরুজ্জীবিত হবে। (আমি যেভাবে তোমাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে অঙ্গিত দান করেছি, তেমনি তোমাদের হামিয়তের বন্দোবস্তও করেছি। সেমতে) আমি তোমাদের উর্ধ্বে সঞ্চাকাশ (যেগুলোতে ফেরেশতাদের যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে) সৃষ্টি করেছি। (এগুলোর সাথে তোমাদেরও কিছু কিছু উপকারিতা সংশ্লিষ্ট আছে।) এবং আমি সৃষ্টি সহকে (অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা সহকে বেঁধবর ছিলাম না। (বরং প্রচ্ছেক সৃষ্টিকে উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি করেছি।) এবং আমি (মানুষের দায়িত্ব ও ক্রমবিকাশের জন্য) আকাশ থেকে মাঝারেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩৮

পরিষিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা (কিছুকাল পর্যন্ত) ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি (মেমুতে কিছু পানি জুড়াগের উপরে এবং কিছু পানি অভ্যন্তরে চলে যায়, যা মাঝে মাঝে বের হতে থাকে)। আমি (যেমন তা বর্ষণ করতে সক্ষম, তেমনি) তা (অর্ধাং পানি) বিলোপ করে দিতে (৩) সক্ষম (বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে হোক কিংবা মৃত্তিকার সুগভীর তরে পৌছিয়ে দিয়ে হোক; যেখান থেকে তোমরা যত্নপাতির সাহায্যেও উজ্জ্বলন করতে না পার)। (কিছু আমি পানি অব্যাহত রেখেছি)। অতঃপর আমি তা (অর্ধাং পানি) দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগন সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে অচুর কেশরাও আছে (টাটক্কা খাতরা হলে এগলোকে মেওয়া মনে করা হয়)। এবং তা থেকে (যা তুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাকে ধাদ্য হিসেবে) তোমরা আহারণ কর এবং (এই পানি দ্বারা) এক (যরত্ন) বৃক্ষও (আমি সৃষ্টি করেছি) যা সিনাই পর্বতে (পুরুর পরিমাণে) জন্মায় এবং যা তৈল নিয়ে উৎপন্ন হয় এবং আহারকারীদের জন্য ব্যাঞ্জন নিয়ে। (অর্ধাং এই বৃক্ষের ফল দ্বারা উত্তর প্রকার উপকার লাভ হয়। বাতি জ্বালানোর এবং আলিঙ্গন করার কাছেও দ্বাগে এবং কৃটি তুবিয়ে ধাওয়ার কাছেও দ্বাগে। উপর্যুক্তি ব্যবস্থাসি পানি ও উজ্জ্বলদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়) এবং (অতঃপর জীবজন্মুর মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন উপকার বর্ণনা করা হচ্ছে ৪) তোমাদের জন্য চতুর্ভুজ জুন্সজুন্সের মধ্যেও চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদ্দৱিত বন্ধু (অর্ধাং দুধ) পান করতে দেই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আরও অনেক উপকারিতা আছে। (তাদের চূল ও পশম কাছে লাগে;) এবং তোমরা তাদের কতকক্ষে ভক্ষণ কর। তাদের (মধ্যে যেগুলো বৌকা বহনের কোগ্য, তাদের) পিঠে ও অল্পানন্দে তোমরা আলোকণ করে চলাফেরা (৫) কর।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর বিধি-বিধান পালনে বাহ্যিক কাজকর্ম ও অন্তরক্রে পৰিবেশ রাখা এবং সব বাদার হক আদার করাকে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সাকলের পছন্দ বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও মানবজাতি সৃজনে তাঁর বিশেষ অতিব্যক্তিসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাতে পরিষ্কার মৃটে ওঠে যে, জ্ঞান ও চেতনাশীল মানুষ এছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করতেই পারে না।

— وَلَقَدْ خَلَقْتَ الْأَنْسَانَ مِنْ سُلَّمٍ طِينٍ — অর্থ সারাংশ এবং অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হয়রত আদম (আ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুরু অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে وَلَقَدْ خَلَقْتَ বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সৃষ্টি অংশ অর্ধাং তরু দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তফসীরবিদ আয়াতের এ তফসীরই গিধেছেন। একথা বলাও সভবপর যে, سُلَّمٍ مِنْ طِينٍ বলে মানুষের শুরুই

বুরানো হয়েছে। কেননা, তত্ত্ব সুবাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সঙ্গতির ৩ আলোচ্য আয়োতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বঅপ্রয়োগ্যতর **আর্জান** (الرُّجُونُ مِنْ طَيْنٍ) অর্জান শুভিকার সারাংশ, বিভীষণ বীর্য, তৃতীয় জয়াট রূপ, চতুর্থ মাহসপিত, পঞ্চম অঙ্গু-পঞ্জুর, ষষ্ঠ অঙ্গুকে যাংস ধারা আবৃত্তকরণ ও সঙ্গম সৃষ্টির পূর্ণতা অর্থাৎ কুল সংস্কারকরণ।

৪. হ্যুম্যন ইবনে-আব্দাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব ৫ তত্ত্বসীয়ের কূলসূবীতে এই হলে হ্যুম্যন ইবনে আব্দাস থেকে এই আয়োততর ভিত্তিতেই ‘শবে কদর’ মিশনৰণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হ্যুম্যন উমর ফালকুঁ(রা) একবার সমাবেষ সাহানীগুকে শপু করলেন ৬ রমধানের তোকুল ভারিত্ব পথে কদর। সবাই উক্তরে ‘আল্লাহ’ তা ‘আলাই জাতুলেন’ বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হ্যুম্যন ইবনে-আব্দাস তাদের মধ্যে সর্বক্ষমিত ছিলেন। তাঁকে জিজেস করা হলে তিনি বললেন ৭ আব্দীকুল মু’মিনীন। আল্লাহ তা ‘আলা সৎ আকাশ ও সৎ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; মানুষের সৃষ্টি ও সৎ তত্ত্বে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বশুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আকাশ, তো মনে হয় যে, শবে কদর রমধানের সাতাশতম রাজির্তে হবে। বলীকা এই অভিনব প্রমাণ তত্ত্বে বিশিষ্ট সাহানীগুকে বললেন ৮ এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরাণুরি গজায়নি ৯ অর্থে সে এমন কথা বলেছে, যা আশনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শাইবার ঘুসনবাদে এই দীর্ঘ মুনীজুটি বর্ণিত আছে। ইবনে আব্দাস মানব সৃষ্টির সঙ্গত বলে তাই মুবিয়োছেন, যা আলসেভু আয়তে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের আদের সাতটি বশু সূরা আব্দাসার আয়তে উল্লিখিত আছে ১০ ফَإِنَّمَا فِيهَا حَبَّاً وَعِنْبَا وَقَضْبَنَا وَزَيْتَنَا وَنَخْلَةً وَحَدَّافَنَةً ১১ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমেক সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ প। জন্মদের খাদ্য।

কৌরআন পাকের তাৰালকার লক্ষণীয় যে, মানব সৃষ্টির সাতটি তত্ত্বকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি ১২ বরং কোথাও এক তত্ত্ব থেকে অন্যত্বের বিবর্তনকে ১৩ শব্দ ধারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলক্ষে হওয়া বুবায় এবং কোথাও ১৪ অব্যয় ধারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলক্ষে হওয়া বুবার। এতে সেই ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে ব্যতীবত হয়ে থাকে। কোন কোন বিবর্তন মানব বৃক্ষের দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয় না। সেমতে কৌরআন পাক প্রাথমিক তিন তত্ত্বকে ১৫ শব্দ ধারা বর্ণনা করেছে-প্রথম আটটির সারাংশ গ্রহণ একে বীর্যে পরিষ্কত করা। এখানে ১৬ ব্যবহার করে ১৭ উল্লেখ করে। কেননা, মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকরণ ধারণ করা মানববৃক্ষের সৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিত্বাবে তৃতীয় তত্ত্ব অর্থাৎ বীর্যের জয়াট রূপে পরিষ্কত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ১৮ উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এইপুর জয়াট রূপের মাহসপিত হওয়া, মাহসপিতের অঙ্গ হওয়া এবং অঙ্গুর উপর যাংসের অঙ্গে হওয়া-এই তিনটি তত্ত্ব অসমের সম্পন্ন

হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে । অব্যায় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। কুহ
সপ্তরি ও জীবন সৃষ্টির সর্বশেষ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, একটি নিপুঁত
জড় পদার্থে কুহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানব বৃক্ষের দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বৃক্ষের দৃষ্টিতে
সময়সাপেক্ষ কাজ ছিল সেখানে শব্দ ব্যবহার করে। এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং
যেখানে সাধারণ মানববৃক্ষের দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে অব্যয় । প্রয়োগ
করে সেদিকে ইশ্বারা করা হয়েছে। কাজেই এ বাণিজে সেই হানীস দ্বারা আর অঙ্গেহ হতে
পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয়
হয়। কারণ, এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ কুহ ও জীবন সৃষ্টি করা । কোরআন পাই এ ঘৰ্য্যাটি
এক বিশেষ ও ব্যতীত ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে : ﴿أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَنْشَاءِ يَدِكَ﴾—অর্থাৎ আমি
অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে,
প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদান ও ব্যুৎজগতের বিবর্তনের সাথে সংপ্রিষ্ট ছিল এবং এই শেষ ও
সপ্তম স্তর অন্য অপূর্ব অর্থাৎ কুহ জগৎ তথা কুহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই
একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত কুহ ও জৈব কুহ । এখানে ﴿أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَنْشَاءِ يَدِكَ﴾-এর তফসীর হ্যারত ইবনে আবুস,
মুজাহিদ, শাবী, ইকবারা, যাহাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ ‘কুহ সপ্তর’ দ্বারা
করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে আছে, সভবত এই কুহ বলে জৈব কুহ বুঝানো হয়েছে।
কারণ, এটাও বরুবাচক ও সূক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রক্তে অনুপ্রবিষ্ট
থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে কুহ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার
পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘আলমে-আরওয়াহ’
তথা কুহ জগৎ থেকে প্রকৃত কুহকে এনে আল্লাহ তা‘আলা সীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব
কুহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর ব্যৱহাৰ জানা মানুষের সাধারণতি। এই প্রকৃত
কুহকে মানব-সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা‘আলা এসব
কুহকে সম্বৰ্বত করে দেন। উত্তরে সবাই সমস্তের বলে আল্লাহর
প্রতিপালকত্ব স্থীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে ‘কুহ সপ্তর’ দ্বারা যদি জৈব কুহের সাথে প্রকৃত কুহের
সম্পর্ক স্থাপন বুঝানো হয়, তবে এটাও সভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত
কুহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব কুহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ
জীবন্ত হয়ে ওঠে। এবং সম্পর্ক ছিল হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব কুহও তখন
তার কাজ ভাগ করে।

এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক
নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তা‘আলাৰই বিশেষ শুণ। এই অর্থের দিক
দিয়ে খালি (মৃষ্ট) একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন
সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে শব্দ تَخْلِيقُ وَ خَلْقٌ
তাফ্সীরে মাঝারেফুল কোরআন।। ষষ্ঠ খণ্ড

কারিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্ৰ কুদুরত দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্ম'তে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরম্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে : ﴿إِنَّمَا أَنْتُنَّ أَنْجُونَ لَكُمْ مِنَ الطَّيْبِنَ كَهْيَةً الطَّيْبِ﴾—এসব ক্ষেত্রে খ্রীন হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা (আ) সম্পর্কে বলেছে : ﴿إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الظَّيْنِ كَهْيَةً الطَّيْبِ﴾—এসব ক্ষেত্রে খ্রীন হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে শব্দটি বহুচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে ক্ষেপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ কারিগরের মধ্যে সর্বোস্তম কারিগর।

—**فَمَنْ أَنْتُمْ بِمَذْكُورٍ لَمْ يَعْلَمُنَّ**—পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ আয়াতে বলা হয়েছে : তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে : **فَمَنْ أَنْتُمْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ تَعْلَمُنَّ**—অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুদ্ধিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহানামে পৌছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিত্তুর বর্ণনা আছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা উক্ত করা হয়েছে।

—**وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ**—এর বহুচন। একে স্তরের অর্থেও নেরো যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সম্পূর্ণ আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে স্তরে সম্পূর্ণ আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর প্রতিপাদন অর্থ রাস্তা। এ অর্থে হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী কেরেশতাদের পথ।

—**وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ**
—**بِهِ لَقَادِرُونَ**—এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে উধূ সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেদ্ধবরণ হতে পারি না ; বরং তাদের প্রতিপাদন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জাম ও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল—ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পূর্ববর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে :

—**وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ**
—**بِهِ لَقَادِرُونَ**—

মানুষকে পানি সরবরাহের অঙ্গুলীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ

সৃষ্টিগতভাবে ধূবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর একমাত্র আঘাত হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বৈরিত হয়ে গেলে প্রাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আঘাত হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহু তা'আলা কোন কারণে প্রাবন-তুকন ঢাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ডিন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় হিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বৈরিত হয়, তাত্ত্বিক মানুষ বিপদে প্রতিক্রিয়া করে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও উভাবের পরিপন্থী। যদি সবৎসর অথবা হয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরান্দের পানি হয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহুর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বৈরিত হয়, তখন সাময়িকভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিঙ্গ হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুরু, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্ম তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহ্যিক, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রাত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন ধূলা বালু এমনকি মানুষ ও জীবজন্ম পৌছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক ঝুওয়া এবং অব্যবহৃতযোগ্য হওয়ারও কোন আশংকা নেই। এরপর এই বরফের পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাহাড়ের শিরা-উপরিয়া বয়ে মাটির জাভাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীবালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্ম-জানোয়ারকে সিঙ্গ করে। অবশিষ্ট বরফগুলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে মুখ্য মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজেলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুনা পানির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে ও আয়াতের শেষে এবং আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুই বৈরিত হয়েছে।

অঙ্গপর আববের মেজাজ ও শক্তি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বক্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি ধারা উৎপন্ন : বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙুরের বাসান পানি সেচের ঘারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

“**وَكُمْ فِيهَا فَوَاكِيْكَبِيرَةٌ**” বাক্যে অন্যান্য ফলের কথা ও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব কথানে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোম ফল গোলাঞ্চাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। **وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যমজুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। যমজুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সরু করা হয়েছে। বলা হয়েছে **رَشْجَرَةٌ تَحْرُجُ مِنْ طَرْسِيْنَ**, সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম বেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। যমজুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঙ্গনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে **تَنْبَتُ بِالدُّفْنِ وَصَبْنَيْلَ الْأَكْلَبِينَ** এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তুর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : তুরানে নৃহের পর প্রথীবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যমজুন।—(মায়াহারী)

এরপর আল্লাহু তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানোয়ার ও চতুর্মাস জন্মদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা প্রহণ করে এবং আল্লাহু তা'আলার অপার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তওহাদ ও ইবাদতে মশাগত হয়। বলা হয়েছে : **وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَذِبْحَرَةٌ** অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুর্মাস জন্মদের মধ্যে শিক্ষা ও উপজেশ রয়েছে। অঙ্গপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেখো : **سَقْبَكُمْ مَمَّا فِي بَطْنِهِ** অর্থাৎ এসব জন্মদের পেটে আমি তোমাদের জন্য পাঁকি সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে : **شُرْبٌ**; দুধই নয়, এসব জন্মদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক (অগুণিত) উপকারিতা রয়েছে। **وَلَكُمْ فِيهَا تَأْكُلُونَ** চিজা করলে দেখা যায়, জন্মদের দেহের প্রতিটি অংশ প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর ধারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয়। জন্মদের পশম, অঙ্গ, অঙ্গ এবং সমস্ত অংশ ধারা মানুষ জীবিকার করে যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরও একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্মদের গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য পরিশেষে জন্ম-জানোয়ারের আরও একটি শুধু উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণ ও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারের মধ্যে জন্মদের সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরীক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক জ্বান থেকে অন্য জ্বানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে : **وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ تَخْلُمُونَ** : চলে এমন সব যানবাহন ও নৌকার হকুম রাখে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ مَرْءُوا بَعْدَ وَاللَّهُ مَا لَكُوْ مِنْ رَبٍّ
غَيْرِهِ ۚ أَفَلَا تَتَسْقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَوْأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هُذَا إِلَّا
بَشَرٌ مِثْكُمْ ۖ وَلَيُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَا تَنْزَلَ مَلَكٌ كَهُ
مَا سِعْنَا بِهُدَىٰ فِي أَبَابِنَاءِ الْأَوْلَيْنَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا جُلُجُلٌ يَهُجِّنُهُ فَتَرْبُصُوا بِهِ
حَتَّىٰ حِينٍ ۝ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي مَا كُنْدِبُونِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنِعْ
الْفُلْكَ بِمَا عِنْدِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ الدَّنْسُرُ ۖ لَا فَاسْلُكْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِينَ أَشْنِينَ وَأَهْلَكَ الْأَمَنَ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخْاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرِقُونَ ۝ فَإِذَا أَسْتَوْيَتِ
أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَعْجَلْنَا مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اتَّرْزَلْنِي مِنْ لَا مَبِرَّا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَرْزِلِينَ ۝ إِنَّ فِي
ذِلِكَ لَا يَتَّ ۝ وَإِنْ كُنَّا مُبْتَلِينَ ۝

(২৩) আমি নৃহকে তার সম্পদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার সম্পদায়, তোমরা আল্লাহ'র বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মানবুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না ? (২৪) তখন তার সম্পদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল : এতো তোমাদের যতই একজন যানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ' ইচ্ছা করলে কেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের শূর্বপুরুষদের মধ্যে একুশ কথা উনিনি। (২৫) সে তো এক উন্নাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপায়ে অগ্রেক্ষা কর। (২৬) নৃহ বলেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর ; কেবলমা তার আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং ছল্লী প্রাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে তাদের মধ্যে খাদের বিপক্ষে

পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাদের ছাড়া ! এবং তুমি জালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না । নিচ্য তারা নিমজ্জিত হবে । (২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল : আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে উদ্ভাব করেছেন । (২৯) আরও বল : হে পালনকর্তা আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী । (৩০) এতে নির্দর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের সৃষ্টি এবং তার স্থায়িত্ব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য বিভিন্ন প্রকার সাজ-সরঞ্জাম সৃষ্টি করার কথা আলোচনা করা হয়েছিল । অতঃপর তার আধ্যাত্মিক লালন-পালন ও ধর্মীয় সাফল্য লাভের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ।) এবং আমি নৃহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছিলাম । সে (তাঁর সম্প্রদায়কে) বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর । তিনি ব্যক্তিত তোমাদের উপাস্য হওয়ার ঘোগ্য কেউ নেই । (যখন একথা প্রমাণিত, তখন) তোমরা কি (অপরকে উপাস্য করতে) ভয় কর না ? অতঃপর [নৃহ (আ)-এর একথা শুনে] তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা (জনগণকে) বলল : এ তো তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ বৈ (রাসূল ইত্যাদি) নয় । (এটা দাবির পিছনে) তাঁর (আসল) মতলব তোমাদের উপর নের্তব্য করা (অর্থাৎ জাঁকজমক ও সম্মান লাভই তাঁর লক্ষ্য) যদি আল্লাহ (রাসূল প্রেরণ করতে) চাইতেন, তবে (এ কাজের জন্য) ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন । (সুতরাং তাঁর দাবি যিথ্যা) । তওঁদের দাওয়াতও তাঁর ছিতীয় ভাস্তি । কেননা, আমরা একপ কথা (যে, অন্য কাউকে উপাস্য করো না) আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (কখনও) শুনিনি । বস্তুত সে একজন উন্নাদ ব্যক্তি বৈ নয় । (তাই সারা জাহানের বিকল্পে কথা বলে যে, সে রাসূল এবং উপাস্য এক) সুতরাং নির্দিষ্ট সময় (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর সময়) পর্যন্ত তাঁর (অবস্থার) ব্যাপারে অপেক্ষা কর । (অবশেষে এক সময় সে খতম হবে এবং সব পাপ ঘূচে যাবে) নৃহ (আ) তাদের ইয়ানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর দরবারে আরঝ করল : হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ গ্রহণ কর । কারণ, তাঁরা আমাকে যিথ্যাবাদী বলেছে । অতঃপর আমি (তাঁর দোয়া করুল করে) তাঁর কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশে নৌকা তৈরি কর । (কারণ, এখন প্রাবন আসবে এবং এর সাহায্যে তুমি ও ইয়ানদাররা নিরাপদ থাকবে ।) এরপর যখন আমার (আয়াবের) আদেশ (নিকটে) আসে এবং (এর আলামত এই যে,) ভূগৃহ প্রাবিত হয়, তখন প্রত্যেক প্রকার (জন্মুর মধ্য) থেকে (যা মানুষের জন্য উপকারী এবং পানিতে জীবিত থাকতে পারে না, যেমন ডেড়া, ছাগল, গরু, উট, ঘোড়া, গাঢ়া, ইত্যাদি) এক এক জোড়া (নর ও মাদা) এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার-পরিজনকেও (সওয়ার করিয়ে নাও) তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (যে, তাঁরা নিমজ্জিত হবে) তাদের ছাড়া । (অর্থাৎ তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে কাফির, তাকে নৌকায় সওয়ার করো না ।) এবং (শুনে রাখ যে, আয়াব আসার সময়ে) আমার মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৩৯

কাহে কাফিরদের (মৃত্যি) সম্পর্কে কোন কিছু বলো না। (কেন্দ্র,) তারা সবাই নিমজ্জিত হবে। অতঃপর যখন তুমি ও তোমার (মুসলিমান) সঙ্গীরা নৌকায় বসে থাবে, তখন বল : আস্ত্রাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে কাফিরদের (দুর্ভাগ্য) থেকে উদ্ধার করেছেন এবং (যখন প্রাবন থেমে যাওয়ার পর নৌকা থেকে স্থলে অবতরণ করতে থাক, তখন) আরও বল : হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কল্যাণকরভাবে (স্থলে) নামিয়ে দাও (অর্থাৎ ধৰ্ম্মিক ও অভ্যন্তরীণ নিচিত্তায় রেখো।) তুমি থেঠে অবতরণকারী (অর্থাৎ অন্য যারা মেহমান নামায়, তারা নিজ মেহমানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির শক্তি রাখে না। তুমি সব কাজের শক্তি রাখ) এতে (অর্থাৎ উদ্ধৃতিত ঘটনায় বৃদ্ধিমানদের জন্য আমার কুদরতের) নির্দর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি (এসব নির্দর্শন জানিয়ে দিয়ে আমার বাস্তবাদেরকে) পরীক্ষা করি (যে, কে এগুলো ধারা উপকৃত হয় এবং কে হয় না। নির্দর্শনাবলী এই : রাসূল প্রেরণ করা, মু'মিনদেরকে উক্তার করা, কাফিরদেরকে ধ্রংস করা, হঠাত প্রাবন সৃষ্টি করা, নৌকাকে নিরাপদ রাখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।)

আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়

চুটীকে বলা হয়, যা কৃটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থেই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভৃগৃষ্ট। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই অনুবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ এ ধারা বিশেষ চুটীর অর্থেই নিয়েছেন, যা কৃফার মসজিদে এবং কারও কারও মতে সিরিয়ার কোন এক জায়গায় ছিল। এই চুটী উৎসুকিত হওয়াকেই নৃহ (আ)-এর জন্য মহাপ্রাবনের আলাগত ঠিক করা হয়েছিল। —(মাযহারী)।

ইয়রত নৃহ (আ) তাঁর মহাপ্রাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিজ্ঞারিত বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَآخْرِينَ ⑥ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِنْ سُوْلَانِهِمْ أَنْ
اَبْعَدُ وَاللَّهُ مَالِكُمْ مِنِ الْإِلَهِ غَيْرُهُ ۖ اَفَلَا يَتَّقُونَ ⑦ وَقَالَ الْمُلَائِكَةُ مَوْمِهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَكْنَبُوا إِلَيْقَاءَ الْآخِرَةِ وَاتْرَفُوهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝
مَا هُنَّ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لِيَا كُلُّ مِنَّا تَكُونُ مِنْهُ وَيُشَرِّبُ مِنَّا تَشْرِبُونَ ⑧
وَلَيْسُ أَطْعُتُمْ بِشَرَامِثَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخِسْرُونَ ⑨ اَيَعْدُكُمْ اِنَّكُمْ إِذَا
مِنْهُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا ۖ وَعَظَمًاً اَنْكُمْ مُخْرَجُونَ ⑩ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا

تَوَعَّدُونَ ⑥ إِنْ هُنَّ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمُعْوَذَةٍ ⑦ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَفْتَرُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ
بِمُؤْمِنَيْنَ ⑧ قَالَ رَبُّ أَنْصَارِنِي بِسَائِكْ بُوْنِ ⑨ قَالَ عَمَّاقِيلٌ لَّيْصِبِحُنَّ
غَنَّائِيْنَ ⑩ فَلَعْنَانَهُمُ الظَّاهِرَةُ بِالْقِعْدَةِ فَعَلَنَّهُمْ غَثَاءُ فَبَعْدَ الْمُقْوَمِ

الظَّالِمِينَ ⑪

(৩১) অতঃপর অন্য এক সম্মানায় আমি তার ফুলাত্তিবিত করেছিলাম। (৩২) এবং তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাস্তারপে প্রেরণ করেছিলাম এই ক্ষেত্রে যে, তোমরা আস্ত্রাহুর বন্দেগী কর; তিনি ব্যাপীত তোমদের অন্য কোন আনুম নেই। তবুও কি তোমরা তয় করবে না? (৩৩) তার সম্মানায়ের প্রধানরা যারা কাকিয়ে ছিল, পরবাসের সাক্ষাতে শিখ্যা বলত এবং সাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ-ব্যবহৃত দিয়েছিলাম, তারা বলল: এতো আমাদের অভিই একজন মানুষ বৈ নয়। তোমরা যা বাণি, সে কাহি বাণি এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমদের হস্তই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা নিচিতরপেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সেকি তোমদেরকে এই ওয়াদা দেয় যে, তোমরা যারা গেলে এবং মৃত্যুকা ও অহিতে প্রদিত হবে তোমদেরকে পুনরুৎস্থীবিত করা হবে। (৩৬) তোমদেরকে যে ভাবাদ দেখবা হবে, তা কেবলমাত্র হতে পারে? (৩৭) আমাদের পার্থিব জীবনই একআবু জীবন। আমরা আরি ও বৈচি এবাবেই এবং আমরা পুনরুৎস্থিত হবো না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি বৈ নয়, যে অস্ত্রাহ স্বতে শিখ্যা উত্তোলন করবে এবং আমরা তাকে বিষ্টাস করি না। (৩৯) তিনি বশিষ্টেন: যে আমার পালনবর্কর্ত্তা আরকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে বিষ্টাসবাসী করবে। (৪০) আস্ত্রাহ বললেন: কিন্তু দিলের ঘণ্টে তারা অনুভূত হবে। (৪১) অতঃপর সাত্য সত্যই এক ভুঁতুকুর শব্দ তাদেরকে হত্তচকিত করল এবং আমি তাদেরকে বাস্ত্যা-তাত্ত্বিত আমার্জন সমূশ করে দিলাম। অতঃপর খালে হোক পাশী সংগ্রহায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপর (অর্থাৎ কওমে-নূহের পর) আমি তাদের পশ্চাতে অন্য এক সম্মান সুষ্ঠি করেছিলাম (এরা আদ অথবা সামুদ সম্মান) এবং আমি তাদেরই একজনকে তাদের মধ্যে রাস্তারপে প্রেরণ করেছিলাম। ইনি হল অথবা সালেহ (আ) পয়গুর, বলেছিলেনঃ। তোমরা আস্ত্রাহ তা'জালারই ইবাদত কর। তিনি ব্যাপীত তোমদের অন্য কোন আনুম নাই। তোমরা কি (শিরককে) তর কর না? তাঁর সম্মানায়ের প্রধানরা, যারা কাকিয়ে ছিল,

পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলত এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখ হাচ্ছন্দ্যও দিয়েছিলাম, তারা বলল : বাস, সে তো তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষ। (সেমতে) তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। (সে যখন তোমাদের মতই মানুষ তখন) তোমরা যদি তোমাদের মতই একজন (সাধারণ) মানুষের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চিতই তোমরা (বৃদ্ধিতে) ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ এটা খুবই নির্বুদ্ধিতা।) সে কি তোমাদেরকে এ কথা বলে যে, তোমরা মরে গেলে এবং (মরে) মৃত্যিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে গেলে (মাংসল অংশ মৃত্যিকা হয়ে গেলে অহিসমূহ মাংসবিহীন থেকে যায়। কিছুদিন পর তাও মৃত্যিকায় পরিণত হয়। এই ব্যক্তি বলে যে, এ অবস্থায় পৌছে গেলে) তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (এরূপ ব্যক্তিও কি অনুসরণীয় হতে পারে?) খুবই অবাস্তু, যা তোমাদেরকে বলা হয়। জীবন তো আমাদের এই পার্থিব জীবনই। কেউ আমাদের মধ্যে মরে এবং কেউ জন্মান্ত করে। আমরা পুনরুত্থিত হব না। এই ব্যক্তি তো এমন, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা গড়ে (যে তিনি তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোন মানুষ নেই এবং কিয়ামত অবশ্যভাবী।) আমরা তো কখনও তাকে সত্যবাদী মনে করব না। পয়গম্বর দোয়া করলেন : হে আমার পালনকর্তা, আমার প্রতিশোধ নাও। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ বললেন : কিছুদিনের মধ্যে তারা অনুত্থ হবে। (সেমতে) সত্যসত্যই এক ভয়ংকর শব্দ (অথবা মহা-আয়াব) তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা ধূংস হয়ে গেল।) অতঃপর (ধূংস করার পর) আমি তাদেরকে বাত্যা-তাড়িত আবর্জনা (-এর মত) পদদলিত করে দিলাম। অতএব আল্লাহর গবে কাফিরদের উপর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বেকার আয়াতসমূহে হিন্দায়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে নৃহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গম্বর ও তাঁদের উপ্রতিদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরকারগণ বলেন : লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয়, এসব আয়াতে আদ অথবা সামুদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হয়রত হৃদ (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামুদ সম্প্রদায়ের পয়গম্বর ছিলেন হয়রত সালেহ (আ)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক অর্থাৎ ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধূংসপ্রাণ হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচীৎকার দ্বারা ধূংসপ্রাণ হয়েছিল। এ থেকে কোন কোন তফসীরকার বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহে *فَرِّطْ أُخْرِينَ* বলে সামুদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, শব্দের অর্থ আয়াব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

—*إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةٌ لِّذِيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُتَعَوِّثِينَ*—পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফিরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো

খোলাখুলি কাফিরই ; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আদ্ধার তাঁআলা ইমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

ثُرَّ أَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا أَخْرِينَ ⑧٢ مَاتَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ
 أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑧٣ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْهَا مُكَانًا جَاءَ أُمَّةً
 رَسُولُهَا كَذَبُوهُ فَاتَّبَعُنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
 فَبَعْدَ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ⑧٤ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هُرُونَ ⑧٥
 بِإِيمَانِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ⑧٦ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأْنِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
 قَوْمًا عَالِيًّا ⑧٧ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبُودُونَ
 فَكَذَبُوهُمْ فَكَانُوا أُمِّنَ الْمَهْلِكَيْنَ ⑧٨ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لِعَلِيهِمْ
 يَهْتَدُونَ ⑧٩ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرِيمَ وَأُمَّةَ آيَةً ⑧١٠ وَأَوْيَنْهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ
 ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ⑧١١

(৪২) এরপর তাদের পরে আমি বহু সম্পদায় সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন সম্পদায় তার নির্দিষ্টকালের অঠে বেতে পারে না এবং পচাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাধিকবে আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উচ্চতের কাছে তার রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক খৎস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিগণ করেছি। সুতরাং খৎস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মূসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নির্দর্শনাবলী ও সুশ্পষ্ট সনদসহ, (৪৬) ফিরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে। অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উজ্জ্বল সম্পদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল : আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস হাপন করব ; অথচ তাদের সম্পদায় আমাদের দাস ? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা খৎসপ্রাণ হলো। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সংপত্তি পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম-তনয়

ও অংশ কানেকে এক শির্ষসম দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানযোগ্য বহু পদি পিণ্ডি তিনিই অপ্রয় দিয়েছিলাম ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতুলন্য তাদের (অর্ধাং আদ ও সম্মুদ্রের ধৰ্মস্থান হওয়ার) পরে আমি আরও বহু উক্ত সৃষ্টি করেছি । (রাস্তাগুপকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে তারাও ধৰ্মস্থান হয়েছে এবং তাদের ধৰ্মস্থান হওয়ার বে মুক্ত অবস্থাকৃত জনে নির্ধারিত ছিল), কোন উদ্ভিত (তাদের ঘথ কেক) তার নিদিষ্ট মুক্তভোগ (ধৰ্মস্থান হওয়ার ব্যাপারে) আগে যেতে পারত না এবং (সেই মুক্ত যেতে) পচাতেও যেতে পারত না ; (বরং ঠিক নিদিষ্ট সময়েই তাদেরকে ধৰ্মস করা হয়েছে) মোটকোথা, পথে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়) এরপর আমি (তাদের কাছে) একের পর এক আমার রাসূল (হিদায়াতের জন্যে) প্রেরণ করেছি ; (যেমন তাদেরকেও একের পর এক সৃষ্টি করেছি) কিন্তু তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে,) যখনই কোন উচ্চতর কাছে তাঁর (বিশেষ) রাসূল (আব্রাহাম বিধানবলী নিয়ে আগমন করেছে উক্তই তরুণ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে) সুতরাং আমি (-এ ধৰ্মস করার ব্যাপারে) তাদের একের পর এককে ধৰ্ম করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি (অর্ধাং তারা এসন সেজনাবুদ হয়েছে যে, কাহিনী ছাড়া তাদের কোন নাম-নিশানা রইল না) সুতরাং আসে হেক তারা, যারা (প্রয়ারুলগ্নের বুকানের পরও) বিশ্বাস স্থাপন করতো না । অতুলন্য আমি মূল (আ) ও তার ভাই হারুন (আ)-কে আমার নির্দেশাবলী ও সুল্টান প্রয়াশসহ কিছাক্ষণ ও তার পারিবহনবর্ণের কাছে (পরম্পরার করে) প্রেরণ করেছি । (বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত ইগুরা তো আনাই রয়েছে)। অতুলন্য তারা (তাদেরকে সভ্যবাদী বলতে ও আনুগত্য করতে) অহংকার করল এবং তারা ছিল প্রকৃতই উদ্ভিত । (অর্ধাং পূর্ব খেকেই তাদের মষ্টিক বিকৃত ছিল । সেমতে) তারা (পরম্পরে) বলল : আমরা কি আমাদের অভিই দুই ব্যক্তিতে (যাদের মধ্যে সাতজন্ম বলতে কোনকিছু নেই) বিশ্বাস স্থাপন করব (এবং তাদের অনুগত হয়ে যাব) অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা (ব্যবং) আমাদের অনুগত ? (অর্ধাং আমরা তো স্বয়ং তাদের নেতা)। এমতাবস্থায় এই দুই ব্যক্তির ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে আমরা কিছুপে মেনে নিতে পারি ? তারা ধর্মীয় নেতৃত্বকে পার্থিব নেতৃত্বের সাথে এক করে দেখেছে যে, তারা বেহেন্ত এক অকার নেতৃত্বের অর্ধাং পার্থিব নেতৃত্বের অধিকারী । কাজেই অন্য অকার নেতৃত্বেরও তারাই অধিকারী হবে । পক্ষান্তরে এই দুই ব্যক্তি যখন পার্থিব নেতৃত্ব পাখনি, তখন ধর্মীয় নেতৃত্ব কিছুপে পেতে পারে ?) তারা উভয়কে মিথ্যাবাদীই বলতে লাগল । ফলে (এই মিথ্যাবাদী বলার কারণে) ধৰ্মস্থান হলো । (তাদের ধৰ্মস্থান হওয়ার পর) আমি মূল (আ)-কে কিভাব (তেওরাত) দিয়েছিলাম যাতে (তার বাধ্যত্বে) তারা (অর্ধাং বনী ইসরাইল) হিদায়াত জাত করে এবং আমি (আমার কুস্মান্ত ও তাজীবীয় বুকানের জন্যে এবং বনী ইসরাইলের হিদায়াতের জন্য) মারইয়াম-তনয় কিসা (আ)-কে এবং তাঁর মাতা (মারইয়াম)-কে আমার কুস্মান্তের ও তাদের সভ্যতার) বড় বিদর্শন করেছিলাম (শিক্ষা বাজীত অনুযায়ী করা উক্তরেরই বড় বিদর্শন ছিল) এবং (যেহেতু তাঁকে প্রয়াশ করা লক্ষ্য ছিল এবং জনেক অভ্যাচারী বাদশাহ শৈশবেই তাঁকে

হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে)তাদেরকে এমন এক টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শসা ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানযোগ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যামল ছিল। (ফলে তিনি শান্তিতেই ঘোবনে পদার্পণ করেন এবং নবৃত্যত প্রাণ হন। তখন তাওহীদ ও রিসালতের দাবিতে তাঁকে সত্যবাদী ঘনে করা জরুরী ছিল; কিন্তু কেউ কেউ করেনি।)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّ أَمِنَ الطَّيِّبِتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلَيْكُمْ ۖ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ مُّتَكَبِّرَةٌ وَأَنَّارَبَكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَنَفْتَحُ عَوْنَ
 امْرُهُمْ بِيَدِنَاهُمْ نَزِراً ۗ كُلُّ حَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ فَذَرْهُمْ فِي
 غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ أَيْحِسْبُونَ أَنَّا نَانِمُ ۚ هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ۝
 نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ ۖ طَبْلٌ لَا يَشْعُرُونَ ۝

(৫১) হে মাসুলগণ, পরিজ্ঞ বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আগন্তব্য যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আগন্তব্যের এই উচ্চত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আগন্তব্যের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর যানুব তাদের বিষয়কে বহুধা বিজ্ঞ করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতায় নিয়মজিঞ্চিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি ঘনে করে থে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সজ্ঞান-সন্তুষ্টি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত যত্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গস্তরকে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের উপর্যুক্তগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পরগন্তরগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উপর্যুক্তগণ) পরিজ্ঞ বস্তু আহার কর (কারণ, তা আল্লাহর নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর; অর্থাৎ সৎকাজ কর (অর্থাৎ ইবাদত))। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গস্তর ও তাঁদের উপর্যুক্তগণের। কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং তরিকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ

আঘার নির্দেশাবলীর বিস্তৃকচরণ করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের মুষ্টা ও যালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগত্যই দাবি করে।) কিন্তু (এর ফলঝড়তি হিসেবে সবাই উল্লিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরীকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সম্মত। (বাতিল হওয়া সম্বেদ তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিয়মিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে আপনি দৃঢ়বিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব দ্রুতপ খুলে যাবে। তাত্ক্ষণিকভাবে তাদের উপর আঘাত আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সত্ত্বান-সন্তুতি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিপামে তাদের জন্য আরও বেশি আয়াবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধৃত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়াবাড়ি করবে। ফলে আয়াব বাড়বে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا — এর আতিথানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বৰ্ত্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বন্ধু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই শব্দ তারা শব্দ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গস্থরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র বন্ধু আহার কর। দুই, সংকর্ম কর। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গস্থরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উচ্চতরে জন্য এই আদেশ আরও পালনীয়। বন্ধুত আসল উদ্দেশ্যও উচ্চতরে অনুগামী করা।

আলিমগণ বলেন : এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তঙ্গুকীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সম্বেদ তাতে নানা বিপন্নি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হানীসে আছে, কেউ কেউ সুনীর্ব সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব বলে ডাকে ; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম হারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। একপ শোকদের দোয়া কিরণে কবূল হতে পারে ? —(কুরআনী)

এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য হয় না।

شَكْرِيٌّ مُّنْكَمْ أَمْ — وَإِنْ هُذِهِ أُمُّكُمْ أَمْ — وَاحِدَةٌ — شক্রি সম্পদায় ও কোন বিশেষ পয়গ্রহের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সংগ্রহ তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বুঝানো হয়েছে।

فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بِيَنْهُمْ زِبْرٌ — زির এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গ্রহের ও তাঁদের উপরকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরিকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উপর্যুক্ত তা মানেনি। তারা পরম্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبرة زির এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ বৎ ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুন্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্পদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার এবং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জারেয নয়।

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيشَ رِبْهُمْ مَشْفِقُونَ ⑭ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيْتٍ سَبِّحُمْ
وَيُؤْمِنُونَ ⑮ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ⑯ وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا أَنْتُوا
وَقَلْبُهُمْ وَجْهَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ⑰ أُولَئِكَ يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرِ
وَهُمْ لَهَا سِيقُونَ ⑱ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يُنْطِقُ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ ⑲

(৫৭) নিচয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্তুষ্ট, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা জীত কঞ্চিত দ্রুদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অংশগ্রহণ করে না। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুক্ত্য করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্তুষ্ট, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহর পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান করা সন্দেশও) তাদের হৃদয় ভীতকল্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, কিংবা নিয়ত খাঁটি ছিল না। এসব হলে উচ্চা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর উভ পরিণতি নিশ্চিত। কেননা,) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“شَهْدُتِيٌّ بِمَا أُنْوِيَ وَقَلُوبُهُمْ وَجْهٌ
— وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أُنْوِيَ وَقَلُوبُهُمْ وَجْهٌ”
খরচ করা। তাই দান-খয়রাত ধারা এর তফসীর করা হয়েছে। হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিরাআত মান্তব্য ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত নামায, রোধা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন এক হাদীসে হ্যরত আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকল্পিত হবে? তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হে সিদ্দীকতনয়া, এক্ষণে নয়; বরং এরা তারা, যারা রোধা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসন্দেশেও তারা শক্তিত থাকে যে, সংক্ষিপ্ত আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন জুটির কারণে) কবূল হবে না। এ ধরনের লোকই সৎকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরিমিয়ী, ইবনে-মাজা-মাযহারী), হ্যরত হাসান বসরী বলেনঃ আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। —(কুরআন)

أَوْفَنَكُمْ بِمَا عَوْنَانَ فِي الْحَيَّاتِ وَمُمْلِئُ لَهَا سَابِقُونَ
লোক যেমন পার্থিব মূলাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্নে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ أَهْمَانِهَا
 عَمِلُوْنَ ⑤٥ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَدْنَا مُتَرَفِّهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُوْنَ ⑤٦ لَا يَتَجَرَّوْا
 الْيَوْمَ قَاتَلُوكُمْ مِّنْ أَنَا لَا تَنْصُرُوْنَ ⑤٧ قَدْ كَانَتْ أَيْتِيَتْ سُلْطَنِيَّتُكُمْ فَكَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِ
 يَكُمْ تَنْكِصُوْنَ ⑤٨ مُسْتَكْبِرِيَّنْ قَادِيَّهُ سِرَّاً تَهْجُرُوْنَ ⑤٩ أَفَلَمْ يَدِيرُوا الْقَوْلَ
 أَمْرُجَاءَهُمْ مَالِمُيَّاتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِيَّنَ ⑥٠ أَفَلَمْ يَعْرِفُوْا رَسُولَهُمْ فَهُمْ
 لَهُمْ مُنْكِرُوْنَ ⑥١ أَمْ يَقُولُوْنَ إِنَّهُ جَنَّةٌ بَلْ جَاءُهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْعَقْ
 كِرُهُوْنَ ⑥٢ وَلَوْ أَتَبَعُ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعَرِّضُوْنَ ⑥٣ اَرْسَلْنَاهُمْ خَرْجًا
 فَخَرَاجُرِبَكَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيَّنَ ⑥٤ وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطِ
 مُسْتَقِيمٍ ⑥٥ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنِكَبُوْنَ ⑥٦
 وَلَوْ رَحْمَنَهُمْ وَكَشْفَنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لِلْجَوَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُوْنَ ⑥٧
 وَلَقَدْ أَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا الرِّزْقُمْ وَمَا يَصْرُّعُوْنَ ⑥٨ حَتَّىٰ
 إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بِاَبَادَأَعْذَابَ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُوْنَ ⑥٩

(৬৩) সা, তাদের অঙ্গর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ হাজ্জা তাদের আরও কাজ
 অব্যবহৃত করেছে, যা তারা করছে। (৬৪) এমনকি বখন আমি তাদের ঝোঁকদেরকে শাস্তি
 দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিকিরার ছুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চিকির করো না।
 তোমরা আমার কাছ থেকে নিঃস্তি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ
 শোনানো হতো, তখন তোমরা উল্টো পারে সরে পড়তে। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে
 অর্থহীন পঞ্জ-বজ্র করে হেতে। (৬৮) অঙ্গের তারা কি এই কালাম সশ্পকে চিন্তাভাবনা

করে না ? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃগুরুদের কাছে আসেনি ? (৬৯) না তারা তাদের রাসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অবীকার করে ? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল ? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সভ্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমগুল ও ভূমগুল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সরকিছুই বিশুল্পল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান ঢাল ? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিহিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন ; (৭৪) আর দ্বারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতার দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হলো না এবং কারুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশ্যেই যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বারা খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে মূল্যনদের অবস্থা উল্লে ; কিন্তু কাফিররা একেপ নয় ;) বরং (এর বিপরীতে,) কাফিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে (যা رَبِّيْتُ بِهِمْ এ উত্ত্বিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (তাদের অবস্থা فَنَرَفْمُ فِي غَمْرَتِهِمْ আয়াতেও জানা গেছে)। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অবীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিত্র) কাজ আছে, যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিঙ্গ থাকবে) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সরকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আয়াব দ্বারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আয়াব থেকে বাঁচার কোন অশ্রুই উঠে না)। মোটকথা, যখন তাদের সবার উপর আয়াব নায়িল হবে) তখনই তারা আর্জনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অবীকৃতি ও অহকার কর্পুরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে :) আজ আর্জনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্জনাদ ও কারুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রাসূলের মুখে) পাঠ করে শোনানো হতো, তখন তোমরা দণ্ডভরে এই কোরআন সশর্কে বাজে গঞ্জগুজব বলতে বলতে উল্টোপায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যানু বলত এবং কেউ কবিতা বলত)। সুতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ কি ?) তারা কি এই (আল্লাহর) কালাম সশর্কে চিন্তাভাবনা করেনি ? (যাতে

এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহর বিধানাবলী আসা, যা নজুন কিছু নয়। চিরকালই পয়গঞ্জদের মাধ্যমে উচ্চতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে। যেমন এক আয়াতে আছে কাছে স্মাক্তَ بِعْدًا مُنْ الرَّسُولِ সুতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও অসার প্রতিপন্থ হলো। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত ; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রাসূল সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলের সততা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অঙ্গীকার করে ? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রাসূলের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাকেয় স্বীকার করত।) না (কারণ এই যে,) তারা (নাউয়ুবিস্তাহ) বলে যে, সে পাগল ! (রাসূল যে উচ্চতরের বৃক্ষিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুশ্পষ্ট। অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে স্ফুরিয়ুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রাসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (বাস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ।) বর্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক। যেমন এক আয়াতে আছে فَلَمَنِ لَيْرَجُونَ لَقَائَنَا ائْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِهِ مَذَا أَوْبَدَنَ (এবং (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হতো এবং) সত্য তাদের কামনা-বাসনার আনুগামী (ও অনুকূলে) হতো, তবে (সারা বিশ্বে কৃফরেই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহর গ্যব বিশ্বকে ঘাস করে নিত। পরিণামে) নভোমগুল, ভূমগুল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ধ্রংস হয়ে যেত ; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথচারিতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার গ্যবও সবার উপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গ্যব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্রংসযজ্ঞও ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবুল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবুল না করাই ব্যবহার অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপছন্দ করারই দোষ নয় ;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে ; অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। বাস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ করেছি ; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও শুধু ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চান ? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন ? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে উপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবে। (উদ্দেশ্য এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ঈমানের দাবি করে এবং অন্তর্নায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায়

ইমান না আনা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হঠকারী যে, খরীয়তের নির্দশনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবাবিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীকর্ত ও গবেষের নির্দশনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবাবিত হয় না, যদিও বিপদ মুহূর্তে আমাকে আহবান করে, কিন্তু এই আহবান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেমত্তে) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতার দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় যে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিল, সব খতম হয়ে যাবে; যেমন এ আয়াতে আছে *إِنَّ الْفَسَرَ رُعَيْتَ أَعْلَمَ* অন্য আয়াতে আছে *إِنَّ رَكِبَوْنَا فِي الْفَلْقِ* অর্থাৎ এর প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে) আমি তাদেরকে আয়াবে প্রেক্ষিতারও করেছি; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরোপুরি) নত হয়নি এবং কাকুতি-মিনতি করেনি। (সুতরাং ঠিক বিপদমুহূর্তও যখন—বিপদও এমন কঠোর, যাকে আয়াব বলা চলে; যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে যক্ষায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরপ আশা করাই বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেগোয়া ভাব ও নিষ্ঠীকতা অভ্যন্ত বিপদাপন পর্যন্তই থাকবে।) অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আয়াবের দ্বার খুলে দেব (যা হবে অলৌকিক, দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গবব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো অবশ্যজারী হবে), তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হলো; তখন সব দেশা উধাও হয়ে যাবে;)

আনুষঙ্গিক ক্ষাতব্য বিষয়

—*أَنْتَ مَنْ تَوْلِيهِ*—এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই *شَدَّ* শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মূল্যায়নসূলভ মূর্খতাকে *شَدَّ* বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর ক্রিয় পৌছত না।

—*وَلَمْ يَعْمَلْ مِنْ نَوْنَذْ*—অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুকরের আবরণই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা এতেই ক্ষাত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

—*مَنْ تَرْفَ* থেকে উভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সুখ-ব্রহ্মাণ্ডীল হওয়া। এখানে কওমকে আয়াবে প্রেক্ষিত করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধর্ম-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপন থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিন্তু না কিন্তু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আয়াব যখন আসে, তখন সর্বাধিম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আয়াবে প্রেক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আয়াব বুকানো হয়েছে, যা বদর যুক্তে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সবদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারণ কারণ মতে এই আয়াব দ্বারা সুর্ভিক্ষের আয়াব বুকানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার কারণে যক্ষাবাসীদের উপর চাপিয়ে

দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্ম, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা). কাফিরদের জন্য খুবই কম বদনোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ হলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন শীঘ্র ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে একপ দোয়া করেন—**إِنَّمَا اشْدُد وَطَأْتَكُمْ عَلَى مُضِرٍّ وَاجْعَلُهَا سَبِّنَ كَسْنِي يَوْسُفَ**—(বুখারী, মুসলিম-কুরতুবী)

مُسْتَغْرِبِينَ بِسَامِرَ تَجْرِيْنَ—অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে **سَامِر** শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ তনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না আনার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। **سَامِر** শব্দটি থেকে উল্টুত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাতি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই **سَامِر** শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশারিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন উৎসুক্য নেই।

مُجْرِيْنَ—শব্দটি **مُجْرِي** থেকে উল্টুত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও পালিগালাজ। আল্লাহর আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও পালিগালাজে অভ্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এখনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা বলত।

এশার পর কিস্সা-কাহিনী বলা নিবিড়, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ : রাত্তিকালে কিস্সা-কাহিনী বলার পথা আরব-আজমে আচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) এই পথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের শুনাইসমূহের কাফকরাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উচ্চম। যদি এশার পর অনর্থক কিস্সা-কাহিনীতে লিখ হয়, তবে প্রথমত এটা ব্যাং অনর্থক ও অপচলনীয় ; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরিনিষ্ঠা, যিথ্যা এবং আরও কত রকমের শুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিষ্ঠি এই যে, বিলৈ নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কাজেই হয়রত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মন্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতকক্ষে শাস্তি দিতেন। তিনি বলতেন : **شَيْءٌ نِدْرَةٌ يَوْمَ** নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাতে তাহাজুন্দ পড়ার তত্ত্বাত্মক হয়ে যাবে। —(কুরতুবী)

أَمْ يَقُولُونَ بِـجَهْنَمْ يَدْبَرُوا الْقَوْلَ
যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিশ্বাসই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে । এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই । পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে । এমতাবস্থায় তাদের অঙ্গীকার নির্ভেজান্ব শক্তি ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয় । পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

بَلْ جَاهَمُ بِالْحَقِّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ—অর্থাৎ রিসালত অঙ্গীকার করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ও স্বত্বাবজ্ঞাত কারণ তো বর্তমান নেই ; এতদস্বেও তাদের অঙ্গীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপচন্দ করে শুনতে চায় না । এর কারণ কৃত্রিম ও কৃবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ । ঈমান ও নবৃত্য স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই ।

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ—অর্থাৎ তাদের অঙ্গীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবৃত্যতের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি তিনি দেশের লোক । তাঁর বৎশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয় । এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই ; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিছিপে অনুসরণ করতে পারি ? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয় । বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তান কুরাইশ বৎশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর ঘোরণ ও পরবর্তী সমগ্র যামানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল । তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না । নবৃত্য দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফির সম্পদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আয়ীন'—সত্যবাদী ও বিশ্বাস বলে সম্মোধন করত । তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি । কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না ।

وَلَقَدْ أَخْذَنَا هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُونَ—

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আয়াবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে । আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপূর্বশ হয়ে আয়াব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আয়াব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে । এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আয়াব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কৃফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে ।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আয়ার এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আয়ার সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জস্ত, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে : আমি আপনাকে আল্লাহর আজ্ঞায়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতব্দীপ প্রেরিত হয়েছেন ? তিনি উত্তরে বললেন : নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বললে : আপনি ব্রগোত্ত্বের প্রধানদেরকে তো বদর যুক্তে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আয়ার আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাত্মে আয়ার খত্ম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই **وَلَقَدْ أَخْذَنَا مُمَّا لَّمْ يَأْتِنَا** আয়াত নায়িল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আয়াবে পতিত হওয়া অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল ; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রাইল। —(মাযহারী)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْإِبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ طَقْلِيلًا مَا تَشْكِرُونَ ⑥

وَهُوَ الَّذِي ذَرَ أَكْمَرٍ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ⑦ وَهُوَ الَّذِي
يُحْيِي وَيُمُيَّتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الْيَوْمِ وَالْآَنَاءِ فَلَا تَعْقِلُونَ ⑧ بَلْ
قَالُوا إِمْثُلْ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ⑨ قَالُوا إِنَّا إِذَا مِنَّا وَكُنْتُمْ
وَعَظَمَاءُ إِنَّا لَمُبْعَثُونَ ⑩ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَابْنَ آتَاهُنَا مِنْ قَبْلِ
إِنْ هُنَّ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑪ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ⑫ سَيَقُولُونَ إِنَّهُ طَقْلِيلٌ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑬ قُلْ مَنْ رَبُّ
السَّمْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑭ سَيَقُولُونَ إِنَّهُ طَقْلِيلٌ قُلْ أَفَلَا
تَشْقِقُونَ ⑮ قُلْ مَنْ يُبَدِّلُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ

عَلَيْهِ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑭ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَإِنِّي تَسْحَرُونَ
 بَلْ أَتَيْتُهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِّابُونَ ⑯ مَا أَنْتَ خَذَنَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ
 مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 سَبِّحُنَّ اللَّهَ عَمَّا يَصْفُونَ ⑭ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑮

(৭৮) তিনি তোমাদের কান চোখ ও অন্তরকরণ সৃষ্টি করেছেন ; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা দ্বীকার করে থাক । (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে হংড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে । (৮০) তিনিই প্রাণ মান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিবা গ্রান্তির বিবর্তন তাঁরই কাজ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? (৮১) বরং তাঁরা বলে বেঘন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত । (৮২) তাঁরা বলে : যখন আমরা মরে যাব এবং মৃতিকা ও অহিতে পরিষণ্ঠ হব তখনও কি আমরা পুনরুদ্ধিত হব ? (৮৩) অঙ্গীতে আমাদেরকে এবং আমাদের শিল্পুরবদেরকে এই উদ্যাদাই দেওয়া হয়েছে । এটা তো পূর্ববর্তীদের কল-কথা বৈ কিছুই নয় । (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, কারা কার ? যদি তোমরা জান, তবে বল । (৮৫) এখন তাঁরা বলবে : সবই আল্লাহর । বলুন : তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না ? (৮৬) বলুন : সংগ্রাম ও মহা-আগ্রহের মালিক কে ? (৮৭) এখন তাঁরা বলবে : আল্লাহ । বলুন তবুও কি তোমরা তর করবে না ? (৮৮) বলুন : তোমাদের জ্ঞান থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ত করেন এবং হার কবল থেকে কেউ রক্ত করতে পারে না ? (৮৯) এখন তাঁরা বলবে : আল্লাহর । বলুন : তাঁলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে ? (৯০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি, আর তাঁরা তো মিথ্যাবাদী । (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান ধর্ম করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাসুদ নেই । থাকলে অত্যেক মাসুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্য জনের উপর প্রবল হয়ে যেত । তাঁরা যা বলে তা থেকে আল্লাহ পরিবর্ত । (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী । তাঁরা যাকে শর্কীক করে, তিনি তা থেকে উর্দ্দেশ ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ) এমন (শক্তিশালী ও নিয়ামতদাতা), যিনি তোমাদের জন্য কর্ত, চক্ষু ও অন্তরকরণ সৃষ্টি করেছেন (যাতে আরামও অর্জন কর এবং ধর্মও অনুধাবন কর । কিন্তু) তোমরা খুবই কম শোকর করে থাক । (কেননা, এই নিয়ামতদাতার ধর্ম গ্রহণ করা এবং কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অঙ্গীকার না করাই ছিল প্রকৃত শোকর) । তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে হংড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমরা সবাই (কিয়ামতে) তাঁরই কাছে সমবেত হবে । (তখন নিয়ামত অঙ্গীকার করার স্বরূপ জানতে পারবে ।) তিনি এমন,

যিনি প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং যাজি ও দিবসের বিবর্ষণ তারই কাজ। তোমরা কি (এতটুকুও) বুঝ না ? (যে, এসব প্রমাণ তাওহীদ ও কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন দুই-ই বুঝায়। কিন্তু তবুও যান না।) বরং তারা তেমনি বলে, দেবম পূর্ববর্তীরা বলত। (অর্থাৎ) তারা বলে : যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্যুকা ও অস্থিতে পরিপন্থ হব, তখনও কি আমরা পুনরুজ্জীবিত হব ? এই উয়াদা তো আমাদেরকে এবং (আমাদের) পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে। এগুলো কঠিত কাহিনী বৈ কিছুই নয়, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ধর্ষিত হয়ে আসছে। (এই উক্তি আরা আল্লাহর শক্তিসামর্থ্যের অঙ্গীকৃতি অঙ্গীকৃতি হয়ে পড়ে। এবং পুনরুজ্জীবনের অঙ্গীকৃতির ন্যায় তাওহীদেরও অঙ্গীকৃতি হয়। তাই এর জওয়াবে আক্তি-সামর্থ্য প্রমাণ করার সাথে সাথে তাওহীদও প্রমাণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ) আপনি (জওয়াবে) বলুন : (আজ্ঞা বল তো,) পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে তারা কার ? যদি তোমরা খবর ন্যায়। তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহর। বলুন : তবে চিন্তা কর না কেন ? (যাতে পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা ও তাওহীদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে যায়।) আপনি আরও বলুন : (আজ্ঞা বল তো,) সংসাকাশ ও সহা-আরপ্লের অধিপতি কে ? কারা অবশ্যই বলবে, এটাও আল্লাহর। বলুন : তবে তোমরা (উক্তকে) তয় কর না কেন ? (যাতে কুদরত ও পুনরুজ্জীবনের আয়তসমূহ অঙ্গীকার না করতে।) আপনি (তাদেরকে) আরও বলুন : যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, তিনি কে ? এবং তিনি (যাকে ইচ্ছা) আশ্রয় দেন ও তার মুকাবিলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারেন না, যদি তোমরা জান। (তবুও জওয়াবে) তারা অবশ্যই বলবে, এসব শুণও আল্লাহরই। আপনি (তখন) বলুন : তাহলে তোমরা দিশেহারা হচ্ছ কেন ? (প্রমাণের বাক্যাবলী সব স্বীকার কর ; কিন্তু ফলাফল স্বীকার কর না, যা তাওহীদ ও কিয়ামতের বিশাস। অতঃপর তাদের 'أَنْفَاسَكُمْ' উক্তি বাতিল করা হচ্ছে; অর্থাৎ কিয়ামত আসা এবং মৃত্যুদের জীবিত হওয়া পূর্ববর্তীদের উপকথা নয়।) বরং আমি তাদেরকে সত্য বাণী পৌছিয়েছি এবং নিশ্চয় তারা (নিজেরা) যিষ্যাবাদী। (এ পর্যন্ত কথোপকথন সমাপ্ত হলো এবং তাওহীদ ও পুনরুজ্জীবন প্রমাণিত হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তাওহীদের বিবরণটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যায় পরিশিষ্টে একে ব্রতন্তরাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) আল্লাহ তা'আলা কোম সজ্ঞান শুভে করেননি (যেমন মৃশিকরা ফেরেশতাদের সম্পর্কে একথা বলে) তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ তার সৃষ্টি (ভাগ করে) পৃথক করে নিত এবং (দুনিয়ার রাজা-বাস্তুপাহদের ন্যায় অন্যের সৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে একজন অপরজনের উপর আক্রমণ করত। এমতাবস্থায় সৃষ্টির ধৰ্মসম্পূর্ণতার শেষ প্রাক্ত না ; কিন্তু বিষ্঵ব্যবস্থায় এমন কোন বিশ্বজ্ঞলা নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা যেসব (যুণ) কথাবার্তা বলে, তা থেকে আল্লাহ পরিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি তাদের শিরক থেকে উর্ধ্বে (ও পবিত্র)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— وَهُوَ يُعِينُ إِلَيْهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আশ্রয়, মুসীবত ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাথে নেই যে, তার মুকাবিলায় কাউকে

আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না।—(কুরআন)

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيكُ مَا يُوَعِّدُونَ ۝ رَبِّ فَلَاتَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدْ رُونَ ۝ إِدْفَعْ بِالْتَّقْرِيْهِ أَحْسَنُ السَّيِّعَةَ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَيْنِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝ لَعَلَىٰ أَعْمَلِ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمةٌ هُوَ قَالِهَا مَوْمِنٌ وَرَأَيْهُمْ بِرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعْثَوْنَ ۝

(৯৩) বলুন : ‘হে আমার পালনকর্তা ! যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৮৪) হে আমার পালনকর্তা ! তবে আপনি আমাকে শনাহগার সম্পদায়ের অঙ্গৰ্ভ করবেন না।’ (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) যদের জওয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন : ‘হে আমার পালনকর্তা ! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা ! আমার নিকট তাদের উপরিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ (৯৯) যখন তাদের কারণ কাছে যত্ন আসে, তখন সে বলে : ‘হে আমার পালনকর্তা ! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। (১০০) যাতে আমি সত্ত্বকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।’ কখনই নয়, এ তো তার একটি কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুদ্ধান দিবস পর্যন্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (আল্লাহ তা'আলার কাছে) দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা, কাফিরদের সাথে যে আযাবের কথা ওয়াদা করা হচ্ছে (যেমন উপরে আল্লাহ মালিক থেকেও জানা যায়) তা যদি আমাকে দেখান, (উদাহরণত আমার জীবদ্ধশাতেই তাদের উপর এভাবে আসে যে, আমিও দেখি। কারণ, এই প্রতিশ্রুত আযাবের কোন বিশেষ সময় বলা হয়নি।

উল্লিখিত আয়াতও এ ব্যাপারে অস্পষ্ট। ফলে, উল্লিখিত সভাবনাও বিদ্যমান। মোটকথা, যদি এরূপ হয়) তবে হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে যালিয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আমি তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দিছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (তবে যে পর্যন্ত তাদের উপর আয়াব না আসে,) আপনি (তাদের সাথে এই ব্যবহার করুন যে) তাদের মধ্যকে এমন ব্যবহার দ্বারা প্রতিহত করুন, যা খুবই উত্তম। (ও নরম। নিজের জন্য প্রতিশেধ নেবেন না ; বরং আয়াব হাতে সমর্পণ করুন) তারা (আপনার সম্পর্কে) যা বলে, সে বিষয়ে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। (যদি মানুষ হিসেবে আপনার ক্ষেত্রে উদ্বেগ হয়, তবে) আপনি দোয়া করুন, হে আয়াব পালনকর্তা, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্চর্য প্রার্থনা করি (যা শরীয়ত-বিরোধী না হলেও উপযোগিতা বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে) এবং হে আয়াব পালনকর্তা, আয়াব নিকট শয়তানের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্চর্য প্রার্থনা করি, প্ররোচিত করা তো দূরের কথা। এই দোয়ার ফলে ক্ষেত্র দূর হয়ে যাবে। কাফিররা তাদের কুফর ও পরকালের অবীকৃতি থেকে বিরত হবে না ; এমনকি যখন তাদের কারণ মাথার উপর মৃত্যু এসে (দণ্ডযামন হয় এবং পরকাল দেখতে থাকে), তখন (চোখ খুলে এবং মূর্ধনা ও কুফরের কারণে অনুত্তম হয়ে) বলে হে আয়াব পালনকর্তা, (মৃত্যুকে আয়াব কাছ থেকে সরিয়ে দিন এবং) আমাকে (দুনিয়াতে) পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে যাকে (অর্থাৎ যে দুনিয়াকে) আমি ছেড়ে এসেছি, তাতে (পুনরায় গিয়ে) সংকাজ করি (অর্থাৎ ধর্মকে সত্য জানি ও ইবাদত করি। আস্ত্রাহ তা'আলা এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন) কখনও (এরূপ হবে) না, এ তো তার একটি কথা মাত্র, যা সে বলে যাচ্ছে। (তা বাস্তবে পরিণত হবে না। কারণ,) তাদের সামনে এক আড়াল (আয়াব) আছে (যার আসা জরুরী)। এটাই দুনিয়াতে ফেরত আসার পথে বাধা। অর্থাৎ মৃত্যু। এই মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে。 وَلَنْ يُؤْخِرَ اللَّهُ أَعْلَمُ — نَفْسًا إِذَا جَاءَهُ — مৃত্যুর পর দুনিয়াতে কিরে আসাও) কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (আস্ত্রাহ আইনের খেলাফ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই ফُلْ رَبِّ امَّا تُرِيَّنِيْ مَأْبُوْعَدُونَ . رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফিরদের উপর আয়াবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আয়াব হওয়া তো অকাট্য ও নিষিত্যিই, দুনিয়াতে হওয়ারও সভাবনা আছে। যদি এই আয়াব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলের পরে হওয়ারও সভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আয়াব আসার সভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আয়াব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আয়াবের প্রতিক্রিয়া শুধু যালিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকগুলি এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আয়াব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন গাক বলে : اِنَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ النِّبِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَامِسَةً অর্থাৎ এমন আয়াবকে

ডয় কর, যা এবে গেলে তখু বালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না ; এবং অন্যরাও এর কথালে পার্তি হবে ।

আলোচ্য অস্তুতিসমূহে রাসূলস্লাহ (সা)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই বালিমদের সাথে রাখবেন না । রাসূলস্লাহ (সা) নিষ্পাপ ছিলেন বিদ্যমান আল্লাহর আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল । তা সত্যেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃক্ষের উচ্চেশ্বে তিনি সর্ববস্থায় আল্লাহকে স্বরূপ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন ।—(কৃবরুমী)

وَأَنَا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا تَعْبُدُمْ لَقَابِرِنَ — অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আযাব আসা সেবিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম । কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উচ্চতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার শয়দী হয়ে গেছে । আল্লাহ বলেন : وَمَا كَانَ اللَّهُ بِغَنِيمَةٍ وَأَنْتَ بِفِيمْ — অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধূস করব ন্যা । কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয় । এই আয়তে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেবিয়ে দিতে প্রকৃত । যক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলিমানদের তরুণারিয়ে আযাব রাসূলস্লাহ (সা)-এর সামনেই তাদের উপর পার্তি হয়েছিল ।
— ادْفِعْ بِأَقْسَىٰ مِنْ أَحْسَنِ السَّيْئَاتِ — অর্থাৎ আপনি মন্দকে উভয় দ্বারা, যুলুমকে ইন্সাফ দ্বারা এবং নির্যাতনের জওয়াবে কম্বকির ও মুশ্রিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাদান কর করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আরাত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে । কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে ; যেমন কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলিমানদের মুকাবিলায় যুক্তে অংশপ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা । কাউকে হত্যা করা হলে তার বাক, কাল ‘ইত্তাদি ‘সুল্লা’ না করা ইত্যাদি । আই পরবর্তী আয়তে রাসূলস্লাহ (সা)-কে শর্করাম ও তাঁর প্ররোচনা থেকে আব্দ্য প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে ঠিক সুজলেত্তেও তাঁর পক্ষ থেকে শর্করানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিবোধী কোম কাজ প্রকাশ না পার । দোয়াটি এই :

فَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ
بُخْضُرُونِ -

শব্দের অর্থ প্রভারণা করা, চাপ দেওয়া । শক্তিক্ষিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয় । শহীদানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আভরক্ষার জন্য এটা একটা সুন্মুখসারী অর্থবহু দোয়া । রাসূলস্লাহ (সা) মুসলিমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছিল,

যাতে ক্রোধ ও গোসসার অবহায় মানুষ যখন বেক্ষণ হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আস্তরঙ্গের জন্যও এ দোয়াটি পরিচিত। হযরত খালিদ (রা)-এর রাত্রিকালে নিম্ন আসত না। রাসূলুল্লাহ (সা)-তাঁকে এই দোয়া পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া পর্যন্ত করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يُخْبِرُونِ -

—سَهْلَ مُسْلِمِي—**إِنْ يُخْسِرُونَ**—**إِنْ يُخْسِرُونَ**—সহীহ মুসলিমে হযরত আবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : শয়তান সব কাজে সর্বাবহায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অস্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরআন)

এই প্ররোচনা থেকেই আগ্রহ প্রার্থনার জন্য দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبُّ ارجُونْ অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফির ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন একপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎ কর্ম করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জারীর ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে ; তুম কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দৃঢ়-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আক্রান্ত কাছে নিয়ে যাও। কাফিরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, **رَبُّ ارجُونْ**, অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمةٌ هُوَ فَانِلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ -

—এর শাহিদ অর্থ অস্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযথ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযথ বলা হয়। কারণ, এটা ইহলোকিক জীবন ও পারলোকিক জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণেন্দুর ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরযথে পৌছে গেছে। বরযথ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনজীবন পায় না, এটাই আইন।

فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمٌ مِّنْ وَلَآيَتَسَاءُونَ ③

فَمَنْ نَثَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلُحُونَ ①٥١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ①٥٢ تَلْقَهُ
 وَجْوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كُلُّهُونَ ①٥٣ إِنْ تَكُنْ أَيْتَى تَتَلَقَّهُمْ
 فَكَنْتُمْ بِهَا كَذِبُونَ ①٥٤ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبْتَ عَلَيْنَا شَقَوْتَنَا وَكَثَافَةً مَا
 ضَالَّلَنَّ ①٥٥ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عَذَابَنَا فِي أَنَّا ظَلَمُونَ ①٥٦ قَالَ
 أَخْسَأْوْفِيهَا وَلَا تَكَلَّمُونَ ①٥٧ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
 رَبَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ①٥٨ فَإِنْ تَخَذِّ
 تَمَوْهُمْ سِخْرِيَّاً حَتَّى أَنْسُوكُهُ ذَكْرِي وَكَنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضَعَّفُونَ ①٥٩
 إِنِّي جَزِيَّتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَلَا نَهُمْ هُمُ الْفَاعِزُونَ ①٦٠ قُلْ كُمْ
 لَيَشْتَمُّ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِينِينَ ①٦١ قَالُوا لَيَشْتَمُّ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كَنْتُمْ
 فَسُعِلُ الْعَادِيَنَ ①٦٢ قُلْ إِنْ لَيَشْتَمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ①٦٣ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْشًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ①٦٤

(101) অঙ্গপুর যখন শিঙায় ফুক্কার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারম্পরিক আজীবনতার বদ্ধন ধাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (102) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (103) এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করবে তারা দোষথেই চিরকাল বসবাস করবে। (104) আগুন তাদের মুখমণ্ডল দষ্ট করবে এবং তারা তাতে বীড়ৎস আকার ধারণ করবে। (105) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না ? তোমরা তো সেতলোকে যিথ্যা বলতে। (106) তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে প্রান্তৃত হিলাম এবং আমরা হিলাম বিভাস্ত জাতি। (107) হে আমাদের পালনকর্তা ! এ থেকে আমাদেরকে উকার কর ; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা শনাহগার হব। (108) আল্লাহ

বলবেন : তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না । (১০৯) আমার বাস্তাদের একদল বলত : হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি । অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি রহম কর । তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু । (১১০) অতঃপর তোমরা তাদেরকে ঠাণ্টার পাত্রক্ষণে প্রহণ করতে । এমনকি তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে পরিহাস করতে । (১১১) আঞ্জ আমি তাদেরকে তাদের স্বরের কারণে এমন প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম । (১১২) আল্লাহ বলবেন : তোমরা পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিলম্ব করলে বছরের গণনায় । (১১৩) তারা বলবে, আমরা একসিন অথবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি । অতএব আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন । (১১৪) আল্লাহ বলবেন : তোমরা তাতে অল্পদিনই অবস্থান করেছ, যদি তোমরা জানতে ! (১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন (কিয়ামত দিবসে) শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন (এমন ভয় ও আসের সংশ্রান্ত হবে যে,) তাদের পারম্পরিক আংশীয়তার বন্ধনও সেদিন (যেন) থাকবে না : (অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না ; অপরিচিতের মত ব্যবহার করবে ।) এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না (যে, তাই, তুমি কি অবস্থায় আছ ? মোটকথা, আংশীয়তা ও বঙ্গুত্ত পরিচয় কাজে আসবে না)। সেখানে একমাত্র ঈয়ানই হবে উপকারী বিষয় । এর প্রকাশ্য পরিচিতির জন্য একটি পাত্রা ধাড়া করা হবে এবং তাতে ক্রিয়াকর্ম ও বিশ্বাস ওজন করা হবে ।) অতএব যাদের পাত্রা (ঈয়ানের) ভারী হবে (অর্থাৎ যারা মু'মিন হবে) তারাই সফলকাম (অর্থাৎ মৃত্তিপ্রাণ) হবে (এবং মু'মিনগণ উপরোক্ত ভয়জীতি ও অজিজ্ঞাসামূলক অবস্থার সম্মুখীন হবে না)। আল্লাহ বলেন : لَيُخْرِجُنَّهُمُ الْفَرَزْعَ لَكُلَّ بَرْبَرٍ
এবং যাদের (ঈয়ানের) পাত্রা হাঙ্গা হবে, (অর্থাৎ যারা কাফির হবে) তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা চিরকালের জন্য জাহানামে থাকবে । (জাহানামের) অগ্নি তাদের মুখ্যগুলকে দষ্ট করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে । (আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাদেরকে বলবেন :) কেন, (দুনিয়াতে) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হতো না কি ? আর তোমরা সেগুলোকে যিথ্যা বলতে । (এটা তারই শাস্তি প্রাপ্ত হচ্ছে ।) তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, (বাস্তবিকই) আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত হিলাম এবং (নিঃসন্দেহে) আমরা হিলাম পথভ্রষ্ট সম্পদায় । (অর্থাৎ আমরা অপরাধ স্থীকার এবং তজ্জন্য অনুশোচনা ও ওয়রখাহী করে আবেদন করছি যে,) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এ (জাহানাম) থেকে (এখন) বের করে দিন (এবং পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করুন;) যেমন সূরা সিজদায় আছে আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) —৪২
আল্লাহ বলবেন : مَا 'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) —৪২

তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এতেই (অর্থাৎ জাহানামেই) পড়ে থাক এবং আমার সাথে কথা বলো না (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন নামজ্ঞার। তোমাদের কি মনে নেই, যে,) আমার বাস্তাদের এক (সৈমান্দার) দলে বলত : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর তোমরা (গুরু এই কথার উপর যারা সর্বাবস্থায় উভয় ও গ্রহণযোগ্য ছিল,) তাদেরকে ঠাট্টার পাত্রপে প্রহণ করেছিলে, এমনকি তা (অর্থাৎ এই বৃত্তি) তোমাদেরকে আমার শরণও ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং তোমরা তাদেরকে দেখে হাস্য করতে। (অতএব তাদের তো কোন ক্ষতি হয়নি, কিছুদিনের কষ্টের জন্য সবর করতে হয়েছে মাত্র। এই সবরের পরিণতিতে) আজ আমি তাদের সবরের এই প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই সফলকাম। (আর তোমরা এহেন অকৃতকার্যতায় প্রেক্ষিতার হয়েছ। জওয়াবের উদ্দেশ্য এই যে, শপ্তির সময় অন্যায় স্বীকার করলেই ক্ষমা করা হবে—তোমাদের অন্যায় একেপ নয়। কেননা, তোমাদের আচরণে আমার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বাস্তার হকও নষ্ট হয়েছে এবং বাস্তাও কেননা, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্কশীল মকবুল ও প্রিয় বাস্তা। তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করায় বাস্তার হক নষ্ট হয়েছে এবং ঠাট্টার আসল লক্ষ্য সত্যকে প্রিয়া বলায় আপ্তাহ্র হক নষ্ট হয়েছে। সুতরাং এর জন্য স্থায়ী ও পূর্ণ শাস্তি উপযুক্ত। তাদের সামনে ঘুর্মিনদেরকে জান্নাতের পুরস্কার প্রদান করাও কাফিরদের জন্য একটি শাস্তি। কেননা, শক্রের সফলতা দেখলে অত্যধিক শীড়া অনুভূত হয়। এ হচ্ছে তাদের আবেদনের জওয়াব। অতঃপর তাদের বিশ্বাস ও ধর্ষ যে বাতিল তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে সাঙ্গনার উপর লাঙ্গলা ও পরিতাপের উপর পরিতাপ হওয়াতে শাস্তি আরও তীব্র হয়ে যায়। তাই) বলা হবে : (আচ্ছা বল তো,) তোমরা বছরের গণনায় কি পরিমাণ সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেছ ? (যেহেতু কিয়ামতের দিন ভয়ঙ্গিতির কারণে তাদের হঁশ-জ্ঞান লুণ হয়ে যাবে এবং সেদিনের দৈর্ঘ্যও দৃষ্টিতে থাকবে, তাই) তারা জওয়াব দেবে (বছর কোথায়, বড় জোর থাকলে) একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ আমরা অবস্থান করেছি (সত্য এই যে, আমাদের মনে নেই), আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে, যারা আমল ও বয়স সবকিছুর হিসাব রাখে) জিজেস করুন। আস্তাহ বললেন : (একদিন ও দিনের কিছু অংশ ভুল ; কিন্তু তোমাদের বিশুদ্ধ স্বীকারোক্তি থেকে অতটুকু তো প্রমাণিত হয়েছে যে,) তোমরা (দুনিয়াতে) অল্পদিনই অবস্থান করেছ, কিন্তু ভাল হতো যদি তোমরা (একথা তখন) বুঝতে (যে, দুনিয়ার স্থায়িত্ব ধর্তব্য নয় এবং এটা ছাড়া আরও অবস্থানস্থল আছে। কিন্তু তোমরা স্থায়িত্বকে দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করেছ এবং জগতকে অস্বীকার করেছ)।—এখন অস্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং তোমরা ঠিক যন্তে করছ ; কিন্তু বেকার। বিশ্বাসের অস্তি বর্ণনা করার পর এই বিশ্বাসের কারণে সতর্ক করা হচ্ছে) তোমরা কি ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (উদ্দেশ্য এই যে, যখন আমি বিশুদ্ধ প্রয়াণাদি স্থারা সত্য প্রমাণিত আয়াতসমূহে

কিয়ামত ও তাতে আমলের প্রতিদানের সংবাদ দিয়েছিলাম, তখনই মানব সৃষ্টির অন্য রহস্যসমূহের মধ্যে এ রহস্যও জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কিয়ামত অঙ্গীকার করা ছিল অতি জঘন্য ব্যাপার।)

আনুবাদিক আত্ম্য বিষয়

فَإِذَا نَفَخْ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ—কিয়ামতের দিন দু'বার শিখায় ফুৎকার দেশের হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যদীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধৰ্ম হবে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উপিত হবে। কোরআন পাকের আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিখার প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়রের রেওয়ায়েতে হ্যরত ইবনে আবুসাম থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে ইবনে আবুসাম থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশেরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অসুকের পুত্র অসুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিচ্ছায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করবেক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিচ্ছায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-ঝী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিচ্ছায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সম্মুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে **فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারম্পরিক আঙ্গীয়তার বক্ষন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিত্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই :

يَوْمَ يَغْرِيُ الْمَرءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَمْهُ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِتِهِ وَبَنِيهِ-

অর্থাৎ সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, ঝী ও স্তৰান-সন্ততির কাছ থেকে দুরে পলায়ন করবে।

হাশের মু'মিন ও কাফিরের অবস্থার পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে—মু'মিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফিরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মু'মিনদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্য করেআল বলে যে, অর্থাৎ **الْحَقِيقَةُ بِهِمْ دُرْبَتِهِمْ** অর্থাৎ কাফিরপরায়ণ মু'মিনদের স্তৰান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা'আলা (ইমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন হাশেরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান স্তৰান অঞ্চল বন্দে মৃত্যুমুখে পাতিত হয়েছিল, তারা জাগ্রাতের পানি নিয়ে বের হবে।

মানুষ তাদের কাছে পানি ঢাইবে । তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি । এ পানি তাদের জন্যই ।—(মাযহারী)

এমনিভাবে হয়রত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলগ্রাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন বৎশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আঙ্গীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না)—আমার বৎশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আঙ্গীয়তা ব্যক্তীত । আলিমগণ বলেন : নবী করীম (সা)-এর বৎশের মধ্যে সমগ্র মূলমূলান উচ্চতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে । কারণ, তিনি উচ্চতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উচ্চতের মাতা । মোটকথা, আঙ্গীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না ; কিন্তু এটা কাফিরদের অবস্থা । মু'মিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে ।

—وَلَا يَنْسَأُنَّ—অর্থাৎ পরম্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না । অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, **وَأَقْبَلَ بِغُصْنِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَّسَأَلُونَ**—আর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আবুস (রা) বলেন : হাশরের বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে । এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না । এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়বীভূত ও আতঙ্ক ত্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে ।—(মাযহারী)

**فَمَنْ تَقْلِبْتُ مَوَازِينَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ -**

অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সেই সফলকাম হবে । পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাঙ্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে । এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে । এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফিরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে । এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে । কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং তারা সফলকাম হবে । কাফিরদের পাল্লা হাঙ্কা হবে । ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে ।

কোরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা থারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারী হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ শুন্দর পাল্লায় কোন ওয়নই হবে না, তা শুন্য দৃষ্টিগোচর হবে । পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা হাঙ্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতই হাঙ্কা হবে । কোরআনের অন্তর্বলা হয়েছে, **فَلَا تُقْبِلُنَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَلِكَ**—অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফিরদের ত্রিয়াকর্ম ওয়নই করব না । কামিল মু'মিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো । পক্ষান্তরে যাদের থারা কোন শুন্দর সংঘটিতই হয়নি কিংবা তাঁরা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের শুন্দরের পাল্লায় কিছুই থাকবে না । অপরদিকে কাফিরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত

বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওয়ন হাস্কা হবে। শুনাহ্গার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং শুনাহ্গ পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কোরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কোরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিগ্রা শুনাহ থেকে পরিদ্রাই ছিলেন। কারণ দ্বারা কোন শুনাহ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল ঘির্ষ। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আববাস বলেন : কিয়ামতের দিন যার নেকী শুনাহুর চাইতে বেশি হবে—এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যার শুনাহুর নেকীর চাইতে বেশি হবে—এক শুনাহুর বেশি হলেও সে দোষখে যাবে ; কিন্তু মু'মিন শুনাহ্গারের দোষখে প্রবেশ পরিত্বর্ক করার উদ্দেশ্য হবে ; যেমন শোহা বৰ্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোষখের অগ্নি দ্বারা যখন তার শুনাহুর মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আববাস আরও বলেন : কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওয়ন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক-সেদিক হবে না। যার নেকী ও শুনাহুর পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোষখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। —(মাযহারী)

ইবনে আববাসের এই উক্তিতে কাফিরদের উল্লেখ নেই, তখন মু'মিন শুনাহ্গারদের কথা আছে।

আসল ওফনের ব্যবস্থা : কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, ব্যং মু'মিন ও কাফির ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওয়ন করা হবে। কাফিরের কোন ওয়নই হবে না, সে যত মোটা স্কুলদেহীই হোক না কেন। (—বুখারী, মুসলিম) কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওয়ন করা হবে। তিরিমিয়া, ইবনে মাজহা, ইবনে হিবরান ও হাকিম এই বিষয়বস্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওয়নহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থার পাল্লায় রাখা হবে এবং ওয়ন করা হবে। তাবারানী প্রযুক্ত ইবনে আববাসের ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আবদুর রাজ্জাক 'ফযলুল ইলম' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাথীয়া থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওফনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাস্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে, পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে : তুমি জান এটা কি? (যার দ্বারা পাল্লা ভারী হয়ে গেছে)। সে বলবে : আমি জানি না। তখন বলা হবে : এটা

তোমার ইল্ম, যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন শহীদদের রক্ত এবং আশিমদের কলমের কালি (যদ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক প্রচার করেছেন) পরম্পরে ওয়ন করা হবে। আশিমদের কালির ওয়ন শহীদদের রক্তের চাইতে বেশি হবে।—(মাযহারী)

আমল ওয়নের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেখ্যায়েত উদ্ভৃত করার পর তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওয়ন করার মধ্যে কোন অবস্থার তা নেই। তাই তিন প্রকার রেখ্যায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

— وَمَنْ فِيهَا كَالْحُونَ —
অতএব অতিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠবয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক উষ্ট উপরে উথিত এবং অপর উষ্ট নিচে বুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা শুরু বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠবয়ও অনুপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

— وَلَيَكُنْ —
ইয়রত হাসান বসরী বলেন : এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্মদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী শুহামদ ইবনে কাব থেকে বর্ণনা করেন : কেরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ভৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি জওয়াব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে ৪ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না।—(মাযহারী)

فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ مَا إِنَّهُ لَا يَقْدِحُ الْكُفَّارُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

(১১৬) অতএব শীর্ষ অহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্ত্বিকার মালিক, তিনি ব্যক্তিত কোন মাতৃস্ত নেই। তিনি সম্মানিত আগ্রহের মালিক। (১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য ভাকে, তার কাছে ধার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে আছে। নিচয় কাফিয়ার সকলকাম হবে না। (১১৮) বলুন : হে আমার পালনকর্তা, কর্তা কর্তন ও মহম কর্তন। বহুকারীদের মধ্যে আপনি প্রের বহুকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এসব বিষয়বস্তু যখন জানা গেল) অতএব (এ থেকে পূর্ণজগৎে প্রমাণিত হয় যে,)।

আল্লাহ মহিমাবিত, তিনি বাদশাহ (এবং বাদশাহ-ও) সত্যিকার। তিনি ব্যক্তিত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই (এবং তিনি) মহান আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি (এ বিষয়ে প্রমাণাদি প্রতিচিঠি হওয়ার পর) আল্লাহর সাথে অন্য কোন মানুদের ইবাদত করে, যার (মানুদ হওয়া) সম্পর্কে তার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে হবে, (যার অবশ্যকাবী ফল এই যে,) নিচ্ছয়ই^১ কাফিররা সফলকাম হবে না। (বরং চিরকাল আয়াব ভোগ করবে এবং যখন আল্লাহ তা'আলার শান এই, তখন) আপনি (এবং অন্যরাও) বলুন : হে আমার পালনকর্তা, (আমার ক্রটিসমূহ) ক্ষমা করুন ও (সর্বাবহায় আমার প্রতি) রহম করুন (জীবিকায়, ইবাদতের শুওফীকদানে, পরকালের মৃত্যির ব্যাপারে এবং জাম্মাত দানের ব্যাপারেও।) রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মু'মিনুনের সর্বশেষ আয়াতসমূহ عَبْدًا خَلَقْنَاكُمْ أَنْتُمْ حَافِظُونَ থেকে নিয়ে শেষ সূরা পর্যন্ত বিশেষ ফর্মীলত রাখে। বগভী ও সালাবী হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি জনেক রোগাজ্ঞাত ব্যক্তির কানে এই আয়াতসমূহ পাঠ করলে সে তৎক্ষণাত আরোগ্য লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজেস করলেন যে, ভূমি তার কানে কি পাঠ করেছ? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন : আমি এই আয়াতগুলো পাঠ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : সেই আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর পাঠ করে দেয়, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে।

— رَبُّ اغْفِرْ وَارْحَمْ — এখানে মণ্ডুর তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা, ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।—(মাযহারী)। রাসূলুল্লাহ (সা) নিষ্পাপ ও রহমতপ্রাপ্তি ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উদ্বাতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। —(কুরআনী)

— قَدْ أَفْلَحَ الرَّؤْسَنْ ۖ إِنَّمَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۖ — সূরা মু'মিনুনের সূচনা আরো হয়েছিল এবং সমাপ্তি ب্যুল্ল কাফিরুন্ন দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বুরো গেল যে, ফালাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্তি এবং কাফিররা এ থেকে বাস্তিত।

سُورَةُ النُّورِ

সূরা আন-নূর

মদীনায় অবতীর্ণ, ৯ কৃকৃ ; ৬৪ আয়াত

সূরা নূরের কঠিপয় বৈশিষ্ট্য : এই সূরার অধিকাংশ বিধান সভীত্বের সংরক্ষণ ও পর্দাপুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসাবে ব্যতিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মু'মিনুনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি শুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সভীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সভীত্বকে শুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।

علموا نساعكم : হ্যরত উমর ফাতেব (রা) কৃফাবাসীদের নামে এক ফরযানে লিখেছেন : অর্থাৎ তোমাদের নারীদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও।

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে ; অর্থাৎ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا سورة النور এটাও এ সূরার বিশেষ শুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا أَيْتَ بَيْتٍ بَيْتٌ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

الْزَّانِيَةُ وَالْزَّانِيُّ فَاجْلِدُ وَاكْلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَا مِائَةَ جَلْدٍ ۝ مَوْلَانَا خَذْكُمْ

بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝

وَلَيَشْهَدُ عَنْ أَبِيهِمَا طَافِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

পরম কর্মশালয় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুক করছি।

(১) এটা একটা সূরা, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এবং এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা স্বরণ রাখ। (২) ব্যতিচারিণী নারী ও ব্যতিচারী পুরুষ ; তাদের অত্যোক্তকে একশ' করে কশাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্বেক না হয়, যদি তোমরা

আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে ; মু'মিনদের একটি দল যেমন তাদের শান্তি প্রত্যক্ষ করে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এটা একটা সূরা, যা (অর্থাৎ যার ভাষাও) আমি (ই) অবতীর্ণ করেছি, যা (অর্থাৎ যার অর্থসম্ভাব তথা বিধানবলীও) আমি (ই) নির্ধারিত করেছি (ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব, মনদ্ব হোক কিংবা স্বত্ত্বাব্দ) এবং আমি (এসব বিধান বুঝানোর জন্য) এতে (অর্থাৎ এই সূরায়) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝ এবং আমল কর)। ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ (উভয়ের বিধান এই যে,) তাদের প্রত্যেককে একশ করে দুরুরা মার এবং তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যেন দয়ার উদ্বেক না হয় (যেমন দয়ার বশবর্তী হয়ে ছেড়ে দাও কিংবা শান্তি ত্রাস করে দাও), যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। তাদের শান্তির সময় মুসলমানদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে (যাতে তাদের লাঙ্ঘনা হয় এবং দর্শক ও শ্রোতারা শিক্ষা গ্রহণ করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্তুরূপ, যদ্বারা এর বিধানবলীর বিশেষ শুরুত্ত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শান্তি—যা সূরার উদ্দেশ্য—উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হিফায়ত, অনুমতি ব্যভিচারকে কারণ গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানবলীর বিরুদ্ধে অকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শান্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শান্তি সবচাইতে কঠোর ও অধিক; ব্যভিচার স্বয়ং বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধর্মসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। গৃথিবীতে যত হত্যা ও সুষ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্জন্তার মূলোৎপাটনের জন্য এর শরীয়তানুগ শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি যথা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর শান্তি ও সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে : কোরআন পাক ও সুতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শান্তি ও তার পক্ষ স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শান্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘হৃদ্দ’ বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শান্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা; অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শান্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শান্তি দিতে পারে। এ ধরনের শান্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘তা’য়ীরাত’ (দণ্ড) বলা হয়। হৃদ্দ চারটি : মা’আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৪৩

হৃষি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই বহুলে গুরুতর, জগতের শাস্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অগত পরিণতি মামুদিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হালে, তেমনি বৌধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই ।

(১) কোন ব্যক্তির কল্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধৰ্মস করার নামান্তর । স্ত্রীর মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা যতটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অন্দরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন । এ কারণেই দুনিয়াতে রোজাই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পথ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বিশেষ পর বংশকে বরবাদ করে দেয় ।

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারণ বংশই সংঘর্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কল্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারায় ; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কল্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সভাবনা আছে, যা ব্যভিচারের চাইতেও কঠোরতম অপরাধ ।

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশাস্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থসম্পদ । যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বাস্তির রক্ষাকর্ত হতে পারে । এটা ব্যভিচারের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্ত্রিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয় । মানব সমাজের জন্য এর খৎসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট । এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাদের শাস্তির চাইতে কঠোরতর করেছে । আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : ﴿إِنَّمَا يُحَرِّمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَا جَنَبَ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يُنْهِي مِنْ أَذْنِنَاهُنَّ أَذْنُنَّا بِمَا يَرَنَّ وَمَا يُنْهِي مِنْ أَذْنِنَا بِمَا يَرَنَّ﴾ । পুঁজিস পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অস্তর্ভুক্ত রয়েছে । সম্বত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে । তবে এই পদ্ধতিদ্বাটে কেউ একাপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যাই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত । তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে বরত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয় ; যেমন ﴿أَفَلَمْ يَرَنِ الْمُلْكَةُ وَأَتْيَنَ الرَّكْوَةَ﴾ যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ত্রুম একাপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে । তুরিয়ে শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمْ﴾ বলা হয়েছে । এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর

অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমীয়ত : নারীর উল্লেখ এসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি ; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপরূপে মনে করা হচ্ছে দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক বিষয় নিহিত আছে। নারী অবলো এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যক্তিগত একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী হাত্তা এটা সংস্কৃতি হওয়া চৰম নিভীকৃতা ও উদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আশ্চর্য তাঁর কাজে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত সংবক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গঠিত রেখেছেন, এবং তার হিষায়তের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ মুক্ত পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত। পুরুষকে আশ্চর্য তাঁর আলা উপর্যুক্তের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রচলনাদি মিট্টিলোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্বৰ্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা অদ্বিতীয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা শয় ও বল্লজ্জরের অপরাধ হবে।

جَلْ—شَدَّهُ الرَّأْسَ—فَلَمْ يَلْبُدْ—অবস্থার অর্থ চাবুক হারা। শব্দটি (চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণত চামড়া হারা তৈরি করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেন : جَلْ—শদ হারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইহিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যবেক্ষণে সীমিত থাকা চাই এবং মাঝে পর্যবেক্ষণ না পৌছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) কশাঘাতের শাস্তিতে কার্যের মাধ্যমে এই মিঙ্গাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয়, মাঝে পর্যবেক্ষণে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভূত না হয়। এছাড়ে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি খুব অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নিশ্চিত, বিবাহিতদের শাস্তি প্রত্যুষাঘাতে হত্যা করা : স্তর্তব্য যে, ব্যক্তিগতের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উল্লিখিত হয়েছে; যেমন মনের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কেন্দ্ৰস্থানে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যক্তিগতের শাস্তি সংস্কৃতিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতজুর্বা : ۱۵-۱۶ :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ النَّفَاحَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّا مُسْكُونُهُنَّ فِي الْبَيْوَتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّفَا هُنَّ الْمُؤْتُمْ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا—وَالَّذِي يَأْتِيَنَاهَا مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ هُمَا فَلِئْنَ تَابَ وَأَصْلَحَ فَغَافِرُهُمْ إِنَّمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا -

“তোমদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগত করে, তাদের বিজ্ঞে তোমদের চাবুকজ্জল পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবক্ষ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ করে দেন এবং

তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ষ করে তাকে শাস্তি দাও । অতঃপর সে যদি তওবা করে সৎশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর । নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তওবা করুলকারী, দয়ালু৷ ।” এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে । ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো । আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ দরকার হবে । স্থিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবক্ষ রাখা এবং উভয়ের জন্য কট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে । এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়—ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে । আয়াতের অংশের মর্ম তাই ।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তি ও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে । কিন্তু এই শাস্তি ও কট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি । বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'য়ির' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি ; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল । তাই আয়াতে 'কট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । কিন্তু সাথে সাথেই **أُوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয় । সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবর্তীর হলে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস মন্তব্য করলেন : সূরা নিসায় **أُوْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنْ سَبِيلًا** বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে ; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে । এতদসঙ্গে হ্যরত ইবনে আবুস একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন : **الرجم للثيب والجلد للبكر** يعني الرجم للثيب والجلد للبكر অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে ।

বলা বাহ্যিক, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনুক্ত বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে । এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা-একথা হ্যরত ইবনে আবুস কোন হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন । সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম মুসনাদে আহমদ, সুনানে নামায়ী, আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়তে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماء

وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم -

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহু তা'আলা ব্যতিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রূত পথ সূরা নূরে বাংলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা।—(ইবনে কাসীর)

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, না বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য দেশান্তরিতও করে দেবেন-এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আয়মের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল ; অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবৃহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা-এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তি ও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্রিত হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এতে *أَوْيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سِبْلًا* আয়াতের তফসীর করেছেন। তফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম, একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া ; দ্বিতীয়, এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং তৃতীয়, বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান। বলা বাহ্যে, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদেশ বলেই ছিল। *إِنْ مُوَالِاً وَحْيٌ يَوْحِي* । পয়গম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কোরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'এয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগুলো সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে, জনেকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যতিচার করে। ব্যতিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তি মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) *فَصَنِينَ بِينَكَمَا بَكْتَاب* । অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যতিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিতা মহিলাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উমায়সকে আদেশ দিলেন। উমায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো।—(ইবনে কাসীর)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) একশ কল্পান্ত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহর কিভাবে অনুমানী ফয়সালা বলেছেন; অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কল্পান্তারে শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে—প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তফসীর আল্লাহর কিভাবেই অনুজ্ঞপ ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিভাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে হ্যবরত উমর ফারক (রা)-এর ভাষণ হ্যবরত ইবনে আবাসের রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের অধ্যায় :

قَالَ عَمْرِيْبُنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَيْهَا الرِّجْمَ قِرَأَنَاهَا وَرَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمْنَاهَا فَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَحْنٌ أَنْ يَقُولُ حَاقِلٌ لَا يَنْجَدُ الْمَرْجِمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَضْلُّوا بِتَرْكِهِ فَرِيْضَةً أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الْمَرْجِمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَفَنَ إِذَا حَسِنَ هُنَ الرِّجَالُ وَالْخَيْرَاءُ إِذَا قَاتَتْ أَبِيَّتَةً أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْأَعْتَرَافَ -

হ্যবরত উমর ফারক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিশ্রে উপরিটি অবস্থায় বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিভাবে নায়িল করেন। কিভাবে যেসব বিষয়ে অবর্তীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, কারণ রেখেছি এবং হৃদয়সম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশংকা করছি যে, সবৰের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুক করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে ইঙ্গার বিধান আল্লাহর কিভাবে পাই না। ফলে সে একটি ধৰীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথচার হয়ে যাবে, যা আল্লাহ সাধিল করেছেন। মনে বেখ, প্রস্তরাঘাতে ইঙ্গার বিধান আল্লাহর কিভাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও মারীর প্রতি প্রযোজ্য—যদি ব্যক্তিচারের শরীরত সম্বত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ত ও দীক্ষারীতি পাওয়া যায়।—(মুসলিম ২৩ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

এই ক্ষেত্রান্তে সহীহ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। —(বুখারী, ২য় খণ্ড ১০০৯ পৃষ্ঠা) নাম্যারীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষা একই।

إِنَّا لَانْجَدَ مِنَ الرِّجْمِ بِدَائِنَتِهِ حَدَّ مِنْ حَدَّدَ اللَّهُ إِلَّا وَانْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ رَجَمْ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا أَنْ يَقُولُ قَاتِلُونَ أَنْ غَمُّ زَادَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَالِبِسَ قِبَهُ لَكَتَبَتْ فِي نَاحِيَةِ الْمَصْحَفِ وَشَهَدَ عَمْرِيْبُنَ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَفَلَانَ وَفَلَانَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمْ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ -

“শরীয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যক্তিগত শাস্তিতে অন্তরালাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা, এটা আল্লাহর অন্যতম হৃদ। মনে রেখ, রাসূলুল্লাহ (সা) রাজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রাজম করেছি। যদি এরপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে উমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কোরআনের এক প্রাণে এটা লিখে দিতাম। উমর ইবনে বাতাব, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং আমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রাজম করেছি।—(ইবনে কাসীর)

হযরত উমর ফারук (রা)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সুরা নূরের আয়াত ছাড়া রাজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত উমর সেই আয়াতের ভাষা প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কোরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষাবোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কোরআনের প্রাণে লিখে দিতাম।—(নাসায়ী)

এই রেওয়ায়েতে অণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কোরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা শুয়াজির হয়, তবে হযরত উমর মানুষের নিদ্বাবাদের জন্য একে কিরণে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিষ্ট। এখানে আরও অণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত উমর একথা বলেননি—আমি এই আয়াতকে কোরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কোরআনের প্রাণে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত উমর (রা) সুরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তফসীর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত গুরুত্ব ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল (সা)-এর কার্যপদ্ধালীকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই তফসীর ও বিবরণ কিতাবের হস্ত রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুন এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রাণে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোন আয়াত নয়; বরং সুরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এছলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েতে সবদ ও প্রমাণের মিক দিয়ে এরপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কোরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তুবিদ্যুপ একে “তিলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়” এর দ্বাটাতে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কোরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সুরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিগতী নারী ও ব্যক্তিগতী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যাখ্যা ও তফসীরের ভিত্তিকে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রাজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পরি স সন্তার প্রতি আয়াত নাখিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে ঘৰ্য্যাস্তীন

ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কিরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়ন ও প্রমাণিত রয়েছে। এই প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত ‘তাওয়াতুর’ তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধানে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শান্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা অকট্যুলপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা) থেকে একথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমই একরূপ।

জরুরী জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে ‘মুহসিন’ ও ‘গায়র মুহসিন’ অথবা ‘সাইয়েব’ ও ‘বিকর’ শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুধু বিবাহের মাধ্যমে স্তৰীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদ শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শান্তির পর্যায়ক্রমিক তিনি স্তৱ : উপরোক্ত রেওয়ায়েত ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শান্তি লভু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অস্তীর্ণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ (সা) উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু ‘একশ’ কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শান্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনে কঠোর শান্তিরোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যভিচারের শান্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শান্তি হদ মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শান্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু ব্যভিচারের হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাকুর ও দ্ব্যাধীন সাক্ষ্য জরুরী ; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিষ্ঠার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর ‘হন্দে কয়ফ’ জারি করা হবে ; অর্থাৎ আশিষি বেআঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোন ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুইজন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শান্তি বেআঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলী ফিকাহ গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোন পুরুষের সাথে অথবা জঙ্গির সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তি কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা মিসার তফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তি কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে কম নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

—بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—**ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের তরফ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা ত্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া অনুকূল্যা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানব জাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।**

—وَلَيَسْتَهِنْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ—**অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাস্তুনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হাদুদ প্রকাশ্য হানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল সোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।**

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে অপরাধীদের পূর্ণ লাল্লামাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাঃ অশুল ও নির্লজ্জ কাজকারবার দমনের জন্য ইসলামী শরীয়ত দূর-দূরাত্ম পর্যন্ত পাহাড়া বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারী কঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্তে বুঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাল্লিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবহুয় তার অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরীয়ত যতটুকু যত্নবান হিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাল্লিত করার জন্যও ততটুকুই যত্নবান। এ কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি ও ধূৰ্ঘ প্রকাশ্য হানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

الَّذِي لَا يَنْكِحُ الْأَزْانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالَّذِي نَهَىٰ لَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

⑤ أَوْ مُشْرِكَةٍ وَ حِرْمَانِ ذِلْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ব্যভিচার এমন নোংরা কাজ যে, এতে মানুষের মেজায়ই বিগড়ে যায়। তার আগ্রহ মন্দ বিষয়াদির প্রতিই নিবন্ধ হয়ে যায়। এমন বদ লোকের প্রতি আগ্রহ তার মতই আরেকজন চরিত্রাঙ্গ বদ লোকেরই হতে পারে। সেমতে) ব্যভিচারী পুরুষ (ব্যভিচারী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং (এমনিভাবে) ব্যভিচারিণীকেও (ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হওয়ার দিক থেকে) ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। এবং এটা (অর্থাৎ ব্যভিচারিণীর যে বিবাহ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, যার ফলহীনত সে ভবিষ্যতেও ব্যভিচারিণী থাকবে অথবা যে বিবাহ কোন মুশরিকা নারীর সাথে হয়) মুসলিমানদের উপর হারাম (এবং গুনাহ কারণ) করা হয়েছে (যদিও শুন্দতা ও অশুন্দতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচারিণীকে কেউ বিয়ে করলে গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে শুন্দ হবে। পক্ষান্তরে মুশরিকা নারীকে বিয়ে করলে গুনাহ তো হবেই, বিয়েও শুন্দ হবে না ; বরং বাতিল হবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান ৪ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন ঝঁপ। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত তফসীরই অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয়। এর সারাংশ এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরীয়তের কোন বিধান নয়, বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রাঙ্গ হয়ে যায়। ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায় দুচরিত্রাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। একপ চরিত্রাঙ্গ লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারক অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয় ; কিন্তু সে মনেধাগে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা, বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-ধাপন করা এবং সৎকর্মপ্রয়াণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য জীবন আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রাঙ্গ লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলিমান নারীদের প্রতিই নয় ; বরং মুশরিকা নারীদের

প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোন সামাজিক অথাবা কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুল্ক কিনা অথবা শরীয়ত মতে বাস্তিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিদ্যুমাত্রও জরুরী করে না। কাজেই একপ চরিত্রজষ্ঠ লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে—পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যন্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোন মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্যের অর্থ : **أَرْبَعَةُ رَبِيعٍ أَوْ مُشْرِكٍ لَا زَانِي لَا يَنْكِحُ لَا زَانِي لَا يَنْكِحُ**

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যন্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোন সংত্যকসর মু'মিন মুসলমানের অগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ, মু'মিন মুসলমানের আসল জন্ম হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরীয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। একপ নারী দ্বারা এই জন্ম অর্জন আশা করা যায় না ; বিশেষত যখন এ কথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। ইয়া, একপ নারীকে কোন ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল জন্ম কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা-বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোন পার্থির স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে ; তবে অবিষ্ট সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা একপ নারীকে বিবাহ করতে কোন মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দুটি বিষয়ের সম্মানেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ ; **أَرْبَعَةُ رَبِيعٍ وَالزُّانِي لَا زَانِي لَا يَنْكِحُ**

উল্লেখিত তফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোন পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কোন সঙ্গী-সাক্ষী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোন ব্যভিচারিণী নারী কোন সৎ পুরুষকে বিবাহ করে, তবে আঘাত দ্বারা একপ বিবাহের অশুল্কতা বুঝা যায় না। শরীয়ত মতে একপ বিবাহ শুল্ক হবে। ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকাহবিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কিরাম থেকে একপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলী প্রয়োগিত আছে। তফসীরে ইহলে কাসীঝে ইয়রত ইবনে আবুআস খেকেণ্ড একপ ফতোমাই বর্ণিত আছে। **وَحَرَمْ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোন কোন তফসীরকারকের মতে গ্রাও বলে যিনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মু'মিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এই শুল্ক দ্বারা ব্যভিচার বুঝানো আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সম্মতিহীন। তাই অন্যান্য তফসীরকারক বলেন যে, এই শুল্ক দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলিমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে

মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎ পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ ব্যক্তি থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ুসী (ডেডুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সন্তুষ্ট সতী নারী যদি কোন ব্যভিচারে অভ্যন্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারম্পরিক বিবাহ অশুল্ক কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়-এক. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্থির বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। একপ বিবাহ কবীরা গুনাহ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোন তফাখ নেই। দুই. কাজটি হারাম অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুল্ক হয়; যেমন কোন নারীকে ধোকা দিয়ে অথবা অগহরণ করে এমন শরীয়তানুযায়ী দুইজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুল্ক হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্থির স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থির বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরীয়তানুসূত ফলাফল-যেমন তরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুল্ক ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকারক আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْ بِأَبْرَعَهُ شَهْدَاءٍ فَاجْلِدُوهُمْ

ثُمَّ لِنِجْلِدَةٍ وَلَا تَقْبِلُوا إِلَيْهِمْ شَهَادَةً أَبْدًا ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ④

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا ۝ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

(৪) যারা সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপৰাদ আরোপ করে, অতঃপর ব্যক্তে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেআঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কব্যল করবে না। এরাই নাফরমান। (৫) কিন্তু যারা এরপর তওবা করে এবং সংশোধিত হয়; আল্লাহ ক্ষামাশীল, পরম যেহেতুবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা সঙ্গী-সাক্ষী নারীদের প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে, (যাদের ব্যভিচারিণী হওয়া কোন প্রমাণ অথবা শরীয়তসম্মত ইঙ্গিত দ্বারা প্রমাণিত নয়) অতঃপর (দাবির স্বপক্ষে) চরজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেআঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করবে না (এটাও অপবাদ আরোপের শাস্তির অংশ। তাদের সাক্ষ্য চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে। এ হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি।) এবং এরা (পরকালেও শাস্তির যোগ্য। কেননা তারা) পাপাচারী। কিন্তু যারা এরপর (আল্লাহর কাছে) তওবা করে (কেননা, অপবাদ আরোপ করে তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছে এবং আল্লাহর হক নষ্ট করেছে) এবং (যার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে, তার দ্বারা ক্ষমা করিয়েও) নিজের (অবস্থার) সংশোধন করে; (কেননা, তারা তার হক নষ্ট করেছিল) নিচয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (অর্থাৎ খাঁটি তওবা করলে পরকালের আয়াব মাফ হয়ে যাবে ; যদিও জাগতিক শাস্তি অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া বহাল থাকবে। কেননা, এটা শরীয়তের হৃদের অংশ এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তওবা করলে হদ মণ্ডকুফ হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান; মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কল্পনিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন আদেল পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপবাদ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেআঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবস্থাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও জওয়াব : এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোন সময় শরীয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই

ধারণা ভাস্ত। কেননা, এসব শর্ত হচ্ছে ব্যক্তিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্তায়ত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহুরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্জন কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ-ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোন শর্ত আরোপিত নেই। এ-ধরনের যেসব বিষয় ব্যক্তিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরীয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এ ক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না ; বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্তায়তের শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই যে শাস্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যক্তিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যক্তিচারের সাক্ষ্য দেবে না। কিন্তু অবাধ মেলামেশার সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহসিনাত করা ?
احسان
শুভটি থেকে উত্তৃত। শরীয়তের পরিভাষায়
দুই প্রকার। একটি ব্যক্তিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরাটি অপবাদ আরোপের
শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যক্তিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
احسان
এই যে, যার বিরুদ্ধে
ব্যক্তিচার প্রয়োগিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মৃত্য ও মুসলমান হতে হবে এবং
শরীয়তসম্মত পছায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরপ
ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ
আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
احسان
এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তিচারের অপবাদ
আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মৃত্য ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে
হবে অর্থাৎ পূর্বে কখনও তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিচার প্রয়োগিত হয়নি। আলোচ্য আয়তে
মুহসিনাতের অর্থ তাই।—(জাস্সাস)

মাসজ্জালা : কোরআনের আয়তে সাধারণ রীতি অনুযায়ী কিংবা শানে নয়নের
ঘটনার কারণে অপবাদের শাস্তি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদিকে আছে অপবাদ
আরোপকারী পুরুষ ও অপরদিকে যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, সেই সঙ্গী-সাধী
নারী। কিন্তু শরীয়তের বিধান কারণের অভিন্নতাবশত ব্যাপক ; কোন নারী অন্য নারীর
প্রতি অথবা কোন পুরুষের প্রতি কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের প্রতি ব্যক্তিচারের
অপবাদ আরোপ করলে এবং প্রমাণ উপস্থিত না করলে সবাই এই শাস্তির যোগ্য বলে
গণ্য হবে।—(জাস্সাস, হিদায়া)

০ ব্যক্তিচারের অপবাদ প্রসঙ্গে উল্লিখিত এই শাস্তি শুধু এই অপবাদের জন্যই নির্দিষ্ট।
অন্য কোন অপরাধের অপবাদ আরোপ করা হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে
বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী অভ্যেক অগ্রাধের অপবাদের জন্য দণ্ডমূলক শাস্তি দেওয়া
যেতে পারে। কোরআনের ভাষায় যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই যে, এই হদ ব্যক্তিচারের
অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের কথা বলা
এই সীমাবদ্ধতার প্রমাণ। কেননা, চারজন সাক্ষীর শর্ত শুধু ব্যক্তিচার প্রমাণের জন্যই
নির্দিষ্ট।—(জাস্সাস, হিদায়া)

০ অপবাদের হদে বাস্তবার হক অর্থাৎ যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়, তার হক ও
শামিল রয়েছে। তাই এই হদ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন প্রতিপক্ষ অর্থাৎ যার প্রতি
আরোপ করা হয়, সে হদ কার্যকর করার দাবিও করে। নতুনা হদ জারি করা হবে না—

(হিদায়া), ব্যক্তিকের হস্ত একপ নয়। এটা খাঁটি আল্লাহর হস্ত। কাজেই কেউ দাবি করলেক
বা না করলেক, হস্ত কার্যকর হবে।

—**أَرْبَعَةَ أَبْدَىٰ**— অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরচকে ব্যক্তিকের মিথ্যা অপবাদ
আরোপের অভিযোগ প্রয়োগিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হস্ত কার্যকর হয়,
তার একটি শাস্তি তো তাঁকে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে ; তাকে আশিটি বেআঘাত করা
হয়েছে ; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য
কবৃল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুত্তপ্ত হয়ে তওবা করে
এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। একপ
তওবা করলেও হানাফী আলিমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবৃল করা হয় না। হ্যাঁ, তবে
গুলাহ মাফ হয়ে যায় ; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে : **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ**
أَنْفُكَ مُمْبَدِلُ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ— অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হস্ত কার্যকর করা
হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত
ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

—**أَلَا الَّذِينَ تَابُوا**— বাকের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবু হানীফা ও অন্য কয়েকজন ইমামের
মতে **পূর্ববর্তী** আয়াতের শুধু শেষ বাকের সাথে সম্পর্ক রাখে ; অর্থাৎ **وَأَرْفَكَ مُمْ**
—**الْفَاسِقُونَ**— অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হস্ত জারি
করা হয়, সে ফাসেক ; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের
অবস্থা শোধরায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে।
এর ফলশুভ্রতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দুটি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ
আশিটি বেআঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া—এ শাস্তিদ্বয় তওবা সন্তুলণ বহানে
বহাল থাকবে। কেননা, **أَرْبَعَةَ أَبْدَىٰ** বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটি ও
হদেরই অংশবিশেষ। এ স্থিতিয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হস্ত মাফ হয় না ; যদিও
পরকালীন আয়াব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা
দ্বারা মাফ হবে না। ইয়াম শাফেই ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম
পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাকের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার
ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাস্সাস ও
মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জওয়াব বিজ্ঞাপিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক
সেখানে দেখে নিতে পারেন। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

**وَالَّذِينَ يَرْمَوْنَ ازْوَالَ جَهَنَّمْ وَلَوْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَدَاءِ إِلَّا نَفْسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدٍ هُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِإِنَّ اللَّهَ لِئِنَّ الصِّدِّيقِينَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ**

أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ ⑥ وَيَدْرُوْعَاهُ الْعَذَابَ
 أَنْ تَشَهَّدَ أَرْبَعَ شَهْلَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكُفَّارِ ⑦ وَالْخَامِسَةَ أَنْ
 غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ كَانَ مِنَ الصَّدِّيقِينَ ⑧ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ ⑨

এবং (৬) যারা তাদের জ্ঞানের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ'র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী ; (৭) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ'র লানত । (৮) এবং দ্বারা শান্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ'র কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী ; (৯) পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ'র গ্যব নেমে আসবে । (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ'র তওবা কবৃলকারী, প্রজ্ঞায়ন না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা তাদের জ্ঞানের প্রতি (ব্যক্তিকারের) অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া (অর্থাৎ নিজেদের দাবি ছাড়া) তাদের আর কোন সাক্ষী নেই ; এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য (যাতে আটকাদেশ অথবা অপবাদের হন দূর হয়ে যায়) ঐভাবে হবে যে, সে আল্লাহ'র কসম খেয়ে চারবার বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ'র লানত হবে যদি সে মিথ্যাবাদী হয় । (ত্রিপর) দ্বারা শান্তি (অর্থাৎ আটক থাকা অথবা ব্যক্তিকারের হন) রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ'র কসম খেয়ে চারবার বলে যে, এই পুরুষ অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, তার উপর আল্লাহ'র গ্যব নেমে আসবে যদি এই পুরুষ সত্যবাদী হয় (এভাবে উভয় স্বামী-দ্বী পার্থিব শান্তির কবল থেকে বাঁচতে পারবে । তবে দ্বারা স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে) । যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত (যে কারণে মানুষের ব্রহ্মাণ্ডত প্রবণতার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে বিধানাবলী প্রদান করেছেন) এবং আল্লাহ'র তওবা কবৃলকারী ও প্রজ্ঞায়ন না হতেন, তবে তোমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে (যেগুলো পরে বর্ণনা করা হবে) ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানব্য বিষয়

ব্যক্তিকার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান : **لَعْنَتٌ** শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহ'র অভিশাপ ও ক্ষেত্রের বদদোয়া করা । শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-দ্বী

উভয়কে বিশেষ কর্যকৃতি শপথ দেয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোন স্থামী তার স্তুর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার উচ্চজ্ঞত নয়, অপরপক্ষে স্থামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেআঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্থামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে রলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্তুর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্থামী-স্তুর উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্থামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্থামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না থায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম থেঁয়ে নেয়, তবে স্তুর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম থেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্থামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। একপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম থেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম থেঁয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থির শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্থামী-স্তুর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্থামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিজ্ঞেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকাহ গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামী শরীয়তে লেয়ানের আইন স্থামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়তে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাকুৰ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উষ্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুর্ক হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্থামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বত্কে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও সুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্থামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৪৫

মেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেয়ান শুধু বাসী-বীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ হলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ান আয়াতের শামে-নয়ুল কোন্ ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উকি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ মু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শামে-নয়ুল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টিকাকার হাফেয ইইমাম হাজর এবং মুসলিমের টিকাকার ইমাম নবজী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শামে-নয়ুল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বুখারীতে হ্যরত ইবনে আবাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আবাসেরই জবানী মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَالْأَذِينَ يَرْمُونَ
الْخُصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْيَعَ شَهْدَاءَ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا
মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চার্জল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপরাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপর্যুক্ত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশ্চিটি বেআঘাত করা হবে এবং তিরতরে তার সাক্ষ প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হ্যরত সা'দ ইবনে উবাদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে ? রাসূলুল্লাহ (সা) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এক্ষণ্প কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সর্বোধন করে বললেন : তোমরা কি শুন্দে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তাকে তিরঙ্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ; কিন্তু আমি আচর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর তিনি পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই ; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চারজন স্তোক এমে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি ? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না ? এ হলে হ্যরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারংশ একই।—(কুরতুবী)

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়ায়ের এই কথাবার্তার অঙ্গস্থিতি পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে কিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে ব্রহ্মকে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা মিজ কালে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি শুর দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে শুরুতর ঘনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আয়াদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন,

এক্ষণে আমরা তাতেই লিখে হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিচ্ছি বেত্তাযাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই ধিপসি থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হিলালের ব্যাপার ওলে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, কৈ দাবির ব্যপকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শান্তিরূপ আশিচ্ছি বেত্তাযাত পড়বে। হিলাল উভয়ে আরয় করলেন : যিনি আপনাকে সচ্যাসহ ধোঁপ করেছেন, তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এইস কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শান্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরান্দি (আ) লেয়ামের আইন সরলিত আরাত নিয়ে অবর্তীর হলেন ; অর্থাৎ **بِعَذْلٍ أَزْوَاجُهُمْ**

আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হ্যারত আনাস (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেয়ামের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুস্বাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সংস্কার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয় করলেন : আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হিলালের ক্ষীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-ক্ষীর উপস্থিতিতে ক্ষীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল : আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আয়াবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে ? হিলাল আরয় করলেন : আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়াম করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাযির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ দিলেন। পঞ্চম সাক্ষের কোরআনী ভাষা একপ : যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হিলালকে বললেন : দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শান্তি পরকালের শান্তির তুলনায় অনেক হাস্ত। আল্লাহর আয়াব আনুষের দেয়া শান্তির চাহিতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষই শেষ সাক্ষ। এর ডিট্রিভেই ফরসালা হবে। কিন্তু হিলাল আরয় করলেন : আমি কসম থেঁয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমকে এই সাক্ষের কারণে পরকালের আয়াব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের ক্ষীর কাছ থেকেও এখনি ধরনের চর সাক্ষ অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : একটু ধাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষাই শেষ সাক্ষ। আল্লাহর আয়াব আনুষের আয়াব অর্থাৎ ব্যভিচারের শান্তির চাহিতে অনেক কঠোর। একধা ওলে সে কসম থেকে ইত্তেক

କରତେ ଲାଗଲ । ଏ ଅବହ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଣ ଅଭିବାହିତ ହଲେ ଅବଶ୍ୟେ ସେ ବଲଲ : ଆଜ୍ଞାହର କସମ, ଆମି ଆମାର ଗୋଟିକେ ଲାଭିତ କରନ ନା । ଅତଃପର ସେ ସାକ୍ଷାତ ଏ କଥା ବଲେ ଦିଯେ ଦିଲ ଯେ, ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ହଲେ ଆମାର ଉପର ଆଜ୍ଞାହର ଗୟବ ହବେ । ଏଭାବେ ଲେଯାନେର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମାପ୍ତ ହେଁ ଗେଲେ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା) ଉତ୍ସବ ସ୍ଵାମୀ-ତ୍ରୀକେ ବିଚିନ୍ତନ କରେ ଦିଲେନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର ବିବାହ ନାକଟ କରେ ଦିଲେନ । ତିନି ଆରା ଫ୍ୟସାଳୀ ଦିଲେନ ଯେ, ଏହି ଗର୍ଭ ଥେକେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଥାହ କରବେ, ସେ ଏହି ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ବଲେ କଥିତ ହବେ—ପିତାର ସାଥେ ସହକ୍ରୟୁକ୍ତ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଟିକେ ଧିକ୍କତଓ କରା ହବେ ନା ।—(ମାଯହାରୀ)

ଦ୍ଵିତୀୟ ଘଟନାଓ ବୁଝାରୀ ଓ ମୁସଲିମେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ । ଘଟନାର ବିବରଣ ଇମାମ ବଗଭୀ ଇବନେ ଆବବାସେର ରେଓୟାଯେତେ ଏଭାବେ ଉତ୍ସେଖ କରେଛେନ : ଅପବାଦେର ଶାନ୍ତି ସମ୍ବଲିତ ଆଯାତ ନାଯିଲ ହଲେ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା) ମିଶ୍ରରେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ତା ମୁସଲିମାନଦେରକେ ଶୁଣିଯେ ଦିଲେନ । ଉପର୍ତ୍ତି ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଆସେଯ ଇବନେ ଆଦୀ ଆନ୍ସାରୀଓ ଛିଲେନ । ତିନି ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆରଯ କରଲେନ : ଇଯା ରାସ୍ତୁଲୁହାହ, ଆମାର ପ୍ରାଣ ଆପନାର ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉ ଯଦି ତାର ତ୍ରୀକେ କୋନ ପୁରୁଷେର ସାଥେ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖେ, ତବେ ଦେଖା ଘଟନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାର କାରଣେ ତାକେ ଆଶିଷି କଶାଘାତ କରା ହବେ, ଚିରତରେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହବେ ଏବଂ ମୁସଲିମାନଗଣ ତାକେ ଫାସେକ ବଲବେ । ଏମତାବହ୍ୟ ଆମାର ସାକ୍ଷୀ କୋଥା ଥେକେ ଆନବ ? ସାକ୍ଷୀର ଥୋଜେ ବେର ହଲେ ସାକ୍ଷୀ ଆସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରା କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରେ ପଲାୟନ କରବେ । ଏଟା ହୁବହ ପ୍ରଥମ ଘଟନାଯ ସା'ଦ ଇବନେ ମୂରାଷେର ଉଥାପିତ ପଶୁ ।

ଏକ ଶୁଭ୍ରବାରେ ଏହି ପଶୁ କରା ହେଁଛିଲ । ଏରପର ଏକଟି ଘଟନା ଘଟିଲ । ଆସେଯ ଇବନେ ଆଦୀର ଚାଚାତ ଭାଇ ଓୟାଯମେର ବିବାହ ଆସେଯ ଇବନେ ଆଦୀର ଚାଚାତ ବୋଲ ଖାଲୁାର ସାଥେ ହେଁଛିଲ । ଓୟାଯମେର ଏକଦିନ ତାର ତ୍ରୀକେ ଶରୀକ ଇବନେ ସାହମାର ସାଥେ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପେଲେନ । ଶରୀକତ ଆସେଯ ଇବନେ ଆଦୀର ଚାଚାତ ଭାଇ ଛିଲ । ଓୟାଯମେର ଆସେମେର କାହେ ଘଟନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରଲେନ । ଆସେମ ଇନ୍ନା ଲିପ୍ତାହି ଓୟା ଇନ୍ନା ଇଲାଇହି ପାଠ କରଲେନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଜୁମ'ଆର ନାମାଯେର ସମୟ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା)-ଏର କାହେ ଆରଯ କରଲେନ : ଇଯା ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ! ବିଗତ ଜୁମ'ଆଯ ଆମି ଆପନାକେ ଯେ ପଶୁ କରିଛିଲାମ ପରିତାପେର ବିଷୟ ଯେ, ଆମି ନିଜେଇ ଏତେ ଜାଗିତ ହେଁ ପଡ଼େଛି । କେବଳା, ଆମାର ପରିବାରେର ମଧ୍ୟେଇ ଏକପ ଘଟନା ଘଟି ଗେଛେ । ଇମାମ ବଗଭୀ ଉତ୍ସବକେ ଉପର୍ତ୍ତି କରା ହେଁ ଏବଂ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଲେଯାନ କରାନୋର ଘଟନା ବିଭାଗିତ ଉତ୍ସେଖ କରେଛେନ ।—(ମାଯହାରୀ) ବୁଝାରୀ ଓ ମୁସଲିମେ ସାହଳ ଇବନେ ସା'ଦ ସାଯେଦୀର ରେଓୟାଯେତେ ଏର ସାର-ସଂକ୍ଷେପ ଏଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଛେ ଯେ, ଓୟାଯମେର ଆଜଲାନୀ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା)-ଏର କାହେ ଆରଯ କରଲେନ : ଇଯା ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ଯଦି କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ତ୍ରୀର ସାଥେ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷକେ ଦେଖେ, ତବେ ସେ କି ତାକେ ହତ୍ୟା କରବେ, ଯାର ଫଳେ ତାକେଓ ହତ୍ୟା କରା ହବେ ? ନୃବା ସେ କି କରବେ ? ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା) ବଲଲେନ : ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଲା ତୋମାର ଓ ତୋମାର ତ୍ରୀର ବ୍ୟାପାରେ ବିଧାନ ନାଯିଲ କରେଛେନ । ଯାଓ, ତ୍ରୀକେ ନିଯରେ ଏମ । ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ସାହଳ ବଲେନ : ତାଦେରକେ ଏନେ ରାସ୍ତୁଲୁହାହ (ସା) ସମ୍ଭାବରେ ମଧ୍ୟେ ଲେଯାନ କରାଲେନ । ସମ୍ମନ ଉତ୍ସବ ପଞ୍ଚ ଥେକେ ପାଚଟି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁ ଲେଯାନ ସମାପ୍ତ ହଲୋ, ତଥାନ ଓୟାଯମେର ବଲଲେନ : ଇଯା ରାସ୍ତୁଲୁହାହ ! ଏଥିନ ଯଦି ଆମି ତାକେ ତ୍ରୀରପେ ରାଖି, ତବେ ଏର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆମି ତାର ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଆରୋପ କରେଛି । ତାଇ ଆମି ତାକେ ତିନ ତାଳାକ ଦିଲାମ ।—(ମାଯହାରୀ)

উপরোক্ত ঘটনাদ্যয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবর্তীণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সম্বঙ্গস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবর্তীণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্ভূধীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন। তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে এবং ওয়ায়মের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে ফুজল জিরিন। এর অর্থ এরপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।—(মাযহারী) **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় ; যেমন দুঃখ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **الْمُتَلَعِّنُانَ لَا يَجْتَمِعُونَ أَبَا** লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ; কিন্তু ইহতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আয়মের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিনি হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।—(মাযহারী)

মাসআলা : লেয়ানের পর এই গর্ত থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না ; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আয়াব আরও বেড়ে যাবে ; কিন্তু দুনিয়ার খাসি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যক্তিগতিশীল সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। وَقُضِيَ بَانَ لَا تَرْمِي وَلَا وَلِهَا

**إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْلَاثِ عَصَبَةٌ مِّثْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرِّ الْكُمْ بَلْ هُوَ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّ كُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ قَاتَلَ تَسْبِيْهَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَالَّذِي تَوْلَى كِبْرَةً مِّنْهُمْ
 لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑫ لَوْلَا إِذْ سَعَتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ**

بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا لَا وَقَالُوا هَذَا إِفْلَكٌ مُّبِينٌ ۝ لَوْلَا جَاءَهُ وَعَلَيْهِ بِارْبَعَةَ
 شَهَدَاتٍ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاتِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ وَلَوْلَا
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَسَكَمُ فِي مَا أَفْصَنْتُهُ فِيهِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّنَنِ كُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَرَحِبُّ بُونَهُ هِيَنَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝ وَلَوْلَا أَدْسِمَ عَمَوهُ
 قَلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا دُطْ سِبْحَنَكَ هَذَا يَهْتَكَ عَظِيمٌ ۝
 يَعِظُّكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَيْهِمْ أَبْدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَبَيْنَ اللَّهِ
 لَكُمُ الْأَيْتِ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُعْبَوُنَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ
 فِي الدِّينِ أَمْنُوا هُنْ عَذَابَ الْيَمِنِ لِفِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّاجِحٌ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوتَ الشَّيْطَنِ
 فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ
 مِنْكُمْ مَنْ أَنْهَىٰ أَبْدًا لَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرِزُّكُ مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلِيِّمٌ ۝
 وَلَا يَأْتِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمُسْكِنِينَ
 وَالْمُهَجِّرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا إِلَّا تَعْبُوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
 لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَفُوسٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَشَهَّدُ عَلَيْهِمْ
 الْوَسْطَهُمْ وَإِيمَانِهِمْ وَأَرْجَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ يَوْمَئِنَّ يُوقَيْمُ اللَّهُ دِينُهُمْ
 الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ الْخَيْرَتُ لِلْخَيْرِيْتِينَ وَالْخَيْرَتُونَ
 لِلْخَيْرِيْتِ ؟ وَالظَّيْرَتُ لِلظَّيْرِيْتِينَ وَالظَّيْرَتُونَ لِلظَّيْرِيْتِ ؛ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
 يَقُولُونَ ﴿١٦﴾ لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

- (১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রাখেন করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য যদলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে তনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শনলে, তখন ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সশ্রক্ষে উন্মুক্ত ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জন অপবাদ ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপহিত করে নি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপহিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চৰ্চা করেছিলে, তজন্যে তোমাদেরকে শুরুতর আয়াব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুল মানে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে শুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক শুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপস্থিতি দিচ্ছেন, তোমরা যদি ইমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা পছন্দ করে বে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রসার লাঙ্ক করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যত্নগামায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দুর্বল, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে পেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শরতান্তরের পদার্থ অনুসরণ করো না। যে কেউ শরতান্তরের পদার্থ অনুসরণ করবে, তখন তো শরতান্তর নির্বজ্ঞতা ও যন্ত্র কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না।

কিছু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চর্যাদা ও আর্থিক প্রচূরের অধিকারী, তারা যেন কসম না ধায় যে, তারা আজীব্য-বজ্ঞকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষয়শীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাধী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধ্বন্তি এবং তাদের জন্য যায়েছে গুরুতর শান্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদের সমৃচ্ছিত শান্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তিকারী। (২৬) দুর্চরিতা নারীকুল দুর্চরিত পুরুষকুলের জন্য এবং দুর্চরিত পুরুষকুল দুর্চরিতা নারীকুলের জন্য। সচরিতা নারীকুল সচরিত পুরুষকুলের জন্য এবং সচরিত পুরুষকুল সচরিতা নারীকুলের জন্য। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সমানজ্ঞনক জীবিকা।

পূর্বাপর সম্পর্ক ৩ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-বুরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শান্তি ও পারস্লোকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যতিচারের হস্ত, অতঃপর অপবাদের হস্ত ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হস্ত প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাধী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরপ অপবাদ আরোপকারীর শান্তি আশিষ্টি বেআঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাফিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হাঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফ্কের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্ক' শব্দের অর্থ জগন্য যিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

যিথ্যা অপবাদের কাহিনী ৩ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ

হিজৰীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বনী মুত্তালিক নামান্তরে মুরাইনী মুক্ত গমন করেন, তখন বিখিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দা বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিয়কার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনবিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জনসের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ডেতরেই আছেন। উটানোর সময়ও সনেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য-একপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিন্তার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়ানোড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খৌজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সৌদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেবরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে চলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াওলকে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কৃতিয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন যানুষকে নিরায়গু দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে “ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে মাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দৃঢ়বিন্দু, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শক্ত। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আংগোচনায় যেতে উঠল। পূর্বদের মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৪৬

মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে ঘনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আবাসের এই উচ্চিই বর্ণিত আছে যে, **إعانَ اللَّهُ بْنَ أَبِي حَسَانَ وَمُسْطَحَ وَجْهَهُ**

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা'র তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা'র পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিম্নায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হৃদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের হৃদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিতি বেতাঘাত করা হলো। বায়ার ও ইবনে মরদুওয়াইহ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তিনজন মুসলমান মিসতাহ, হামনাহ ও হাসসানের প্রতি হৃদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি বিত্তন হৃদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেব এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কারেম থাকে। —(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা' সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছ , হযরত আয়েশা'ও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশা' সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল ; একজন সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবাবিত হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিসতাহ ও হামনাহ। এরা ছিল খাটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে মন্ত্র বলে মুসলমনদের অন্তর্ভুক্ত করেছে ; অথচ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক মুসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সাত্ত্বনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক পক্ষে সাত্ত্বনা দেয়া হচ্ছে :) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা ; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিলামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছে। তোমাদের অর্থাদা বৃক্ষ পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা সম্পর্কে অকাটা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; তবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরপ

বিপদ্ধস্ত রাখি এই ঘটনা থেকে সাম্ভুনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে,) তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার শুনাহু (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক শুনাহু হয়েছে। যারা শুনে নিশ্চৃপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুযায়ী শুনাহু হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শাস্তি হবে (অর্থাৎ জাহানামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রাসূলের প্রতি শক্রতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হলো যে, দৃঢ়বিত্তদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশমূলক তিরক্ষার করা হচ্ছে :) যখন তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ (হাসসান ও মিসতাহু এর অন্তর্ভুক্ত)। এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহু ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হ্যরত আয়েশা ও সাফওয়ান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য যিথ্যা। (দুররে মনসুরে আবু আইউব ও তাঁর ক্লীর একুপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা শুনে নিশ্চৃপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরক্ষার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ থগন এবং সুধারণা রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছে :) তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? (যা ব্যতিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত। অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন আল্লাহর কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই যিথ্যাবাদী। (অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতি রহমতের কথা বলা হচ্ছে :) যদি (হে হাসসান, মিসতাহু ও হামনাহু) তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, (যেমন তওবার তওষ্টীক দিয়ে তা কবৃল করেছেন। একুপ না হলো) তবে তোমরা যে কাজে লিঙ্গ হয়েছিলে, তজ্জন্মে তোমাদেরকে শুরুতর আঘাত স্পর্শ করত যেমন তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জান গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবৃল হবে এবং তাঁরা পাক অবস্থায় পরকালে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হবেন।

عَلَيْكُمْ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِعَطَاكُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

فِي الْآخِرَةِ

ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ

এবং তুম্হার আর্থিক প্রথমত উপরের আঘাতে দ্বিতীয়ত বলা। কেননা, মুনাফিক তো পরকালে জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিচিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মুখে আঘাতে তাবারানী ইবনে আবদাসের উক্তি

عَلَيْكُمْ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِرِيدِ مسْطَحًا وَحِمْنَةِ وَحْسَانًا

অর্থাৎ বর্ণনা করেন যে, যিসতাহু হামনাহু ও হাসসান। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের তওবার তওষ্টীক ও তওবা কবৃল করে যদি আল্লাহ তা'আলা

তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে শুরুতর আয়াবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে :) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন (প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। (এই ব্বরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা Fawlik عَنْ الْكَانِبُونَ এবাকে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তৃষ্ণ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহ'র কাছে শুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। [প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ ব্বয়ং মন্ত শুনাই। তদুপরি নারীও কে ? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিজ্ঞানী, যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রাসূলে মকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে শুনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।] তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আয়াদের জন্য শোভন নয়। আমরা আল্লাহ'র আশ্রয় চাই; এ তো শুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন ; যেমন সা'দ ইবনে মু'আয়, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবু আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিচুপ ব্যক্তি সরারই এ কথা বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরকার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরকারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে :) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উপদেশ দিছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিকার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোক্ষিত উপদেশ, অপবাদের হস্ত, তওবা করুন ইত্যাদি সব এর অন্তর্ভুক্ত।) আল্লাহ'র সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞায়। [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা করুন করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তরণপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দিয়েছেন। (ইবনে আবুবাস—দূরবে মনসুর) এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা করা হলো। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহল্য, একপ ব্যক্তি বেঙ্গানই হবে। বলা হচ্ছে :) যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ কাজ করে—এ স্বাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের প্রতি ব্যভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (এ কারণে শান্তির জন্য বিশ্বিত হয়ে না ; কেননা) আল্লাহ তা'আলা জানেন (যে, কোন শুনাই কোন শুনের) এবং তোমরা (এর বদল পুরোপুরি) জান না। (ইবনে আবুবাস—দূরবে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আয়াব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সংস্কার করা হচ্ছে :) এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওঁকীক লাভ করেছে) এবং আল্লাহ'র দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা করুন করেছেন) তবে তোমরাও (এই হ্যাকি থেকে) বাঁচতে পারতে না। (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত শুনাইসহ সকল প্রকার শুনাই থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং

তওবা দ্বারা আঘাতক্ষির কথা বলা হচ্ছে, যা শুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ইমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ; শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্ণজ্ঞতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছে)। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং শুন্ধ অর্জন করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। নতুবা) যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হতো না ; যেমন মূনাফিকদের হয়নি ; না হয় তওবা কৃত করা হতো না। কেননা আমার উপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। (তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কৃত করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়ত নাযিল ইওয়ার পর হ্যরত আবু বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রেতের আতিশয়ে কসম থেকে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহ্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবযুক্তও ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেন :) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না থায় যে, তারা আজীয়স্বজনকে, অভাবযুক্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিন্তুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের উপর কারেম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা কসম তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত শুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হ্যরত মিসতাহ হ্যরত আবু বকরের আজীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে :) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্ষটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষটি ক্ষমা করেন ? (অতএব তোমরাও দেবী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম করুণায়। (অতএব তোমাদেরও আল্লাহর শুণে শুণাবলিত ইওয়া উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত শাস্তিবাণী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা উপরে أَنَّ الْأَذِنِينَ يُمْبَيِّنُونَ দ্বাৰা আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়ত নাযিল ইওয়ার পর) সতী-সাহী, নিরীহ ও ইমানদার নারীদের প্রতি (ব্যক্তিচারের) অপবাদ আরোপ করে, [যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের সবাইকে শায়িল ইওয়ার জন্য বহুচল ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা নারীদেরকে অভিযুক্ত করে ; বলা বাহ্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে।] তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে আল্লাহর বিশেষ ব্রহ্মত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে শুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ দেবে)

যা কিছু তারা করত । (উদাহরণত জিহ্বা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক কুকরের কথা বলেছে এবং হত্যাপদ বলবে, সে কুকরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন চেষ্টা সাধনা করেছে।) সেদিন আল্লাহু তা'আলা তাদের সমৃচ্ছিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট ব্যক্তিকারী (অর্থাৎ এখন তো কুকরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপর্যুক্ত ফয়সালা হবে চিরস্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবাকারীদেরকে **فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ** আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে **لَعْنَتُ** বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে **لَعْنَتُ مَنْ فَيَنْهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ** আযাব থেকে নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে **أَلَّمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** বলে এবং এর আগে **وَالَّذِي تَوَلَّ كَبِيرٌ** বলে আযাবে লিখ বলা হয়েছে। তওবাকারীদের জন্য **إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** তওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য এবং **يُوْقِيْمُ** বাক্যে ক্ষমা না করা ও শাস্তি করার দ্বিতীয় উপর্যুক্ত করা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে **مَارِكِيْمَكْ** বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবর্তী আয়াতে **خَبِيثٌ** তথা দুঃচরিত্ব বলা হয়েছে। একেই পবিত্রজ্ঞার বিশ্ববক্তুর প্রমাণ হিসেবে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সামাজিক নীতি যে দুঃচরিত্ব মারীকুল দুঃচরিত্ব পুরুষকুলের জন্য উপর্যুক্ত এবং দুঃচরিত্ব পুরুষকুল দুঃচরিত্ব মারীকুলের জন্য উপর্যুক্ত। সচরিত্ব মারীকুল সচরিত্ব পুরুষকুলের জন্য উপর্যুক্ত এবং সচরিত্ব পুরুষকুল সচরিত্ব মারীকুলের জন্য উপর্যুক্ত। (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য। এর সাথে আরও একটি স্বতঁসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রত্যেক বন্ধু তাঁর জন্য যোগ্য ও উপর্যুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র নয়। অতএব এই স্বতঁসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবিগণণ সচরিত্ব। তাঁরা সচরিত্ব হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হ্যারত সাক্ষয়ানের নিকল্পতাও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে :) তাদের সম্পর্কে (মুনাফিক) লোকেরা যা বলে বেচায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সহায়জনক জীবিকা (অর্থাৎ জান্নাত) আছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানব্য বিষয়

হ্যারত আয়েশা সিল্লীকার বিশেষ প্রের্তি ও গুণাবলী এবং অপবাদ-কাহিনীর অবশিষ্টাংশে শুনুন্না রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিকল্পে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে দিখা করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে যে উপায় তাদের মতিক্ষে উদিত হতে পারত, তা সবগুলোই তারা সন্ত্বিশিত করেছে। কাহিনীদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সন্ত্বিশ এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদুবী, জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধি ও পবিত্রত্বে উচ্চুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা সিন্ধীকা (রা) ও তাঁর সাথে সাফতুল্লাহ ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃজ্ঞনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রাতে প্রভাবাবিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত ; কিন্তু বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) ও উচ্চুল মু'মিনীনের মানসিক ক্ষেত্রে মোচনের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং কোরআনের প্রায় দুইটি কুরুক তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাযিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাধী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হ্যরত আয়েশা সিন্ধীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও উজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য ধারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলা বাহ্য্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিষ্কুলতার সাক্ষ দিয়েছেন। এই আয়াতসমূহে কিয়াবত পর্বত তিলাওয়াত করা হবে ; বয়ং আয়েশা সিন্ধীকা (রা) বলেন : আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাযিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হ্যদয়স্থ করার পক্ষে সহায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে :

সফর থেকে ফিরে আসার পর হ্যরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে বয়ং হ্যরত আয়েশা বলেন : সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা ছাপ পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই আগমেই দষ্ট হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ সাহাবীর জননী উপরে মিস্তাহকে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর

উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উঞ্চে মিস্তাহুর পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল (মিস্তাহুর নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বাদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুরুরে জন্য বদদোয়ার বাক্য শুনে হ্যরত আয়েশা বিস্তৃতা হলেন। তিনি বললেন : এ তো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সৎ লোককে অন্ধ বলছ। সে বদর যুক্তে যোগদান করেছিল। তখন উঞ্চে মিস্তাহুর আচর্যাবিতা হয়ে বলল : মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহুর কি বলে বেড়ায় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে কি বলে ? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোগান্ত ঘটনা এবং মিস্তাহুর তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হ্যরত আয়েশা বলেন : একথা শুনে আমার অসুস্থিতা দিগ্ধি হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খৌজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সাজ্জন্ম দিয়ে বললেন : মা, তোমার মত মেয়েদের শক্ত থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চৰ্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিন্তু সবর করব ? আমি সারারাত কানাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্যাদা হিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হ্যরত আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত ; হ্যরত উসামা পরিষ্কার আরম্ভ করলেন যে যতদূর আমি জানি, হ্যরত আয়েশা সম্পর্কে কোন রুপ কুখ্যারণাই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্বারা কুখ্যারণার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব শুভবের পরওয়া করবেন না। হ্যরত আলী (রা) তাঁকে চিন্তা ও অস্ত্রিতার কবল থেকে উদ্ভার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। শুভবের কারণে হ্যরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হ্যরত আয়েশার বাদী বরীরার কাছ থেকে খৌজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা) বরীরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরা আরম্ভ করল : অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি ; তবে এটুকু জানি যে, তিনি কঢ়ি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা শুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষণ দান, মিহরে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও শুভ রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংক্ষিপ্ত

কাহিনী এই যে) হয়রত আয়েশা বলেন : আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো । আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন । তারা আশংকা করছিলেন যে, কান্দতে কান্দতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপরিট ছিলেন । এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন । যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি । এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন : হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কালে এই এই কথা পৌছেছে । যদি তুমি দোব্যুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন) । পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্ কাছে তওবা ও ইঙ্গিফার কর । বাল্দা তার শুনাহ স্থীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কৃত করেন । রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশুঁ একেবারে শুকিয়ে গেল । আমার চোখে একবিন্দু অশুঁও আর রইল না । আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথার উন্নত দিন । পিতা বললেন : আমি এ কথার কি উন্নত দিতে পারি । অতঃপর আমি মাকে বললাম : আপনি উন্নত দিন । তিনিও ওয়র পেশ করে বললেন : আমি কি জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো । আমি ছিলাম অল্লবয়কা বালিকা । এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি । পাঠকর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুশ্চিন্তা ও চরম বিশ্বাদময় আবস্থায় হ্রেষ্টতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না । কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি । নিম্নে তার বক্তব্য হ্বহ তাঁরই ভাষায় উন্নত করা হলো :

وَاللَّهُ لَقَدْ عَرَفْتَ لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقْرَفْتَ إِنْفَسْكَمْ
وَصَدَقْتَمْ بِهِ وَلَئِنْ قَلْتَ لَكُمْ أَنِّي بِرِئَةٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بِرِئَةٍ لَا
تَصْدِقُونِي وَلَئِنْ اعْتَرَفْتَ لَكُمْ بِإِمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بِرِئَةٍ
لَتَصْدِقُونِي وَاللَّهُ لَا إِجْدَلِي وَلَكُمْ مِثْلًا لَا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفْ فَصِيرْ
جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعْانُ عَلَىٰ مَاتَصْفُونَ -

“আল্লাহ্ কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বক্ষমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন । এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত ; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না । পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্থীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন । আল্লাহ্ কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যক্তিত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ) মা'আরেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৪৭

পুঁজিদের ভাস্তু কথাবার্তা তলে বলেছিলেন : আমি সবরে জয়ীল অবস্থন করছি এবং তেজস্ব যা কিছু বর্ণনা করছ, সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন : এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিহানায় শয়ে পড়লাম। আমার পূর্ব বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমৃক্ষ আছি আল্লাহ তা'আলা আব্দার দোষমৃক্ষতার বিষয় অবশ্যই ওইর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু একপ কাঁচাও ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত নাবিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবী এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। একপ ধারণা ছিল যে, সংবত স্বপ্নযোগে আমার দোষমৃক্ষতার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হ্যরত আয়েশা বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমতাবস্থায় তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো, যা ওই অবক্ষয়ণের সবয় উপস্থিত হতো। ফলে, কল্কনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাঙ্গ হয়ে দেখে। এই ভাবান্তর দূর ইওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হাসিমুর্রে গাজোথান করলেন এবং সর্বশ্রদ্ধে যে কথা বললেন, তা ছিল এই :

—ابشري يا عائشة اما الله فقد ابراك
অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোষমৃক্ষ করেছেন। আমার যা বললেন : দাঁড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম : না যা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যক্তিত কারণ খণ্ড ছীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মৃক্ষ করেছেন।

হ্যরত আয়েশা (রা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে বলেছেন : হ্যরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেত্তো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেন। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্ভভরে বর্ণনা করতেন। অন্যম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাইল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন : এ আপনার স্ত্রী। (তিরমিয়ী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাইল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

বিত্তীয়, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। ত্তীয়, তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হ্যরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিরিত হন। পঞ্চম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কখনও ওই অবর্তীর হতো, যখন তিনি হ্যরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির একপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমৃক্ষতার বিষয় অবর্তীর হয়েছে। সপ্তম, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্ধীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরও অন্যতম।

হ্যরত আয়েশার কৃতী ও পণ্ডিতসমূহ জ্ঞানানুসর্কান এবং বিজ্ঞানোচিত বক্তব্য দেখে হ্যরত মুসা ইবনে তালহা (রা) বলেন : আমি আয়েশা সিদ্ধীকাৰ চাইতে অধিক তত্ত্বজ্ঞী ও পাঞ্জলভাষী কাউকে দেবিনি। —(তিরমিয়ী)

তৎসীরে কুরভূবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কঠি শিখকে বাকশকি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হ্যরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হ্যরত আয়েশা খিলাফতের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কোরআনের চৃষ্টি আরাও শামিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আল্লায় আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তৎসীর, তৎসীরের সাব-সংক্ষেপে আল্লাচিত হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে বেসর আলোচনা আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে।

— إِنَّ الْبِلْلَى جَانِبٌ بِالْأَفْكَارِ عَمَّا يُنْتَهِي
— শব্দের অভিধানিক অর্থ পার্শ্বের দেরা, দাদলিয়ে
দেরা। যে জগন্ন মিথ্যা সত্যকে রাতিলুপে, বাতিলকে সত্যরূপে দাদলিয়ে দের এবং
ম্যাথপমানের আল্লাহত্তীরকে কাসিক ও ফাসিককে আল্লাহত্তীর প্রাহিম্যের কান্দে দের, সেই
মিথ্যাকেও তা বলা হয়। — شَدِّدْ — শব্দের অর্থ দশ থেকে চাহিস পর্যন্ত ক্ষেত্রের সম। এর
কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। — مُعَمِّل — বলে মু'মিলদেরকে মুক্তিযো হয়েছে। এই
অপবাদের অকৃত বচানিত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মু'মিল নয়—মুদাচিক হিল; কিন্তু
মুলাফিকরা মুসলমানী দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিলদের বাহ্যিক বিধানাবলী
ব্যবোজ্য হতো। তাই — شَدِّدْ — শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের অধ্যে দুর্বলতা
পুরুষ ও একজন ঝীলোক এতে জড়িত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা) আবাদ মুদাচিক হওয়ার পর
তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মু'মিলগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ
তা'আলা তাদের তওবা কৃবুল করেন। হ্যরত হাসসান ও মিস্তান তাদেরই অন্যতম
ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর বেঁকাদের জন্য আল্লাহ
তা'আলা কোরআন পাকে আগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হ্যরত আয়েশাৰ
সামনে কেটি হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি আপবাদের
শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হ্যরত আয়েশা বলতেন : হাসসান রাসুলুল্লাহ (সা)-এর
পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমৎকার মুক্তিবিদ্যা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা
সম্ভব নয়। হাসসান কোন সময় হ্যরত আয়েশাৰ কাছে আগমন করলে তিনি সমস্তমে
তাঁকে আসন্ন দিতেন। —(মাযহায়ী)

— إِنَّ مَبْرُوْرَةً شَرِّكَمْ — এতে সবী করীম (সা) হ্যরত আয়েশা, সাক্ষ্যান ও সকল মু'মিল
মুসলমানকে সংযোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই ক্ষেত্রে হর্জাত ছিলেন। অর্থ
এই যে, এই ক্ষেত্রকে তোমরা আরোপ মনে করো না। কেবলমা, আল্লাহ তা'আলা ক্ষেত্রক্ষেত্রে
তাদের সোব্যুক্ততা শামিল করে তাদের সকল আরও বাড়িয়ে ছিলেন এবং তারা এই
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী শামিল করেছেন, যা কিন্তু পর্যন্ত
প্রতিষ্ঠিত হয়ে।

— إِنَّ أَمْرِيْ مَتَّهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْأَطْمَمْ — অর্থাৎ যারা এই অপবাদে ব্যক্তিকু অংশ নিয়েছে, সেই
পরিমাণে তার শুমাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই

থবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে থবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চৃণ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

كَبْرٌ — وَالَّذِي تَوَلَّ كَبْرَةً مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ
এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য শুরুতর আযাব আছে। বলা বাহ্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। (বগতী)

لَوْلَا ذَسْمَعْتُهُ طَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَأْنِسُهُمْ خَيْرًا وَقَاتُلُوا هُنَّ أَفْكَارٌ مُّبِينٌ
—অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ মির্থ্যা ? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম **يَأْنِسُهُمْ** শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নীয় রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে ; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বুবানো হয়েছে। আরও এক জায়গায় আছে **وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ** অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নীয়ই এর পরিণতি। সাদী বলেন :

چوا ز قومے یکے بے دانشی گرد

نے کہ رامنزلت ماند نے مے را

কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেশ্য যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে **لَوْلَا سَمَعْتُمُوهُ طَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَأْنِسُهُمْ خَيْرًا** সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল ; যেমন শুরুতে **سَمَعْتُمُوهُ** সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিঙ্গ বাক্য হেতু দিয়ে পর্দ্ধতি পরিবর্তন করত সম্বোধনপদের পরিবর্তে **طَنَ الْمُؤْمِنُونَ** বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মুঘ্যিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে—এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রশিক্ষণযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য "مَذَلْأَةً مُبَشِّرِينْ" এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাঝেই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গুনাহ অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা ৪ এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে তিনি কথা। যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিষ্ক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হয়ে করা। —(মাযহারী)

—نَلْوَ جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءِ، فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهُدَاءِ، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الظَّالِمُونَ—এই আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, একপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যক্তিগতের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে একপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের বক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুন মুখ বক্ষ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাকুর ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরণে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনৱাপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার বুদ্ধিপূর্ণ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরণে? এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যক্তিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিপক্ষে কোন দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষী গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কল্যাণমূলকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া একপ দাবি করলে

সংগঠিত বাকি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না ; বরং উচ্চা মিথ্যা বলার শাস্তি তোগ করতে হবে । তখন সে আল্লাহর কাছে উপরোক্ত সদুদেশের দাবিতে মিথ্যাবাদী । কেননা শরীয়তের ধীরা মৌতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ত্ত সদুদেশ হতেই পারে না । —(মাঝহারী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মুশিয়ারী । উপরোক্ত উভয় আয়াতে এতোক মুসলমানকে অন্য মুসলমাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দাল করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রাচারণালীন কথাবার্তা মাক্ষ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে । এখানে শুধু হতে পারে যে, তাহাসে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদেশ সংবাদটিকে আন্ত বলে দিব্যাস করলেন মা কেন এবং এর বকল করলেন মা কেন ? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমৃচ্ছ অবস্থায় কেন থাইলেন ? এমনকি, তিনি হযরত আয়েশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমা ধীরা কোন মুল হয়ে থাকে, তবে তঙ্গা করে নাও ।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কিংকর্ত্তব্যবিমৃচ্ছ অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয় । কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়মও করেননি এবং রাসূল্যারী কোন কর্ত্ত করে করেন নি । তিনি এর চৰ্চা করাও পছন্দ করেননি । সাহাবাঙ্গে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে, مَلَّتْ عَلَيْيِ اطْهَارُ الْأَنْبِيَا । অর্থাৎ আমি আয়ার স্ত্রী সম্পর্কে তাল ছাড়া কিম্বাই জাসি না । —(তাহাতী) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কর্মপর্ণ উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ বহিম করে । তবে কিংকর্ত্তব্যবিমৃচ্ছিতাও দূর হয়ে যাব, এরপর অকাটাও ও নিশ্চিত জান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে ।

গ্রোটিকথা এই যে, অন্তরে কোনকাল সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতাঘৃতক ব্যবহা প্রহণ করা, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, মুসলমাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল মা । তিনি তো খবর অনুযায়ী কোন কর্ত্ত করেন নি । যেমন মুসলমাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ডর্সেনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ত্ত করেছিল । তারা এর চৰ্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল । তাদের এ কাজ, আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল ।

وَلَوْلَا فَضَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً فِي الدِّينِ وَأَخْرَجَهُمْ فِي مَا أَنْفَقُوكُمْ فِي نَعِيَّبٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ । যেসব মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই অপবাদে কোন না কোনকালেও অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর ততোবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তি ও তোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল । এর কারণ মুনিয়াতেও আয়াব আসতে পারত ; যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরিকালেও কঠোর শাস্তি হতো । কিন্তু মুনিদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহযুক্ত ইহকালেও এবং পরকালেও । তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তিমত হয়েছে । মুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এতাবে শ্রেণী পেয়েছে যে, অথবে তিনি ইসলাম ও ইমানের তত্ত্বাবলীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসর্গ দাল করেছেন । এটা আয়াব অবতরণের পথে প্রতিবক্তব্য । এরপর কৃত

তনাহ্র জন্যে সত্ত্বিকার তত্ত্বাব তত্ত্বিক দিয়েছেন এবং তত্ত্বা করুণ করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও আগক্রিয়াতের ওপরান্ত দিয়েছেন।

إذْ تَقْرُبُنَا بِالسَّيْفِ — إذْ تَقْرُبُنَا بِالسَّيْفِ — এই শব্দের অর্থ এই যে, একে অন্যের কাছে জিজেস করে দূর্বল করে। এখানে কোন কথা তাম তা সত্ত্বাসত্ত্ব, যাচাই না করে সামনে ঢালু করে দেয়া বুঝানো হয়েছে।

—أَرْثَاءً تَوْمَرَا— وَتَعْسِبُونَهُ بَيْنَ يَدَيْ عَظِيمٍ — অর্থাৎ তোমরা একে তুলু ব্যাপার ঘনে করেছিলে যে, যা তনলে তাই অন্যের কাছে মহাপাপ হিল। তোমরা সত্ত্বাসত্ত্ব যাচাই না করে এমন কথা ঢালু করে দিয়েছিলে, যদ্যপুন অন্য মুসলিমান দাক্ষণ্য ঘর্ষিত হয়, মাল্টি হয় এবং তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

—أَرْثَاءً وَلَوْلَا ذَسَعْتُمُونَهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُنَّا أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا سُبْحَانَكَ لَذَا بَهْتَانَ عَظِيمٍ— অর্থাৎ তোমরা যারুন এই গুরুব তনেছিলে, তখন এ কথা কেন বলে দিলে না যে, এক্ষণে কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পরিব্রজা। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনর্বায় সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরও অকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ তনে মুসলিমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিকার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এক্ষণে কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপবাদ।

একটি সম্ভেদ ও তার জগত্তাব : কেউ সম্ভেদ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার সত্ত্বাতা যেমন প্রমাণ ছাড়া আনা যায় না, কলে তার চৰ্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা আবেদ্ধ হয়েছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। কাজেই এক্ষণে কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরণপে বলা যেতে পারে। উভয় এই যে, প্রত্যেক মুসলিমানকে শুনাই থেকে পাক-পরিব্রজা মনে করা শরীয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিপুলকে বিদ্যা দর্শীলে যে কথা বলা হবে; তাকে শিখ্য মনে করার জন্য অন্য কোন দর্শীলের প্রয়োজন নেই। এতক্ষেত্রে যে, একজন মুসলিম-মুসলিমানের প্রতি শরীয়তসম্বত্ত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা শিখ্য আপবাদ।

إِنَّ الَّذِينَ يُعْبَدُونَ أَنْ تُشْبِئَنَّ أَنْ تُشْبِئَنَّ فِي الدِّيَنِ أَمْنَرًا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدِّيَنِ وَالْأُخْرَاءِ — এই অপবাদে কোন-না কেননাপে অশংগৃহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনর্বায় তাদের নিম্না অবৎ ইহকাল ও পরকালের শান্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা এক্ষণে শব্দের রটনা করে, তারা যেন মুসলিমানদের অধ্যে ব্যক্তিকার ও নির্জনতার প্রসারই কামনা করে।

নির্জনতা দর্শনের কোরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী উপায়, যার উপেক্ষার জন্যে আজ নির্জনতার প্রসার ঘটেছে : কোরআন পাক নির্জনতা দর্শনের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচী বৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রাচিত হতে পারবে না। রাচিত হলেও শরীয়তসম্বত্ত প্রমাণ সহকারে রাচিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে বাস্তিকারের হস্ত প্রয়োগ করে রটনাকেই জমাবের উপায় করে দেয়া

যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্জন্তার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নির্জন্তার ও ব্যতিচারের প্রতি ঘৃণা ত্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায় হবে। আজকাল প্রতি-পত্রিকার প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। ঘুরক-ঘুরতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আন্তে আন্তে এই দুর্ভূত তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উদ্দেশ্যে সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে এই নির্জন্তার ভয়াবহ শাস্তি ও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবো। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্জন্তা ছড়ানোর উপায়ের আধ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্জন্তার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না ; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتِلُ أُولَئِكُمْ فَخْلُلْ مِنْكُمْ وَالسُّعْدَةُ أَنْ يُؤْتَوْا أُولَئِي الْفَرْبَى
وَالْمَسَاكِينُ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلَيَغْفِفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا
شَبِّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

সাহাবাদে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । লাইতাল :
অর্থ কসম থাওয়া। হ্যরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের ইদ প্রয়োগ করেন। তারা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খৌটি তওবার তওকীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হ্যরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কৃত করা ও ক্ষমা করার কথা ও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ হ্যরত আবু বকর সিন্দীক (রা)-এর আজীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কল্যা-বৎসল পিতা হ্যরত আবু বকর সিন্দীক কল্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাঁকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহ্য্য, কোন

বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজির নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বক্ষ করে দেয়, তবে গুনাহুর কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহায্যের দলকে আল্লাহ' তা'আলা' বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলকূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়মামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা ব্যাড়াবগত দৃঢ়থের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম থে়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ডঙ করে তার কাফকারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ ঘর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ' তা'আলা' যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

ହୟରତ ମିସତାହକେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରା ହୟରତ ଆବୁ ବକରେର ଦୟିତ୍ବ ବା ଓୟାଜିବ ଛିଲ ନା । ତାଇ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲା କଥାଟି ଏଭାବେ ବଲେହେନ ଓ ସେବ ଜାନୀ-ଶୂଣୀକେ ଆଲ୍ଲାହୁ ତା'ଆଲା ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଦାନ କରେହେନ ଏବଂ ଯାରା ଆଲ୍ଲାହର ପଥେ ବ୍ୟାୟ କରାର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବିତି ଓ ରାଖେ, ତାଦେର ଏକପ କସମ ଥାଓୟା ଉଚିତ ନଯ । ଆଯାତେ -**أَوْلَى الْمُفْضِلِ وَالسُّبْعَةِ** ଅର୍ଥେଇ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଁବେ ।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়েছে : **أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُغَفِّرَ اللَّهُ لَكُمْ** অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শুনাই মাফ করবেন ? আয়াত শুনে হ্যরত আবু বকর সিন্ধীক (রা) তৎক্ষণাত বলে ওঠেন : **وَاللَّهِ أَئِيْ أَحَبُّ أَنْ يُغَفِّرَ اللَّهُ لَى** অর্থাৎ আল্লাহ্ কসম, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হ্যরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোন দিন বঙ্গ হবে না। —(বুখারী, মুসলিম)

এহেন উচ্চাসের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বৃথারীতে আবদ্ধাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لِسَ الْوَاصِلُ بِالسَّكَافِيِّ وَلَكُنْ لِوَاسِلٍ । অর্থাৎ যারা আঞ্চীয়দের অনুপ্রাহের প্রতিদান দেয়, তারাই আঞ্চীয়তার হক আদায়কারী নয় ; বরং প্রকৃত আঞ্চীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি যে আঞ্চীয়গুণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

এবং গুরুতর শান্তি উপলব্ধিত আছে। এতে যারা যাই যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশাৰ চরিত্রে অপবাদ আবোপ কৰার পর তওবা কৰেনি। এমনকি কোরআনে তাঁৰ দোষমুক্ততা নাযিল হওয়াৰ পৱণ তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চৰ্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহ্য্য, এ কাজ কোন মুসলমান দ্বাৰা সম্ভবপৱ নহ। কোন মুসলমানও কোৱানেৰ একলপ বিৰক্ষাচৰণ কৰলে সে মুসলমান থাকতে পাৰে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদেৱ সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততাৰ আয়াত নাযিল হওয়াৰ পৱণ এই অপবাদবৃত্তি পৱিত্যাগ কৰেনি। তারা যে কাফিৰ মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনৱৰ্তন সম্ভেহ নেই। তওবাকাৰীদেৱকে আঘাত তা'আলা **فَحْلَ اللَّهُ وَرَحْمَةُ** বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাণ আখ্যায়িত কৰেছেন। যারা তওবা কৰেনি, তাদেৱকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকাৰীদেৱকে আয়াব থেকে মুক্তিৰ সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা কৰেনি, তাদেৱ জন্য গুরুতর আঘাতেৰ হঁশিয়াৱী দিয়েছেন। তওবাকাৰীদেৱকে **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** "বলে মাগফিৱাতেৰ সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা কৰে নি তাদেৱকে পৱবৰ্তী **يَوْمَ شَهَادَتِ عَلَيْهِمْ** আয়াতে ক্ষমাপ্রাণ না হওয়াৰ এবং শান্তিপ্রাণ হওয়াৰ কথা বলেছেন। —(বয়ানুল-কোৱান)

একটি জরুরী ছঁশিয়ারী : হ্যারত আয়েশা সিন্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কোরআনে দোষমৃক্ষতার আয়াত নাফিল হয়নি। আয়াত নাফিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হ্যারত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিঙ্গ দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতভাবে কাফির।

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিবৃক্ষে
বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে।
হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্মীকার করবে, আশ্লাহ তা আলা
তাকে ঘাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন।
পক্ষাঞ্চলে যে ব্যক্তি সেখানেও অঙ্গীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক
ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বক করে দেওয়া হবে
এবং হস্তপদের সাক্ষ্য প্রদণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। **الْيَوْمَ نَخْتِمُ**
আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে।
আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন
বৈশর্ণবীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে,
সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে একপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের
জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিশর্ণীতে সত্য কথা স্মীকার করবে। এটা ও সত্যবপন যে, এক সময় ও

জিহ্বাকে বক্ত করে দেওয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

**الْخَيْرَاتُ لِلْخَيْرِتَينَ وَالْجَنَاحِيْثُونَ لِلْجَنَاحِيْثَاتِ ۚ وَالْطَّيْبَاتُ
لِلْطَّيْبِيْنَ وَالْطَّيْبَيْنُ لِلْطَّيْبَاتِ ۚ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِنَ بَكَوْلُونَ ۖ لَهُمْ
مَفْرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ۝**

অর্থাৎ দুষ্টরিজ্বা মারীকুল দুষ্টরিত পুরুষকুলের জন্য এবং দুষ্টরিত পুরুষকুল দুষ্টরিতা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচরিজ্বা মারীকুল সচরিত পুরুষকুলের জন্য এবং সচরিত পুরুষকুল সচরিজ্বা মারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পরিজ্ঞ। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সখানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুষ্টরিজ্বা ও ব্যক্তিচারী নারী ব্যক্তিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুষ্টরিত ও ব্যক্তিচারী পুরুষ দুষ্টরিজ্বা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবমিভাবে সচরিজ্বা মারীদের আগ্রহ সচরিত পুরুষদের প্রতি এবং সচরিত পুরুষদের আগ্রহ সচরিজ্বা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে দেয় এবং অকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেজপাই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও স্থীতি থেকে পরিকার বৃত্তা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গঘরগণকে আল্লাহ তা'আলা পঢ়ী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গঘরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে করীয় (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যাকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিন্ধীকা এই বিবিগণের মধ্যে ত্রোঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। যথং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সেই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সদেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লৃত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আবুআস (রা) বলেন : **مَا بَدَتْ امْسَرَةً فِيْ قَطْ** অর্থাৎ কোন পয়গঘরের বিবি কাফির ছবে—এটা তো সম্ভবপর ; কিন্তু ব্যক্তিচারী হবে—এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যক্তিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণে হয় না। —(ব্যাকুল কোরআন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيْوَاتَ غَيْرِ بَيْوَاتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْأَلُوْا وَنَسِّلُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا ذُلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ⑭ فَإِنْ لَمْ تَتَبَدَّلْ وَافِيهَا أَحَدٌ أَفْلَأَ
 تَلْخُلوُهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوهُوا ذَكِّرِ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ ⑯ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَلْخُلُوا بِيُوتِكُمْ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ
 لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كَتَمْتُونَ ⑯

(২৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যক্তিত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উভয়, যাতে তোমরা স্বরূপ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারণ গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা : সূরা নূরের উক্ত থেকেই অঙ্গীলতা ও নির্ণজ্ঞতা দয়ন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারণ প্রতি অপবাদ আরোপের নিম্না উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অঙ্গীলতা দয়ন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্ণজ্ঞতা সুগঘ হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারণ গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহুরাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার : ১. নিজের বাসগৃহ, যাতে অন্য কারণ ও আসার সত্ত্বাবনা নেই ; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহুরাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সত্ত্বাবনা আছে ; ৩. যে গৃহে কারণ ও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সত্ত্বাবনা আছে ; ৪. যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় ; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারণ ও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিকারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে

বর্ণিত হচ্ছে ৪) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। (অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি ? বিনানুমতিতে এমনিতেই চুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্বরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো স্বতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে ; যদিও সুমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের থালি গৃহে বিনানুমতিতে চুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শাখিল, যা জায়েয নয়। এ হলো তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাস্তুনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হয়। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। (বিরুদ্ধচারণ করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তথনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না ; কিন্তু হ্যাঁ, না-ও কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনিবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে আসা উচিত ; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গুনাহ হবে না যাতে (বাসগ্রহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্বাবস্থায় তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অপরিহার্য।)

আনুমতিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআনী সামাজিকভাব একটি উরুজ্বলপূর্ণ অধ্যায় ৪ কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো না ৪ পরিভাষের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই উরুজ্বল দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবর্তীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলগ্রাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে ;

কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা পুর হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামাজ্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হ্যাবত ইবনে আবাস (রা) কোরআনের আয়াত অঙ্গীকার করার মতো শুরুতর তাৰায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের অতি এমন উপকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে চলছে, যেন তাদেৱ ব্যতে এগুলো কোৱাআনেৰ বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ ।

অনুমতি চাওয়াৰ রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসেৰ জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাঙ্গা কৰা হোক, সৰ্বাবহুৱাৰ তাৰ গৃহই তাৰ আবাসস্থল। আবাসস্থলেৰ আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আৱাম। কোৱাআন পাক অবৃদ্ধি নিয়ামতৱাজিৰ উদ্দেশ্য প্ৰসমে এ দিকে ইঙিত কৰে বলেছে : جَعْلَ لِكُمْ مِنْ بَيْنِ كُلِّ مَا خَلَقْنَا لَكُمْ أَرْضًا إِنَّمَا تَأْمُلُونَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেৱ গৃহে তোমাদেৱ জন্য শান্তি ও আৱামেৰ ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আৱাম তখনই অক্ষণ থাকতে পাৱে, যখন মানুষ অন্য কাৰও হস্তক্ষেপ ব্যাজীত নিজ গৃহে নিজ প্ৰয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাৱে কাজ ও বিশ্বাম কৰতে পাৱে। তাৰ স্বাধীনতায় বিন্ন সৃষ্টি কৰা গৃহেৰ আসল উদ্দেশ্যকে গও কৰে দেওয়াৰ নামাঞ্চল। এটা খুবই কঠৈৰ কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম কৰেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কত বিধানবলীৰ একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষেৰ স্বাধীনতায় বিন্ন সৃষ্টি কৰা ও কষ্ট দান কৰা থেকে আস্তৰক্ষা কৰা, যা প্রত্যেকটি সন্তুষ্ট মানুষেৰ যুক্তিসঙ্গত কৰ্তব্যও। হিতীয় উপকারিতা হয়ৎ সাক্ষাৎ প্ৰার্থীৰ। সে যখন অনুমতি নিয়ে দ্বন্দজনোচিতভাৱে সাক্ষাৎ কৰবে, তখন প্ৰতিপক্ষও তাৰ বক্তব্য যত্নসহকাৰে উনবে। তাৰ কোন অভাৱ থাকলে তা পূৰণ কৰাৰ প্ৰেৰণা তাৰ অস্তৱে সৃষ্টি হবে। এৰ বিপৰীতে অভদ্ৰজনোচিত পহায় কোন ব্যক্তিৰ উপৰ বিনামুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অক্ষ্যাত বিপদ মনে যত পীঢ়ি সম্ভব বিস্তাৰ কৰে দিতে চেষ্টা কৰবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাৰ প্ৰেৰণা থাকলেও তা নিষেচণ হয়ে যাবে। অপৰদিকে আগস্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়াৰ পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্জনতা ও অঙ্গীলতা দৰ্শন। কাৰণ, বিসামুমতিতে কাৰও গৃহে প্ৰবেশ কৰলে মাহবাৰ নয়, এমন মারীৰ উপৰ দৃষ্টি পড়া এবং অস্তৱে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আচৰ্য নয়। এ দিকে সম্ভব কৱেই অনুমতি প্ৰহণেৰ বিধানবলীকে কোৱাআন পাক ব্যাচিয়া, অপৰাদ ইত্তাদিৰ শান্তিৰ বিধি-বিধানে সংশল্পন বৰ্ণনা কৰেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহেৰ নির্জনতায় এমন কাজ কৰে, যে সম্পর্কে অপৰকে অবহিত কৰা সমীচীন মনে কৰে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিয়েকে গৃহে চুকে পড়ে, তাৰ ডিন লোক তাৰ পোপন বিবৰ সম্পর্কে জ্ঞাত হৰে যাব। কাৰও গোপন কথা অবৰমন্তি জানাৰ চেষ্টা কৰাও গুৰুত্ব এবং অপৰেৱ অন্য কঠৈৰ কাৰণ। অনুমতি প্ৰহণেৰ কিন্তু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। অথবে এগুলোৰ ব্যাখ্যা ও বিবৰণ দেখা যেতে পাৱে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পাৱে বৰ্ণিত হবে।

মাস'আলা : আয়াতে **الذين لمن** বলে সংৰোধন কৰা হয়েছে, যা পুৰুষৰেৰ জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মারীৰাও এই বিধানেৰ অক্ষণুক; যেমন কোৱাআনেৰ অন্যান্য বিধানেৰ ক্ষেত্ৰে পুৰুষদেৱকে সংৰোধন কৰা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তৰ্ভুক্ত রয়েছে। কভিপয় বিশেষ

মাস'আলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথা ও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের জীবনের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারণ গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হয়রত উম্মে আয়াস (রা) বলেন : আমরা চারজন মহিলা থায়ই হয়রত আয়েশা'র গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা তেতুরে প্রবেশ করতাম। —(ইবনে কাসীর)

মাস'আলা : এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারণ গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহরাম ও গায়র-মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি চাওয়া উয়াজিব। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। ইয়াম মালেক মুয়াত্তা এছে আত্তা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজেস করল : আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। সোকটি আবার বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর ? সে বলল : না। তিনি বললেন : তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে।—(মাযহারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ থাকে না।

মাস'আলা : যে গৃহে শুধু নিজের জ্ঞান থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া উয়াজিব নয়। কিন্তু মোকাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও ইঠাই বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদমুক্তি দ্বারা অথবা গলা ঘেড়ে হিঁশিয়ার করা দরকার। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের জ্ঞান বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হিঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন।—(ইবনে কাসীর) একেব্রে অনুমতি চাওয়া যে উয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হয়রত আত্তাকে জিজেস করলেন : নিজের জ্ঞান কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী ? তিনি বললেন : না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত করে বলেন : এর অর্থ উয়াজিব নয়। কিন্তু মোকাহাব ও উত্তম এ ক্ষেত্রে।

অনুমতি প্রবেশের সুরাত তরীকা : আয়াতে ^{حَتَّىٰ تُسْتَأْسِنُوا وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا} বলা হয়েছে ; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারণ গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিয়য় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে ^{اسْتِيْنَاس} শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি

লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়—সে আতঙ্কিত হয় না । দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর । কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ একপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর । কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন । এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অংগপক্ষাং নেই । তিনি আবু আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন । যাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে । নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে । কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায় ।

ইহায় বুখারী আদাবুল মুফরাদ প্রস্তু হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না । কারণ সে সুন্নাত তরীকা ত্যাগ করেছে । —(কুহল মা'আনী) আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনেক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল : ﴿لَمْ يَكُنْ لِّأَبْرَارٍ﴾ আমি কি চুক্তে পড়ব ? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না । বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও । সে বলুক ৪ ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الدُّخْلُ﴾ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি ? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনে ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الدُّخْلُ﴾ বলল । অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন । —(ইবনে কাসীর). বায়হাকী হ্যরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উকি বর্ণনা করেছেন : ﴿لَمْ يَدْعُ مَنْ لَا يَدْعُ بِالسَّلَامِ﴾ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না । —(মায়হারী) এই ষট্টনাম রাসূলুল্লাহ (সা) দু'টি সংশোধন করেছেন—প্রথমে সালাম করা উচিত এবং ﴿لَمْ يَدْعُ﴾ এর স্থলে ﴿لَمْ يَدْعُ﴾ শব্দের ব্যবহার অসমীচীন । কেননা, ﴿لَمْ يَدْعُ﴾ থেকে উভূত । এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় চুক্তে পড়া । মার্জিত ভাষার পরিপন্থী । গোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম । অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক শোনে । গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে ।

মাসআলা : উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে । এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম । হ্যরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন । একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দ্বারে এসে বললেন, ﴿السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ﴾ অর্থাৎ সালামের পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি ? —(ইবনে কাসীর) সহীহ মুসলিমে আছে, হ্যরত আবু মুসা হ্যরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا﴾ এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মুসা বলেছেন,

এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশঙ্কারী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রাপ্তীকে না চেনা পর্যবেক্ষণ নিরুৎসু জওয়াব দেয়া যায় না।

মাসআলা ৪: এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পক্ষ মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেঙে প্রবেশের অনুমতি চায় ; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। জেতর থেকে পৃষ্ঠকর্তা জিজ্ঞেস করে, কে ? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহ্য, এটা জিজ্ঞাসার অগুহ্য নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে ‘আমি’ শব্দ ধারা কিম্বপে চিনবে ?

খৃষ্টীয় বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরাত্রি হ্যুগীয়া ইবনে শো’বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হ্যুগীয়া শেক্তর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর হলো, আমা অর্ধাং আমি। হ্যুগীয়া বললেন, আমার বস্তুদের মধ্যে তো কারও নাম ‘আনা’ নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাসীস তলালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজায় কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) শেক্তর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে, উত্তরে জাবের ‘আনা’ বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে শাসিয়ে বললেন : ‘আনা’ ‘আনা’ অর্ধাং ‘আনা’ ‘আনা’ বললে কাউকে চেনা যায় নাকি ?

মাসআলা ৫: এর চাইতেও আরও মন্দ পক্ষ আজকাল অনেক সেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন শেক্তর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে ? তখন তারা নিচুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উপরিপুর করার নিকৃষ্টতম পক্ষ। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পও হয়ে যাব।

মাসআলা ৬: উচ্চিষ্ঠিত হাসীসসমূহ থেকে আরও প্রয়াণিত হয় যে, দরজার কড়া নেতৃত্বে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অস্তুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা কর্ত্ত্ব-অনুমতি চাওয়ার এ পক্ষাও জায়েয়।

মাসআলা ৭: কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে শ্রেষ্ঠ চরকে উঠে, করং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌছে যায় এবং কেন্দ্ৰীয় কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা মন্দ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কষ্ট না হয়।—(কুরআনী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বুঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি জক্ষ রাখাকে জরুরী মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরী ঝঁপিয়ারী : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ঝঁকেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার উপায়। যারা সুন্নাত তরীকার অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান মুখে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখালৈ সালালের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই কুঢ়ে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যক্তিরেকে গৃহে প্রবেশ মা করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পক্ষ পক্ষে ও প্রতি দেশে বিভিন্নৰূপ হতে পারে : দরজায় কড়া নাড়ার এক পক্ষ তো হাসীস থেকেই আসা গেল। এমনিভাবে যা ‘আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৪৯

যান্মা দরজায় ঘটা লাগায়, তাদের এই ঘটা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘটা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌছে। এছাড়া অন্য কোন পছন্দ কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও আয়েবে। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পছন্দ অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাসজালা : যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ
হতে পারবে না-ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক
ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যাকে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধা
হয় এবং আপনাকেও ডেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমতাবস্থায় তার ওয়ার মেনে নেওয়া
উচিত। উল্লিখিত আয়তেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে :
وَإِنْ قَبْلُكُمْ أَرْجُعُوا فَارْجِعُوا مُوْ
বলুকে আর্জু করুক আর্জু করুক
অর্থাৎ যখন আপনাকে আগতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হষ্টচিত্তে
ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই
অসম্ভব। পরবর্তীকালের জন্মেক বৃহুর্গ বলেন : আমি সারা জীবন এই আয়ত-চিহ্নাম যে,
কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি
ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি ; কিন্তু হায়, এই
নিয়মান্তর কখনও আমার ভাগে জটল না।

ଆମାଜାଳୀ । ଇସଲାମୀ ଶରୀରତ ଶୁଦ୍ଧର ସାମାଜିକତା-ଶିକ୍ଷା ଦିଯେଇଁ ଏବଂ ସବାଇକେ କଟିଥେବେ ବୌଚାନୋର ଜନ୍ୟ ବିମୁଖୀ ସୁଷମ ବ୍ୟବହାର କାହେଁ କରାଇଛେ । ଏହି ଆସାତେ ଯେମନ ଆଗମ୍ବୁକରେ ଅନୁମତି ନା ଦିଲେ ଏବଂ ଫିରେ ଯେତେ ବଳେ ହଟଚିତ୍ତେ ଫିରେ ଆସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଓଯା ହେଁଥେ, ତେବେବିଜାବେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀସେ ଏର ଅପର ପିଠ ଏହାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଥେ ଯେ, ان لزورك عليك حسنة ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷାତ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓ ଆପନାର ଉପର ହକ ଆଛେ । ତାକେ କାହେ ଡାକୁଳ; ବାଇରେ ତାର ସାଥେ ମୋଳାକାତ କରନୁ; ତାର ସଞ୍ଚାଳ କରନୁ, କଥା ତମୁମ ଏବଂ ତକ୍ତର ଅସୁରିଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧର ହାଙ୍ଗ ସାକ୍ଷଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଅସୀକାର କରାବେଳ ନା । ଏଟାଇ ତାର ହକ ।

ମାନାଳୀ : କାରଣ ଦଶଜାର୍ହ ଅନୁମତି ଚାଇଲେ ସମ୍ପଦ ଭେତର ଥେବେ ଜଗ୍ଯାବ ନା ଆସେ, ତବେ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ଓ ତୃତୀୟବାର ଅନୁମତି ଚାଓଯାବ ସୁମାତ୍ : ସମ୍ପଦ ଦ୍ଵିତୀୟବାରରେ ଜଗ୍ଯାବ ନା ଆସେ, ତବେ ଫିରେ ଆସାଇ ନିର୍ଦେଶ ଆହେ । କାରଣ ଦ୍ଵିତୀୟବାର ବଲତେ ଏଠା ଧ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଯାଏ ଯେ, ଆସ୍ୟାଙ୍କ ଉନ୍ନେହେ ; କିନ୍ତୁ ନାମବରତ ଥାକା ଅର୍ଥବା ଗୋଟିଲାରତ ଥାକା ଅର୍ଥବା ପାଇବାନାମ୍ବ ଥାକାର କାରଣେ ମେ ଜଗ୍ଯାବ ଦିତେ ପାରଛେ ନା । କିଂମା ଏକଟି ତାର ସାକ୍ଷାତ୍କର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଉତ୍ସବ ଅବହାୟ ସେବନେ ଅଟିଲ ହେ ଥାକା ଏବଂ ଅବିରାମ କଡ଼ା ନାଡ଼ାଓ କଟେଇ କାରନ୍, ଯା ଥେବେ ବୈଚେ ଥାକା ସ୍ୱାଜିତ । ଅନୁମତି ଚାଓଯାବ ଆସିଲ ଶକ୍ତି କଟି ଦାନ ଥେବେ ବୈଚେ ଥାକା ।

ହେଉଥି ଆବୁ ମୂସା ଆଶାରୀ ବର୍ଣନ କରେନ, ଏକବାର ରାସ୍‌ସ୍ଲେ କରୀଯ (ସା) ବନ୍ଦଳେନ ୧୩ ଅସ୍ତାନେ ଅଧିକମ୍ ତାଟା ଫିଲ୍ ମୁନ୍ ଲେ ଫିଲ୍ ରଖିମ

যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। —(ইবনে কাসীর) মুসনাদে আহমদে হ্যরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হ্যরত সা'দ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হ্যরত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন; কিন্তু খুবই আস্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হ্যরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনতেন এবং আস্তে জওয়াব দিতেন। তিনবার একপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওয়র পেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আস্তে দিয়েছি। যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হ্যরত সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কৃত করেন।

হ্যরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশ্ক ও মহকতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এনিকে চিন্তাও করেননি যে, দু'জাহানের সরদার হ্যুর পাক (সা) দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলু না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এনিকে নিবন্ধ ছিল যে, রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশ্যে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাপকর হবে। গ্রোটিকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নাত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাসআলা ৪ এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিনি বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোন আলিম অথবা বুর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যক্তি ও অবৰ দেওয়া ব্যক্তি এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয়; এবং এটাই আদব ও শিষ্ঠাচার। বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাপ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন মুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই ৪ : حُلِّيٌ تَخْرُجُ إِلَيْهِمْ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَزِّلُّوْنَهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ দিপ্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট বীকার করে নেই।—(বুখারী)

— لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْخَلُوا بَيْنَنَا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ — শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত

হওয়া যায়, তাকেও 'عَلَّ' বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বুৰানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্ধাং ভোগ করার অধিকার। হয়রত আবু বকর সিদ্দিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবি লোকেরা কি করবে ? যেকুন ও মদীলা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়া কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় - (মাযহারী)। শানে নুয়লের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে **بِيَوْنَ غَيْرَ مُسْكُنٍ** বলে এমন গৃহ বুৰানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয় ; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও ধান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে টেলিন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিন্তিবিলোন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাসআলা : জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে টেলিনের প্লাটফর্মে টিকিট ব্যক্তিত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্লাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী ; এর বিরুদ্ধাচারণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিক, সেখানে অনুমতি ব্যক্তিত যাওয়া শরীয়তে নাজারেয়।

মাসআলা : এমনিভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবহারপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যক্তিত যাওয়া নিষিক ও গুরাহু।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানবলীর আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আম্বরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিষ্পত্তির মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোন ব্যক্তিকে ব্যাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশতুল থাকার সময় শুরুতর প্রয়োজন ব্যক্তিত টেলিফোনে সংযোগ করা জারীয নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার হাথীনতায় বিঝে সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

যাসআলা ও যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজ্ঞলক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরুব করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শব্দে মানুষ ইভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন শব্দ কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শব্দেও কোনরূপ পরিশোধ করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে : ان لزورك عليك حقاً অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগজ্ঞুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অবীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার অগুর্যাব দিন।

কারণ গৃহে পৌছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পও হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।—(বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সা) ষথন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিশৱীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডালে কিংবা বাসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিশৱীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তথ্বকার মুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত ; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশঁকা থাকত। —(মাযহারী)

উল্লিখিত আরাতসমূহে যে অনুমতি ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায় (যদি দৈবাত্ম কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত। —(মাযহারী))

যাকে কেউ দৃঢ় মারফত ভেকে পাঠায়, সে যদি দৃঢ়ের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই ; দৃঢ়ের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : إذا دعى أحدكم فجاء معه أرضاً أو ماءً أو حلاً فلما ذهب إلى ذلك أرض أو ماء أو حلاً ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى ذلك أذن له أن يدخله، فلما دخله أذن له أن يخرج منه، فلما خرج منه أذن له أن يدخله again

قُلْ لِلّٰهِ مُتَّبِعٌ بِخَصْرٍ وَمِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فِرْجَهُمْ ذَلِكَ أَذْنٌ لَهُمْ
إِنَّ اللّٰهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلّٰهِ مُتَّبِعٌ بِخَصْرٍ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيُحْفَظُنَ فِرْوَاهُنَّ وَلَا يُبَدِّلُنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيُضَرِّبُنَ بِخُمُرِهِنَّ
 عَلَى جُمُوْبِهِنَّ صَوْلَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُبَدِّلُنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبَاءِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ
 بَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بَعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي أَخْوَتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَالِكَتْ أَيْمَانِهِنَّ أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرُ أُولَئِكَ
 الْأُرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ صَوْلَةِ
 وَلَا يُضَرِّبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۝ وَتَوْبُولَى اللَّهُ
 جَمِيعًا إِيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لِعِلْمِكُمْ تَقْلِحُونَ ⑤

(৩০) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের মৌনাজের হিফায়ত করে। এতে তাদের জন্য খুব পরিচিত আছে। নিচয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (৩১) ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের মৌন অঙ্গের হিফায়ত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার উড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, খন্তির, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নিপুত্র, ক্রীলোক, অধিকারাত্মক বাঁদী, মৌনকামনাযুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অঙ্গ, তাদের ব্যক্তিত কারণ কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ'র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন : তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থাসংস্কৃতিপাত্র করা নাজায়েয়, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত্র না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয়, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয়, সেই অঙ্গ যেন কৌমুভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের মৌনাজের হিফায়ত করে (অর্থাৎ অবেধ পাত্রে কামপ্রবৃত্তি চারিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুঁটৈযথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পরিচিতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিঙ্গ হবে) নিচয় আল্লাহ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণকারীরা শাস্তিমোগ্য হবে) আর

(এমনিভাবে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন : তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয় সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয়, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয়, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের ঘোনাসের হিফায়ত করে। (ব্যক্তিচার, পারম্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না করে। ('সৌন্দর্য' বলে গহনা ; যেমন কংকন, চুরি, পায়ের অলংকার, বাঞ্ছবন্দ, বেঢ়ি, ঝুমুর, পঁতি, বালি ইত্যাদি এবং 'সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, পায়ের গোচা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বুরানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যক্তিক্রমসহয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয়। পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অব্যান্য অঙ্গ—যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়তনে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয় নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দুটি ব্যক্তিক্রমের প্রথমটি অয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্ত্তা যেসব অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যক্তিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ এরূপ :) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই—) থাকে (যা আবৃত করার ঘণ্টে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। এরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং বিতর্কতম উকি অনুযায়ী পদযুগলও বুরানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয় ; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেদী ও আংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেদীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যক্তিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে —— এর তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহবিকশণ কাব্যসের ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে (দিয়েছেন) এবং (বিশেষ করে তারা যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের উভয় (যে সাধা/অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহ যে ব্যবহৃত হয়) বক্ষদেশে ছেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশে জামা দ্বারা আবৃত হবে, যা কেবল কিন্তু প্রায়ই জামার বোজাম খোলা থাকে এবং বক্ষের আকৃতি জামা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াজনক হচ্ছে)। এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দাৰ উল্লিখিত রিধান থেকে ব্যক্তিক্রমকৃত করা হয়েছে।) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের অঞ্চলিত স্থানসমূহকে কল্পনা করে), কৃকৃশ না করে ; কিন্তু শারী, পিতা, পুত্র, কন্যাৰ পুত্র, (সহোদর, বৈমাত্রয়, ও বৈপ্রিয়েয়) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি মাত্রা, নয়) জ্ঞাতপুত্র, (সহোদরা, বৈমাত্রয় ও বৈপ্রিয়েয়) ভগিনীপুত্র, (চাচাত, খালাত-বোনদের পুত্র-নয়) নিজেদের, (ধর্মে শরীর) শৈলীকৃত (অর্থাৎ মুসলমান জীবোক) কাফির শৈলীকৃত বেপানা-পুরুষের মতে বেপানা-পুরুষকে বৃক্ষ। তার কাছেও পর্দা ওয়াজিব), এমন পুরুষ যার (অথ পানামের অভ্য) সেবক (হিস্তির মাত্রে

এবং ইন্দ্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) যাহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয়। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, তখন এ ধরনের শোকই বিদ্যমান ছিল। (দুরুরে-মনসুর) অত্যেক নির্বোধ ঘটনার বিধান ছাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিন্তু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই তাবে' তথা সেবক উদ্দেশ করা হয়েছে। যারা বোধগতির অধিকারী, তারা বৃক্ষ থোকা অথবা পিঙ্ককর্তৃত হলেও বেগানা শুরু করে। তাদের কাছে পর্ণী ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবসন্ত অঙ্গ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকত্ত্বের নিকটবর্তী ইয়নি এবং কামতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত সবার সামনে বৃক্ষস্তুল, হস্তয়ের তলু ও পদবুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উচ্চিষিত হানসমূহ প্রকাশ করাণ জারী ; অর্থাৎ মাঝা ও বক। হারীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুভব।

قالت سيدتنا أم المؤمنين عائشة ما محصله لم ار مني ولم ير مني ذلك الموضع اورده في المشكواة وروى بقى بن مخلد وابن عدى عن ابن عباس مرفوعا اذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر الى فرجها فان ذلك يورث العمى قال ابن حساح جيد الاستناد كذا في الجامع الصفير -

এবং (পর্ণীর প্রতি এতুকু যত্নবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের পোপন সাজসজ্জা অকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকার্যাদির আওয়াজ বেগোনা প্রক্রিয়াদের কানে পৌছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের ধারা যে জটি হয়ে গেছে, তজন্য) তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে তওরী কর, যাতে তোমরা সকলকাথ হও (নতুন তন্মাহ পূর্ণ সফলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

جَنْزِيرٌ

অনুবাদিক আর্থিক বিষয়

একী পর্ণীগ্রন্থ বিশেষজ্ঞতা দরবণ ও সংকীর্ত সংরক্ষণের একটি উচ্চস্তুপূর্ণ অধ্যায় । যাহিলাদের নদী সম্পর্কিত প্রথম আল্লাহর সূরা আহ্মাবে উচ্চল সূর্যনীন হস্তরত যবনমূল বিনতে আহাশের সাথে সূর্যসূত্রাহ (সা)-এর বিধানের সবচ অবজীর্ণ হয়। এর আরিব কারণও মতে প্রতিয়া হিজরা প্রথম আরো অতে পৰম হিজরী। তকসীরে ইবনে কাসীর ও নায়েজুল আলিমতের প্রাচীন প্রতিয়া হিজরীকে অবজীর্ণতা দান করা হয়েছে। অহল সাংআনীতে হস্তরত আলামগ্রন্থের প্রতিক্রিয়া আলামগ্রন্থে, পরবর্তি হিজরীর বিলক্ষণ মাসে এই বিধান সম্পর্ক হয়। এ প্রতিয়া সূর্যবাহু প্রক্রিয়াতে, পরবর্তি অবিজ্ঞত এই বিধানের সবচই অবজীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুদ্রের আলোচন আলকাতসমূহই বনা সুস্থানিক শুরু অব্যায় সূর্যালী শুরু থেকে ফেরার পথে সহিত স্থগনাদ দ্বিতীয় সাথে সম্মত অবজীর্ণ হয়। এই শুরু ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। প্রথম আলোচনা থেকে জামা পায় যে, সূরা মুদ্রের পর্ণী সম্পর্কিত আলামসমূহ পরে প্রথম সূরা আহ্মাবের পদী সম্পর্কিত আলামসমূহ অঙ্গে অবজীর্ণ হয়। সূরা আহ্মাবের

আখ্যাতসমূহ নাবিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহ্যাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়তসমূহের তফসীর সিদ্ধিত হচ্ছে।

فَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغْصُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكِنَ

— غضن يغصنوا — لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لَّهُمَا بِمَا يَمْتَعُونَ —

নত করা। — (রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরুহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমজূক)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

— وَيَعْنَقُونَ فُرُوجَهُمْ — ঘোনাস সংহত রাখার অর্থ এই যে, কৃপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ঘত পছা আছে, সবগুলো থেকে ঘোনাসকে সংহত রাখা। এতে ব্যতিচার, পুঁয়েমুন, দুই নারীর পারম্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমেধুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পছায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যতিচার। এ দৃষ্টিকে স্পষ্টও উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদ্ভয়ের অন্তর্ভুক্ত হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, শ্রেণ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গসম্মে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হ্যরত ওকায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিন্তু আর্থাৎ যদ্বারা আল্লাহর বিধানের বিকল্পকারণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রাঞ্চ--সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যতিচার। তাবারানী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

النظر سبع من سهام البليس مسموم من تركها مخافتها ابدلته ايماناً بجد حلواته في قلبه
— দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিবাহ শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সন্তোষ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবৃত্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টিতা সে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উকি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। — (ইবনে কাসীর) হ্যরত আলী (রা)-এর হাদীসে আছে, অথবা দৃষ্টি মাঝ এবং ভিত্তির দৃষ্টিপাতে শুনাও। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকল্পনা ও অনিষ্টকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্থ। নভুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্থ নয়।

শাশ্বতবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ ৪. ইবনে কাসীর লিখেছেন : পূর্ববর্তী অনেক ঘনীমী শাশ্বতবিহীন বালকদের প্রতি অপচক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

— وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْصَبُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ۚ ۗ ۗ
এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের অন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জোর দেওয়ার অন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যক্তীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ; কামভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হ্যরত উল্লে সালমার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ৪. একদিন হ্যরত উল্লে সালমা ও মায়মুনা (রা) উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অঙ্গ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উল্লে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবজীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উল্লে সালমা আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তো অঙ্গ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে দেখেও না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ তোমরা তো অক নও, তোমরা তাকে দেখছ।—(আবু দাউদ, তিরিয়ী) অপর কয়েকজন ফিকাহবিদ বলেনঃ কামভাব ব্যক্তীত বেগোন পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূর্বলীয় নয়। তাদের প্রমাণ হ্যরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ৪. একবার ঈদের দিন মসজিদে নবীর আঙিনায় কিন্তু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হ্যরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যক্তীত দেখাও অনুমতি। আয়াতে ভাষা দৃষ্টি আরও দুর্বা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যক্তিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু, পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যক্তীত বাকিগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সদ্দেহাভীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ أَلَا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبَدِّيْنَ زِينَتَهُنَّ أَلَا لِبَعْوَلَتِهِنَّ -

অতিধানে এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ আয়াতে -এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। (রহস্য মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে أَرْبَعَةَ رِنْبَهَ অর্থাৎ নারীর কোন সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যক্তিত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বত্ত্বাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অস্তর্ভূক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গুনাহ নেই। —(ইবনে কাসীর) এতে কোন কোন অঙ্গ বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হ্যরত ইবনে মাসউদ বলেন : بِلَّهِ رِنْبَهَ বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লসা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অস্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাকে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা স্থলবপর নয়, সেগুলো ব্যক্তিত সাজসজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয় নয়। হ্যরত ইবনে আববাস বলেন : এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিন্তু চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরহ হয়। অতএব হ্যরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েয় নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হ্যরত ইবনে আববাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয়। এ কারণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিশ্রাম দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ পক্ষে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয় নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয় নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুद্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভূক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুক্র ও দুরত হবে।

কাষী বায়বাভী ও 'খায়েন' এই আয়াতের তফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না । আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয় । তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে ব্রতাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে । বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত । নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট । সেনদেনের প্রয়োজনে কোন সহযথ্য মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে । এটা ও ক্ষমাই—গুনাহ নয় । কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয় ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রয়োজ্য । যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওয়র ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য । এই ব্যাখ্যায় পূর্বোন্নিষিত্য উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে । ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয় নয় । যাওয়াজের ঘৰে ইনে হাজার মঙ্গী শাফেট্স (র) ইমাম শাফেট্স (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন । নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় । এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায় ; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতীতেকে জায়েয় নয় । পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের ঘতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয়, তারাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয় । বলা বাহ্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র । এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির মূগ । তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয় নয় ।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে : **خُسْرٌ شَبَّثٌ**—**أَرْبَعَةِ تَارَا** যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে । অর্থ এর বহুবচন । অর্থ এই কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায় । জিবু—শব্দটি এর বহুবচন । এর অর্থ জামার কলার । প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত । তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা । আয়াতের উল্লিঙ্কৃত সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে । এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে । এর আসল কারণ মূর্ধাযুগের একটি প্রধান বিলোপ সাধন করা । মূর্ধাযুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দৃই প্রাপ্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত । কলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত । তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন একেপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রাপ্ত পুরুষের উচ্চিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে । —(কলম মা'আলী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই । এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিধি । এক. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমজুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই । তারা

মাহরাম। আঝাহ তা'আজা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সভীত সংরক্ষণ করে : বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সংভাবনা নেই। দুই সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরম্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্বর্ত্ব্য যে, স্বামী ব্যক্তিত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম—গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়েয় নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও জায়েয় নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহবাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইশ্পিয়ারী : অরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শব্দ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উচ্ছেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভূক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : প্রথমত স্বামী, যার কাছে ঝীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুমতি। হয়রত আয়েশা সিঙ্গীকা (রা) বলেন : **أَرْبَعَ مَارِدَى مِنْ لِلْوَيْلَةِ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর দেখিনি।

ব্রতীয়ত, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ত্রৃতীয়ত, শুভত্ব। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত, স্বামীর অন্য ঝীলের গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রের ও বৈপিত্রের সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, ধালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় তাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম, ভ্রাতৃপুত্র। এখানেও শব্দ সহোদর, বৈমাত্রের ও বৈপিত্রের ভ্রাতার পুত্র বুরানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বৌন বুরানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহরাম। নবম, **أَوْسَانِينْ** অর্থাৎ নিজেদের ঝীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান ঝীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে—গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তাঁর মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান ঝীলোকের সামনেও খোলা জায়েয় নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

مُسَلِّمَاتِ মুসলমান ঝীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফির মুশরিক ঝীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তাঁরা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হয়রত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : এ থেকে জানা গেল যে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয় নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারণ যতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফির উভয়

প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন ; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না । ইমাম রায়ী বলেন : প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফির সব নারীই ^{نَسَاءٌ} শব্দের অন্তর্ভুক্ত । পূর্ববর্তী বুর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ । কৃত্তল মা'আনীতে মুক্তী আল্লামা আলুসী এই উকি অবলম্বন করে বলেছেন :

هذا القول أوفق بالناس اليوم فانه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمين عن الذميات
উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ থায় । কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে ।

দশম প্রকার অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন । এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এখানে শধু দাসী বুঝানো হয়েছে । পুরুষ দাস এ হ্রকুম্ভের অন্তর্ভুক্ত নয় । তাদের কাছে সাধারণ মাহুরামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব । হ্যরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন : لَا يُفْرِنُكُمْ
أَيْتَ النُّورَ فَانَّهُ فِي الْإِلَامِ بِوْنَ الزَّكْوَةِ
অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদ্রষ্টে বিভাস্ত হয়ো না যে, শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে । এই আয়াতে শধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে । পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয় । হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন বলেন : পুরুষ দাসের জন্য তার প্রত্যু নারীর কেশ দেখা জায়েব নয় ।—(কৃত্তল মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শধু নারী দাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী ^{نَسَاءٌ} শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন :
شَفَقَةً
শক্তি বাহ্যিক দিক দিয়ে শধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজা । দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভূক্ত করার জন্য এই শক্তি আলাদা আনা হয়েছে ।

একাদশ প্রকার হ্যরত ইবনে আব্বাস বলেন : أَوَالْأَبْعَيْنِ غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَعَةِ مِنَ الرِّجَالِ
এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও উৎসুক্য নেই ।--(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবু আবদুল্লাহ, ইবনে জুবায়র ইবনে আতিয়া প্রযুক্ত থেকে বর্ণনা করেছেন । কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামতাব নেই এবং তাদের ঝগঞ্জের প্রতিও কোন উৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে । তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ শুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব । হ্যরত আরেশা (রা)-এর হাদীসে আছে, জনেক নপুংসক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত । বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত ^{نَسَاءٌ} অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন । রাসুলুল্লাহ (সা) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন ।

এই কারণেই ইবনে হাজর মক্কী মিলহাজের টীকায় বলেন : পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্ত্তিত অথবা বুব বেশি বৃক্ষ হয়, তবুও সে ^{غَيْرُ أُولَى الْأَرْبَعَةِ} শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয় । তার

কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে **غَيْرُ أُولَئِكَ** শব্দের সাথে **النَّابِعُونَ** শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহত মেহমান হয়ে আওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে চুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভূক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহত হয়ে আওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর অনাহত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দাদশ প্রকার এখানে এমন অপ্রাঙ্গবয়ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্ত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কর্মনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবের। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মৌরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্ত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।—(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন : এখানে **طَفْل** বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভূক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

وَلَا يُضِرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِبُطْمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ رِيْتَهُنَّ — অর্থাৎ নারীরা যেন সঙ্গেরে পদক্ষেপ না করে, যদরূপ অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উজ্জ্বাসিত হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয়। আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মন্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই— গোপন সাজসজ্জার যে কোনভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েয নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদরূপ অলঙ্কার বাস্তু হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারম্পরিক সংর্ঘনের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সঙ্গেরে থা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে নাজায়েয। এ কারণেই অনেক ফিকাহবিদ বলেন : যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রয়াণিত হলো; তখন বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রশাতীক্ষণ্যে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন করে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়ায়েল গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সুষ্ঠব নারীগণকে কোরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নির্মাপ্য অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ বুখারী প্র মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত ‘সুবহানাল্লাহ’ বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করতে পারবেন না ; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধুলি : নারীর আওয়াজ গোপন অসের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ

বর্তমান। ইমাম শাফেইর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েন। হানাফীদের উকিল বিভিন্ন ক্ষণ। ইবনে হুমাম নাওয়ায়েলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আখ্যান মাকরাহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে জায়েয়।—(জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে বাঁওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না বাঁওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধি গোপন সাজসজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েয়। তিরিয়াবীতে হ্যরত আবু মুসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয় : ইমাম জাসসাস বলেন : কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন কারুকার্যখন্তি বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা উয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা ব্যতীক্ষণ।—(জাসসাস)

وَتَبَوَّءُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا أَيْهَا الْمُؤْمِنُونَ
অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে
তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে
এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা
আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ
দেয়া হয়েছে যে, কামত্বুতির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন ; কিন্তু
আল্লাহ তা'আলার কাছে অত্যোক্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেনীপ্রয়মান। তাই
উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারও দ্বারা কোন ক্ষেত্রে হয়ে যায়, তবে তার জন্য
তওবা করা সেহায়েতে জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুত্তম হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা
চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَإِنَّهُ وَآسِمٌ عَلِيمٌ ⑦٢ وَلَيُسْتَعِفِ الَّذِينَ

لَا يَجِدُونَ شِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃশ্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সজ্ঞ করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংবস্ত অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও ব্যাপক অর্থে—এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর জ্ঞান মৃত্যু অথবা তাসাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ বিবাহের) ঘোগ্য, (অর্থাৎ বিবাহের হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে দাও। শুধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, তাদের দারিদ্র্য ও নিঃশ্বত্তা প্রতি লক্ষ্য করে অঙ্গীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃশ্ব হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিস্তৃশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিস্তৃশালী না হওয়ার কারণে বিবাহ অঙ্গীকার করো না এবং একগুণ মনে করো না যে, বিবাহ হলে খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিস্তৃশালী সেও বিস্তৃহীন ও কাঙ্গাল হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আল্লাহর ইচ্ছার উপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিস্তৃশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃশ্ব ও অভাবগ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন দারিদ্র্য বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সন্ত্রেণ দারিদ্র্য ও নিঃশ্বত্তা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।) আল্লাহ তা'আলা প্রাচুর্যময় (যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময়। (যাকে বিস্তৃশালী করা রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিস্তৃশালী করে দেন এবং যাকে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দারিদ্র্য রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে।

বিবাহের ক্রতিগ্রাম বিধান ৪ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশির ভাগ সভীভু ও পৰিদ্রাঘির হিফায়ত এবং নির্জলতা অনুলিপ্ত দয়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উন্নিষ্ঠিত হয়েছে। এই পরম্পরায় ব্যক্তিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দাৰ বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর ধারণীয় বিধি-বিধানে সমতা নিহিত আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একদিকে স্বত্ন মানুষকে অবৈধ পছায় কামপ্রবৃত্তি চরিত্তার্থ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিস্তৃত পছাড় নাই।

মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫১

বলে দেয়া জরুরী ছিল । এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অতিভুত অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার তেতো থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পছ্টা প্রবর্তন করাও যুক্তি শরীয়তের দাবি । কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এই পছ্টার নাম বিবাহ । আলোচ্য আয়াতে এ স্পর্শকে স্বাধীন নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَدَّا تِبْيَانٍ—وَأَنْكُوا أَلْبَامِيْ مِنْكُمْ—
—এর বহুবচন । অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বাধী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক । এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে ।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে; নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসন্নুন ও উন্নত পছ্টা । এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে । বিশেষত যেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা মিলজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্রীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সংশ্লিষ্ট থাকে । এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে । ইমাম আয়ম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে । যদি কোন প্রাঙ্গবয়কা বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যাতীত 'কুকু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুল্ক হয়ে যাবে । তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরকারের যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে ।

ইমাম শাফেই ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাঙ্গবয়কা বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শায়িল বলে গণ্য হবে । এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয় । কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাস্তুনীয় । এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুল্ক হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে বিশ্বৃপ্ত ; বিশেষত এ কারণেও যে, مُر্টী (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাঙ্গবয়ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত । প্রাঙ্গবয়ক বালিকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুল্ক—কেউ একে বাতিল বলে না । এমনিভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে; প্রাঙ্গবয়কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুল্ক হয়ে যাবে । তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালিক-বালিকা উভয়কে তিরকার করা হবে ।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নাত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শুল্ক ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি স্পর্শকে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে

শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, শুনাহে লিখ হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার অক্ষি-সামর্থ্যও রাখে, এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরয অথবা শুয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন শুনাহুগার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুজাজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগ্রহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। এরপ ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোয়া রাখবে। রোয়ার ফলে কামোন্তেজনা ডিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ওকাফ (রা)-কে জিজেস করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেনঃ না! আবার জিজেস করলেনঃ কোন শরীয়তসম্মত বাঁদী আছে কি? উত্তর হলোঃ না। প্রশ্ন হলোঃ তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলোঃ হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেনঃ বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক মীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।—(মাযহারী)

যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে শুনাহুর আশংকা প্রবল, ফিকাহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে শুনাহে লিখ হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহবিদ একমত যে কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে শুনাহে লিখ হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাপ্ত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্তুর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন শুনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারায অথবা মাকরহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার শুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন শুনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকাহবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উক্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উক্তম। ইয়াম আয়ম আবু হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উক্তম। ইয়াম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উক্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সম্ভাগতভাবে পানাহার, নিদা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মূবাহ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে শুনাহ থেকে আঘারক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মাদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ

যদি একপ সদুদেশ্যে যে কোন মুবাহ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও একপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেই ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মুবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গন্তরদেরও হওয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গন্তরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা ও শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গন্তরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গন্তরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গন্তরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গন্তরগণের সুন্নত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গন্তরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ একপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গন্তরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুব্যক্তি কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোন উন্নাহতে লিঙ্গ হওয়ার আশংকাও নেই, একপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার যিকর ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গন্তর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্বপৰী ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার একপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ظُلْمُكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا إِنَّكُمْ أَوْزُعُونَ﴾ এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর যিকর থেকে বিমুক্ত করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

—وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانَكُمْ— অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞানিদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সম্মোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ জ্ঞান বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা। যদি শালিব্ব শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আঘাতক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খালেশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভুদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাঁদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে **وَلَا تَنْفِعُونَ أَنْ يُنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ**—অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরপ না করলে দেশে বিগুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।—(তিরমিয়ী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইত্তেত না করে সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবহ বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিন্মায় ওয়াজিব--এটা জরুরী নয় **وَاللهُ أَعْلَمُ**।

—إِنْ يُكُنُّوا فُقَرَاءَ يَغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ—যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফায়তের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফায়ত ও সুন্নাতে রাসূল (সা) পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন গুরু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অঙ্গীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অঙ্গীকৃতি জানান উচিত নয়।

হ্যরত ইবনে আবুআস বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন।—ইবনে কাসীর। ইবনে আবী হাতেয় বর্ণনা করেন, যহরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সহোধন করে বললেনঃ তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাচ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

—إِنْ يُكُنُّوا فُقَرَاءَ يَغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ—হ্যরত ইবনে মাসউদ বলেনঃ তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ **إِنْ يُكُنُّوا فُقَرَاءَ يَغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**—(ইবনে কাসীর)

হংশিয়ারীঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাচ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পরিব্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াকুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতঃ

وَلَيْسَتْغَافِلُ الدِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুল্মগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোষা রাখবে। তারা এক্ষণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করবেন।

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تُبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْكَمْ دَوْلَةٌ شَرِكُهُمْ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى
 الْبَغَاءِ إِنَّ الدِّينَ مُحَكَّمٌ لَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكَرِّهُ هُنَّ فَيْكُنَّ
 اللَّهُ مِنْ بَعْدِ أَكْرَاهِهِنَّ عَفْوٌ وَرَحْمَةٌ ۝ ৩৩

(৩৩-এর বাকী অংশ)

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিবেছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ্ন) দেখতে পাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও দান কর (যাতে দ্রুত মৃক্ষ হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সতী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই ইহীন কর্ম) শুধু এ কারণে যে, তোমরা পার্থিব জীবনের কিছু উপকার (অর্থাৎ ধনসম্পদ) সাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে চাইবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর জবরদস্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, কর্মণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে,

তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাত্তিরে গোলাম ও বাঁদীদের হভাবজ্ঞাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের সাথে সহ্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদীরা যদি মালিকদের সাথে যুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার প্রস্তুকার এবং অধিকাংশ ফিকাহবিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহবই হিসেবে করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবক্ষ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মুস্তাহব ও উত্তম। এই চুক্তির ক্ষণেরখা একপঃ কোন গোলাম অথবা বাঁদী তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ ঘরগের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে ‘বদলে-কিতাবত’ বা চুক্তির বিনিয়য় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই হিসাবকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিয়য় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদী মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবক্ষ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মুস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফকারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, *إِنْ عَلِمْتُمْ فَبِعْلِمْ*। অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই সুরক্ষিত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হ্যবরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে একপঃ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুন অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পও হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার প্রস্তুকার বলেনঃ এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার

কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপর্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোন ক্লপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।—(মাযহারী)

—أَرْدِنْ أَسْلَامٍ تَوْمَادِيْرَكَهْ كَهْ ধুন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সরোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু ছাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী ত্তীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরও কম ছাস করে দিতেন।—(মাযহারী)

অর্থনীতি একটি ক্ষত্তপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের কর্যসালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্তৃত হয়ে কেবল অর্ধেপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট শাব্দের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমূর্খী। মতবাদের এই সংবর্ধ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধার্মাধৰ্ম ও যুদ্ধ-বিপ্রাহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শাস্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাকুর এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচারাচরে মানুষ তার শর্ম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপর্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার অবকাঠারা অথবা ব্যবহার করতে যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলোর কোন একজন স্বষ্টা আছেন। একথা ও বলা বাহ্যিক যে, এগুলোর আসল মালিক ও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্বষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্বষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্নাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্বষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভূক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন

ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে ?

প্রথম মতবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনৱেশ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপন্তি উৎপন্ন করে বলেছিল : এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েয়-নাজায়েয়ের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোরআনের أَمْوَالَنَا مَا نَشَاءُ আয়তের উদ্দেশ্য তাই। বিভীষণ মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বস্তুর উপর কোনৱেশ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার স্বান্ব অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমজূড়ও করে দেওয়া হলো।

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ড করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্বত্ত্ব। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে ; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়নুগ্র ও প্রজ্ঞাতিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অনুক পথ হালাল, অনুক পথ হারাম এবং অনুক জ্ঞানগায় ব্যয় করা হালাল ও অনুক যায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়তে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত উভয়পূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আয়তের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন। أَنْتَ الَّذِي مَنَّا عَلَىٰكُمْ مِّنْ مُّثْبَرٍ অর্থাৎ এই অভাবক্ষণ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ। দুই. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিনি তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব মুক্তিহাব, উক্তম করেছেন। এবং মূর্ধন্তা যুগের কুপথা উৎপাটন, ব্যক্তিচার ও নির্বাঙ্গতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়তের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, لَا تُنْكِرْفُ যা আরেমূল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৫২

أَنْ أَرْدِنَ تَحْسِنُنَا — অর্থাৎ তোমাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থকৃতি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কৃপথার বিমলজ্ঞ বিধান প্রদান করাও জরুরী ছিল।

— অর্থাৎ যদি বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্ণজ্ঞ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদস্তি করা জায়েয নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েয। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লজ্জাশৰম ও সতীত্ববোধ মূর্খতাযুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রযুক্ত মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রভুদেরকে শাসানে উদ্দেশ্য যে, বাঁদীরা তো সতীসাক্ষী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর—এটা নিরতিসয় বেহারাপনার কাজ।

— فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ يَعْفُدُ أَكْرَامَهُنَّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ — এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারায়। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ তা'আলা তার উন্নাহ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত উন্নাহ জবরকারীর উপর বর্তাবে। — (মাঝহারী)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَتٍ مُّبَيِّنَةً وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ⑥ اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ۖ مَثَلٌ نُورٍ ۖ
كِشْكُوٰةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الْزُّجَاجَةُ كَانَهَا كَوْكَبٌ
وَدِرْيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبُوكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ لَا يَعْكُدُ
زِيَّهَا يُضِيَّ ۖ وَلَوْلَا تَمَسَّسَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۖ يَهِيدِي اللَّهُ نُورٌ مَّنْ يَشَاءُ مَا
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦ فِي بَيْوَتٍ أَذَنَ

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيَدَكَ فِيهَا سَمِعٌ لَا يُسْبِحُ لِهِ فِيهَا بَالْغُلُّ وَالْأَصْمَالُ ④٦ رِجَالٌ لَا تُنْهِيهِمْ تِجَارَةً وَلَا بَيعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوْنَةِ مَنْ يَخْافُونَ يَوْمًا تَقْلِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ④٧ لِيُجزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَإِذْ يُزَيِّنُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ④٨ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ④٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٌ يَقْبِعُهُ يَحْسِبُهُ الطَّيْلَانُ مَاءً طَحْنَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَعْدُهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابٌ ⑩ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْعِسَابِ ⑪ أَوْ كَظَلَمْتُ فِي بَحْرٍ لَّيْسَ بِيَغْشِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ⑫ طَلَمْتُ بِعَضَهُ فَأَفَوْقَ بَعْضٍ ⑬ إِذَا أَخْرَجْتَهُ لَمْ يَكُنْ بِرَاهِمَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَإِمَالَهُ مِنْ نُورٍ ⑭

(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ-ভীকুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ নভোহওল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচগাত্রে স্থাপিত, কাচগাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পৃতঃপুরিত যয়তূল বৃক্ষের তৈল প্রচলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি শৰ্শ না করলেও তাঁর তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সকায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; (৩৭) এমন স্থানে যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্বরূপ থেকে, নামায কারয়ে করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা তব করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্লে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুঘাতে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত ঋণী দান করেন। (৩৯) যারা কফির, তাদের কর্ম মরজুমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিগাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তাঁর কাছে যায়, তখন কিছুই

পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ত্তব্য) প্রমত্ত সমন্বয়ের থেকে গভীর অক্ষরায়ের ন্যায়, যাকে উজ্জেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল যেষ আছে। একের উপর এক অঙ্ককার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতি নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (তোমাদের হিদায়াতের জন্যে এই সুরায় অথবা কোরআনে রাসূল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে) তোমাদের ধর্তি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্তৃগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের (অথবা তাদের যত লোকদের) কিছু দ্রষ্টান্ত এবং আল্লাহ-ভীরুদ্দের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ তা'আলা নভোমগুলের (বাসিন্দাদের) এবং ভূমগুলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়াত) দাতা। (অর্থাৎ নভোমগুল ও ভূমগুলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়াত পেয়েছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলাই হিদায়াত দিয়েছেন। নভোমগুল ও ভূমগুল বলে সমগ্র বিশ্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যেসব সৃষ্টি জীব নভোমগুল ও ভূমগুলের বাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল।) তাঁর জ্যোতির (হিদায়াতের) আচর্য অবস্থা এমন, যেমন (মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ (স্থাপিত)। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয় ; বরং) একটি কাচপাত্রে স্থাপিত (এবং কাচপাত্রটি তাকে রাখা আছে।) কাচপাত্রটি (এমন পরিকার ও বস্ত্র) যেন একটি উজ্জ্বল তারকা।

প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) যারা প্রজ্ঞলিত করা হয়, যা যয়তুন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার উপর রৌদ্র পতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনশেষে তার উপর রৌদ্র পড়বে না ; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তের অবস্থিত, যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরিকার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিকার ও প্রজ্ঞলনশীল যে) অগ্নি শৰ্প না করলেও মনে হয় যেন আপনা-আপনি জুলে উঠবে। (আর যখন অগ্নি শৰ্প করে, তখন তো) জ্যোতির উপর জ্যোতি। (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট তরের ছিল, এরপর আগনের সাথেও যিলিত হয়েছে। যিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাচপাত্রে রাখা আছে, যদরূপ চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাচপাত্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বক্ষ। এমতাবস্থায় কিরণ এক জ্বানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলও যয়তুনের, যা পরিকার আলো ও কম ধোয়া হওয়ার জন্যে প্রসিদ্ধ। ফলে অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রথম আলো হবে। একেই “জ্যোতির উপর জ্যোতি” বলা হয়েছে। এখানে দ্রষ্টান্ত সমাপ্ত হলো। এমনভাবে মুঘিনের অঙ্গের আল্লাহ তা'আলা যখন হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন, সত্য গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে ; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তুনের

তেল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এরপর যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নূর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয়। ফলে, সে তৎক্ষণাত্ত তা কবূল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত হয়ে নূরের উপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্ত্ব ঘটনে কোনরূপ বিধা করে না। এই উন্নত্বতা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : ﴿أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾। আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের উপর থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে : ﴿فَنَّبِيَ اللَّهُ أَنَّ يَهْدِيَ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ﴾। এ হচ্ছে নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত।) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং পৌছিয়ে দেন। হিদায়াতের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাও মানুষের হিদায়াত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ তা'আলা মানুষের (হিদায়াতের) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে জ্ঞানগত বিষয়বস্তু ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগ্য হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), (যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই যে, তাতে মাপাক ও হায়েয়ওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না, গওগোল করা যাবে না, পার্থিব কাজ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা যাবে না, দুর্গংক্রযুক্ত দ্রব্য খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সকায় (নামাযে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহর মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্ত্বেও তাদের ভয়বীতি এবং যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) তয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (যেমন অন্য আয়াতে আছে ﴿أَتُنْبَتُ مِنْ أَنْهَمٍ﴾। অর্থাৎ তা'আলা আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এতদসম্মতেও তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়াত ও নূর ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের পরিমামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) পরিগাম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। (প্রতিদান তো এটা—যার ওয়াদা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে, অধিক হলো—যার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) কুর্যী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনিভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়াত ও হিদায়াতওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও

পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নূরে-হিদায়াত থেকে দূরে) তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার ইওয়ার কারণে দুটি দৃষ্টান্তের অনুরূপ)। কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) ফর্মুলির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি ঘনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়); এমনকি, সে যখন তার কাছে পৌছে, তখন তাকে (যা ঘনে করেছিল) কিছুই পায় না (এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারূণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আধিক আঘাত পেয়ে সে ছটকট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) আল্লাহর ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা তার (জীবনের) হিসাব চুক্তিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাঙ্গ করে দেন)। আল্লাহ তা'আলা (যার মেয়াদ এসে যায়, তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাঁকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, দেরী লাগবে। সুতরাং এই বিষয়টি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে : ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مَوْتَهُ لَمْ يُؤْخَرْ أَدَى جَاهَ، أَجَلَهُ لَمْ يُؤْخَرْ﴾ এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি ঘনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে বাধ্যক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আধিরাতেও ফলদায়ক ঘনে করে এবং যেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবৃলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে কাফিররাও আধিরাতে পৌছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভাস্ত ইওয়ার কারণে হা-হৃতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভাস্ত ইওয়ার কারণে চিরস্তন ধৰ্ম অর্থাৎ জাহান্নামের আঘাতে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অঙ্গীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর সম্মুদ্রের অভ্যন্তরীণ অঙ্গকারের ন্যায়, (যার এক কারণ সম্মুদ্রের গভীরতা, তদুপরি) তাকে (অর্থাৎ সম্মুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ দেকে রেখেছে (তরঙ্গও একা নয়, বরং) তার (তরঙ্গের) উপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার উপর কাল ঘেষ আছে, যদরূপ তারকা ইত্যাদির আলোও পৌছে না। মোটকথা) উপর-নীচে অনেক অঙ্গকারই অঙ্গকার। যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সম্মুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় অঙ্গীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সংকর্মকে পরকালের পুঁজি ঘনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না—একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অঙ্গীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা তাদের ঘনে থাকতে পারে। মোটকথা, তাদের কাছে অঙ্গকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। সম্মুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। না দেখা যাওয়ার

ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রতিশের মধ্যে হাত নিকটতম। এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই যথন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিশের কথা বলাই বাহ্যিক। অতঃপর এই কাফিরদের অঙ্গকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ তা'আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না।

আলুম্বিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতকে আলিয়গণ ‘নূরের আয়াত’ বলে থাকেন। কেননা, একে ঈমানের নূর ও কুফরের অঙ্গকারকে বিস্তারিত দৃষ্টিক্ষেত্র দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

الظاهر بنفسه والمظاهر لغيره ৪
অর্থাৎ যে বল্ল নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের ক্রিয় তার বিগ্রহাতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে ক্রিয় প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, ‘নূর’ শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা'র সন্তান জন্মে প্রযোজ্য ময়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজ্ঞাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াত আল্লাহ তা'আলা'র সন্তান জন্মে ব্যবহৃত ‘নূর’ শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে ‘মূলাওয়ের’ অর্থাৎ উজ্জ্বল দানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে ‘নূর’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে ‘দান’ বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেওয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা' নভোমগ্নি, ভূমগ্নি ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টি জীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হ্যরত ইবনে আবিস থেকে এর তফসীর একপ বর্ণনা করেছেন : ﴿أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِأَفْلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

মু'মিনের নূর ৪ : مَنْ تُبَرِّئُهُ كُشْكُرِيَّةً
আলোচ্য আয়াতের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা'র যে নূর-হিদায়াত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টিক্ষেত্র। ইবনে-জারীর হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فتضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض فبذا بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابى بن كعب يقرأها مثل نور من امن به -

অর্থাৎ—এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টিক্ষেত্র, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কোরআনের নূরে-হিদায়াত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন

مَثْلُ نُورٍ أَنَّ بِنْزُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
অতঃপর মু'মিনের অন্তরের নূর উঞ্জেখ করেছেন উবাই ইবনে কাব এই আয়াতের কিরাতও مَثْلُ نُورٍ مَّنْ أَمْنَى بِهِ
পড়তেন। সাইদ ইবনে জুবায়র এই কিরাত এবং আয়াতের এই অর্থ হ্যরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন : مَثْلُ
নুরٍ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দুর্বকম উক্তি
আছে। এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই
যে, আল্লাহর নূরে-হিদায়াত, যা মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তাৰা দৃষ্টান্ত
এটা হ্যরত ইবনে আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো
হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে,
মু'মিনের বক্ষ একটি তাকের ঘত এবং এতে তার অঙ্গের একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে
স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মু'মিনের ব্যভাবে
গঞ্জিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে প্রহণ করা। যয়তুন তৈল রাখা
নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে
বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-ক্রিয়া ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে
মু'মিনের অন্তরে সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা
গুরু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নুরু এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময়
মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় না ; বরং প্রত্যেক
মানুষের মজ্জায় ব্যভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক
জাতি, প্রত্যেক ভূগুণ এবং প্রত্যেক ধর্মাবলীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর
অস্তিত্ব ও তার মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন
করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় ঘত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে
প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের
ব্যভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বেই অবীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা
হয়েছে, كُل مُسْلِمٍ يَوْلُدُ عَلَى الْفَطْرَةِ
এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে আন্ত পথে পরিচালিত করে।
এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত। ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে
সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে
প্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়সব্র ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে
ওহীর জ্ঞান পৌছে, তখন তারা সহজেই তা প্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত
কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুর্কর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা
হয়েছে, যাতে ভূমগ্ন ও ভূমগ্নের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মু'মিন ও কাফিরেরও
প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : يَعْلَمُ اللَّهُ لَنْ يُنْهَى مَنْ شَاءَ
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার
শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয় ; বরং

এর সম্পর্ক কোরআনের নুরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর
পক্ষ থেকে তাওফিক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুনা আল্লাহর তাওফিক ছাড়া
মানবের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন :

اذا لم يكن عون من الله للفتن

فأول من يحيى عليه اجتهاده

অর্ধাং আল্লাহুর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উন্টা তার জন্ম ক্ষতিকর হয়।

ନବୀ କରୀମ (ସା)-ଏର ନୂର : ଇମାମ ବଗଭୀ ବଣିତ ଏକ ରେଓୟାହେତେ ଆହେ, ଏକବାର ହୟରତ ଇବନେ ଆକ୍ରମକ କା'ବ ଆହିବାରକେ ଜିଙ୍ଗେସ କରଲେନ : ଏହି ଆଯାତେର ତଫ୍ସିରେ ଆପଣି କି ବଲେନଃ କା'ବ ଆହିବାର ତତ୍ତ୍ଵାତ ଓ ଇନ୍ଡିଲେ ସୁପତ୍ତିତ ମୁସଲମାନ ଛିଲେନ । ତିନି ବଲେନ : ଏଟା ରାସ୍ତୁଲ୍ଲାହ (ସା)-ଏର ପରିତ୍ର ଅନ୍ତରେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଯିଶକାତ ତଥା ତାକ ମାନେ ତୀର ବକ୍ଷଦେଶ, ز جان ; ତଥା କାଚପାତ୍ର ମାନେ ତୀର ପୃତ ପରିତ୍ର ଅନ୍ତର ଏବଂ مسباع ତଥା ଅନ୍ତିମ ମାନେ ନବୁଯତ । ଏହି ନବୁଯତକୁଣ୍ଡଳୀ-ନୂରେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହି ଯେ, ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଘୋଷିତ ହେଯାର ପୂର୍ବେଇ ଏତେ ଯାନ୍ବଯମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ୟ ଆଲୋ ଓ ଉଞ୍ଜଳ୍ୟ ଛିଲ । ଏରପର ଓହି ଓ ଘୋଷଣା ଏର ସାଥେ ସଂୟୁକ୍ତ ହଲେ ଏଟା ଏମନ ନୂରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୟ, ଯା ସମ୍ବନ୍ଧକେ ଆଲୋକୋଞ୍ଜଳ କରେ ଦେଯ ।

ରାମୁଣ୍ଗାହ (ସା)- ଏଇ ନବୁଯତ ପ୍ରକାଶ ବରଂ ତା'ର ଜନୋର ପୂର୍ବେ ତା'ର ନବୁଯତର ସୁସଂବାଦବାହି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ପୃଥିବୀତେ ସଂଘଟିତ ହେଁଯେଛେ । ହାଦୀସବିଦଗଣେର ପରିଭାଷାଯ ଏଇବ ଘଟନାକେ ‘ଏରହାସାତ’ ବଲା ହୟ । କେନନା, ‘ମୁ’ଜିହା’ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷଭାବେ ଏମନ ଘଟନାବଳୀ ବୁଝାବାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହୟ, ଯେଉଁଲୋ ନବୁଯତର ଦାବିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ପଞ୍ଚ ଥେକେ କୋନ ପଯଗସ୍ତରେର ହାତେ ପ୍ରକାଶିତ ହୟ । ପଞ୍ଚଭାବରେ ନବୁଯତ ଦାବିର ପୂର୍ବେ ଏକ ଧରନେର ଅତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ପ୍ରକାଶ ପେଲେ ତାକେ ନାମ ଦେଓଯା ହୟ ‘ଏରହାସାତ’ । ଏ ଧରନେର ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟନା ସହିତ ହାଦୀସ ଦାରା ପ୍ରମାଣିତ ଆଛେ । ଶାୟିଥ ଜାଲାଲୁଦ୍ଦୀନ ସୁହୂତୀ ‘ଆସାଯେସେ-କୋବରା’ ଥାଏ, ଆବୁ ନାୟିମ ‘ଦାଲାଯେଲେ ନବୁଯତ’ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲିମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଘଟନା ସନ୍ନିବେଶିତ କରେଛେ । ଏ ହୁଲେ ତକ୍ଷସୀରେ ମାଯହାରୀତେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଯେଛେ ।

যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য : এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তুন ও যয়তুন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আশিমগং বলেন : আল্লাহু তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রয়েছেন। একে ধূমীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে ঝুঁটির সাথে ব্যঙ্গনের হুলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না—আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে শালিষণ কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।—(মাযহারী)

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكُر فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ -

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অস্তরে নিজের নূরে-হিদায়াত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন : এই নূর দ্বারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা চান ও তওকীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামায়ের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়—সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে; যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী **فِي بَيْوُتٍ** এর সম্পর্ক **بَيْوُمٍ** বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক **بَيْسِبْعٍ** উহু শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী **بَيْسِبْعٍ** শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উভয় মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার নূরে-হিদায়াত পাওয়ার স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ : আল্লাহ্ ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব : কুরআনী একেই অধ্যাধিকার দিয়েছেন এবং প্রাণ হিসেবে ইয়রত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

من أحب الله عز وجل فليحببني ومن أحببني فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها اقربة الله اذن الله في رفعها ورباك فيها ميمونة ميمونة أهلها محفوظة محفوظ اهلها هم في صلاتهم والله عز وجل في حوالتهم هم في المساجد ذا الله من ورائهم -

—যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মহবত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহবত করে। যে আমার সাথে মহবত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহবত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহবত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহবত করে। যে কোরআনের সাথে মহবত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহবত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহ্ তা'আলা ঘর। আল্লাহ্ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও আল্লাহ্ তা'আলা হিফায়তে থাকে। যারা নামাযে মশতুল হয়, আল্লাহ্ তাদের কার্যোক্তার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা পচাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফায়ত করেন।—(কুরআনী)

অর্থ অনুমতি এর অর্থ : **أَنْ** **الله أَنْ تُرْفَعْ**—**أَنْ** **شَكْرِي** থেকে উদ্ভৃত। অর্থ অনুমতি রفع মসজিদ দেওয়া। অর্থ উচ্চ করা, সর্বান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার

মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হ্যরত ইবনে আবাস বলেন : উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

ইকরামা ও মুজাহিদ বলেন : رفع بـلـه مـسـجـيـد نـিـরـمـاـن بـুـخـাـنـوـ হয়েছে : যেমন কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে : أَرْفِعْ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رفع أَرْفِعْ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رفع مساجد : বলে ভিত্তি নির্মাণ বুখানো হয়েছে। হ্যরত হাসান বসরী বলেন : رفع مـسـاجـد رفع مـسـاجـد : বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইয়ত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুখানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে মসজিদে কোন নাপাকী আমা হলে মসজিদ এমন কৃত্তিত হয়, যেমন আগুনের সংশ্রে মানুষের চামড়া কৃত্তিত হয়। হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উচ্চি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জানাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।—(ইবনে মাজাহ)

হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বাসগ্রহের মধ্যে মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্য আদেশ করেছেন।—(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, ترْفِع شَدَّدَهُ الرَّبِيعِيِّ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই দাখিল আছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গঞ্জযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) রসুন ও পিয়াজ থেয়ে মুখ না ধূয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস প্রস্তুসমূহে এ কথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, ছক্কা, পান, তায়াক থেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্দুপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গঞ্জযুক্ত কেরোসিন তেল জ্বালানোও ডেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হ্যরত ফাতেম বলেন : আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিয়াজের দুর্গঞ্জ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন : যে ব্যক্তি রসুন-পিয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে থায়, যাতে দুর্গঞ্জ নষ্ট হয়ে যায়। এই হাদীসের আলোকে ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয় তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া।

এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হ্যরত উসমান (রা) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃক্ষ করেছিলেন এবং হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহুরা তো মসজিদ নির্মাণে

অটেল অর্থকভি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খিলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিধ্যমান আছে। ইমাম আয়ম আবু হানীফার মতে যদি নাম-ঘশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরয়, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষয়ীলত : আবু দাউদে হ্যরত আবু উমামার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে ওয় করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহরাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওয় করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়ীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের যাবধানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হ্যরত বুরায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যারা অঙ্ককারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।—(মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে হ্যরত আবু হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : পুরুষের নামায জামা'আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ শুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উস্তুরুপে সুন্নাত অনুযায়ী ওয় করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃক্ষি পায় এবং একটি গুলাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে—ইয়া আল্লাহ, তার প্রতি রহমত নামিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওয় না ভাঙ্গে। হ্যরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অস্তরে নস্তুতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহ নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহর ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে একেপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিবিস্তুত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হ্যরত আবু দারদা তাঁর পুত্রের উপদেশছলে বলেন : তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুস্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিশ্বাদার হয়ে যান। আবু সাদেক ইজদী উভায়ব ইবনে হারহাবের জামে এক পত্র লিখেছেন : মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে দুনিয়ার ও তার মহৱতের কথাবার্তা

বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার নেই।

হ্যরত সাইদ ইবনে মুসাইয়ের বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বলল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না করা তার দায়িত্ব।—(কুরতুবী)

মসজিদের পনরটি আদব : আলিমগণ মসজিদের পনরটি আদব উল্লেখ করেছেন। (১) মসজিদে পৌছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে আসْلَمْ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسَاجِنِينَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দুরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাআত তাহিয়াতুল-মসজিদ নামায পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য মাকরাহ সময় না হয়: অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোজ বস্তুর তলাশী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্থানে কথা না বলা। (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না করা। (৯) যেখানে কাতারে পুরোপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। (১০) নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে খুঁশু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্নাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনরটি আদব লিখার পর বলেন : যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাণ পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিকায়ত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সৱলিত ‘আদাবুল মাসাজিদ’ শিরোনামে একটি পৃষ্ঠক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তফসীরে-বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন : কোরআনের ফিয়ুত শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওরায়-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সন্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اللّٰهُ أَكْبَرُ بِأَنَّ رَبَّهُ أَكْبَرُ شৈলের বিশেষ রহস্য : তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে প্রান্তির শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে حكم ও শব্দের পরিবর্তে প্রান্তির শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি ? কল্পনা মানীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মতি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

—এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসনা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বুকানো হয়েছে।

—**رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** — যেসব মু'মিন আল্লাহ তা'আলার নূরে-হিদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে **رِجَالٌ** শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য গৃহে নামায পড়া উচ্চম।

মুসলিমদের আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উষ্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : خير مساجد النساء قعرا بيتهن : অর্থাৎ নারীদের উচ্চম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অক্ষকার প্রকোষ্ঠ। আয়তে সংক্ষর্পণায়ণ মু'মিনদের শুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তিজারতের অর্থ ক্রয় এবং بَيْع শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এক্ষণ্প বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক শব্দ। এর উপকারিতা ও মূলাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বন্ধু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা ভার্তক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় মু'মিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন : এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন : একদিন আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বক করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন : এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْيَعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ও ঘন করার সময় আয়ানের শব্দ ঝন্তিগোচর ছিল তিনি দাঢ়িপালা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি ধারার সময় আয়ানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁদের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি ধারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসনয়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। —(কুরুতুবী)

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে

বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা, আল্লাহর স্বরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই শুণ হতে পারে। নজুবা একথা বলা অনর্থক হবে।—(রহল মা'আনী)

إِنَّمَا يُخَافُونَ يُؤْمِنُونَ تَقْبِلُهُمْ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ
গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর যিকর, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও উৎসুন্দি হয়ে যায় না ; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হিদায়াতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পুরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে،
وَرَبُّكُمْ مَنْ فَحَشَّ وَرَبُّكُمْ مَنْ فَرَدَّهُمْ مِنْ فَحْشَهُمْ
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন আইনের অধীন নন এবং
তার ভাষারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম রূপী দান করবেন। এ গৰ্যস্ত যেসব সৎকর্মপূর্ণ মু'মিনের বক্ষ নূরে হিদায়াতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়াতকে ধ্রুণ করে, সেই সব মু'মিনের আঙ্গোচনা ছিল। অতঃপর
সেই সব কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তা'আলা নূরে-হিদায়াতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে উজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে
পৌছল না, তখন তারা তা অঙ্গীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল
অঙ্গকারেই রায়ে গেল। তারা কাফির ও অঙ্গীকারকারী—এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই
দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, কাফিররা নূরে-হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের
প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত মূরক্কেও বিজীবন করে দিয়েছে। আল্লাহর নূর কোথায়
পাবে ?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই
কেউ জ্ঞানী ও শুণী হয়ে যায় না ; বরং এটা নিরেট আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক
মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও স্বেচ্ছবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অসম্ভু
জ্ঞানী ও চক্ষুয়ান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে
অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেশেক্ষ
ও মূর্খ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

الْعِزْلَةُ إِنَّ اللَّهَ يُسِّعُ لَهُ مَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّيرَاصْفَتُ دُكْلَ قَدْ

عِلْمَ صَلَاتِهِ وَنَسِيْحَهُ طَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑤ وَلِلَّهِ مَلْكُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْبَصِيرُ ⑥ الْمُرْقَانَ اللَّهُ يَرْبِّي سَعَابِمَ يَوْلِفُ بِيْهِ ثَمَ

يَجْعَلُهُ كَمَا فَتَرَى الْوَدْقَ يُخْرُجُ مِنْ خَلْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
 فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصَبِّبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرُّ فَهُوَ عَنْ مَنْ يَشَاءُ طَيْكَادُ
 سَنَابِرِ قَهْيَدْ هَبْ بِالْأَبْصَارِ ۝ يُقْلِبُ اللَّهُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لِعِبْرَةٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۝ فِيهِمْ مَنْ يَمْشِي
 عَلَى بُطْنِهِ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ
 يَغْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَقِيرٌ ۝

(৪১) তুমি কি দেখ না বে, নভোমগল ও ভূমগলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? এত্যেকেই তার যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্ম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমগল ও ভূমগলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না বে, আল্লাহ মেষমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে তরে তরে ঢাকেন; অতঃপর তুমি দেখ বে, তার অধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা ধারা যাকে ইল্লা আবাত করেন এবং ধার কাহ থেকে ইল্লা, তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎবলক দৃষ্টিশক্তি বেন বিশীন করে দিতে চায়। (৪৪) আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অস্তর্দৃষ্টিসম্পর্গণের জন্য চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ এত্যেক চলাত জীবকে পানি ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক শুকে তর দিয়ে চলে, কতক সুই পায়ে তর দিয়ে চলে এবং কতক চার পারে তর দিয়ে চলে, আল্লাহ বা ইল্লা সৃষ্টি করেন। নিচয়ই আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জ্ব. সর্বেবিত্ব বাস্তি) তোমার কি (প্রয়াণাদি ও চাকুর অভিজ্ঞতা ধারা) জানা নেই যে, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে যাঁ কিছু আছে নভোমগলে ও ভূমগলে? (উকিগতভাবে হোক, যেমন কোন কোন সৃষ্টি জীবের অধ্যে তা পরিস্থিতি হয় অথবা অবস্থাগতভাবে হোক, যেমন সব সৃষ্টি জীবের অধ্যে তা বিবেক-বৃক্ষের মাধ্যমে জানা আছে) এবং বিশেষভাবে পক্ষীকুল (শ), যারা পাখা বিস্তার করে (উড়ীয়মান) আছে। (তারা আরও আচর্যজনকভাবে সৃষ্টিকর্তার অভিজ্ঞ বুঝায় তাদের দেহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা শুনে অবস্থান করে) প্রত্যেকেরই (অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষীরই) নিজ নিজ দোয়া (এবং আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয়)

এবং তসবীহ (ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি ইলহাম দ্বারা) জানা আছে (এসব প্রমাণ জানা সত্ত্বেও কেউ কেউ তাওহীদ বীকার করে না। অতএব) তারা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহু সম্যক জ্ঞাত আছেন। (এই অম্যান্তার কারণে তাদেরকে শান্তি দেবেন) আল্লাহু তা'আলারই রাজত্ব নভোমগুলে ও ভূমগুলে (খ্রিস্ট) এবং (পরিশেষে) আল্লাহুর দিকেই (সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (তবনও সর্বময় বিচার-ক্ষমতা তাঁরই হবে। সে যতে রাজত্বের একটি প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হচ্ছে হে সর্বোধিত ব্যক্তি) তুমি কি জান না যে, আল্লাহু তা'আলা (একটি) মেঘখণ্ডকে (অন্য মেঘখণ্ডের দিকে) সঞ্চালিত করেন, অতঃপর সেই মেঘখণ্ডকে (অর্থাৎ তার সমষ্টিকে) পরম্পরে মিলিয়ে দেন, এরপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, অতঃপর তুমি দেখ যে, তার (মেঘমালার) মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি মেঘমালা থেকে অর্থাৎ তার বিরাট স্তুপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যাকে (অর্থাৎ যার প্রাণ অথবা মালকে) ইচ্ছা আবাত করেন (ফলে তার ক্ষতি হয়ে যায়) এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে নেন (এবং তার জ্ঞান ও মালকে বাঁচিয়ে দেন। সেই মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎও সৃষ্টি হয়, এমন চোখ বলসানো যে) তার বিদ্যুৎবলক যেন দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায় (এটাও আল্লাহু তা'আলার অন্যতম ক্ষমতা)। আল্লাহু তা'আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান (এটাও তাঁর অন্যতম ক্ষমতা)। এতে (অর্থাৎ এর সমষ্টি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য প্রয়াণ আছে। (যদ্বারা তাওহীদ ও ^{لَمْ يُمْكِن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করে। এটাও আল্লাহু তা'আলারই ক্ষমতা যে) আল্লাহু প্রত্যেক চলত জীবকে (স্থলের হোক কিংবা জলের) পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে (যেমন সর্প, মাছ) কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন মানুষ ও উপবিষ্ট পার্থী) এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে (যেমন চতুর্পদ জল)। এমনভাবে কতক আরো বেশির উপরও ভর দিয়ে চলে। আসল কথা এই যে আল্লাহু তা'আলা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিচয় আল্লাহু সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান (তাঁর জন্য কিছুই কঠিন নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়:

—**কُلْ قَدْلَعْ مَلَانَ وَتَسْبِيْحَ**—আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেকে সৃষ্টি বস্তু আল্লাহু তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশাশুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হয়রত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহু তা'আলা পথিবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, যমীন চন্দ্ৰ-সূর্য, প্রহৃ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপ্ত আছে—এর চূল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যাকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত—উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে তারা আল্লাহু তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বত্রোচ্চ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপ্ত আছে।

যামাখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : এটা অবাস্তুর নয় যে, আল্লাহু তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বৌধশক্তি ও চেতনা নিহিত রয়েছেন, যদ্বারা সে তার স্মৃষ্টি ও প্রস্তুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৫৪

বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশ্শুল থাকে। ۱۰۸ ﴿كُلُّ فَدْعٍ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ﴾ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তসবীহ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ব্যাপ্ত আছে ; কিন্তু প্রত্যেকের নামায ও তসবীহ পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্দিদ অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতি ও ভিন্ন রূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্তুর সংর্ঘন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ۱۰۹ ﴿أَعْطَلِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تُمْ هُنْدِي﴾ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপ্ত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পূর্ণ করে আসছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিঞ্চালদের চিঞ্চা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে কেবল আচর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেবল কোশল অবলম্বন করে।

— من السباء من جبال فيها —
এবং মানে জিবাল মেঘমালা —
— بـ—
এর অর্থ শিলা ।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ بِيَوْمٍ مِّنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝
وَيَقُولُونَ أَمْتَابَ اللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعَنُاهُمْ يَتَوَلَّ فِرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ
بَعْدِ ذَلِكَ ۝ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لِيُحَكَمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرِيقٌ مِّنْهُمْ مَعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مِنْ عِنْدِنِ ۝ أَفَقُلُوْهُمْ مَرْضٌ أَمْ أَرَاتُ أَبُوكُمْ أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ يَحِيفَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ طَبِيلٌ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُحَكَمْ بَيْنَهُمْ أَفَيْقُولُوا سَمِعُنَا وَأَطْعَنُنا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَقْتَلُهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَابِرُونَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمْرَتْهُمْ لِيُخْرِجُنَّ
قَلْلًا لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً ۝ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ قَلْ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حِيلَ وَعَلَيْكُمْ
مَا حِيلَتُمْ وَإِنْ تَطِيعُوهُ تُهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ④৪

(৪৬) আমি তো সুন্দর আয়াতসমূহ অবঙ্গীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে : আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি ; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের পক্ষে হলো তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে রোগ আছে, না তারা ধোকায় পড়ে আছে ; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ? বরং তারাই তো অবিচারকারী। (৫১) ঝুঁমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকারী। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, আগনি তাদেরকে আদেশ করলে তাঁরা সবকিছু হেঁড়ে বের হবেই। বলুন : তোমরা কসম খেয়ো না। নিয়মানুস্থানী তোমাদের আনুগত্য। তোমরা যা কিছু কর নিচ্ছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত। (৫৪) বলুন : আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুন্দরুপে পৌছিয়ে দেওয়া।

তফসীরের সাম্র-সংক্ষেপ

আমি (সত্যকে) বুরানোর প্রমাণাদি (ব্যাপক হিদায়াতের জন্য) অবঙ্গীর্ণ করেছি। সাধারণের মধ্য হতে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎ পথের দিকে (বিশেষ) হিদায়াত করেন। (ফলে সে আল্লাহর জ্ঞাতব্য হক অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং কার্যগত হক অর্থাৎ ইবাদত পালন করে। নতুরা অনেকেই বিষ্ণিত থাকে।) মুনাফিকরা (মুখে) দাবি করে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং (আল্লাহ্ ও রাসূলে) আদেশ (মনে-প্রাণে) মানি। এরপর (যখন কর্মের মাধ্যমে দাবি প্রমাণের সময় আসল, তখন) তাদের একদল (যারা খুবই পাপিষ্ঠ, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ তাদের কাছে যখন কারণ প্রাপ্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং প্রাপক সেই মুনাফিককে বলে যে, চল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বিচার নিয়ে যাই, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কেননা, সে জানে যে, তাঁর এজেন্সে ইক প্রমাণিত হলো তিনি তার পক্ষেই ফয়সালা দেবেন। পরবর্তী (৫৩) আয়াতে এর একপ বর্ণনাই উল্লিখিত হয়েছে। সকল মুনাফিকই

এরপ ছিল, এতদসত্ত্বেও বিশেষভাবে এক দলের কথা বলার কারণ এই যে, গরীব মূলাফিকরা আন্তরিক অনিষ্টাসত্ত্বেও পরিকার অঙ্গীকার করার দুঃসাহস করতে পারত না। যারা প্রভাবশালী ও শক্তিমান, তারাই এ কাজ করত। তারা মোটেই ইমানদার নয়। (অর্থাৎ কোন মূলাফিকের অন্তরেই ইমান নেই; কিন্তু তাদের বাহ্যিক কৃতিম ইমানও নেই; যেমন এক আয়াতে আছে, *فَلَمْ يَأْتُوكُمْ كُلُّ الظُّفَرِ وَكُلُّ رُوْبَرِ* অর্থাৎ *فَلَمْ يَأْتُوكُمْ كُلُّ أَسْلَمِيْمْ* অর্থাৎ তাদের এই আদেশ সংঘনের বর্ণনা এই যে) তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, যাতে রাসূল তাদের (ও তাদের প্রতিপক্ষের) মধ্যে ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল (সেখানে যেতে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং তালবাহনা করে)। এই আহবান রাসূলের দিকেই করা হয়; কিন্তু রাসূল যেহেতু আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন, তাই আল্লাহর দিকেও আহবান করা হয় বলা হয়েছে। মেটকথা, তাদের কাছে কারও হক প্রাপ্য হলে তারা এরপ করে) আর যদি (ঘটনাক্রমে) তাদের হক এক (অন্যের কাছে) থাকে, তবে তারা বিনয়বন্ত হয়ে (নির্ধায় তাঁর ডাকে তাঁর কাছে ছুটে আসে)। কারণ, তারা নিশ্চিত যে, সেখানে সত্য ফয়সালা হবে। এতে তাদের উপকার হবে। অতঃপর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও উপস্থিত না হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি সংজ্ঞনা উল্লেখ করে সবগুলোকে বাস্তিল ও একটিকে সপ্রমাণ করা হয়েছে) কি (এই সুখ ফিরিয়ে নেয়ার কারণ এই যে) তাদের অন্তরে (নিশ্চিত কুফরের) রোগ আছে (অর্থাৎ তারা নিশ্চিত যে, আপনি আল্লাহর রাসূল নন) না তারা (নবুয়াতের ব্যাপারে) সন্দেহে পাতিত আছে, (অর্থাৎ রাসূল না হওয়ার বিশ্বাস তো নেই; কিন্তু রাসূল হওয়ারও বিশ্বাস নেই) না তারা আশংকা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি ঘৃণুম করবেন (এবং তাদের কাছে যে হক প্রাপ্য, তার চাইতে বেশি দিতে বলবেন। বাস্তব ঘটনা এই যে, এগুলোর মধ্যে একটিও কারণ নয়) বরং (আসল কারণ এই যে) তারাই (এসব মোকদ্দমায়) অন্যায়কারী। (তাই রাসূলের দরবারে মোকদ্দমা আনতে রাজী হয় না। এছাড়া পূর্ববর্তী সব কারণ অনুপস্থিত)। মুসলমানদের (অবস্থাও তাদের) উক্তি যে, যখন তাদের (কোন মোকদ্দমায়) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো (হচ্ছিলে) একথাই বলে : আমরা (তোমার কথা) শুনলাম এবং যেনে নিলাম। (এরপর তৎক্ষণাত্মে চলে যায়) এটা এরই আলামত, যে তাদের *أَنْفَانِ* ও *أَنْفَاتِ* বলা দুনিয়াতেও সত্য।) তারাই (পরকালেও) সফলকাম। (আমার নিকট তো সামগ্রিক নীতি এই যে) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম হবে। (এটাও মূলাফিকদের অবস্থা যে) তারা দৃঢ়ভাবে কসম খায় যে, (আমরা এমন অনুগত যে) যদি আপনি তাদেরকে (অর্থাৎ আমাদেরকে) আদেশ করেন (যে, বাড়িঘর ছেড়ে দাও) তবে তারা (অর্থাৎ আমরা) এখনি (সব ত্যাগ করে) বের হব। আপনি বলে দিন : তোমরা কসম থেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের স্বত্ত্বপ জানা আছে। (কেননা) আল্লাহ তাঁ'আলা তোমারে কাজকর্মের পূর্ণ খবর রাখেন। (তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন : যেমন অন্যত্র আছে *فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ* অর্থাৎ *فَلَمْ يُنْتَدِرُوا لَنْ تَنْعِمْ لَكُمْ* অর্থাৎ আপনি (তাদেরকে) বশুন : (কথায় শাস্তি হবে না, কাজ কর। অর্থাৎ) আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। (অতঃপর আল্লাহ তাঁ'আলা শুরুত্বদানের জন্য বয়ং তাদেরকে

সর্বোধন করেন যে, রাসূলের এই আদেশ ও প্রচারের পর) পুনরায় যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মনে রেখ (যে, এতে রাসূলের কোন ক্ষতি নেই, কেননা) রাসূলের দায়িত্ব প্রচার, যা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে (তিনি তা সম্পর্ক করে দায়িত্বমূক হয়ে গেছেন) এবং তোমাদের দায়িত্ব তা (অর্থাৎ আনুগত্য করা) যা তোমাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। (তোমরা তা পালন করনি। সুতরাং ক্ষতি তোমাদেরই হবে) যদি (মুখ না ফিরাও, বরং) তাঁর আনুগত্য কর (যা আল্লাহরই আনুগত্য) তবে সৎ পথ পাবে। (মোটকথা) রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেয়া (এরপর কবূল করলে কি না তা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে)।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ

ଆଲୋଚ୍ୟ ଆସାନ୍ତ ବିଶେଷ ଘଟନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଯେଛେ । ତାବାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଘଟନା ବର୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବଳେନ ୩ ବିଶର ନାମକ ଜନେକ ମୂଳାଫିକ ଓ ଏକ ଇହୁଦୀର ମଧ୍ୟେ ଯମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କଲହ-ବିବାଦ ଛିଲ । ଇହୁଦୀ ତାକେ ବଳଳ ୩ ଚଲ, ତୋମାଦେଇ ରାସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଏର ମୀମାଂସା କରିଯେ ନିଇ । ମୂଳାଫିକ ବିଶର ଅନ୍ୟାଯେର ଉପର ଛିଲ । ସେ ଜାନନ୍ତ ଯେ, ରାସ୍ତ୍ରଭାବ (ସା)-ଏର ଏଜଲାସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଗେଲେ ତିନି ନ୍ୟାୟବିଚାର କରବେଳେ ଏବଂ ସେ ହେବେ ଥାବେ । କାଜେଇ ସେ ଅସ୍ଵିକାର କରଲ ଏବଂ ରାସ୍ତ୍ରଭାବ (ସା)-ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ କା'ବ ଇବନେ ଆଶରାଫ ଇହୁଦୀର କାଛେ ମୋକଦ୍ଦମା ନିଯେ ଯେତେ ବଳଳ । ଏର ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆସାନ୍ତମୁହଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଯା ।

— وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَقْنَعُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۚ ۲۷
আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সেই দুনিয়া ও আবিরাতে সফলকাম।

একটি আচর্য ঘটনা : তফসীরে-কুরআনীতে এ স্থলে হ্যরত ফারানকে আয়মের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য মুক্ত ওঠে। হ্যরত ফারানকে আয়ম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডয়ন ছিলেন। হঠাৎ জনেক কন্যার প্রায় ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল :

—أَشْهُدُ أَنَّ رَبِّيَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ—হয়রত ফারুকে আযম জিজ্ঞেস করলেন :
ব্যাপার কি ? সে বলল : আমি আল্লাহ'র শুয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হয়রত ফারুক
জিজ্ঞেস করলেন : এর কোন কারণ আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, আমি তওরাত, ইনজীল,
যব্রু ও পূর্ববর্তী প্রয়গস্বরগণের অনেক প্রস্তু পাঠ করেছি। কিন্তু সপ্তাতি জনৈক মুসলমান
কয়েদীর মুখে একটি আয়াত তনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত
প্রাচীন ধর্মের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে,
এটা আল্লাহ'র পক্ষ থেকেই আগত। ফারুকে আযম জিজ্ঞেস করলেন : আয়াতটি কি ?
রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তিলাওয়াত কুরল এবং সাথে সাথে তার অভিনব
তফসীরও বর্ণনা করল যে, اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بِالْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
আল্লাহ'র কৰয কার্যাদির সাথে, وَرَسُولُهُ
সুন্নাতের সাথে, وَتَفْقِيْهُ
অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَعْلَمُ
ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক
সংশ্করণের সাথে, وَيَعْلَمُ
রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে আন্দোলনের মুক্তি ও
আন্দোলনের স্থান পায়। ফারুকে আযম একথা তনে বললেন : রাসূলে করীম (সা)-এর কথায়

এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : **অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সুদূরপশ্চারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিণ এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।—(কুরআনী)**

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُسْتَخْلَفُوكُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُوَ لَيْكُمْ بِئْنَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى
 لَهُمْ وَلَبِدَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا طَيِّبًا وَنِعْمَةً لَا يُشَرِّكُونَ بِإِيمَانِهِمْ
 وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ⑩ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا
 الرُّكُوْةَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑪ لَا تَحْسِبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۝ وَمَا وَهُمْ بِالنَّارِ طَوِيلِيْسَ الْمُصِيرِ ⑫

(৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস হাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃ দান করবেন যেমন তিনি শাসনকর্তৃ দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ঙ্গিতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (৫৬) নামায কাহেম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী যন্তে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কত নিকৃষ্ট না এই প্রভ্যাবর্তনস্থল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সফল উপর) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নূরে-হিদায়াতের পুরোপুরি অনুসরণ করে।) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রূতি দেন যে, তাদেরকে (এই অনুসরণের কল্যাণে) পৃথিবীতে রাজত্ব দান করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তী (হিদায়াত প্রাণ) লোকদেরকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। (উদাহরণত বনী-ইসরাইলকে ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবর্তীদের উপর প্রবল করেছিলেন। এরপর শাম দেশে আমালেকার ন্যায় দুর্বৰ্ষ জাতির উপর তাদেরকে আধিগত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও শাম দেশের শাসনকর্ত্ত্বের উত্তরাধিকারী করেছিলেন।) আর (এই রাজত্ব দান করার উদ্দেশ্য এই যে) তিনি যে ধর্মকে তাদের জন্য পছন্দ করেছেন (অর্থাৎ ইসলাম; যেমন অন্য আয়াতে আছে (رَضِيَتْ لَهُمُ الْإِسْلَامُ بِنَا) তাকে তাদের (পরাকালীন উপকারে) জন্য

শক্তিশালী করবেন এবং (শক্রদের তরফ থেকে তাদের যে হাতাহিক ভয়ঙ্গিতি) তাদের ভয়ঙ্গিতির পর তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এই শর্তে যে, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন প্রকার শিরক করবে না। (প্রকাশও নয় অপ্রকাশও নয়, যাকে রিয়া বলা হয়) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই প্রতিশ্রূতি ধর্মের উপর পূর্ণরূপে কার্যম থাকার শর্তাদীন। এই প্রতিশ্রূতি তো দুনিয়ার জন্য। পরকালে ঈমান ও সৎ কর্মের কারণে যে মহান প্রতিদান ও চিরস্তন সুখ-শাস্তির প্রতিশ্রূতি আছে, সেটা তিনি।) যে ব্যক্তি এরপর (অর্থাৎ এই প্রতিশ্রূতি জাহির হওয়ার পর) অকৃতজ্ঞ হবে, (অর্থাৎ ধর্ম বিরোধী পথ অবলম্বন করবে, তার জন্য এই প্রতিশ্রূতি নয়; কেননা) তারাই নাফরমান। (প্রতিশ্রূতি ছিল ফরমাবরদারদের জন্য। তাই তাদেরকে দুনিয়াতেও রাজত্ব দান করার প্রতিশ্রূতি দেয়া হয়নি এবং পরকালের শাস্তিও তিনি হবে। হে মুসলমানগণ, তোমরা যখন ঈমান ও সৎ কর্মের ইহলোকিক ও পারলোকিক উপকারিতা শুনেছ, তখন তোমাদের উচিত যে) তোমরা নামায কার্যম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (অবশিষ্ট বিধানাবলীতেও) রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি পূর্ণ অনুগ্রহ করা হয়। (এরপর কুফর ও অবাধ্যতার পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে সর্বোধিত ব্যক্তি) কাফিরদের সম্পর্কে একপ ধারণা করো না যে, পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে পলায়ন করবে এবং) আমাকে হারিয়ে দেবে (এবং আমার ক্ষেত্র থেকে বেঁচে যাবে। না, বরং তারা স্বয়ং হেরে যাবে এবং ক্ষেত্রের শিকার ও পরাভূত হবে। এটা দুনিয়ার পরিণাম। পরকালে) তাদের ঠিকানা দোয়খ। কত নিকৃষ্টই না এ ঠিকানা!

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শালে নুয়ুল : কুরআনুর আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ওই অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফির ও মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরিকদের আক্রমণের আশংকা বিদ্যশান ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে আরয় করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা নিরজ অবস্থায় শাস্তিতে ও সূখে বসবাস করব—একপ সময় কি কখনও আসবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : একপ সময় অতি সন্তুরই আসবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবর্তীণ হয়। —(কুরআনুর, বাহর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উল্লেখে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইনজালে দিয়েছিলেন। —(বাহরে-মুহীত)

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. আপনার উল্লতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবেং ৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে যে, তাদের অস্তরে শক্রর কোন ভয়ঙ্গিতি থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুর্ণময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, সমগ্র অয়রব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শয়াম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিয়িয়া কর আদায় করেন। রোম স্বার্ট হিরাকুরিস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার স্বার্ট মুকাউকিস, আস্তান ও আবিসিনিয়া স্বার্ট নাজাশী প্রমুখ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপটোকল প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইতিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্ধীক (রা) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ, (সা)-এর ওফাতের পর যে দক্ষ-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কৃতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্ধীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাতুবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাতুব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিলাঙ্গ করলেন যে, পম্যাস্বরণগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিষ্কৃত হয়। এরপর উসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহুওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলিমানদের অধিকারভূক্ত হয়। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন : আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উচ্চতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিষ্ঠিতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন।—(ইবনে কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। পর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খিলাফত হযরত আলী (রা) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

ইবনে কাসীর এ স্থলে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ভৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমার উচ্চতের কাজ অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত বারজন খলীফা থাকবেন। ইবনে কাসীর বলেন : এই হাদীসটি উচ্চতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিলে। এর বাস্তবায়ন জরুরী। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন ; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে একুশ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ হবেন হযরত মাহদী। রাফেয়ী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোন প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এটাও জরুরী নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শাস্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শাস্তির ওয়াদা ইমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্শ্বক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌক্ষিক বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোন ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও

সত্তার পরিনাম এই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিতির অংশ লাভ করেছেন। কোরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে। —**إِنْ حَرْبُ اللَّهِ مُّمْلِكُ الْعَالَمِينَ**— অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল ধাকবে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা খোলাফারে-রাশেদীনের বিলাফত ও আল্লাহর কাছে একবৃল হওয়ার প্রয়াণ : এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুরতের প্রয়াণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হ্বহ পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফারে রাশেদীনের খিলাফতের সত্ত্বা, বিপত্তি ও আল্লাহর কাছে একবৃল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিষ্ঠিত সীয় রাসূল ও উত্থতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিপত্তি সীকার করা না হয় ; যেহেন রাক্ষেপ্যীদের ধারণা অন্দুপই ; তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রতিষ্ঠিত হ্যরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌকুণ্ড বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও সাহ্মনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এই প্রতিষ্ঠিতিতেই সেই রাজত্ব বুবানো হয়েছে। নাউয়বিল্লাহ। সত্য এই যে, ইমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিষ্ঠিতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফারে-রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদীও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ইমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাটি আর বিদ্যমান নেই ; এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাণীয়ও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكُمْ فَالْفَاسِقُونَ— শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ইমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুবানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিষ্ঠিতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা দ্বিতীয় শক্তি, শাস্তি ও হিরণ্য লাভ করে এবং তাঁদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুকুর করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে একে প্রৱেশ লোকেরাই সীমালংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ইমানের শক্তি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হবে যায়। কুকুর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্য-বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ বিশুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই এই বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমান বৃক্ষী বলেন : তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হ্যরত উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। তাঁদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উপরিখিত নিয়ামতসমূহও ত্রাস পেয়ে যায়। তারা পারম্পরিক হত্যাক্ষেত্রের কারণে ভয় ও আসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরম্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগাড়ি নিজস্ব সনদ দ্বারা হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিমোত ভাষণ উদ্ভৃত করেছেন। তিনি হ্যরত উসমানের বিকলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই :

যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পদার্পণ করেন, সেইদিন থেকে আল্লাহর ক্ষেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হিকায়তে শশগুল আছে। যদি তোমরা মা'আরেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৫৫

উসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না । আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে বাস্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হত্য কর্তিত অবস্থায় হায়ির হবে, তার হাত থাকবে না । সাবধান, আল্লাহর তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে । আল্লাহর কসম, যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না । কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সতর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীজ্বাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয় । —(মযহারী) সেমতে হযরত উসমান গনীর হত্যার পর যে পারল্পরিক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে । হযরত উসমানের হত্যাকারীরা ধিলাফত ও খর্বীয় সংহতির ন্যায় নিয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাখেবী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা বুলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল । এই ঘটনা পরল্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদতের মর্মান্তিক দুঃঘটনা সংঘটিত হয় ।

سَلَّمَ اللَّهُ الْهَدَايَةُ وَشَكَرَ نِعْمَتَهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يُبْلِغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثَيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَثَ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ طَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ④
وَإِذَا بَلَغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلِيَسْتَأْذِنُوَا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ⑤ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ بِحَا حَاجَةً فَلِيُسْ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرُ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ ⑥

(৫৮) হে মু'মিনগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাণ বয়ক হয় নি তারা যেন তিনি সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রদণ করে, ফজরের নামায়ের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বন্ধ খুলে রাখ এবং এশার নামায়ের পর। এই তিনি সময় তোমাদের দেহ খোলার সময় ; এ সময়ের পক্ষ তোমাদের ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহু তোমাদের কাছে সুপ্রস্তুত আরাতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি ঠায়। এমনিভাবে আল্লাহু তাঁর আরাতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃক্ষ নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বন্ধ খুলে রাখে। তাদের জন্য দোষ নেই তবে এ থেকে বিরুদ্ধ থাকাই তাদের জন্য উভয়। আল্লাহু সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, (তোমাদের কাছে আসার জন্য) তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাণবয়ক হয়নি, তারা যেন তিনি সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি প্রদণ করে, (এক) ফজরের নামায়ের পূর্বে, (দুই) দুপুরে যখন তোমরা (নিদ্রার জন্য অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখ এবং (তিনি) এশার নামায়ের পর। এই তিনিটি সময় তোমাদের পর্দার সময় (অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই তিনিটি সময় একান্তবাস ও বিশ্রাম প্রাপ্তের সময়)। এতে মানুষ খোলাখুলি থাকতে চায়। একান্তে কোন সময় আবৃত অঙ্গও খুলে যায় অথবা প্রয়োজনে খোলা হয়। তাই নিজের দাসদাসী ও অপ্রাণবয়ক বালকদেরকে বুকাও, যাতে বিনা খবরে ও বিনানুমতিতে এ সময়ে তোমাদের কাছে না আসে। এ সময়গুলো ছাড়া (বিনানুমতিতে আসতে দেওয়ায় ও নিষেধ না করায়) তোমাদের কোন দোষ নেই। (কেননা) তোমাদেরকে একে অপরের কাছে তো বারংবার যাতায়াত করতেই হয়। (সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি চাওয়া কঠিন)। যেহেতু এটা পর্দার সময় নয়, তাই আবৃত অঙ্গ গোপন রোধ কঠিন নয়।) এমনিভাবে আল্লাহু তা'আলা তোমাদের কাছে বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বিদ্যুত করেন এবং আল্লাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যখন তোমাদের (অর্থাৎ মুক্তদের) বালকরা (যাদের বিধান উপরে বর্ণিত হয়েছে) বয়োপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সাবালক ও সাবালকত্তুর নিকটবর্তী হয়) তখন তারাও যেন (এমনিভাবে) অনুমতি প্রদণ করে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা (অর্থাৎ বয়োজ্জেষ্ঠরা) অনুমতি প্রদণ করে। এমনিভাবে আল্লাহু তোমাদের কাছে তাঁর বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহু সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (জানা উচিত যে, পর্দাক বিধানের কঠোরতা, অনর্থের অঙ্গুঠকার উপর ভিত্তিশীল। যেখানে স্বত্ত্বাবগতভাবে অনর্থের সংজ্ঞাবলা নেই ; উদারণত) বৃক্ষ-নারী যারা (কারণ সাথে) বিবাহের আশা রাখে না (অর্থাৎ আকর্ষণীয়া নয়—এটা বৃক্ষ হওয়ার ব্যাখ্যা)। এতে তাদের কোন শুনাই নেই যে, নিজ (অতিরিক্ত) বন্ধ (যদ্বারা মুখ ইত্যাদি আবৃত থাকে এবং তা গায়র-সাহৃদায়ের সম্মুখেও খুলে রাখে, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের ছানসমূহ) প্রকাশ না করে ; (যা মাহুরায় নয়, তা এমন ব্যক্তির সামনে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয়। অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও হাতের তাকু এবং কারণ যতে পদযুগলও। পক্ষান্তরে অনর্থের আশংকার

কারণে যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ইঙ্গিদিরও পর্দা জরুরী। এবং (যদি বৃক্ষ ও নারীদের জন্য মাহুরাম নয় এমন ব্যক্তির সামনে মুখমণ্ডল খোলার অনুমতি আছে; কিন্তু এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম (কেননা, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পর্দাহীনতাকে উচ্ছেদ করা)। আস্তাহ তা'আলা সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

আলুম্বিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, সূরা ন্তরের অধিকাংশ বিধান নির্ণজ্ঞতা ও অগ্রীলতা দ্বয়ন করার উদ্দেশ্যে বিবৃত হয়েছে। এগুলোর সাথে সম্পর্ক রেখে সামাজিকতা ও পারম্পরিক দেখা-সাক্ষাতেরও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে। পুনরায় নারীদের পর্দার বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

আর্জীয়বজ্জন ও মাহুরামদের জন্য বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ : সামাজিকতা ও পারম্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে “অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী” শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগত্বক পুরুষ হোক কিংবা নারী-স্বারার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আর্জীয় ও মাহুরাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণত এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দা ও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় থবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দে পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে গৃহে প্রবেশের আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ একপ আর্জীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়—মুত্তাহাব। এটা তরক করা যাকনহ তানফিহী। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে :

فمن اراد الدخول في بيته نفسه وفيه محرماته يكره له الدخول
فيه من غير استيذان تزييه لاحتمال رؤية واحدة منه من عرباته وهو
احتمال ضعيف مقتضاه التزه -

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আর এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামায়ের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামায়ের পরবর্তী সময়। এই তিনি সময়ে মাহুরাম আর্জীয়বজ্জন এমনকি, সময়দ্বারার অগ্রাণ বয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে

কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই সজ্জার সমৃদ্ধীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও বিশ্রামে বিষ্ণু সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহ্যিক। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে,

—إِنَّ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ بَعْدِ مُنْ
এর্থাৎ— এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই। কেননা, সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত্ত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ দ্বীর সাথে মেলামেশাও করে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাঞ্চিবয়ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি প্রদণের আদেশ দান করা তো বিধেয় ; কিন্তু অপ্রাঞ্চিবয়ক বালক-বালিকা শরীয়তের কোন আদেশ নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া নীতিবিনম্ব।

জওয়াব এই যে, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাঞ্চিবয়ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুবিয়ে দেয় যে, এই—এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না ; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দল বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাঞ্চিবয়ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি প্রদণের আসল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি প্রদণ ব্যক্তিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন জন্ম নেই। জন্ম শব্দটি সাধারণত শুনাই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক ‘অসুবিধা’ ও ‘দোষ’ অর্থেও আসে। এখানে জন্ম এর অর্থ তাই; অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাঞ্চিবয়কদের শুনাহ্গার হওয়ার সঙ্গেও দ্রুতভাবে হয়ে গেল।—(বয়ানুল কোরআন)

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে—
—إِنَّ عَلَيْكُمْ جَنَاحَ بَعْدِ مُنْ
এর্থাৎ— এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাঞ্চিবয়ক হয়, তবে সে মাহুরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হ্রস্ব রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাঞ্চিবয়ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যন্ত।

মাসআলা : এই বিশেষ অনুমতি প্রদণ আয়ীয়দের জন্য ওয়াজিব, না মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলিয় ও ফিকাহবিদদের মধ্যে যতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রাহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে আয়াতটি মোহকাম ও অবরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। —(কুরতুবী)। কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই দ্বীর সাথেও লিঙ্গ থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত্ত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানভা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত্ত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং দ্বীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আয়ীয় ও অপ্রাঞ্চিবয়কদেরকে অনুমতি প্রদণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আয়ীয়দের জন্যও

ওয়াজিব নহ। তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হয়রত ইবনে আবুরাস এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওয়র বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়ায়েতটি ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হয়রত ইবনে আবুরাস বলেন : তিনটি আয়াতের আমল পোকেরা হেড়েই দিয়েছে। **يَا إِنَّمَا الَّذِينَ أَسْتَأْنَدُونَكُمْ** —**إِنَّمَا الَّذِينَ مَلَكُوكُمْ** —**إِنَّمَا الَّذِينَ مَلَكُوكُمْ** —এতে আজীয়-স্জন ও অপ্রাপ্তবয়কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। **وَإِنَّمَا حَفَرَ الْقُسْطَنْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىِ** —এতে উভরাধিকার স্বত্ত্ব বন্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার সম, এমন কিছু আজীয় বন্টনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃকুণ্ঠ না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে **إِنَّمَا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** —এতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মান ও সন্তুষ্মের পাত্র, যে সর্বাধিক মুস্তাকী। আজকাল যার কাছে পয়সা বেশি, যার বাংলা ও কৃতি সুরূয়াও সুদৃশ্য, তাকেই মানুষ সম্মানের পাত্র মনে করে। কোন কোন রেওয়ায়েতে হয়রত ইবনে আবুরাসের ভাষা এরূপ : তিনটি আয়াতের ব্যাপারে শয়তান মানুষকে পরাভূত করে রেখেছে। অবশেষে, তিনি বলেছেন : আমি আমার দাসীকেও এই তিনি সময়ে অনুমতি ব্যক্তিত আয়ার কাছে না আসতে বাধ্য করে রেখেছি।

বিত্তীয় রেওয়ায়েতে ইবনে আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হয়রত ইকবামা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই রুম্জি ঝুঁয়রত ইবনে আবুরাসকে আজীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হয়রত ইবনে আবুরাস বললেন **إِنَّمَا** **أَرْثَاثَ آَنَّ** **أَنْ** **سِنِيرِيْحِ السِّرِّ** অর্থাৎ আল্লাহু পর্দাশীল। তিনি পর্দার হিফায়ত পছন্দ করেন। আসল কথা এই যে, এসর আয়াত যখন নায়িল হয়, তখন সামাজিক চালচলন অভ্যন্তর সাদাসিধে ছিল। মানুষের দরজায় পর্দা ছিল না এবং গৃহের ভেতরেও পর্দাবিশিষ্ট মশারি ছিল না। তখন যাবে যাবে চাকর অথবা পুত্র-কন্যা হঠাত এবন সময় গৃহে প্রবেশ করত যে, গৃহকর্তা তখন স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় লিঙ্গ থাকত। তাই আল্লাহু তাঁ'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনি সময়ে অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে দেন। বর্তমানে মানুষের দরজায় পর্দা আছে এবং গৃহধ্যে মশারির ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে, তাই মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, এই পর্দাই যথেষ্ট—অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। —(ইবনে কাসীর) । ইবনে আবুরাসের এই বিত্তীয় রেওয়ায়েত থেকে বুরা যায় যে, স্ত্রীর স্বাথে লিঙ্গ থাকা, আবৃত অঙ্গ খুলে যাওয়া, কারও আগমনের সভাবনা ইত্যাদি ঘটনার আশংকা না থাকলে অনুমতি গ্রহণের বিধান শিথিল হতে পারে। কিন্তু কারও স্বাধীনতায় বিষ্ণু সৃষ্টি না করা উচিত। সবারই সুখে শান্তিতে থাকা দরকার। যারা পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্য করে না, তারা স্বয়ং কঠে পতিত থাকে। তারা নিজেদের প্রয়োজন ও বাস্তিত কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা বৈধ করে।

নারীদের পর্দার ভাগিদ এবং এর মধ্যে আরও একটি ব্যক্তিক্রম : ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিধান বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যক্তিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যক্তিক্রম দর্শকের দিক দিয়ে এবং অপর ব্যক্তিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে। দর্শকের দিক দিয়ে মাহুরাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যক্তিক্রমভুক্ত

করা হয়েছিল এবং বে বক্তু দ্রষ্টি থেকে শোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিক দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক বোরকা অথবা বড় চাদর বুঝানো হয়েছিল এবং কারও কারও মতে নারীর মুখ্যগুল এবং হাতের ডিলুও এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি ভূজীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ খোখ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এবং শিথিল করা হয়েছে যে, অনন্তীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহুরাবের ন্যায় হয়ে যায়। মাহুরাবদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছে সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে ۚ—وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ—এর তফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এবং বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহুরাবের সামনে খোলা যায়—যে মাহুরাব নয়, এবং ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যাদ সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে ۚ—وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ—অর্থাৎ সে যদি মাহুরাব নয় এবং ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিস্তৃত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حِرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حِرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حِرْجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوَاتِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ
أَبْايكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ أَمْهِنْتِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ أَخْوَاتِكُمْ
أَوْ بَيْوَاتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيْوَاتِ
خَلَدِتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَأْنَاهُ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيْوَاتًا
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَّكَةً طَيِّبَةً
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

(৬১) অছের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, ঝোগীর জন্য দোষ নেই, এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের শাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যাদের গৃহে অথবা তোমাদের

ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের আলাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে ; যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বকুদের গৃহে । তোমরা একজে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই । অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের বজলদের প্রতি সালাম বলবে । এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পরিজ্ঞ দোষ । এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নোও ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি তোমরা কোন অক, খঙ্গ ও রোগী অভাবীকে তোমাদের কোন বজল অথবা পরিচিতের গৃহে নিয়ে গিয়ে কিছি খাইয়ে দাও অথবা নিজেরা পানাহার কর, এমতাবস্থায় সেই বজল তোমাদের খাওয়ানো ও খাওয়ার কারণে অস্তুষ্ট ও কষ্ট অনুভব করবে না বলে নিশ্চিতভাবে জন্য দোষ নেই, খঙ্গের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা (নিজেরা অথবা উপরোক্তদের সহ সবাই) নিজেদের গৃহে (এতে স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহেও অস্তুষ্ট হয়ে গেছে) আহার করবে । অথবা (পরে উল্লিখিত গৃহসমূহে আহার করবে । অথাৎ তোমাদের নিজেদের আহার করা ও উপরোক্ত বিকলাঙ্গদের আহার করার মধ্যে কোন শুনাহ নেই । এমনিভাবে তোমাদের খাওয়ানো ও তাদের খাওয়ার মধ্যে কোন শুনাহ নেই । গৃহগুলো এই ১) তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের আতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের আলাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বকুদের গৃহে । (এতেও) তোমরা একজে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই । অতঃপর (মনে রেখ যে) যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের বজলদের (অর্ধাং সেখানে যেসব মুসলমান থাকে, তাদের) প্রতি সালাম বলবে (যা) দোয়া হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং (সওয়াব পাওয়ার কারণে) কল্যাণময়, (এবং প্রতি পক্ষের মন সন্তুষ্ট করার কারণে) উত্তম কাজ । এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য (নিজের) বিধানাবলী বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝ (এবং পালন কর) ।

আনুষঙ্গিক আতব্য বিষয়

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী ক্ষতিপূরণ বিধান ও সাজাজিকতার রীতিনীতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরাও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে । আলোচ আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোকাহাব অথবা ওয়াজিব । আয়াতের মর্য ও বিধানাবলী হন্দয়ন্তর করার জন্য প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেওয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবর্তীর হয় ।

কোরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল ইবাদ তথা বাদ্দার হকের হিফায়তের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা কোন মুসলমানের অজ্ঞান নয় । অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যক্তীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীবণ শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে । অপরদিকে আল্লাহ তাজ্জ্ঞা তাঁর সর্বশেষ রাসূলের সংসর্গে থাকার জন্য

এমন স্থানের লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ ও রাসুলের আদেশের প্রতি উৎসর্গহয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রাসূলপ্রাহ (সা)-এর শপথিত সংসর্গের পরশ পাথর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের জন্য ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যক্তীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই শুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রাসূলপ্রাহ (সা)-এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বিধানা-বলী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শালে নৃযুল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শালে নৃযুল। ঘটনাবলী নিম্নরূপ :

(১) ইমাম বগভী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহ্যাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের ব্যাবহার এই যে, খঞ্জ, অঙ্গ ও ঝঁঝ ব্যক্তির সাথে বসে থেকে তারা শৃণু বোধ করে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অঙ্গ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশি না থায় এবং সবাই সমান অংশ পায়। আমি অঙ্গ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চাইতে বেশি থেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দুই জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এই চরম সাবধানতার ফলে ব্যবহার অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিদার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

(২) বগভী ইবনে-জারীরের জবানী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে !أَوْلَكُمْ يَنْتَهُمْ بِالْبَاطِلِ (অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে থেঁয়ো না) আয়াতটি নাখিল হলে সবাই অঙ্গ, খঞ্জ ও ঝঁঝ ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, ঝঁঝ ব্যক্তি তো ব্যাবহার করে আহার করে, অঙ্গ উৎকৃষ্ট ধাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে থেকে পারে না। অতএব সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি থেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ ধাদ্যস্ত্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও সৌকর্ক্যতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

(৩) সাঈদ ইবনে-মুসাইয়ির বক্সেন : মুসলমানগণ জিহাদে বাহ্যিক সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাদের হাতে সোপর্স করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৫৬

তা তোমরা পীক্ষাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসল্মাদে বায়বারে হয়রত আয়েশা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন যুক্তে গ়াঢ় করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাসদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চৱম আল্লাহ-ভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশক্ত করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হয়রত ইবনে আবুআস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের (অর্থাৎ مسیقِکم বস্তুর গৃহে পানাহার করার দোষ নেই) শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চলে যান এবং বস্তু মালেক ইবনে যায়দের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভাব সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়দ দুর্বল ও শক্ত হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আয়ি পছন্দ করিন।—(মায়হারী) বলা বাহ্য্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যক্তিত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকাচার অনুযায়ী এসব নিকট আঞ্চলিক মতে লোকিকভাব বালাই ছিল না। এরকে অপরের গৃহে কিছু থেলে গৃহকর্তা মোটেই কষ্ট ও শীঘ্ৰ অনুভব করত না; বৰং এতে সে আনন্দিত হতো। এমনিভাবে আঞ্চলিক যদি নিজের সাথে কোন বিকলাঙ্গ, রংপুর ও মিসকীনকেও থাইয়ে দিত, তাতেও সে কোনৰূপ অবস্থা বোধ করত না। এসব বিষয়ের স্পষ্টত অনুমতি না দিলেও অভ্যাসগতভাবে অনুমতি ছিল। বৈধতার এই কারণ দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, যেকালে অথবা যেস্থানে এক্সপ লোকাচার নেই এবং গৃহকর্তার অনুমতি সন্দেহযুক্ত হয়, সেখানে গৃহকর্তার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে পানাহার করা হারাম, যেমন আজকাল সাধারণত এই লোকাচার নেই এবং কেউ এটা পছন্দ করে না যে, কোন আঞ্চলিক তার গৃহে যা ইচ্ছা পানাহার করবে অথবা অপরকে পানাহার করবে। তাই আজকাল সাধারণভাবে এই আয়াতের অনুমতি অনুযায়ী পানাহার জায়েয নয়। তবে যদি কোন বস্তু ও বজান সম্পর্ক কেউ নিশ্চিতভাবে জানে যে, সে পানাহার করলে অথবা অপরকে পানাহার করালে কষ্ট কিংবা অবস্থাবোধ করবে না; বৰং আনন্দিত হবে; তবে বিশেষ করে তার গৃহে পানাহার করার ব্যাপারে এই আয়াত অনুযায়ী আমল করা জায়েয।

মাসআলা : উল্লিখিত বর্ণনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান ইসলামের প্রাথমিক মুগে ছিল, এরপর ব্রহ্মত হয়ে গেছে—এ কথা বলা ঠিক ময়। বৰং বিধানটি শুরু থেকে আজ প্রয়ত্ন কার্যকর আছে। তবে গৃহকর্তার নিশ্চিত অনুমতি এর জন্য শর্ত। এক্সপ অনুমতি না থাকলে তা আয়াতের আওতায় পড়ে না। ফলে পানাহার করা জায়েয নয়।—(মায়হারী)

মাসআলা : এমনিভাবে এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই বিধান কেবল আয়াতে বর্ণিত বিশেষ আঞ্চলিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বৰং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তার তরফ থেকে পানাহার করা ও করানোর অনুমতি আছে,

এতে সে আশঙ্কিত হবে এবং কষ্ট অনুভব করবে না, তবে তার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য।—(মাযহারী) কারও গৃহে অনুমতিক্রমে প্রবেশের পর যেসব কাজ জায়েয় অথবা মুস্তাহাব, উপরিখ্রিত বিশাস সেসব কাজের সাথে সম্পৃক্ত। এসব কাজের মধ্যে পানাহার ছিল প্রধান, তাই একে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে عَلَى أَنفُسِهِمْ বলে তাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ হাদীসে মুসলমানদের প্রশংসনে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফর্মাল বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ
أَمْرٍ جَاءُوكُمْ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا سَتَأْذِنُوكُمْ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ
فَادْعُوهُمْ إِنَّمَا شِدَّتْ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَذَّابًا بَعْضُكُمْ بُعْضًا ۚ قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَسْأَلُونَ مِنْكُمْ لِوَادِعًا ۖ فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عذَابًا ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يَرْجِعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَذِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(৬২)

(৬২) যুগিন ক্ষেত্রে তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশাস স্থাপন করে এবং রাসূলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শক্তি হলে তার কাছ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তিত চলে যাবে না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্য অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, যেহেরবান। (৬৩) রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে

জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিশ্বর্য তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যত্নগাদার্থক শান্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখ, বজ্জোমঙ্গল ও তৃতীয়গুলে যা আছে, তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থার আছ, তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমান তো তারাই, যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং রাসূলের কাছে যখন কোন সমষ্টিগত কাজের জন্য একত্রিত হয় (এবং ঘটনাক্রমে সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়) তখন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যক্তিত (এবং তিনি অনুমতি না দিলে সভাস্থল থেকে ওঠে) চলে যায় না। (হে রাসূল) যারা আপনার কাছে (একপ স্থলে) অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঝুমান রাখে। (অতঃপর তাদেরকে অনুমতিদানের কথা বলা হচ্ছে ১) অতএব তারা (বিশ্বাসীরা একপস্থলে) তাদের কোন কাজের জন্যে আপনার কাছে (চলে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যার জন্য (উপযুক্ত মনে করেন এবং অনুমতি দিতে) চল, অনুমতি দিন। (এবং যার জন্য উপযুক্ত মনে করবেন না, তাকে অনুমতি দেবেন না। কেননা, অনুমতি প্রার্থী হয় তো তার কাজটিকে খুব জরুরী মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তা জরুরী নয়, অথবা জরুরী হলেও তার চলে যাওয়ার কারণে তদপেক্ষ বড় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তাই অনুমতি দেওয়া না দেওয়ার ফয়সালা রাসূলল্লাহ (সা)-এর বিবেচনার উপর হেড়ে দেওয়া হয়েছে) এবং অনুমতি দিয়েও তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের, দোয়া করুন। (কেননা, তাদের এই বিদায় প্রার্থনা শক্ত ওয়ারের কারণে হলেও এতে দুনিয়াকে দীনের উপর অগ্রগণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা এক প্রকার ঝটি। এর জন্য আপনার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের দোয়া করা দরকার। দ্বিতীয়ত এটাও সত্ত্ব যে, অনুমতিপ্রার্থী যে ওয়ার ও প্রয়োজনকে শক্ত মনে করে অনুমতি নিরেছে, তাতে সে ইজতিহাদগত ভুল করেছে। এই ইজতিহাদী ভুল সামান্য চিঞ্চা-ভাবনার মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারত। এমতাবস্থায় চিঞ্চা-ভাবনা না করা একটি ঝটি। ফলে ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন (আছে)। নিচয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, যেহেরবান। (তাদের নিয়ত ভাল ছিল, তাই এ ধরনের সূচৰ ব্যাপারাদিতে তিনি ধরণাকৃত করেন না)। তোমরা রাসূলের আহবানকে (যখন তিনি কোন ইসলামী প্রয়োজনে তোমাদেরকে একত্রিত করেন) একপ (সাধারণ আহবান) মনে করো না, যেমন তোমরা একে অপরকে আহবান কর (যে আসলে আসল, না আসলে না আসল)। এসেও ঝুক্তকণ ইচ্ছা বসল, যখন ইচ্ছা উঠে চলে গেল। রাসূলের আহবান একপ নয়; বরং তাঁর আদেশ পালন করা ওয়াজিব এবং অনুমতি ছাড়াই চলে যাওয়া হারাম। যদি কেউ অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তবে রাসূলের তা অজ্ঞান থাকতে পারে; কিন্তু (মনে রেখ) আল্লাহ তাদেরকে ভালভাবে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে (অপরের) চুপিসারে (পয়গঞ্চের মজলিস থেকে) সরে যায়। অতএব যারা আল্লাহর আদেশের (যা রাসূলের মাধ্যমে পৌছে) বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে,

তাদের উপর (দুলিমান্ত) কোন বিপর্যর পতিত হবে, অথবা (পরকালে, তাদেরকে কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ধার্স করবে। দুলিয়া ও আবিরাত উভয় জাহানে আয়াব হওয়াও সম্ভব। আরও মনে রেখ, যা কিছু নভোমগুল ও ভূমগুলে আছে, সব আশ্চর্য। তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন এবং সেদিনকেও, বেদিন সবাই তাঁর কাছে পুনরজীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দেবেন, যা তারা করেছিল। তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কিয়ামতের দিনই শুধু নয় আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিশেষভাবে রাসূলে কর্মীয় (সা)-এর মজলিসের এবং সাধারণ সামাজিকভাবে কঠিপৰ বীতিনীতি ও বিধান : আলোচ্য আয়াতে দুইটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জিহাদ ইত্যাদির জন্য একত্রিত করেন, তখন ঈমানের দাবি হলো একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যক্তিরেকে মজলিস ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি প্রাপ্ত করতে হবে। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবির বিরুদ্ধে দুর্নামের করল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়ে যায় ; কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সরে পড়ে।

আহ্যাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবর্তীণ হয় ; তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফুল্ট সম্প্রিতভাবে ঘূর্ণী আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে 'গায়ওয়ায়ে খন্দক' তথা পরিখার শুল্ক বলা হয়। এই শুল্ক পদ্ধতি হিজরীর শওয়াল ঘাসে সংঘটিত হয়। (কুরআনী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) শয়ঃ এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমত আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্য সামান্য কাজ করে চুপিসারে সরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্রান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবর্তীণ হয়।—(মায়হারী)

একটি ঔপন্থ ও জওয়াব : আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যক্তি চলে যাওয়া হারাব। অথচ সাহাবায়ে কিরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন এবং অনুমতি নেওয়া জরুরী মনে করতেন না। জওয়াব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়েন। বরং কোন প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, তার বিধান ; যেমন খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এই বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

বলে কি বুঝানো হবেছে? : এসম্পর্কে বিভিন্ন উকি আছে; কিন্তু পরিকার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরী মনে করেন ; যেমন আহ্যাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল।

এই আদেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? কিন্তু বিদগ্ধ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এই বিধান, তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনান্যতিতে কিরে যাওয়া নাজুর্যে। (কুরুতুবী, মাযহারী, বয়ানুল কোরআন) বলা বাহ্য, বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসের জন্য এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারম্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মুস্তাহাব ও উন্নয়। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিঞ্চা-ভাবনা অথবা কর্মসূচা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ يَسْكُنُ إِلَيْكُمْ

—এর তফসীরের সার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা (إِسْأَافُ إِلَى الْفَاعِلِ) আয়াতের অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেওয়া না দেওয়া ইচ্ছামীন, বরং তখন সাড়া দেওয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনা ধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহারী ও বয়ানুল কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হয়রত ইবনে আবুস থেকে ইবনে কাসীর, কুরুতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دُعَاءَ الرَّسُولِ—এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন কাজের জন্য ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা (إِسْأَافُ إِلَى الْمَفْعُولِ)।

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রয়োজনে আহবান কর অথবা সম্মোহন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম দিয়ে 'ইয়া মোহাম্মদ' বলো না—এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' অথবা 'ইয়া নবী আল্লাহ' বল। এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সম্মান ও সন্তুষ্টি প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্বারা তিনি ব্যাখ্যিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণগত উজ্জ্বল ক্ষেত্রে অতি লক্ষণ রাখ। প্রয়োজনাতিরিক উচ্চস্থানে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরম্পরে বলে। আরও একটি উদাহরণঃ—অর্থাৎ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষণ রাখ। প্রয়োজনাতিরিক উচ্চস্থানে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরম্পরে বলে। আরও একটি উদাহরণঃ—অর্থাৎ তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না, বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হংসিয়ারিঃ—এই দ্বিতীয় তফসীরে বুর্যুর্গ এবং বড়দেরেও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুরুবী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহবান করা উচিত।

سورة الفرقان

সূরা আল-ফুরকান

মকাব অবতীর্ণ, ৬ রক্ত, ১৭ আংশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ
 مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي
 الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذَ وَامِنَ دُونَهُ
 إِلَهٌ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يُمْلِكُونَ لَا نَفْسٍ هُمْ ضَرَّاءِ
 لَا نَفْعَاءِ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

পরম কল্যাণয় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করাই।

(১) পরম কল্যাণয় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফয়সালার প্রস্তুত অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন যাঁর রয়েছে নড়োমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান প্রাপ্ত করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁকে শোধিত করেছেন পরিষিক্তভাবে (৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য প্রাপ্ত করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্টি এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মক্ষণ করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়।

তফসীরের স্বর-সংখ্যক

কত মহান সেই সন্তা, যিনি ফয়সালার প্রস্তুত (অর্থাৎ কোরআন) তাঁর রিশেষ দাসের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য বিস্বাস হ্রাপন না করা অবস্থায় আল্লাহর আবাদ্য থেকে সতর্ককারী হয়, তিনি এখন সন্তা যাঁর রয়েছে নড়োমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব। তিনি কাউকে নিজের সন্তান সাব্যস্ত করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সবার

পৃথক পৃথক প্রকৃতি রেখেছেন। কোনটির প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য এক রকম এবং কোনটির অন্য রকম। মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে কত উপাস্য প্রহণ করেছে, যারা কোনক্রমেই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা, তারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং তারা নিজেরা সৃষ্টি এবং নিজেদের কোন ক্ষতির অর্থাৎ ক্ষতি দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং কোন উপকার (অর্জন) করার ক্ষমতা রাখে না। তারা কারও মৃত্যুর মালিক নয় অর্থাৎ কোন প্রাণীর প্রাণ বের করতে পারে না, কারও জীবনেরও ক্ষমতা রাখে না অর্থাৎ কোন নিষ্পাণ বন্ধুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। এবং কাউকে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখে না। যারা এসব বিষয়ে সক্ষম নয়, তারা উপাস্য হতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মুক্তায় অবর্তীর্ণ। হ্যরত ইবনে-আবুসাম ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে ইদীনায় অবর্তীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি ইদীনায় অবর্তীর্ণ এবং কিছু আয়াত মুক্তায় অবর্তীর্ণ। —(কুরুভী) এই সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শুন্দের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

শুন্দ থেকে উত্তৃত প্রক্টর থেকে উত্তৃত। বরকতের অর্থ প্রস্তুত কল্যাণ। ইবনে আবুসাম বলেনঃ আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। فرقان কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজিয়ার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রতিদেশ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে কোরআন বলা হয়।

—**الْمَالِيُّونَ**—এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ একেপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

—**تَطْلِيقٌ**—এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বন্ধুকে অন্তিম থেকে অতিতে আনয়ন করা—তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্টি বন্ধুর বিশেষ বিশেষ রহস্য।—**غَثْن-**—এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বন্ধুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বন্ধুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। এই ও নক্ষত্র সূজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূগুঠে ও তার গর্জে সৃজিত প্রত্যেকটি বন্ধুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা

সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, ধনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে ধনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি ধনন করে সুটক দাঙ্গান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল ; কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়মাভিত করেছেন, কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌছে যায় ; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্টি বস্তুসমূহের রহস্য বিজ্ঞানিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টি বস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গায়শালী (র) এ বিষয়ে الحكمة في مخلوقات الله تعالى নামে একটি বৃত্তি পৃষ্ঠক রচনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عبد থেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিশ্বাসকর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্টি মানবের জন্য এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্বষ্টি তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

بَنْدَهْ حَسْن بَصِدْ زَبَانْ كَفْتْ كَيْ بَنْدَهْ تَوَامْ
تُوبَزَبَانْ خَوْد بَكْو بَنْدَهْ نَوَازْ كِيسْتِي

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هُنَّ إِلَّا فِكَارٌ أَفْتَرَاهُ وَأَعْنَاءَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
أَخْرُونَ ۝ فَقَدْ جَاءُوكُمْ ظُلْمًا وَ زُورًا ۝ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الَّلَّا وَ لَيْلَيْنَ
أَكْتَتَبَهَا فَرِيَّ تُمْلِي عَلَيْهِ بِكْرَةً وَ أَصِيلًا ۝ قُلْ أَنْزَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ
السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ۝ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَقَالُوا
مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الظَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ طَلُولًا أَنْزِلَ
إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ
جَنَّةٌ يَا كُلُّ مِنْهَا ۝ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّقِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝
أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوكُمْ الْأَمْثَالَ فَضَلَّوْ أَفَلَا يَسْتَطِيعُونَ سِيْلًا ۝

(৪) কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উজ্জ্বাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছেন। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এতে তো পুরাকালের উপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধিয় তাঁর কাছে শিখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবর্তীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমঙ্গল ও ভূমগ্নিলোর গোপনভেদে অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রাসূল যা খাদ্য আহার করে এবং হাটেবাজারে চলাকেরা করে ? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাবিল করা হলো না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত ? (৮) অথবা তিনি ধনভাণ্ডার প্রাণ হলেন না কেন অথবা তাঁর একটি বাগান হলো না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন ? জালিয়রা বলে, তোমরা তো একজন যান্মুগ্ধস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা (কোরআন-সম্পর্কে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) কিছুই নয়, নিরেট মিথ্যা (ই মিথ্যা) যাকে তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর) উজ্জ্বাবন করেছেন এবং অন্য লোকে (এই উজ্জ্বাবনে) তাঁকে সাহায্য করেছেন [এখানে সেসব ধন্বধারীকে বুঝানো হয়েছে, যারা যুসলিমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা রাসূলগ্রাহ (সা)-এর কাছে এমনিতেই যাতায়াত করত।] অতএব (এ কথা বলে) তারা যুলুম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে (এটা যে যুলুম ও মিথ্যা, তা পরে বর্ণিত হবে)। তারা (কাফিররা এই আপত্তির সমর্থনে) বলে, এটা (অর্থাৎ কোরআন) পুরাকালের উপকথা, যা তিনি (অর্থাৎ পয়গম্বর সুন্দর ভাষায় চিন্তাভাবনা করে করে সাহাবীদের হাতে) লিখিয়ে নিয়েছেন (যাতে সংরক্ষিত থাকে), এরপর তাই সকাল-সন্ধিয় তাঁর কাছে পঠিত হয় (যাতে ক্ষরণ থাকে)। এরপর মুখ্য করা অংশ জনসমাবেশে বর্ণনা করে আল্লাহর সাথে সমন্বযুক্ত করে দেওয়া হয়।) আপনি (জওয়াবে) বলে দিন, একে তো সেই (পবিত্র) সন্তা অবর্তীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমঙ্গল ও ভূমগ্নিলোর সব গোপন বিষয় জানেন। (জওয়াবের সারমর্য এই যে, এই কালামের অলৌকিকতা এ বিষয়ের প্রয়াণ যে, কাফিরদের এই আপত্তি ভাস্ত, মিথ্যা ও যুলুম। কেননা, কোরআন পুরাকালের উপকথা হলে কিংবা অপরের সাহায্যে রচিত হলে সমগ্র-বিশ্ব এর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে কেন অক্ষম হতো ?) নিচয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (তাই এ ধরনের মিথ্যা ও যুলুমের কারণে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না।) তারা [কাফিররা রাসূলগ্রাহ (সা) সম্পর্কে] বলে, এ কেমন রাসূল যে, (আমাদের মত) খাদ্য (ও) আহার করে এবং (জীবিকার ব্যবস্থার জন্য আমাদের মতই) হাটেবাজারে চলাকেরা করে। (উদ্দেশ্য এই যে, রাসূল মানুষের পরিবর্তে ফেরেশতা হওয়া উচিত যে পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনের উর্ধ্বে।) কমপক্ষে এতটুকু তো হওয়া দরকার যে, রাসূল দ্বয়ং ফেরেশতা না হলে তার মুসাহিব ও উপদেষ্টা কোন ফেরেশতা হওয়া উচিত। (তাই তারা বলে) তাঁর কাছে কেন একজন ফেরেশতা প্রেরণ করা হলো না যে, তাঁর সাথে তাকে (মানুষকে আবাব থেকে) সতর্ক করত অথবা (এটাও না হলে কমপক্ষে রাসূলকে পানাহারের প্রয়োজন থেকে নিশ্চিত হওয়া

উচিত, এভাবে যে) তাঁর কাছে (গায়ের থেকে) কোন ধনভাণ্ডার আসত অথবা তাঁর কোন বাগান ধাকড়, যা থেকে আহার করত। (মুসলমানদেরকে) জালিমরা বলে, (যখন তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা নেই, ধনভাণ্ডার সেই এবং বাগান নেই; এরপরও সে নবৃত্ত দাবি করে, তখন বুদ্ধি যায় যে, তাঁর বুদ্ধি নষ্ট। তাই) তোমরা তা একজন বিকারগত্ব ব্যক্তির পথে গমন করছ। (হে মুহাম্মদ) দেখুন, তাঁরা আপনার কেমন অস্তুত উপর্যা বর্ণনা করে। অতএব তাঁরা (এসব প্রলাপোক্তির কারণে) পঞ্চদ্বিতী হয়েছে, অতঃপর তাঁরা পথ পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরচকে কাফির ও মুশরিকদের উৎপাদিত আপত্তি ও তাঁর জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ (সা) নিজেই তা নিষামিষ্ঠি উজ্জ্বাল করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধিয় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেয় যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে :—*أَنْزَلَهُ اللَّهُ الَّذِي يَطْلُمُ السُّرًّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ*—এর সামর্থ এই যে, এই কালাম শব্দং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাযিলকারী আল্লাহ তা'আলার সেই পরিকল্পনা সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভোগে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেওয়া যোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসন্দেহে তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মুকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারণও হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি বরং সন্তান-সন্ততি ও আগ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়ের জাজ্জল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানব রচিত কালাম নয়। নতুন অন্য মানুষও একে কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারণগুল ছাড়াই এর অর্থ সংজ্ঞার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্ত্বার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকবর্গ প্রথম ধাঁও তা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ ঘানুমের ন্যায় পানাহার করতেন না ; বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঘামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধনভাওর অথবা বাগ-বংগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে ঢলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল এ কথা আমরা কিন্তু মানতে পারি ; প্রথম তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয় কোন ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি যাদুগ্রন্থ। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বল্লাহিন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, **أَنْتُرْ كَيْفَ ضَرِبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَخَلُوَا فَلَا يَسْتَطُونُ سُبْلًا** অর্থাৎ দেখুন এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অনুভূত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথবর্ণ হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই। বিস্তারিত জওয়াব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

**تَبَرَّكَ الدِّينُ إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَهَنَّمَ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَيَجْعَلُ لَكَ قَصْوَرًا ⑩ بَلْ كَذَّبُوا إِلَيْهَا قَوْمٌ
وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ⑪ إِذَا رَأَاهُمْ مِنْ مَكَانٍ
بَعِيدٌ سَمِعُوا هَا تَغْيِظًا وَزَفِيرًا ⑫ وَإِذَا أُقْوَاهُمْ هَامَكَانٌ ضَيْقًا
مُقْرَرَّينَ دَعُوا هَنَالِكَ ثِبُورًا ⑬ لَا تَدْعُوا إِلَيْمَوْرَ ثِبُورًا وَأَحِدًا
وَادْعُوا ثِبُورًا كَثِيرًا ⑭ قُلْ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلُ�ِ الَّتِي
وَعِدَ الْمُتَقْوِنَ طَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ⑮ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَلِدِينَ طَ كَانَ عَلَى رِبِّكَ وَعْدًا امْسُولًا ⑯ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءا نَتَمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَؤُلَاءِ
أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ⑰ قَاتُلُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَبْتَغِيْ لَنَا أَنْ
تَتَخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمْ وَابْأَهُمْ حَتَّى نَسُوا**

اللّٰهُ كَرِّهُ وَ كَانُوا فِي دِيْنٍ بُّوْرًا ⑯ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ لَا فِيمَا سَطَّعْتُمُونَ صَرْفًا وَ لَا نَصْرًا وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ فَنُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ⑭
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيْا كُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتنَةً ۖ
أَنْصَبُرُونَ ۚ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ⑮

- (১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কিয়ামতকে অঙ্গীকার করে এবং যে কিয়ামতকে অঙ্গীকার করে, আমি তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি। (১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও চীৎকার। (১৩) যখন এক শিকলে তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় জাহানামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিঙ্গেগ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না—অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জাহান, যা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে মুভাকীদেরকে ? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থার সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার প্রতিপালকের দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাসনাদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই ব্যাপাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল ? (১৮) তারা বলবে—আপনি পরিত্র, আমরা আমপার পরিবর্তে অন্যকে মুক্তিপ্রাপে প্রাণ করতে পারতাম না ; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের শিত্তপুরুষদেরকে ডোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিশ্বৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল দ্বিস্পাণ্ড জাতি। (১৯) (আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে শুনাহুগার আমি তাকে শুরুতর শাস্তি আঙ্গাদন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাব্রহ্মণ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কি না। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কত মহান তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদন্পেক্ষা (অর্থাৎ কাফিরদের ফরমায়েশের চাইতে) উত্তম বস্তু দিতে পারেন। (অর্থাৎ অনেক গায়েবী) বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় (উত্তম এ কারণে যে, তারা শুধু বাগ-বাগিচার ফরমায়েশ করত ; যদিও তা একই হয়। একাধিক বাগান যে এক বাগানের চাইতে উত্তম তা বলাই বাহ্য) এবং (বাগবাগিচার সাথে অন্য উপযুক্ত জিনিসও দিতে পারেন, যার ফরমায়েশ তারা করেনি ; অর্থাৎ) দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ (যেগুলো বাগানেই নির্মিত কিংবা বাইরে। এতে তাদের ফরমায়েশ আরও অধিকতর নিয়ামতসহ পূর্ণ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, যা জাহানাতে পাওয়া যাবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা দুনিয়াতেই আপনাকে দিতে পারেন, কিন্তু কতক রহস্যের কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি এবং মূলতঃ জরুরী ছিল না। অতএব সন্দেহ অনর্থক। তাদের সন্দেহের কারণ নিছক দৃষ্টান্ত এবং সত্ত্বের প্রতি অবীহা। এই অবীহা ও দৃষ্টান্তের কারণ এই যে,) তারা কিয়ামতকে যিথ্যা মনে করছে। (তাই পরিণামের চিন্তা নেই ; যা মনে আসে করে এবং বলে) এবং (তাদের পরিণাম হবে এই যে,) যারা কিয়ামতকে যিথ্যা, মনে করে, আমি তাদের (শাস্তির) জন্য জাহানাম তৈরি করে রেখেছি। (কেননা কিয়ামতকে যিথ্যা মনে করলে আল্লাহ ও রাসূলকে যিথ্যা মনে করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এটা জাহানামে যাওয়ার আসল কারণ। জাহানামের অবস্থা এই যে) সে (অর্থাৎ জাহানাম যখন দূর থেকে) তাদেরকে দেখবে, তখন (দেখান্তাই ত্রুট হয়ে এমন গর্জন করে উঠবে যে) তারা (দূর থেকেই) তার গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। যখন তারা হস্তপদ শুঙ্খলিত অবস্থায় জাহানামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিষ্কিঞ্চ হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে আহবান করবে (যেমন বিপদকালে ব্রতাবতই মৃত্যুকে ডাকা হয় এবং মৃত্যু কামনা করা হয়। তখন তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা এক মৃত্যুকে আহবান করো না ; বরং অনেক মৃত্যুকে আহবান কর। (কারণ, মৃত্যুকে আহবান করার কারণ বিপদ। তোমাদের বিপদ অশেষ। প্রত্যেক বিপদই মৃত্যুর আহবান চায়। কাজেই আহবানও অনেক হবে। এখানে বিপদের আধিক্যকেই মৃত্যুর আধিক্য বলা হয়েছে) আপনি (তাদেরকে এই বিপদের কথা শনিয়ে) বলুন, (বল) এই (বিপদের) অবস্থা ভাল (যা তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে হয়েছে) না চিরকাল বসবাসের জাহান (ভাল), যার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ ভীরুদ্দেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দিয়েছেন। সেটা তাদের আনুগত্যের প্রতিদান এবং সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। তারা সেখানে যা চাইবে, তা পাবে (এবং) তারা (তথায়) চিরকাল থাকবে। (হে পয়গস্ত্র) এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ করা (কৃপা হিসেবে) আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব এবং দরবার্থযোগ্য। (বলা বাহ্য, চিরকাল বসবাসের জাহানাতই প্রেষ্ট। অতএব আয়াতে ভীতি প্রদর্শনের পর ইমানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।) আর (সেইদিন তাদেরকে শরণ করিয়ে দিন,) যেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে (যারা বেছায় কাউকে পথত্রষ্ট করেনি তা মৃত্যি হোক কিংবা ফেরেশতা প্রযুক্ত হোক) একত্রিত করবেন, অতঃপর (উপাসকদের লাঙ্ঘনার জন্য উপাস্যদেরকে) বলা হবে, তোমরাই কি আমার এই বাসাদেরকে (সংপথ থেকে) বিভাস করেছিলে, না তারা (নিজেরাই) পথত্রাস্ত হয়েছিল ? উদ্দেশ্য এই

যে, তোমাদের ইবাদত বাস্তবে পথচার্টতা ছিল। তারা এই ইবাদত তোমাদের আদেশ ও সম্ভিক্ষয়ে করেছিল; যেমন তাদের ধারণা তাই ছিল যে, এই উপাস্যরা আমাদের ইবাদতে সন্তুষ্ট হয় এবং সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, মী তারা নিজেদের কৃপ্যবৃত্তি দ্বারা এটা উজ্জ্বল করেছিল।) তারা (উপাস্যরা) বলবে, আমাদের কি সাধ্য ছিল যে, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরুবীরপে গ্রহণ করি? সেই মুরুবী আমরাই হই কিংবা অন্য কেউ হোক। অর্থাৎ আমরা যখন খোদায়ীকে আপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ মনে করি, তখন শিরক করার আদেশ অথবা তাতে সম্মতি কিন্তুপে করতে পারতাম? কিন্তু তারা নিজেরাই পথচার্ট হয়েছে এবং পথচার্টও এমন অঘোষিতভাবে হয়েছে যে, তারা কৃতজ্ঞতার কারণসমূহকে কুফরের কারণ করে দিয়েছে। সেমতে) আপনি তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে (খুব) ডোগসভার দিয়েছিসেন। (তাদের উচিত নিয়ামতদাতাকে চেনা, তাঁর শোকর ও আনুগত্য করা; কিন্তু) তারা পরিণামে কৃপ্যবৃত্তি ও আনন্দ-উল্লাসে বেতে ওঠে) আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা নিজেরাই ধৰ্মস্থান হয়েছিল। (জওয়াবে তারা একেবাই বলল যে, তাঁরা নিজেরাই পথচার্ট হয়েছে, আমরা করেনি। আল্লাহর নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে তাদের পথচার্টভাকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তখন আগ্রাহ তাঁ'আলা উপাসনাকারীদেরকে জন্ম করার জন্য বলবেন এবং প্রটাই প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদের উপাস্যরা তো তোমাদের কথা মিথ্যাই সাব্যস্ত করল, (ফলে তাঁরাও তোমাদের সাহচর্য ত্যাগ করেছে এবং অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে)। অতএব (এখন) তোমরা (নিজেরাও শাস্তি) প্রতিরোধও করতে পারবে না এবং (অন্য কারও পক্ষ থেকে) সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। (এমনকি, যাদের উপর পূর্ণ ভরসা ছিল, তাঁরাও পরিকার মুখ ফিরিয়ে নিছে এবং তোমাদের বিরোধিতা করছে) তোমাদের মধ্যে যে জালিয় (অর্থাৎ মুশরিক), আমি তাকে শুল্কতর শাস্তি আলাদান করাব (যদিও তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই মুশরিক হবে; কিন্তু যুলুমের দাবি ও যে শাস্তি, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় একথা বলা হয়েছে।) আপনার পূর্বে আমি যত পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, তাঁরা সবাই খাদ্যত্বর্যাদি আহার করত এবং হাটে-বাজারে চলাক্ষেত্রে করত। (উদ্দেশ্য এই যে, নবৃত্ত ও বানা বাওয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেমতে যাদের নবৃত্ত প্রমাণিত, আপনিকারীরা স্বীকার না করলেও তারা সবাই এসব কাজ করেছেন। সুতরাং আপনার বিরুদ্ধেও এই আপনি ভাস্ত। হে পয়গম্বর, হে পয়গম্বরের অনুসারীবৃন্দ, তোমরা কাফিরদের অনর্থক কথাবার্তা শুনে দুঃখিত হয়ো না। কেননা) আমি তোমাদের (সমষ্টির) এককে অপরের জন্য পরীক্ষাবৃক্ষপ করেছি। (এই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণকে উচ্চতের জন্যে পরীক্ষাবৃক্ষপ করেছি যে, দেখা যাক, কে তাদের মানবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করত মিথ্যারোপ করে এবং কে তাদের নবৃত্তের গুণবলীর প্রতি লক্ষ্য করত ও সত্যায়িত করে। যখন এককথা জানা গেল, (তখন) তোমরা কি (এখনও) সবর করবে? (অর্থাৎ সবর করা উচিত।) এবং (নিচয়) আপনার পালনকর্তা সবকিছু দেখেন। (সেমতে প্রতিশ্রুত সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কাজেই আপনি দৃঢ়খ্যিত হবেন কেন?)

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিবরণ :

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উন্নিখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞান কারণে একধা বশেছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিশুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, এক্ষণে করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাস্তের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশণ করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্যবেক্ষণ ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসলিমে আহ্মদ ও তিরমিয়ীতে হযরত আবু উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমস্ত মুক্তাভূমি ও তাঁর পর্বতসমূহকে সর্বে ঝুপান্তরিত করে দেই। আমি আর করলাম না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে থেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবর করব—এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে সর্বের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। —(মাযহারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণত : দরিদ্র ও উপবাসক্ষিণি থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয় ; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিন্দুশালী ও প্রশঁর্মশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঝৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফিরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফিরের এই ধারণা যে, আল্লাহর রাসূল মানব হতে পারে না—কেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে সীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন ; তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী নয় আয়াতে এই বিষয়ই বর্ণিত আছে।

মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ডিভিশীল : **وَجَعْلَنَا بِعُضْكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةٍ** ছিল। তিনি সকল মানবকে সমান বিভাগালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমসা ও নীচ থাকতে পারত না ; কিন্তু এর কারণে বিশ্বব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেয়া অবশ্যজাবী ছিল। তাই আল্লাহু তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবলও কাউকে দুর্বল করেছেন, কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও কাউকে অধ্যাত করেছেন। শ্রেণী, জাতি ও অবস্থার এই বিভিন্নের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রূপ ও সুস্থের অবস্থাও তদুপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে বড়, তখন তুমি কালবিলু না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চাইতে নিষ্পত্তরের—যাতে তুমি হিংসার গুলাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহু তা'আলা'র শোকের করতে পার।

**وَقَالَ اللَّهُ يَعْزِيزُ لَا يَرْجُونَ لِفَاءً نَالُوا لَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمُلِكَةُ أَوْ
نَرِى رَبَّنَا لَقِينَ اسْتَكْبِرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَنْهُمْ عَتَّوْ كَبِيرًا ②) يَوْمَ يَرْوَنَ
الْمُلِكَةُ لَا يُبْشِرُ يَوْمَيْنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ③)**

(২১) যারা আবার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবঙ্গীর্ণ করা হলো না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন ? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেঠে উঠেছে (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুস্বাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার আশংকা করে না, (কেননা, তারা কিয়ামত ও তাতে বিচারের সম্মুখীন হওয়া এবং হিসাব-নিকাশ হওয়া অঙ্গীকার করে,) তারা (রিসালত অঙ্গীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে আমাদের কাছে ফেরেশতা অবঙ্গীর্ণ করা হলো না কেন ? (যদি ফেরেশতা এসে বলে যে, তিনি রাসূল) অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে অত্যক্ষ করি (এবং তিনি নিজে আমাদেরকে বলে দেন যে, তিনি রাসূল, তবে আমরা মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ))—৫৮

তাঁকে সংজ্ঞ মনে করব। জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) তারা নিজের অঙ্গের নিজেদেরকে ঝুঁট বড় মনে করেছে। (তাই তারা নিজেদেরকে ফেরেশতা অথবা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সমোধনের যোগ্য বলে মনে করে। বিশেষ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে দুনিয়াতে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলার ফরায়েশে) তারা (মানবতার) সীমালংঘন করে অনেক দূর চলে গিয়েছে। (কেননা, ফেরেশতা ও মানবের মধ্যে তো কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা আছে; তারা উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ও মানবের মধ্যে অভিন্নতা ও সামঞ্জস্য নেই। তারা আল্লাহকে দেখার যোগ্য তো নয়ই; কিন্তু ফেরেশতা একদিন তাদের দৃষ্টিগোচর হবে। তবে যেভাবে তারা চায়, সেভাবে নয়, বরং তাদের আবাদ, বিপদ ও পেরেশানী নিয়ে) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে, (সেদিন হবে কিয়ামতের দিন) সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে আসতে দেখে অস্ত্র হয়ে) তারা বলবে, আশয় চাই, আশয় চাই।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالَ الْأَذِينُ لِيَرْجُونَ لِقَاءً رَجًا — شব্দের সাধারণ অর্থ কোন প্রিয় ও কাম্য কস্তুর আশা করা এবং কোন সময় আশংকা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। (কিতাবুল-আয়দাদ ইবনুল-আশুরী) এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে কেন্দ্র অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রক্রিয়া ও ফরায়েশ করার দৃঃসাহস সেই ক্ষয়তে পারে, যে এ পরকালে ঘোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী বাস্তির উপর পরকালের ভয় এত থাকে যে, সে ধরনের প্রশ়া করার ফুরসতই তারা পায় না। নব্যশিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানবলী সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতরকে প্রযৃত হয়। এটাও অঙ্গের পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকার আলাদত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ়া অঙ্গে দেখাই দিত না।

এর শাব্দিক অর্থ হ্যার — حَجْرًا مُّحْجَرًا এর তাকীদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা'থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয় : আশয় চাই ; আশয় চাই। অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশয় দাও। কিয়ামতের দিনেও যখন কাফিররা ফেরেশতাদেরকে আযাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা বলবে। হ্যরত ইবনে আববাস থেকে এর অর্থ حِرَام — حِرَام বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আযাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জালাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিথায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা জওয়াবে حِرَام — حِرَام বলবে। অর্থাৎ কাফিরদের জন্য জালাত হারাব ও নিষিক। —(মাবহারী)

وَقَدِّمْنَا إِلَيْ مَاعِلِمَوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُرًا ⑤ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ

يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقْرٌ أَوْ أَحْسَنُ مَقِيلًا ⑭ وَيَوْمٌ شَقِيقٌ السَّاعَةُ بِالْفَضَّامِ وَنَزَلَ
 الْمَلِكَةُ تَنْزِيلًا ⑮ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
 الْكُفَّارِ عَسِيرًا ⑯ وَيَوْمٌ يَعْصُمُ الظَّالِمُونَ عَلَى يَدِيهِ يَقُولُ يَلِيَّتِنِي اتَّخَذْتُ
 مَمْرُوكًا سَبِيلًا ⑰ يَوْمَئِذٍ لَيَتَنِي لَمْ اتَّخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا ⑱ لَقَدْ أَضَلَّنِي
 عَنِ الدِّرْكِ بَعْدَ أَذْجَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلنَّاسِنَ حَذَّرًا ⑲ وَقَالَ
 الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ⑳ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
 لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَى بِرِبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ㉑

(২৩) আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিণ্ণ ধূলিকণারূপ করে দেব। (২৪) সেদিন জাগ্রাত্তাদের বাসস্থান হবে উভয় এবং বিশ্বামহস্ত হবে মনোরম। (২৫) সেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ঘ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে, (২৬) সেদিন সত্যকার রাজত্ব হবে দয়াময় আচ্ছাহুর এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৭) জালিয় সেদিন আগন হস্তব্য দৎশন করতে করতে বলবে, হায় আক্ষসোস ! আমি যদি রাসূলের পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায় আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি জয়ুককে বস্তুরূপে প্রহণ না করতাম ! (২৯) আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান মানুষকে বিপদকালে দাগা দেয়। (৩০) রাসূল (সা) বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পদায় এই কোরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে। (৩১) এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শক্ত করেছি। আপনার জন্য আপনার পালনকর্তা পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (সেদিন) তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) সেসব (সৎ) কাজের প্রতি, যা তারা (দুনিয়াতে) করেছিল মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলোকে (প্রকাশ্যভাবে) বিক্ষিণ্ণ ধূলিকণা (অর্থাৎ ধূলিকণার ন্যায় নিষ্ফল) করে দেব। (বিক্ষিণ্ণ ধূলিকণা যেমন কোন কাজে আসে না, তেমনিভাবে কাফিরদের কৃতকর্মের কোন সওয়াব হবে না। তবে) জাগ্রাতবাসীদের

সেদিন আবাসস্থলও হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থলও হবে মনোরম । (مُقْبِلٌ وَمُسْتَقِرٌ) বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ জান্নাত তাদের আবাসস্থল ও বিশ্রামস্থল হবে । এটা যে উত্তম, তা বলাই বাহুল্য । যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ঘ হবে এবং (সেই মেঘলামার সাথে আকাশ থেকে) প্রচুর সংখ্যক ফেরেশতা (পৃথিবীতে) নামানো হবে, (তখনই আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব নিকাশের জন্য রি঱াজমান হবেন এবং) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব দয়াময় আল্লাহরই হবে । (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান-শাস্তিদানের কাজে কারও প্রভাব থাটবে না ; যেমন দুনিয়াতে বাহ্যিক ক্ষমতা অল্পবিস্তর অন্যের হাতেও থাকে ।) সেদিন কাফিরদের জন্য অভ্যন্তর কঠিন হবে । (কেননা, জাহান্নামই তাদের হিসাব-নিকাশের পরিণতি ।) এবং সেদিন জালিয় (অর্থাৎ কাফির অভ্যন্তর পরিতাপ সহকারে) আপন হস্তবয় দংশন করবে (এবং) বলবে, হায়, যদি আমি রাসূলের সাথে (ধর্মের) পথে থাকতাম । হায় আমার দুর্ভোগ, (একে করিনি ।) যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে বকুরপে গ্রহণ না করতাম । সে (হতভাগা) আমাকে উপদেশ আগমনের পর তা থেকে বিভাস্ত করেছে (সরিয়ে দিয়েছে) শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে সাহায্য করতে অঙ্গীকার করে বসে । (সেমতে সে এই বিপদকালে কাফিরের কোন সাহায্য করেনি । করলেও অবশ্য কোন লাভ হতো না । দুনিয়াতে বিভাস্ত করাই তার কাজ ছিল ।) এবং (সেদিন) রাসূল (আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে) বলবেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পদায় কোরআনকে (যা অবশ্য পালনীয় ছিল) সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করে রেখেছিল । (আমল করা তো দূরের কথা, তারা এদিকে ভুক্ষেপই করত না । উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা নিজেরাও তাদের পথভূষিত স্থীকার করবে এবং রাসূলও সাক্ষ্য দেবেন ; যেমন বলা হয়েছে ।) অপরাধ প্রমাণের এ দু'টি পছাই সর্বজনস্থীকৃত । স্থীকারোক্তি ও সাক্ষ্য—এ দু'টি একত্রিত হওয়ার কারণে অপরাধ প্রমাণ আরও জোরদার হবে যাবে এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে) এমনি ভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে প্রত্যেক নবীর শক্ত করেছি । (অর্থাৎ এরা যে, কোরআন অঙ্গীকার করে আপনার বিরোধিতায় ঘেরেছে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়, যার জন্য আপনি দৃঢ় করবেন) এবং (যাকে হিদায়াত দান করার ইচ্ছা হয়, তাকে) হিদায়াত করার জন্য ও (হিদায়াত বঞ্চিতদের মুকাবিলায় আপনাকে) সাহায্য করার জন্য আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فِي الْوَلَةِ مُقْبِلٌ شَدِّدَ الرَّحْمَنُ عَلَى حُكْمِهِ وَأَخْسَنَ مَقْبِلًا
শদের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল । مُقْبِلٌ শদের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল । এর উল্লেখ সন্তুত এ থেকে উদ্ভৃত । এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান । এখানে এর উল্লেখ সন্তুত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হামীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিপ্রহরের সময় সৃষ্টি জীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে । —(কুরুতুবী)

عَنِ الْفَعَامِ أَرْثَهُ مَقْبِلٌ السَّمَاءُ بِالْفَعَامِ
এর অর্থ আকাশ বিদীর্ঘ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নিচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে । এই মেঘমালা চাদোয়ার আকাশে আসবে এবং এতে আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতি থাকবে,

আশেপাশে থাকবে ফেরেশতার দল। এটা হবে হিসাব লিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিস্তই আকাশ বিদীর্ঘ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্রংস করার জন্য হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। —(বয়ানুল-কোরআন)

يَقُولُّ بِلَيْسَنِي لَمْ أَنْجُدْ فُلَانًا خَلِيلًا—এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবর্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনা এই : ওকবা ইবনে আবী মুয়াত্ত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, ইবাদতের তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগাভিত হলো। ওকবা ওয়র পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সা) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবশ্যন্নাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য এই কালেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল : আমি তোমার এই ওয়র কবূল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে খুখু নিক্ষেপ শা করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্ভত হলো এবং তদুপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে উভয়কে লাঞ্ছিত করেছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। —(বগভী) পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তঘয় দংশন করবে এবং বলবে : হায় আমি যদি অমুককে অর্পাং উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। —(মাযহারী, কুরতুবী)

দুর্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্বেষী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুভাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিষেশভাবে ওকবার ঘটনায় অবর্তীর্ণ হয়েছিল ; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে তা (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসলিমদের আহ্মদ তিরমিয়ী ও আবু দাউদে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لَا تَصَاحِبُ الْأَمْمَنَا وَلَا يَكُلُّ مَالِكُ الْأَنْتَفِي

ধন-সম্পদ (বস্তুতের দিক দিয়ে) যেন পরহিযগার ব্যক্তিই থায়। অর্থাৎ পরহিযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বস্তু করো না। হ্যরত আবু হুয়ায়ির জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : — المَرءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلِيَنْظُرْ مِنْ يَخْالَلِ — প্রত্যেক মানুষ (অভ্যাসগতভাবে) বস্তুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিঙ্গুপ লোককে বস্তুরপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পুরৈই ভেবে দেখা উচিত। —(বৃথাবী)

হ্যরত ইবনে আবুআস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বস্তুদের মধ্যে কারো উত্তম ? তিনি বললেন : من ذكركم بالله رويته و زاده من ذكركم في علمكم منطقه و ذكركم بالآخرة عمله — অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের সূতি তাজা হয়। —(কুরতুবী)

—وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا—অর্থাৎ রাসূল মুহাম্মদ (সা) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পদায় এই কোরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সভাবনাই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যিত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জওয়াবে তাঁকে সাম্মত দেয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে—رَكَذَكَنْ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِيٍّ مَدْعُواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ—অর্থাৎ আপনার শক্তরা কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহর চিরস্মন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শক্ত থাকে এবং পয়গবরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কোরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অঙ্গীকার করা, যা কাফিরদেরই কাজ। কিন্তু কোন রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু শীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হ্যরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مِنْ تَعْلِمِ الْقُرْآنِ وَعَلِقَ مَصْحَفُهُ لَمْ يَنْعَاهِدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتَعْلِقاً بِهِ يَقُولُ يَارَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ عَبْدَكَ هَذَا اتَّخَذَنِي مَهْجُوراً فَاقْضِ بَيْنِي وَبِيْنِهِ —

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বক্ষ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে ; শীতিমত তিলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন ঝূলস্ত অবস্থায় উপ্তিত হবে। কোরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন। —(কুরতুবী)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً

كَذَّلِكَ لِنُثِّتَ بِهِ فَوَادَكَ وَرَتَّلَهُ تَرْتِيلًا ۝

(৩২) সত্য ধর্মাখ্যানকারীরা বলে, তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ হলো না কেন ? আবি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিররা বলে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) প্রতি কোরআন এক দফায় অবতীর্ণ করা হলো না কেন ? (এই আপত্তির উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন আল্লাহ'র কালাম হলে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার কি প্রয়োজন ছিল । এতে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই চিন্তা করে করে অল্প অল্প রচনা করেন । এর জওয়াব এই যে,) এমনিভাবে (ক্রমে ক্রমে) এজন্য (অবতীর্ণ করেছি) যাতে এর মাধ্যমে আমি আপনার হন্দয়কে মজবুত রাখি এবং (এজন্যই) আমি একে অল্প অল্প করে (তেইশ বছরে) নাযিল করেছি ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে কাফির ও মুশুরিকদের আপত্তিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল । এটা সেই পরম্পরারাই অংশ । আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য । পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে । প্রথম, এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে । একটি বৃহদাকার প্রস্তুতি এক দফায় নাযিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না । সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনক্রমে পেরেশানী থাকে না । তৃতীয়, কাফিররা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সাম্মানার জন্য কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত । সমগ্র কোরআন এক দফায় নাযিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা স্পর্কিত সাম্মান বাণী কোরআন থেকে ঝুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মষ্টিক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরী ছিল না । তৃতীয়, আল্লাহ'র সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ । আল্লাহ'র পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ'র সঙ্গে আছেন । পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য আছে । তন্মধ্যে কতক সূরা বলী ইসরাইলের, আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে । (বয়ানুল কোরআন)

وَلَا يَأْتُونَكُمْ بِمِثْلِ إِلَيْجِنَاتِكَ بِالْحَقِّ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ يَعْشُونَ
 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ لَا أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ وَلَقَدْ أَتَيْنَا
 مُوسَى الْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرَانَ ۝ فَقُلْنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِهِمْ فَلَمْ يَرْمُّهُمْ تَدْمِيرًا ۝

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থিতি করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ ধূবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহানামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট। (৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাতা হারুনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্পদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে খৎস করে দিয়েছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা আপনার কাছে যত অভিনব প্রশ্নেই উপস্থিতি করুক আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি (যাতে আপনি বিরোধীদেরকে উত্তর দেন। এটা বাহ্যিত হৃদয় মজবুত করার বর্ণনা, যা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অবঙ্গীর্ণ করার এক রহস্য হচ্ছে আপনার অন্তর মজবুত করা। কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উপস্থিতি হলে তৎক্ষণাত্মে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জওয়াব প্রদান করা হয়)। তারা এমন লোক, যাদেরকে মুখ ধূবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহানামের দিকে একত্রিত করা হবে। তাদের স্থান নিকৃষ্ট এবং তাঁরা তরিকার দিক দিয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। (এ পর্যন্ত রিসালত অঙ্গীকার করার কারণে শান্তিবাণী এবং কোরআনের বিষয়ে আপত্তিসমূহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এর সমর্থনে অভীত যুগের কতিপয় ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে, যাতে রিসালত অঙ্গীকারকারীদের পরিণতি ও বিস্ময়কর অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য সাম্মনা ও হৃদয় মজবুত করার উপকরণ আছে। আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী পয়গমরণকে যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে শক্তির উপর প্রবল করেছেন, আপনার ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথম ঘটনা হয়েরত মুসা (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে যে,) নিচয়েই আমি মূসাকে কিতাব (অর্থাৎ তওয়াত) দিয়েছিলাম এবং (এর আগে) আমি তাঁর সাথে তাঁর ভাই হারুনকে তাঁর সাহায্যকারী করেছিলাম। অতঃপর আমি (উভয়কে) বলেছিলাম, তোমরা সেই সম্পদায়ের কাছে (হিদায়াত করার জন্য) যাও, যারা আমার (তওয়ীদের) প্রমাণাদিকে মিথ্যারোপ করেছে (অর্থাৎ

ফিরাউন ও তার স্পন্দায়। সেমতে তাঁরা সেখানে গেলেন এবং বুঝালেন ; কিন্তু তাঁরা মানল না। অতঃপর আমি তাদেরকে (আব্যাব থাঁরা) সমূলে ধ্রংস করে দিলাম (অর্থাৎ সমুদ্রে নিষ্পত্তি করে দিলাম)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—اَلْذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا —এতে ফিলাউন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মুসা (আ)-এর প্রতি অবস্থীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতকে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং আয়াতের অর্থ—হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধিজ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে—এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। মিথ্যারোপ দ্বারা এসব ঐতিহ্যের অবীকৃতি বুঝানো হয়েছে : যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে এবং جَامِكُمْ يَنْسُفُ مِنْ قَبْلِ بَأْيَاتِنَا —এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে। —(বস্তানল কোরআন)

(৩৭) নৃহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিয়জিত করলাম, এবং তাদেরকে মানবমঙ্গলীর জন্য নির্দশন করে দিলাম। জালিমদের জন্য আমি যদ্রোগাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধৰ্ম করেছি আদ, সামুদ, কৃপবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ণিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশক্ত করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রোপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, 'এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না ধাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পথচার। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে ? তবুও কি আপনি যিন্দিদার হবেন ? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে ? তারা তো চতুর্পদ জন্মুর মত ; বরং আরও পথভ্রান্ত !

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নৃহের সম্প্রদায়কেও (তাদের সময়ে) আমি ধৰ্ম করেছি। তাদের ধৰ্ম ও ধর্মসের কারণ ছিল একুপ। তারা যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে (প্রাবনে) নিয়জিত করে দিলাম এবং তাদের (ঘটনা)-কে করে দিলাম মানব জাতির জন্যে (শিক্ষার) নির্দশনস্বরূপ। (এ হলো দুনিয়ার শাস্তি) এবং (পরকালে আমি (এই) জালিমদের জন্যে মর্মসূদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আমি ধৰ্ম করেছি আদ, সামুদ, কৃপবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। আমি (তাদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকের (হিন্দায়াতের) জন্যে অভিনব (অর্থাৎ কার্যকরী ও প্রাঞ্জল) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি এবং (যখন তারা মানল না, তখন) আমি সবাইকে সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম করে দিয়েছি। তারা (কাফিররা সিরিয়ার সফরে) সেই জনপদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যার উপর বর্ণিত হয়েছিল (প্রস্তরের) মন্দ বৃষ্টি (প্রত্তের সম্প্রদায়ের জনপদ বুবানো হয়েছে)। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ? (এরপরও শিক্ষা গ্রহণ করে কুফর ও মিথ্যারোপ ত্যাগ করে না, যার কারণে সূত্রের সম্প্রদায় শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আসল কথা এই যে, শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণ প্রত্যক্ষ না করা নয় ;) বরং (আসল কারণ এই যে,) তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের আশক্তই রাখে না (অর্থাৎ পরকালে বিশ্বাস করে না, তাই কুফরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে না এবং পূর্ববর্তীদের বিপর্যয়কে কুফরের দুর্ভেগ মনে করে না ; বরং আকর্ষিক ঘটনা মনে করে)। যখন তারা আপনাকে দেখে, তখন কেবল ঠাট্টা-বিদ্রোপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে (এবং বলে ৪) এই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? (অর্থাৎ এমন নিঃশ্ব ব্যক্তির রাসূল হওয়া ঠিক নয়। রিসালত বলে কোন কিছু থাকলে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির রাসূল হওয়া উচিত। সুতরাং সে রাসূলই নয়। তবে স্তুতির বর্ণনাভঙ্গি এত চিন্তাকর্ষক যে,) সে তো আমাদেরকে আমাদের

উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তরপে) আঁকড়ে না থাকতাম। (অর্থাৎ আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে পথঝোঞ্চ এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল, (তারা নিজেরা না পয়গম্বর? এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাচ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাচ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অবস্থাকার করা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে যা ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে)। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে তার প্রত্যুত্তিকে? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন? অথবা কি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে? (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়াত না পাওয়ার কারণে আপনি দৃঢ়বিত্ত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়াত আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বুঝেও না;) তারা তো চতুর্পদ জন্ম ন্যায়, (চতুর্পদ জন্ম কথা শোনে না এবং বুঝেও না) বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট। (কারণ, চতুর্পদ জন্ম ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয়; কাজেই তাদের না বুঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন। এরপরও তারা বুঝে না। এছাড়া চতুর্পদ জন্ম ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়: কিন্তু তারা অবিশ্বাসী। আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, বরং প্রত্যুত্তির অনুসরণই এর কারণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নৃহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অর্থাৎ তাদের যুগের পূর্বে কোন রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হ্যরত নৃহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল।

—অভিধানে الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— শব্দের অর্থ কাঁচা কৃপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিস্তীর্ণ কৃপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামুদ্র গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কৃপের ধারে বাস করত। (কামুস, দূরবে মনসুর) তাদের শান্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ হাদীস বিবৃত হয়নি।—(বয়ানুল কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রত্যুত্তির অনুসরণ এক প্রকার মৃত্তিপূজা : ﴿إِنَّمَا يَنْهَا مَنْ أَنْفَدَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ﴾। এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রত্যুত্তির অনুসারীকে প্রত্যুত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হ্যরত ইবনে আববাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রত্যুত্তি এক প্রকার মৃত্তিয়ার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। —(কুরতুবী)

أَمْ تَرَى رِبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظِّلَّ ؟ وَأَوْسَأَ لَجْعَلَةَ سَاكِنًا ؟ ثُمَّ جَعَلْنَا^{٨٥}
 الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا^{٨٦} ثُمَّ قَضَنَاهُ إِلَيْنَا قَبْصًا يَسِيرًا^{٨٧} وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمُ الْيَوْمَ لِيَكَاسِأَ النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا^{٨٨} وَهُوَ الَّذِي
 أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً طَهُورًا^{٨٩}
 لِنَجْعَلَ بِهِ بَلَدًا مَيِّتاً وَمُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقَنَا آنْعَامًا وَآنَاسِيَ كَثِيرًا^{٩٠}
 وَلَقَدْ صَرَّفَنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدِنَ كُفُوَادٌ فَابْنَ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا^{٩١} وَلَوْ
 شِئْنَا بَعْثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا^{٩٢} فَلَا تُطِيعُ الْكُفَّارِينَ وَجَاهَهُمْ
 بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا^{٩٣} وَهُوَ الَّذِي مَرَحَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبُ فَرَاتٍ وَهَذَا أَمْلَمُ
 أَجَاجٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا^{٩٤} وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ
 الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِيَّاً وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا^{٩٥} وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ
 سَبِّهِ ظَهِيرًا^{٩٦} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا^{٩٧} قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَيَّ رَبِّهِ سَدِيرًا^{٩٨} وَتَوَكَّلْ عَلَىَ الْحَيِّ
 الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذَنْبِ عِبَادِهِ خَيْرًا^{٩٩}
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّّاً مِنْهُمْ أَسْتَوِي عَلَىَ
 الْعَرْشِ^{١٠٠} الرَّحْمَنُ فَسَلِّبْ بِهِ خَيْرًا^{١٠١} وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا إِلَّا رَحْمَنٌ

سْبَد
قَالُوا مَا الْرَّحْمَنُ أَنْسِجَدَ لِمَا تَأْمُلُوا زَادَهُمْ نَفْرَةً ۖ ۶۰ ۖ تَبَرُّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجَانًا وَقَرَامِنْتِيرًا ۖ ۶۱ ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ أَيْلَ وَاللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ ۶۲ ۖ

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছাড়াকে লও করেন ? তিনি ইচ্ছা করলে একে হির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য মাঝিকে করেছেন আবরণ, নিম্নাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই বীয় রহস্যের থাকালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা দ্বারা মৃত ভূতাগকে সঞ্চালিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্টি অনেক জীবজন্ম ও মানবের ত্বক নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তাদ্বা শৰণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ডয়া প্রদর্শকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংথাম করুন। (৫৩) তিনিই সমাজালে দুই সম্মুখ প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, তৃক্ষা নিবারক ও একটি লোনা, বিশ্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অস্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর মৃত্যুপত, বৎশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপৰ্দশনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সর্তর্ককারীরপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিয়য় চাই না ; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরজীবের উপর ডরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বাস্তাহ উন্নাহ সম্পর্কে যথেষ্ট ধৰণদার। (৫৯) তিনি নভোমগল, ভূমগল ও একদৃষ্টয়ের অস্তর্ভূতী সবকিছু হয়দিলে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাজীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়ায়ীকে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়ায়ী আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব ? এতে তাদের পক্ষায়নপ্রতাই বৃক্ষি পায়। (৬১) কল্যাণয় তিনি, যিনি নভোমগলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও উজ্জ্বল্যময় চন্দ্ৰ। (৬২) দ্বারা

অনুসঙ্গানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলভাবে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে সম্মানিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডযামান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত করেন ? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠলেও ছায়া ভ্রাস পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌছে ; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি।) অতঃপর আমি সূর্যকে (অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) উপর (একটি বাহ্যিক) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের ভ্রাস-বৃক্ষের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ তা'আলা'র ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয় ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা' দুনিয়াতে সৃষ্টি বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে শুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেষিত হতে থাকে। যেহেতু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহর কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই “নিজের দিকে শুটিয়ে আনি” বলা হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জ্ঞাত হওয়ার সময়—এদিক দিয়ে যেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাকালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির আশা সঞ্চার করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পরিত্রাতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টি অনেক জীবজন্ম ও মানুষকে পান করাই। আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগীতা পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কৃফুর ও শিরক। কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা ওপনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না। আপনি একাই কাজ করে যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য আপনার পুরক্ষার ও নৈকট্য বৃক্ষি করা।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গঘর প্রেরণ

করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব দায়িত্ব অর্পণ করতাম না ; কিন্তু যেহেতু আপনার পুরুষার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এক্ষণ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহর নিয়ামত)। অতএব (এই নিয়ামতের ক্রতজ্ঞতায়) আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন ঘোর (অর্থাৎ কোরআনে যেসব গ্রহণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই তাওহীদের প্রয়াগাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ঘোর) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। (অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তাওহীদের প্রয়াগাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্টি, ত্ত্বিদারুক এবং একটির পানি লোনা, বিস্তাদ এবং (দেখার মধ্যে পরম্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে (স্বীয় কুদরত ঘোর) একটি অস্তরায় ও (সত্ত্বিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা হয়ং প্রকাশ ও অনুভূত নয় ; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্থানের পার্শ্বক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ)। এখানে ‘দুই সমুদ্র’ বলে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। একপ স্থানে পানির পৃষ্ঠাদেশ এক মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তী অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেস্থানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্টি ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা উপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা আলাদা দেখা যায়। মাঝলানা শাকীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাংলা ভাষী আলিমের সাক্ষ্য উন্নত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা এ অপরটির পানি কালো। কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উভাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি হ্রিণ থাকে। সাম্প্রান সাদা পানিতে চলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্নোতরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রমতি এই যে, সাদা পানি মিষ্টি এবং কালো পানি লোনা। আমাক কাছে বরিশালের জনৈক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নির্গত দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটি পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু। আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাক্টেল, জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে ধোয় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার ভাটা হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে

লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরম্পর যিশে যায় না। উপরে লোমা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপর থেকে লোনা পানি সরে যায় এবং মিঠা পানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। **أَعْلَمُ أَطْلَابِي**, এসব সাক্ষ্য প্রমাণদণ্ডে আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও এককার হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকে! তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীর্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রজগত বৎশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সে মতে বাপ, দাদা ইত্যাদি শরীয়তগত বৎশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বৎশ। জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও কুদরতের অমান যে, আল্লাহ বীর্যকে কিরণে রজবিষ্ট করে দেন এবং এটা নিম্নামতও; কারণ এসব সম্পর্কের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারম্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রাখিত হয়েছে। হে সরোধিত ব্যক্তি! তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান। (আল্লাহর পরিপূর্ণ সম্মা ও শুণাবলী দ্রষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল; কিন্তু) তারা (মুশুরিকরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার বিকল্পাচরণকারী। (কারণ, তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিকল্পাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল (মুমিনদেরকে জাল্লাতের) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোষব থেকে) সতর্ককারীরাঙ্গে প্রেরণ করেছি। (তারা বিধাস স্থাপন না করলে আপনার কিছিতি; আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এবং চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন আল্লাহর বিরোধী তখন আল্লাহর দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না; বরং তারা আমার স্বার্থপ্রস্তা ভেবে এদিকে ঝুকেপও করবে না। অতএব অস্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরণে সংশোধন করা যায়; সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি আপনি ইশ্বরা ইঙ্গিতে কিংবা মৌলিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে) আপনি (জওয়াবে এতটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্ধাং প্রচারকার্যের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, (আমি অবশ্যই তা চাই)। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন না; বরং প্রচারকার্যে সেই চিরজীবের উপর ভরসা করলে, যার মৃত্যু নেই এবং নিশ্চিতে তাঁর সপ্রশংস পরিব্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শান্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ) বাস্তার শুনাই সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শান্তি দেবেন। সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘনোক্ত ও চিন্তা দূর করা হয়েছে।]

অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের অঙ্গবর্তী সরকিছু হয় দিলে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (—যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাচীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর জন্য উপবৃক্ষ ; এ সম্পর্কে সূরা আরাফের সপ্তম মুক্তির শুরুর আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাঁকে জিজেস কর (যে তিনি কিরণ ? কাফির ও মুশরিকরা কি জানে)। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে ; যেমন আল্লাহু বলেন, ﴿فَإِنَّ اللَّهَ حُقْقُ قَدْرٍ﴾ তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন (যুর্বতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে ? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে বলছে ?) তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব ? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল ; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা স্বত্তে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমগুলে বৃহদাকারের নকশা সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উজ্জ্বল ও উপকারী নকশা অর্ধাংশ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সঙ্গৰত প্রথরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও দিনকে একে অপরের পক্ষাংগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রাপ্তি ও আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (মুক্তির) জন্য, যে বুরতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত চায়। কারণ, এতে সমর্কদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ামত বর্তমান। নতুবা

اگر صد باب حکمت پیش نداد
بخوانی ایدش بازیچہ در گوش

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৃষ্টি বন্ধুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বাস্তুর প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

সৃষ্টি বন্ধুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলী রৌদ্র ও ছায়া দুইটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীবজন্মের জন্য যে কি জীবন বিপদ হতে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থার্কতে পারে না এবং অন্যন্য হাজারো কাজও এতে বিপ্লিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতসমূহ সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আয়াম ও প্রক্ষেপণ দ্বারা মুনিয়ার সৃষ্টিবন্ধুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ষ করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অঙ্গিত্ব লাভ মা'আরেফুল কুরআন (৬৪) — ৬০

করে, তখন এই বস্তুসমূহও অঙ্গিত লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শাক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অঙ্গিতও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও ত্তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ ঘেঁঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন আটুট ও শক্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাও দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্টি দিবারাত্রি ও দৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন আটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শক্ত শক্ত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেন্ডেও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কথনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংকার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অঙ্গিত লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক করে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই আটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টিশক্তি এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দৃষ্টিতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্মৃতি ও প্রতু মনে করতে প্রয়োজন করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত্ত হয়ে গেছেন। তাই পয়গঢ়িরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে আর আর হিঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোলা এবং তীক্ষ্ণকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অভ্যরণে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই ব্রহ্ম উদয়াটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে—*إِنَّمَا تُرَىٰ لِلَّٰهِ كَيْفَ مَدْعُولٌ*। আয়াতে গাফিল মানুষকে হিঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে। এরপর আস্তে আস্তে ত্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মক্ষে ধরা পড়ে না। এ জন্য অন্তচক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দ্রবকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তচক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার ত্রাস বৃক্ষি ঘনিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যাঁর সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামিত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে

সর্বদাই ছায়া থাকত । কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি একেলু করেননি ।

ମାନୁଷକେ ଏହି ସ୍ଵର୍ଗପ ସମ୍ପଦକେ ଅବଗତ କରାର ଜଳ୍ୟ ଛାୟାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ହ୍ରାସ ପାଓଯାକେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆଯାତେ ଏତାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଁଥେ : ۱۷۴ ﴿يَسِيرًا﴾ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଃପର ଛାୟାକେ ଆୟି ନିଜେର ଦିକେ ଶୁଟିଯେ ନେଇ । ବଲା ବାହ୍ୟ, ଆମ୍ବାହ୍ୟ ତା'ଆଲା ଶରୀର, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଦିକେର ଉର୍ଧ୍ଵେ । ତା'ର ଦିକେ ଛାୟା ସଂକୁଚିତ ହେୟାର ଅର୍ଥ ଏଟାଇ ଯେ, ତା'ର ସର୍ବମୟ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରାଇ ଏସବ କାଜ ହୁଏ ।

ରାତ୍ରିକେ ନିଦ୍ରାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଦିନକେ କର୍ମବ୍ୟକ୍ତତାର ଜନ୍ୟ ମିର୍ଧାରଣ କରାର ମଧ୍ୟେ ଓ ରହସ୍ୟ ନିହିତ ଆଛେ ଆୟାତେ ରାତ୍ରିକେ **وَهُوَ الْأَذ୍ୱି جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَى سَبَّاً وَالنَّوْمُ سُبَّاً وَجَعَلَ النَّهَارَ شُسُّراً** : ‘ଲେବାସ’ ଶବ୍ଦ ଜରା ବ୍ୟକ୍ତ କରା ହେଁଲେ । ଲେବାସ ଯେମନ ଯାନବଦେହକେ ଆବୃତ୍ କରେ, ରାତ୍ରିଓ ତେମନି ଏକଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଆବରଣ, ଯା ମସର ସୃଷ୍ଟି ଜଗତେର ଉପର ଫେଲେ ଦେଯା ହୁଯା । ବସ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ଥେକେ ଉତ୍କୃତ । ଏର ଆସଲ ଅର୍ଥ ଛିନ୍ନ କରା । ଏମନ ବସ୍ତୁ, ଯଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକେ ଛିନ୍ନ କରା ହୁଯା । ନିଦାକେ ଆସ୍ତାହୁ ତା’ଆଳା ଏମନ କରେଛେ ଯେ, ଏର ଫଳେ ସାରା ଦିନେର ଫ୍ରାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରାନ୍ତି ଛିନ୍ନ କଥା ଦୂର ହେଁ ଯାଇ । ଚିନ୍ତା ଓ କଲନା ବିଚିନ୍ତି ହେଁ ମହିନିକ ଶାନ୍ତି ହୁଯା । ତାଇ ଏର ଅର୍ଥ କରା ହୁଯା ଆରାମ, ଶାନ୍ତି । ଆୟାତେର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆମି ରାତ୍ରିକେ ଆବୃତ୍ କାରୀ କରେଛି, ଅତଃପର ତାତେ ମାନୁଷ ଓ ପ୍ରାଣୀଦେର ଉପର ନିଦ୍ରା ଚାପିଯେ ଦିଯେଛି, ଯା ତାଦେର ଆରାମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଉପକରଣ ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরোহ বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা ব্যাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আহ্লাদ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাখিকে অঙ্গকারাঙ্গনে করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাখি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্মের নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। মতুরা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যাপারট সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতরভাবে বিপ্লিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার আগবঞ্চের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিম্নোর জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসম্বেদে সাধারণ আইন ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে হিসীকৃত বিশ্বাদিতে ঘূষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্ষতি-বিচৃতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাৎ ব্রাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্মের এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত্ত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। **فَنَبَارَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**

আল্লাহ্ তা'আলা স্বাক্ষে দিনকে শুরু অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমঙ্গলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুনা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বক্ষ থাকত, রাতে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বক্ষ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারম্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সক্ষয়ায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যক্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

طَهُورٌ — وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا — এশদটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে আরবী ভাষায় যা নিজেও পরিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পরিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ শুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পরিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কৃপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পরিত্র ও অপরকে পরিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজয়া এর প্রমাণ।

পর্যাণ পানি—যেমন পুরুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাণ ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর মাধ্যাবৰ্তী ও কুরআনীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহৰ সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

—**إِنَّسِيٌّ شَكْرِيٌّ** — وَنُسْقِبَةٌ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسِيٌّ كَثِيرًا — এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মাটিকে সিক করেন এবং জীবজগ্নি ও অনেক মানুষের ত্বক্ষা নিবারণ করেন। এখানে প্রশিদানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজগ্নি যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা ত্বক্ষা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও ত্বক্ষা নিবারণ করে। এতদসন্দেশেও আয়াতে ‘অনেক মানুষের ত্বক্ষা নিবারণ করি’ বলার কারণ কি? এতে তো বুবা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বাস্তিত আছে। উন্তর এই যে, এখানে ‘অনেক মানুষ’ বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বুবানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর তরস্যা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

—**وَلَئِنْ صَرَفْنَاهُ بِيَنْهُمْ** — আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে শুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হ্যারত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশক্তি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহ্ র নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ত্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও ইঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আয়াব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহ্ র বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আয়াব ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ ৪: এই আয়াত মঙ্গায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিশ্বারে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শক্তিদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থাৎ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রয়ত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কল্পের সাহায্য হোক কিংবা অন্য কোন পছায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

—**وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فَرَاتٍ وَهَذَا مَلْحُ أَجَاجٍ** — শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে স্বাধীন করে বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। মিঠা পানিকে বলা হয়। এর অর্থ সুপেয় ফ্রান এর অর্থ লোনা এবং এর অর্থ তিঙ্গ বিহাদ।

আল্লাহ্ তা'আলা সীয়ে কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই থকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ

বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীক্ষ্ণ লোনা ও বিশ্বাদ। পৃথিবীর হৃষ্টভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের ত্বক্ষানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে একেপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ্ তা'আলা হৃষ্টভাগে বিভিন্ন প্রকারের সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে হৃষ্টভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জলজ-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই যাবে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দুচার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গক্ষে ভূগৃহের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুর্কহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এত তীক্ষ্ণ লোনা, তিক্ত ও তেজক্তিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত ও অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিশৃঙ্খল হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী নহর সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরম্পরে মিথিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অন্তিক্রম্য অস্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا وَصَهْرًا—পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয় তাকে বলা হয় এবং ক্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুস্থি ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজ করতে পারে না।

فُلْ مَا أَسْتَكِنُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ إِنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا—অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ্ তা'আলা বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পূরকার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহ্'র পথ অবলম্বন করবে, বলা বাহ্য্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্'র পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসূলত সেই-মততার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোন বৃক্ষ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ একেও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজ করে, এই সৎকাজের সওয়াব কর্ম নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে।—(মাযহারী)

অর্থাৎ নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গল সংষ্ঠি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাচীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আচ্ছাহৰ কাজ। এ বিষয়ের সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে ইলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। ‘ওয়াকিফহাল’ বলে আচ্ছাহ তা’আলা হয়ং অথবা জিবরাইলকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশ্বী ঘষ্টসম্মহের পশ্চিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। —(মাধ্যহারী)

এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অঙ্ককার, আলো এবং নভোগুল ও ভূগুলের সমগ্র সৃষ্টিগুল এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিঞ্চলীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বয়ো
ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বাস্তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিঞ্চাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অথবা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্রংস হয়ে
যায়।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْذَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ঘাট বছর হয় এবং তাঁর অর্ধেক প্রিশ বছর নিম্নায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায়; অবশিষ্ট মাত্র পিশ বছর কাজে লাগে কোরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, এহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর এ কথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্মৃষ্টি ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমঙ্গল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলোকিক ও পারলোকিক কোন মাস'আলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোন অকাঠ্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়াবিত্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশি কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদয়ত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃতিম উপপ্রক্রিয়া উৎক্ষেপণ,

চন্দ্র পৌছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং তহা ও পাহাড়ের কটো সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিষয়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিভাষের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিণ্ণ করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাকুৰ অভিজ্ঞতাকে অঙ্গীকার করে বসে এবং কেউ কোরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ পথে অয়োজনযাহিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করি। সূরা হিজরের *وَلَمْ جُلِّنَا فِي السَّمَاءِ بِرُوْجًا* আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রূতি দেওয়া হয়েছিল যে, সূরা আল ফুরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ :

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে মহাশূন্যে? আটান ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী : *إِنَّمَا فِي السَّمَاءِ بِرُوْجًا* এ বাক্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা বুঝে আছে :

أَلمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ مُلْبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

—سبع سماوات—*فِيهِنَّ*—এর সর্বনাম এতে *نُورًا وَجَعَلَ الشَّفِّينَ سِرَاجًا*—কে বুঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রধিনাযোগ্য। প্রথম, কোরআনে *سَمَاء* শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল স্ট্রটেজুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই স্ট্রটেজুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহাড়া নিয়োজিত আছে। এই স্ট্রটেজুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। কোরআনের শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ বস্তুকেও স্মা—বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিষ্কল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও *سَمَاء* শব্দের অর্থের মধ্যে দাখিল। *وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا: طَهُورًا*। ও এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাকুৰ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বরং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা। থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা *مَنْ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَنْدَبِ*—*أَنْ تَحْنَ الْمَنْدَبَ*, এতে এই অর্থ উচ্চ মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, উচ্চ মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ, না আমি করেছি। অন্যত্র বলা হয়েছে, *وَأَنْزَلْنَا مِنْ* *شَبَّابَةً*—এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, উচ্চ মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাকুৰ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে,

সেগুলোতে অধিকাংশ তৎক্ষণাত্মক শব্দের ছিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমগ্নল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তৎক্ষণাত্মক শব্দের বর্ণনা অনুযায়ী শব্দটি শূন্য পরিমগ্নল ও আকাশলোক—উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাই হিসেবে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সঞ্চাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমগ্নলেও হতে পারে। এই উভয় সঞ্চাবনার বর্তমানে কোন অকাঠ্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাধ্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমগ্নলে। বরং কোরআনের ভাষাদ্বাটে উভয়টিই সংষ্কৃত। সৃষ্টিগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাকুৰ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টিগতের স্বরূপ ও কোরআন ৩ এখানে নৌতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টিগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টিগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টিগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভৃত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিশ্বয়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলোকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অঙ্গিত লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমগ্নলের সৃষ্টিবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কল্পনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যোকেই নিজ চোখে দেখে এবং বুঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অন্ত, চন্দ্রের ত্রাসমূহি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন খাতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির ত্রাসবৃক্ষির বিশ্বয়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দ্বারা শূন্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বুবার জন্য কেন্দ্ৰীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানবন্ধনের যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহুন জানায়নি। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনাই দাওয়াত দেয়, ইহা সাধারণ চাকুৰ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে করীয় (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম শানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি যা 'আরেফুল কুরআন (৬৭)—৬১

করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা। এবং আকাশগোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি যোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টিগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর ব্রহ্মপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল ; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিসর, শায়, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযবৃত্ত ঈসা (আ)-এর ধোচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেঙ্গলীযুক্তের মতবাদ বিষে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পরিত্র সভার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে জঙ্গেপও করেননি। এ থেকে নিচিতরাপে জানা যায় যে, সৃষ্টিগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য করিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবাব্দিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা যনে করেন যে, মহাশূন্য প্রমণ, চন্দ, যজ্ঞলগ্ন ও উত্তুগ্রহ আবিকারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভূল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্টিগৎ ও সৃষ্টিবৃত্ত সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞানোচ্চিত নীতি ও পছন্দ এটাই যে, সে অত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিচয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসূলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভূল বরং সম্মেহ ও অঙ্গুরতা আরও বাঢ়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের ঘনযিলে-ঘনসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশহৃ সৃষ্টিগতের উর্ধ্বে স্টার ইল্য অনুযায়ী জীবন শাপন করে জান্মাতের চিরহ্যায়ী নিয়ামত ও শাস্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টিগতের ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর গভীরেক্য এবং প্রাত্যক্ষিক নব নব জ্ঞানবিকার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিচিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমগ্নলের সৃষ্টিগৎ, যেহ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট যথলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্ম, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাকুব অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক

তথ্যানুসন্ধানের পক্ষিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোভি পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ যাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা- হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভাস্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোভি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাকুৰ অভিজ্ঞতা আরা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলা যায় যে, *جعلنا في السماء بروجا* মক্তবসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমগ্নলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ এই-উপগ্রহে পৌছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, মক্তবসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাকুৰ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, মক্তবসমূহকে শূন্য পরিমগ্নলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয় ; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভাস্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইল্ল্যা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না ; বরং দাবিকেই ভাস্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মক্তবসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমূসীয় মতবাদকে ভাস্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে মক্তবসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেংলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেংলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা

করেন। এই উভয় পক্ষা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত মীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অঙ্গীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নাতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশত এগুলোকে কোরআন ও সুন্নাতের খেলাফ মনে করে সদর্দের পেছনে পড়ে থায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর তফসীরে ক্লহল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অন্যান্য প্রাচ্য ও পাকাত্ত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নায় গভীর জ্ঞানী, তেমনি আচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোক্তথিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলুসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম **امانٰ على القرآن مما يعنى به الـجـبـدةـالـقـوـيـةـالـبـرـهـانـ** এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের যত্বাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্দের আবশ্য নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে গীর্খিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উন্নত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন :

رأيت كثيرا من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب
والسنة على أنها بخلافت شيئاً من ذلك لم يلتفت إليها ولم نؤول
النصوص لاجلها والتلوييل فيها ليس من مذاهب السلف الحرية
بالقبول بل لابد أن نقول إن المخالف لها مشتمل على خلل فيه فأن
العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل كل منها يصدق الآخر
ويؤيدـهـ

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহবিবরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহর সদর্দের করব না। কেননা, একপ সদর্দে পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে যত্বাদ কোরআন ও সুন্নাহবিবরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না ; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা আচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা

দিতেন। তাঁর পর স্থিতের জন্যের প্রায় একশত চাহিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের ঘোষীয় শুরু বেংলীমূস কুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যত্নপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেংলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরম্পরাবরোধী ছিল। বেংলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় ধীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেংলীমূসের মতবাদই আরবী প্রাচুর্যিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজ্ঞাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেংলীমূসের মতবাদ ভাস্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী অ্যোদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেংলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেবল আছে এবং সব ভারী বস্তু ব্রহ্মাবতী কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নকশা ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

আধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু রায়হান আলবেকজনীর গবেষণার সাহায্যে রক্ষেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাকুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রক্ষেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কোশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশ্যে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শক্তি-মিত্র সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিডিগ্র চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য স্মরণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন প্রেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শক্তি-মিত্র সবাইই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি

আমেরিকার খ্যাতনামা আসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ এবং তার উর্দ্ধ অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দ্ধ আসিক 'সায়ারবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উন্নত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন প্লেন তাঁর দীর্ঘ প্রবক্ষে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

এটাই একমাত্র বস্তু, যে মহাশূন্যে আবাহ্ন অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বুঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথেজড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন : অতদসন্দেশেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদ্দ্বারা আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন :

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, তবে পারি না এবং তার স্বাগ নিতে পারি না। অথচ ফ্লাফলের বিকাশ পরিকার বুঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর সব ত্রুটি-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন :

স্ক্রিটধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে ঘোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জ্ঞানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টিগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও প্রাহ্বিজয়ীদের লক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টিগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকর্ষ আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসরকান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত

পৌছাতে পারেনি। এবং অবশ্যে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা হীকোর করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে সাথো মাইল উচ্চে অসমকারী ও চন্দ্ৰ-গ্রহের পাথৰ, মাটি, শিলা ও চিৎ সংঘর্ষকারিগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্ৰে এৱং চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন কৰতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসৰ্কান মানব ও মানবতাকে কি দান কৰেছে ? মানুষের ছেঁটা-সাধনা, চিন্তাগত কুয়োন্নতি ও বিশ্বযুক্ত আবিক্ষাৰ নিঃসন্দেহে বহুনে বৈধ ও সাধাৰণ দৃষ্টিতে প্ৰশংসনীয়ও; কিন্তু চিন্তা কৰলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্ৰজালিকতা দ্বাৰা মানব ও মানবতাৰ তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকাৰ হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদেৱ কাজ হতে পাৰে না। দেখা দৰকাৰ যে, এই পঞ্চাশ বছৰেৱ অক্ষণ্ড সাধনা এবং কোটি-অৰ্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষেৰ দুঃখ-দুর্দশা সাধাৰণ কৰাৰ জন্য যথেষ্ট হতো, তাৰ বহুৎসব কৰে এবং চন্দ্ৰ পৰ্যন্ত পৌছে সেখানকাৰ মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতাৰ কি উপকাৰ সাধিত হয়েছে ? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধাৰ মৰছে, তাদেৱ বজ্র ও বাসস্থানেৰ সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্ৰচেষ্টা তাদেৱ দারিদ্ৰ্য ও বিপদাপদেৱ কোন সামাধান দিতে পেৱেছে কি ? অথবা তাদেৱ রোগ-ব্যাধিৰ কৰল থেকে শুক্রিয় কোন ব্যবস্থা কৰেছে কি ? অথবা তাদেৱ জন্য অস্তৱৰ্গত শাস্তি ও আৱাহেৱ কোন উপকৰণ সংঘৰ্ষ কৰেছে কি ? নিচিতত্বপৰে বলা যায় যে, এসব প্ৰশ্নেৰ জওয়াবে ‘না’ ব্যক্তীত কেউ কিছু বলতে পাৰে না।

এ কাৰণেই কোৱআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্কল কাজে লিঙ্গ কৰা থেকে বিৱত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকেৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰে মানুষকে সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনাৰ দাওয়াত দেয়। প্ৰথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাকৰ্ষ প্ৰভাৰাদি দেখে সত্যিকাৰ প্ৰভাৰ সৃষ্টিকাৰী ও ইন্দ্ৰিয়-বহিৰ্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন কৰে, যে শক্তি এই ব্যবস্থাৰ পৰিচালক তাৰই নাম আল্লাহ। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা'আলা মানুষেৰ উপকাৰেৱ জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাৰতীয় প্ৰয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষেৰ কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনাৰ সাহায্যে এসব বস্তুকে সূপৃষ্ঠেৰ গোপন ভাগৰ থেকে বেৱ কৰা এবং ব্যবহাৰেৱ পদ্ধতি শিক্ষা কৰা। প্ৰথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্ৰয়োজন যেটানোৰ জন্য—কাজেই দ্বিতীয় পৰ্যায়েৱ। তাই এতে প্ৰয়োজনাতিৰিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাৱনাৰ এই দু'টি দিকই মানুষেৰ জন্য যেমন সহজ, তেমনি কল্পনা। এগুলোৱ ফলাফল সম্পর্কে প্ৰাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদেৱ মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদেৱ সব মতভেদ সৌৱজগৎ ও গ্ৰহ-উপগ্ৰহেৰ আকাৰ-আকৃতি ও বৰূপেৰ সাথে সম্পৃক্ষ। কোৱআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অৰ্জনেৰ অযোগ্য সাব্যস্ত কৰে বাদ দিয়েছে। যিসৱেৱ যুক্তি আল্লামা নজীত তাৰ গ্ৰন্থ ‘তওফীকুৰ রহমান’-এ সৌৱজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত কৰেছেন। এক ভাগ শুণগত, যা আকাৰস্থ উপগ্ৰহেৰ গতি ও হিসাৰ সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কাৰ্যগত, যা এসব হিসাৰ জানাৰ উপযোগী প্ৰাচীন ও আধুনিক যন্ত্ৰপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদাৰ্থগত, যা সৌৱজগৎ ও গ্ৰহ-উপগ্ৰহেৰ আকাৰ আকৃতি ও বৰূপ সম্পর্কিত। তিনি আৱেও লিখেন, প্ৰথমোক্ত দুই প্ৰাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদেৱ মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্ৰপাতিৰ ব্যাপাৰে অনেক মতানৈক্য সত্ৰেও অধিকাৎশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদেৱ ঘোৱ মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকৃটিন। এ কারণেই কোরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণগুলি এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে :

زبان تازه کردن با قرار سو — نیتگریختن ملق اذکار تو
میندس بسی جویرا ذرا شاد — نوازی کجود کردی اغماز شاد
سکھی بزمگان احمدیتی دارا اس و بخ ده بن . اب شرمه تا دهه فرمادا او تا هی، یا
شاید سادی بخ کرده بن :

چه شبها نشستم در بن سیرگم — که جیوت گرفت استینم که قم
ها کفے شیرا جی نیزه رم سرمه بوله بن :

سخن از مطرب و می گوشی و رازد هر کمتر جو
که کس نکشود و نکشید بحکمت این معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্মৃতির অঙ্গিত, তাওহীদ ও তাঁর অধিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রয়োগ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্নতত্ত্ব এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য ছির করে তাতে আকর্ষ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিঙ্গ হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অভিগ্রাহ এবং তা অর্জন সুকৃটিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা সুল। কিছু সংখ্যক আধুনিক পন্থী আলিম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগলোর বিরোধী বলা ও ভাস্তু। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চূপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাকুর অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুধু নয়। চল্পপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا خَاطَهُمْ بِمُجْهَلَوْنَ
 قَالُوا إِسْلَمًا ۝ وَالَّذِينَ يَبْيَتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
 سَبَّبَنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝ فَلَمْ يَطْعَمْهَا
 سَاءَتْ مُسْتَقْرَأً وَمُقْلَمًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
 يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ۝ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ
 إِلَهًا أَخْرَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْزُونَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ۝ يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَيُخْلِدُ فِيهِ مَهَاناً ۝ إِلَامُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَوْلَئِكَ
 يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
 الزُّورَ لَا وَإِذَا أَمْرُوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا يَأْتِيَنَّ رَبِّهِمْ
 لَمْ يَخِرُّوْ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعَمِيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبْلَنَا مِنْ
 أَذْوَاجِنَا وَذَرِيَّتِنَا فَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقْبِينَ إِمَاماً ۝ أُولَئِكَ يُجْزَوُنَ
 الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَلَمْ يُلْقُوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَمًا ۝ لَا خَلِدِينَ فِيهَا مَحْسُنُتْ
 مُسْتَقْرَأً وَمُقْلَمًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُؤُ بِكُمْ سَرِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۝ فَقَدْ
 كَلَّ بَعْدِمِ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ۝

(৬৩) 'রহমান'-এর বাক্স তারাই, যারা পৃথিবীতে নন্দিভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম । (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহানামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিচ্য এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কৃত নিকৃষ্ট জাগুগা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অথবা ব্যয় করে না, ক্ষণেক্ষণতাও করে না এবং তাদের পছন্দ হয় এতদৃঢ়য়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সুজ্ঞ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যতিক্রম করে না। যারা একাঙ্গ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (৬৯) কিম্বাবতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিতীয় হবে এবং তথায় সাহিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের শুনাইকে পুণ্য ঘারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে কিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিমাকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান বৃক্ষার্থ ভুক্তভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অক্ষ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্তুর্দের পক্ষ থেকে আমাদের সন্তানদের পক্ষ আদর্শ ব্রহ্মণ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জানাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কৃত উন্নত ! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না বলি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্ত্ব নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'রহমান'-এর (বিশেষ) বাক্স তারাই, যারা পৃথিবীতে নন্দিভাবে সহকারে চলাফেরা করে (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নন্দিতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নন্দি চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নন্দিতা তাদের নিজেদের কাজেকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উকিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহর কালেমা সমূক্ষে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহর সাথে এই কর্মপছন্দ অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ

নামাযে.রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহর হক ও বাদার হক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আশাবকে দূরে রাখ । কেননা, এর আশাব সম্পূর্ণ বিনাশ । নিচয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান । দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই (অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অথবা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গুনাহুর কাজে ব্যয় করে না) এবং ক্রপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ঝটি করে না) । বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অথবা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে । কেননা, এসব বিষয় গুনাহ । যে বন্ধু গুনাহুর কারণ হয়, তাও গুনাহ । কাজেই পরিণামে তাও গুনাহুর কাজে ব্যয় হয়ে যায় । এমনিভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিম্নا **لَمْ يَنْفَرُوا** থেকে জানা গেল । কারণ কম ব্যয় করা যখন জায়ে নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়ে হবে । কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ঝটি করার তো নিম্না হয়ে গেছে; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিম্না ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি । মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঝটি ও বাড়া-বাড়ি থেকে পবিত্র ।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদৃঢ়য়ের (অর্থাৎ ঝটি ও বাড়াবাড়ি) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে । (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল ।) এবং যারা (গুনাহ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না (এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গুনাহ) আল্লাহ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরীরতসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা) এবং ব্যতিচার করে না । (এই হত্যাও ব্যতিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত গুনাহ) । যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যতিচারও করে, যেমন মুক্তার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে । কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য আয়াতে আছে এবং তারা তথায় লাজ্জিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে (যাতে দৈহিক শাস্তির সাথে সাথে লাজ্জনার আঘাতিক শাস্তি ও হয় এবং শাস্তির কাঠোরতা অর্থাৎ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিয়াণ বৃদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয় । এর জন্য স্টমানের নবায়ন জরুরী নয়, শুধু তওবা করা যথেষ্ট । পরবর্তী আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে । উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আববাস থেকে শানে নূয়ুলও তাই বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাথিল হয়েছে); কিন্তু যারা (শিরক ও গুনাহ থেকে) তওবা করে (তওবা কৃলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা জাহান্নাম তাদেরকে বিনুমাত্রও স্পর্শ করবে না ;

বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অতীত) গুনাহকে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর ও গুনাহ্ ইসলামের বরকাতে মাফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সৎকর্মের কারণে পুণ্য লিখিত হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পুণ্য স্থাপন করে দেন। এ ছিল কুফর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর গুনাহ্ থেকে তওবাকারী যুমিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন সময় গোনাহ্ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি (গুনাহ্ থেকে) তওবা করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আয়াব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ তুম ও আত্মরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতঃপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধূলা ও শরীয়ত বিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের কাছ দিয়ে যায়, তবে গঞ্জির (ও অন্দ) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশতুল হয় না এবং কার্যকলাপ দ্বারা গুনাহগুরদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপাদেশ দান করা হলে তারা অক্ষ ও বধির হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না। (কাফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আগস্তি উপাদেশের উদ্দেশ্যে এবং ব্রহ্মণ ও তত্ত্বকথা থেকে অক্ষ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আয়াতে কোরআন বলে : كَلُّوا يَكْفُونَ عَلَيْهِ لِدْنًا — উল্লিখিত বান্দাগণ এরূপ করে না ; বরং বৃদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সূতরাং আয়াতে অক্ষ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে—কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রয়াণিত হয় ; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়ন্তে এবং অক্ষ বধিদের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিম্ননীয়) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। সেমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের শৌদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের শীতলতা (অর্থাৎ শাস্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শাস্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুন্তাকী করে) আমাদেরকে মুন্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই ; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুন্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থাৎ

আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুস্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছেঃ—তাদেরকে (জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের (ধর্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তর থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) স্থায়িত্বের দোষা ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত উন্নত ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহানাম সম্পর্কে **سَمَّاْتْ مُسْتَقْرًّا وَمُقَامًا** বলা হয়েছে। হে পয়গম্বর,) আপনি সাধারণতাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে বুঝা উচিত যে, হে কাফির সম্পদায়) তোমরা তো (আল্লাহর বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্ত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক—এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আল-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসাখত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের প্রতিরোধ প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রাপ্তে আল্লাহ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমংজ্ঞস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে ‘ইবাদুর রহমান’—(রহমানের দাস) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সখান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্টি জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যক্তিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না ; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ‘নিজের বান্দা’ অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুরু ও শুনাই থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে ‘নিজের বান্দা’ বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও গুণবাচক বিশ্বেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু ‘রহমান’ শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার রহমান (দয়াময়) শব্দের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরাটি শুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ,

দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহজীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও জীবের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عبار عبار شرحتি এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস ; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ষ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يُمْشِّونَ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْتَمِنِينَ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে ন্যস্ততা সহকারে চলাফেরা করে। শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাঁজীর্ষ ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নাতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব ধীরে চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা একপ, এ কান্ত আল্লাহর অর্থে এখানে ক্রিয়ত হতো।—(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী যনীয়ীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলাদাত হওয়ার কারণে মাকরহ সাব্যস্ত করেছেন। হ্যরত উমর ফারক (রা) জনেক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি অসুস্থ? সে বলল : না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।—(ইবনে কাসীর)

হ্যরত হাসান বসরী আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মু'মিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অঙ্গ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্ক মনে করে ; অথচ তারা ঝগ্গও নয় এবং পঙ্কও নয় ; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহজীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপ্ত, সে সর্বদা দৃঢ়েই দৃঢ়ে ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উন্নত চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জন্ম খুবই অল্প তার জন্য শান্তি তৈরি রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ : وَإِنَّ حَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَاتَلُوا سَيِّدَنَا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্ধতার কাজ ও মূর্ধতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্যানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। কুরআনী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে শব্দটি تسلیم থেকে নয় ; বরং থেকে উদ্ভৃত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্ধদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার

কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা শুনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরেই বর্ণিত আছে। —(মাযহারী)

চতুর্থ শুণ : وَالَّذِينَ يَرْبِطُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْدًا وَقُبَّالًا : অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডয়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিম্না ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্য দণ্ডয়মান হওয়া যেমন বিশেষ কঠিকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষানন্দ, অচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাঙ্গুদের নামাযের অনেক ফর্মালত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিয়ী হযরত আবু উমায়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিয়মিত তাহাঙ্গুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বালার অভ্যন্তর কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফকারা এবং শুনাহ্ত থেকে নিবৃত্তকারী। —(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাঙ্গুদের ফর্মালতের অধিকারী باتْ لَهُ ساجداً و قانِتْ (মাযহারী, বগতী)। হযরত উসমান গনীর জবাবী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। —(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম শুণ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا أَصْرَفْ عَنْا عَذَابَ جَهَنَّمْ —অর্থাৎ এই পিয় বাস্তাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সন্দেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আবিরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্রহুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোঁয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ শুণ : وَالَّذِينَ لَا يَنْفَعُونَ اسْرَافًا : অর্থাৎ আল্লাহর পিয় বাস্তার ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ঝটিল করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে অস্রাফ এবং এর বিপরীতে ক্ষতি। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা অস্রাফ তথা অপব্যয় ; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাত্তিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তথা অনর্থক ব্যয় কেরাও আয়াত দ্বারা দারাম ও শুনাহ্ত। আল্লাহ বলেন : **أَنَّ السَّبَّاتِينَ كَانُوا أَخْوَانَ** (الشِّيَاطِينِ) এ দিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্যও হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুকরণ হয়ে যায় ; অর্থাৎ শুনাহ্ত কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। —(মাযহারী)

শব্দের অর্থ ব্যয়ে ঝটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুত্রাং ঘোটেই

ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অঙ্গভূক্ত হবে)। এই তফসীরও হযরত ইবনে আবুস, কাতাদাহ্ প্রযুক্ত থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের শুগ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ঝটিল মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে করীম (সা) বলেন : **مَنْ فَقَرِبَ إِلَيْهِ مُصْدِّهِ فِي مُسْتَقْدِمٍ** অর্থাৎ ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বৃদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—(আহমদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **عَمَّا مَنِعَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কথনও ফকির ও অভাবশূন্য হয় না।—(আহমদ, ইবনে কাসীর)

সন্দেশ শুণ : **وَالَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ مَعَ اللَّهِ الْأَكْثَرُ**—পূর্বোক্ত ছয়টি শুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন শুনাই ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ শুনাই।

অষ্টম শুণ : **وَمَنْ يُفْعِلْ** এখান থেকে কার্যগত শুনাইসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর শুনাই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব শুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় শুনাই বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে **إِنَّمَا تُنْهَىٰ عَنِ الْفَطْحِ**—অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত শুনাইসমূহ করবে, সে তার শান্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা (সা) শব্দের তফসীর করেছেন শুনাহের শান্তি। কেউ কেউ বলেন : **مَمْ** আহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শান্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।—(মাযহারী)

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শান্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে এ কথা নির্দিষ্ট যে, এই শান্তি বিশেষভাবে কাফিরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিঙ্গ হয়। কেননা, প্রথমে তো **يُمَاءِعُنَّ الْعَذَابَ** কথাটি মুসলমান শুনাইগারদের জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক শুনাহের জন্য একই শান্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শান্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। এটা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শান্তি, যদি কাফির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শান্তি দিঙ্গি হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শান্তি সম্পর্কে আয়াতে **وَيَخْلُقُنَّ بَيْنَ كَثَاثِيْدِ وَبَلَّا** হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আঘাতে সাহসিত অবস্থায় থাকবে। কোন মুমিন চিরকাল আঘাতে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করবে, পাপের শান্তি ভোগ করার পর তাকে আহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিঙ্গ হয়, তাদের শান্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শান্তির কথা এখানে বলা হলো, একেপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে

ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଳା ତାଦେର ମନ୍ଦ କର୍ମସମ୍ମହିତେ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରେ ଦେବେନ । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ, ତତ୍ତ୍ଵବାର ପର ତାଦେର ଆମଲନାମାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଥିକେ ଯାବେ । କେନନା, ଆଜ୍ଞାହୁ ତା'ଆଳାର ଓୟାଦା ଏହି ଯେ, ଶିରକ ଓ କୁକୁର ଅବହ୍ଲାସ ଯତ ପାପଇ କରା ହୋକ ନା କେନ, ତତ୍ତ୍ଵବା କରେ ଇସଲାମ ପ୍ରଥମ କରାର କାରଣେ ସେହିସବ ବିଗତ ପାପ ମାଫ ହେଁ ଯାବେ । କାଜେଇ ଅଭିତେ ତାଦେର ଆମଲନାମା ଯଦିଓ ଶୁନାହୁ ଓ ମନ୍ଦ କରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଲ ; କିନ୍ତୁ ଏଥିଲ ଈମାନ ପ୍ରଥମ କରାର କାରଣେ ସେଥିଲେ ସବ ମାଫ ହେଁ ଗେହେ ଏବଂ ଶୁନାହୁ ଓ ମନ୍ଦ କରେଇ ଶ୍ଵାନ ଈମାନ ଓ ସଂକର୍ମ ଦଖଲ କରେ ନିଯାହେ । ମନ୍ଦ କର୍ମସମ୍ମହିତେ ପୁଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାନ୍ତି ଏହି ତଫ୍ସିର ହ୍ୟାରତ ଇବନେ ଆକାଶ, ହାସାନ ବସନ୍ତୀ, ସାଇନ୍ ଇବନେ ଯୁବାଯର, ମୁଜାହିଦ ପ୍ରୟୁଷ ତଫ୍ସିରବିଦ ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ ।—(ମାଯହାରୀ)

ଇବେଳେ କାସିର ଏବଂ ଆରଣ୍ୟ ଏକଟି ତଫ୍ସିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଇଛେ । ତା ଏହି ଯେ, କାଫିରଙ୍କ କୁକୁରଙ୍କ ଅବଶ୍ୱାସ ଯତ ପାପ କରେଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ପର ସେତୁଲୋକେ ପୁଣ୍ୟ ଝପାଞ୍ଚିତ କରେ ଦେଓଯା ହବେ । ଏବଂ କାରଣ ଏହି ଯେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୃଦୟରେ ପର ତାରା ଯଥିଲୁ କୌଣ ସମୟ ଅଭିଭାବ ପାପେର କଥା ଶ୍ଵରଣ କରିବେ, ତଥାନେଇ ଅନୁତଷ୍ଟ ହବେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରେ ତତ୍ତ୍ଵବା କରିବେ । ତାଦେର ଏହି କର୍ମର ଫଳେ ପାପସମୂହ ପୁଣ୍ୟ ଝପାଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯାବେ । ଇବେଳେ କାସିର ଏହି ତଫ୍ସିରରେ ସମର୍ଥନେ କାନ୍ତିପତ୍ର ହାଦୀସିଓ ଉତ୍ସେଖ କରାଇଛେ ।

ମା'ଆରେଫଳ କୁରାଅନ (୬୪) — ୬୩

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বাচ্চাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল, মাঝখানে পাপের পর তঙ্গু করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম শুণ :—**أَرْبَعَ تَارَا مِিথ্যা** ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। **سَر্ববৃহৎ** মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বাচ্চাগণ একেপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হয়রত ইবনে আবাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, যেলা ইত্যাদি। হয়রত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আবধুর ইবনে কারেম বলেন, নির্জনতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। যুক্তি ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বাচ্চাদের একেপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সম্পর্কে রজুকৃত।—(মাযহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের **شَهادَة** অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা তনাহ, তা কোরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হয়রত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা তনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হয়রত উমর ফাতেব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চাহিদাটি বেআঘাত করা দয়কার। এছাড়া তার মুখে চুনকালি মেঝে বাজারে বুরিয়ে মাঝিত করা দয়কার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদৰ্থানায় আবক্ষ রাখা প্রয়োজন।—(মাযহারী)

একাদশ শুণ :—**أَرْبَعَ يَوْمًا مَرُوا بِالْفَوْرَمُ كَرَامًا** অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গারীব ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাক্রমে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও দৃঢ়ার্হ জানা সঙ্গেও পাপাচারে লিখ বাতিলদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাহিতে উত্তম ও প্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিখ হয় না। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা জানতে পেরে বলেন, ইবনে মাসউদ কবীর অর্থাৎ তন্দু হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সন্তুষ্ট লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।—(ইবনে কাসীর)

বাদশ শুণ :—**أَرْبَعَ بَيْتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَنْهَا صَنْمًا وَعَمْنَابًا** এই প্রিয় বাচ্চাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আর্থাত্বাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অক্ষ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং অবগতিশীল ও

অঙ্গদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় একপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়তে দুটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক. আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ শুক্রত সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। দুই অক্ষ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেঝীগণের মতামতের খেলাফ নিজের ঘতে কিংবা জনশ্রূতি অনুসরণে ভাস্ত আমল করা। এটাও এক রকম অক্ষ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভূক্ত।

শুরীয়তের বিধানবক্ষী পাঠ করাই বর্ধেট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী ; আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়তের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অক্ষ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিম্না করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিম্না করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হ্যরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাব ? হ্যরত শা'বী বললেন না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুঝিনের অন্য বৈধ নয় ; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তাঁর জন্য জরুরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্থ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত। ফলে তারা কোরআনকে বিশুদ্ধকৃতে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভাস্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিষ্কৃত এবং অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্য নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী ওস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যবীজ্ঞ এই নীতিবিবর্জিত কোরআন পাঠও আল্লাহর আয়তে অক্ষ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তৎক্ষণ দান করুন।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا مَنْ أَنْزَلَ قُرْءَةً أَعْلَمُ بِهِ وَإِنَّا بِأَنَّا لِنَفْتَقِنَ أَمَّا مَا
এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও ঝীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হ্যরত হাসান বশীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল

দেখা । একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা । যদি সন্তান-সন্ততি ও জীবের বাহ্যিক স্থান, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অস্তর্ভূত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুর্লভ ।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সম্মুখীন থাকেন না ; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও জীবের আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন । এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে । আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রণিধানযোগ্য। *أَعْلَمُ بِالْمُتَقْبِلِينَ* আমাদেরকে মুস্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন । এতে বাহ্যিক নিজের জন্য জাঁকজমক, পদবর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদুষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে : *إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْطَبُهَا لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا*। অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূগূঢ়ে শ্রেষ্ঠত্ব কার্যন্বান করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না । তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন । কাজেই এই দোয়ার সারমর্য এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুস্তাকী করে দিন । তারা মুস্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুস্তাকীগণের ইয়াম ও নেতা কথিত হবেন । সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সন্তান-সন্ততি ও জীবেরকে মুস্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে । হ্যরত ইবরাহীম নাথচৰী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে একুশ ঘোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয় । ফলে আমরা এর সওয়াব পাব । হ্যরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য জাঁকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চতর অর্জন করা, যদ্যুরা মুস্তাকীগণ লাভবান হয় । কুরআনী উত্তয় উত্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উত্তয় উত্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা মিস্তনীয় নয়—জায়েব : *أَلَّا يُرِيدُنَّ عُلُوًّا*। আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিম্ন করা হয়েছে, যা পার্থিব সামান ও প্রতিপন্থি অর্জনের নিমিত্ত হয় । এ পর্যন্ত ‘ইবাদুর রহমান’ অর্থাৎ কামিল মু’মিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হলো । অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে ।

غُرفة — أَوْلَكَ يُجْزَئُنَ الْفَرْقَةَ
বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বাসাখানা পাবে, যা সাধারণ জালাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর সৌকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় । (সুখারী, মুসলিম-মায়হারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিয়ী ও হাকিমে হ্যরত আবু মালিক আশ-'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জালাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে ।

লোকেরা জিজেস করল, ইয়া রাসূলাহ্মাহ ! এসব কক্ষ কাদের জন্য ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নত্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, কৃধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাঙ্গুদের নামায পড়ে ।—(মাযহারী)

وَلَقُونْ فِيهَا نَحِيَةٌ وَسَلَامًا —**অর্থাৎ** জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তাঁরা এই সম্মানও সাড় করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে । এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবের প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল । শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে ।

فَلَمَّا يَغْبَيْ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَدَعَكُمْ —**এই** আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে । উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ । তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো । কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা । যেমন অন্য আয়াতে আছে : **أَنْتَ مَنْ حَنَّتِ الْجِنُّ وَأَنْتَ أَلْيَغْبُدُونَ** অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যক্তিত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি । এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যক্তিত মানুষের কোন মৃত্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই । এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে : **فَفَدَكُنْتُمْ** অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ । এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই ।

فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَبِّ অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারূপ ও কুফর তোমাদের কঠহার হয়ে গেছে । তোমাদেরকে জাহানামের চিরহায়ী আযাবে লিঙ্গ না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে ।

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

সূরা আশ-শ'আরা

মকাব অবতীর্ণ, ১১ রমজুন, ২২৭ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

طَسَمَ ⑤ تِلْكَ آيَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ⑥ لَعَلَّكَ بِأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ أَذَلَّ
 يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ⑦ إِنْ شَاءَنِزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ إِيَّاهُ فَظَلَّتْ
 أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ⑧ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُهَدَّدِ
 إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑨ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسِيَّاتِهِمْ أَنْبَأُوا مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑩ أَوْلَمْ يَرَوُا إِلَى الْأَرْضِ كُلُّ أَنْبَتِنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجٍ كَوِيعٍ ⑪ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْنَةً ⑫ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑬ وَإِنَّ

رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

আল্লাহর নামে তরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

- (১) তা, সীন, শীয়। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিভাবের আয়াত। (৩) তারা বিখ্যাস করে না বলে আপনি ইয়তো মর্মব্যধার আঞ্চল্যাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নির্দর্শন নায়িল করতে পারি; অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। (৫) ষুধনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যাগোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ অরূপ শীত্রাই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ বস্তু কত উদ্বেগ করেছি। (৮) নিচয় এতে নির্দর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তা, সীন, শীয় (এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ আপনার প্রতি

অবতীর্ণ বিষয়বস্তুগুলো) সুস্পষ্ট কিভাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তারা এতে বিশ্বাস করে না বলে আপনি এত দুঃখিত কেন যে, মনে হয়) হয়তো আপনি তাদের বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে (দুঃখ করতে করতে) আস্থাতী হবেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এটা পরীক্ষা জগৎ। এখানে সত্য প্রমাণের জন্য এমন প্রমাণাদিই, কার্যেম করা হয়, যার পরেও ঈমান আনা-না আনা বাস্তর ইখতিয়ারভুক্ত থাকে। নতুবা) যদি আমি (জোরে-জবরে ও বাধ্যতামূলকভাবে তাদেরকে বিশ্বাসী করার) ইচ্ছা করি, তবে তাদের কাছে আকাশ থেকে একটি (এমন) বড় নির্দশন নাখিল করতে পারি (যাতে তাদের ইখতিয়ারই বিলুপ্ত হয়ে যায়।) অতঃপর তাদের গর্দান এর সামনে নত হয়ে থাবে (এবং অনিচ্ছা সাথেও বিশ্বাসী হয়ে যাবে। কিন্তু একপ করলে পরীক্ষা পও হয়ে যাবে। তাই একপ করা হয় না এবং ঈমান আনার ব্যাপারটিকে জোর-জবর ও ইখতিয়ারের মাঝখানে রাখা হয়। তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে 'রহমান'-এর পক্ষ থেকে এমন কোন নতুন উপদেশ আসে না, যা থেকে তারা সুখ ফিরিয়ে না নেয়। (এই সুখ ফেরানো এতদ্ব গঠিয়েছে যে,) তারা (সত্য ধর্মকে) যিষ্যা বলে দিয়েছে (যা সুখ ফেরানোর চরম পর্যায়। তারা শুধু প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ দৃষ্টিপাত না করেই ক্ষান্ত থাকেন। এছাড়া তারা কেবল যিথ্যারোপই করেনি। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছে।) সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার ব্যাপর বৃক্ষপ শৈল্পীই তারা জানতে পারবে (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় অথবা কিয়ামতে যখন তারা আবাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন কোরআন ও কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ আবাব ইত্যাদির সত্যতা সূচিটে উঠবে।) তারা কি ভূগঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি? (যা তাদের অনেক নিকটবর্তী এবং দৃষ্টির সামনে রয়েছে,) আমি তাতে কত উৎকৃষ্ট ও রকম-রকমের উন্নিস উদ্দগত করেছি। (এগুলো অন্যান্য সৃষ্টি বস্তুর ন্যায় তাদের সূচিকর্তার অঙ্গিত্ব, একত্ব ও সর্বব্যাপী ক্ষমতা সপ্রমাণ করে।) এতে (সত্ত্বাগত, উণ্গগত ও কর্মগত একত্বের) বড় (যুক্তিপূর্ণ) নির্দশন আছে। (এ বিষয়টিও যুক্তিপূর্ণ যে, আল্লাহ হওয়ার জন্য সত্ত্বাগত ও উণ্গগত উৎকৰ্ষ শর্ত এবং এ উৎকৰ্ষতার শর্তাবলীতে অপরিহার্য হলো যে, বৌদ্ধিয়তে তিনি একক হবেন। এতদসম্বেদেও) তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস স্থাপন করে না (এবং শিরক করে। মোটকথা, শিরক করা নবৃত্ত অঙ্গীকার করার চাইতেও উন্মত্ত। এতে জাসা গেল যে, হঠকারিতা তাদের ইভাবধর্মকে অকেজো করে দিয়েছে। কাজেই একপ লোকদের পেছনে নিজের জীবনপাত করার কোন অর্থ হয় না।) আর (শিরক যে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয়, তাতে যদি তাদের এ কারণে সন্দেহ হয় যে, তাদের উপর তাৎক্ষণিক আবাব আসে না কেন, তবে এর কারণ এই যে,) নিচয় আপনার পালনকর্তা পরাক্রমশালী (ও পূর্ণ ক্ষমতাবান হওয়া সম্বেদেও) পরম দয়ালু (ও)। (তাঁর সর্বব্যাপী দয়া দুনিয়াতে কাফিরদের সাথেও সশর্কর্যুক্ত। এর কলেই তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। নতুবা কুফর নিশ্চিতই নিন্দনীয় এবং আবাবের যোগ্য।)

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— لَعْلُكَ بِأَخْبَارِ شَجَرَتِي — بَلْعَلْكَ بِأَخْبَارِ نَفْسِكَ —
বিশ্বা' (গর্দানের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্রশে

পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গম্বর, ইজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপূর্দর্শন দেখে দৃঃখ ও বেদনায় আস্থাগাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ইমান নেই—কোন কাফির সম্পর্কে একপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। বিভীষিত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হিসায়াত থেকে বাস্তিত থাকে, তার জন্য অধিক দৃঃখ না করা উচিত।

إِنْ نَشَاءُ نَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَيَّهَا فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ۔

আল্লামা যামাখিশারী বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে ফেলুন লাহা খাসিউন্ অর্থাৎ কাফিররা এই বড় নির্দর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে (اعناني) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয় হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন কোন নির্দর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও আল্লাহর বৰুপ জাজুল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারও পক্ষে অঙ্গীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজুল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আয়াব বর্তিত। জাজুল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যাকীয় ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।—(কুরতুবী)

زوج كريمر — زوج كريمر —
বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারীকে সেগুলোকে এ দিক দিয়ে বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসাবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে বলা যায়। কুরআনের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۝ أَلَا
يَتَّقُونَ ۝ قَالَ رَبٌّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّبُونَ ۝ وَيَصْبِقُ صَدْرِي ۝ وَلَا يَنْطَلِقُ
لِسَانِي ۝ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِرُونَ ۝ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبِهِمْ فَلَا خَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ ۝ قَالَ
كَلَّا ۝ فَأَذْهَبْنَا يَابِنَنَا ۝ أَنَا مَعْكُمْ مُسْتَعِنٌ ۝ فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلًا إِنَّا سُولُ
رِبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنَّا أَرْسَلْنَا مَعَنَّابِي إِسْرَائِيلَ ۝ قَالَ أَلَمْ تَرِبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا
وَلَيْشَتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ۝ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنْ

الْكُفَّارُ ۝ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَغَرَّتُ مِنْكُمْ لَئِنْ
 خَفَّتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتَلَقَّبَتُ بِنِعْمَةِ تَنْهَا
 عَلَىٰ أَنْ عَبَدْتَ بَيْنَ إِلَهِي إِلَهَيْنِي ۝ قَالَ فَرْعَوْنُ وَمَارْبُ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ
 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ ۝ قَالَ لِيَنِ حَوْلَةَ
 الْأَلَّا تَسْتَعِمُونَ ۝ قَالَ سَبِّلْكُمْ وَرَبُّ أَبَاءِكُمْ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ
 الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لِمَجْنُونٌ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ قَالَ لِيَنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ
 الْمَسْجُونِينَ ۝ قَالَ أَلَوْ جَعَلْتَكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ فَأَتَ يَهُوَ أَنْ كُنْتَ
 مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَإِنَّقْتَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ شَعَانٌ مُّبِينٍ ۝ وَنَزَعَ يَدَهُ
 فَإِذَا هِيَ بِيَضَاءٍ لِلنَّاظِرِينَ ۝

- (১০) যখন আগনার পালনকর্তা মূলাকে ডেকে বললেন : তুমি পাশিষ্ঠ সম্মানারের নিকট যাও, (১১) কিরাউশের সম্মানারের নিকট; তারা কি ভয় করে না ? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশঁকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে (১৩) এবঁ আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবঁ আমার জিহবা অচল হয়ে যাব ; সুতরাঁ হাক্কনের কাছে বার্তা প্রেরণ করলুন। (১৪) আমার বিরক্তে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশঁকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আক্লাহ বললেন, কথনই নয়, তোমরা উক্তয়ে যাও আমার নিদর্শনাবজী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা কিরাউশের কাছে যাও এবঁ বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রাসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী ইসরাইলকে আমাদের সাথে বেতে দাও। (১৮) কিরাউশ বলল, আমরা কি তোমাকে শিখ অবস্থার আমাদের শখে পালন-পালন করিনি ? এবঁ তুমি আমাদের শখে জীবনের বহু বহু কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই তোমার অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি বলে কৃতজ্ঞ। (২০) মূসা বলল, আমি সেই অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি জ্ঞান হিলাম। (২১) অতঃপর আমি জীত হয়ে মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৬৪

তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম । এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে ধৈজা দান করেছেন । এবং আমাকে পয়গহর করেছেন । (২২) আমার প্রতি তোমার বে অনুমতিহৰ কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ । (২৩) ফিরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আমার কি ? (২৪) মূসা বলল, তিনি সভোমওল, তৃমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বিশ্বসী হও । (২৫) ফিরাউন তার পারিবদ্বর্গকে বলল, তোমরা কি তন্হ না ? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা । (২৭) ফিরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাস্তাটি নিচয়ই বক্ষ পাগল । (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বুঝ । (২৯) ফিরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যকর্পে ঘৃণ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিকেপ করব । (৩০) মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি ? (৩১) ফিরাউন বলল, তুমি সভ্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর । (৩২) অতঃপর তিনি শাঠি নিকেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অঙ্গর হয়ে গেল । (৩৩) আর তিনি তার হাত বের করলেন তৎক্ষণাত তা দর্শকদের কাছে সুস্পত্র প্রতিভাত হলো ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (তাদের কাছে তখনকার কাহিনী বর্ণনা করুন,) যখন আপনার পালনকর্তা মূসা (আ)-কে ডাকলেন (এবং আদেশ দিলেন) যে, তুমি জালিয় সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও, (এবং হে মূসা দেখ,) তারা কি (আমার ক্ষেত্রকে) ভয় করে না ? (অর্থাৎ তাদের অবস্থা আচর্যজনক ও মন্দ, তাই তাদের কাছে তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে।) মূসা আরব করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি এ কাজের জন্য হায়ির আছি। কিন্তু কাজটি পূর্ণ করার জন্য একজন সাহায্যকারী চাই। কেননা) আমার আশৎকা হচ্ছে, তারা আমাকে (বজ্য পূর্ণ করার আগেই) মিথ্যাবাদী বলে দেবে এবং (বভাবগতভাবে এরপ ক্ষেত্রে) আমার মন হতোদায় হয়ে পড়ে এবং আমার জিহ্বা (ভালুকপ) চলে না। তাই হাক্কনের কাছে (ও ওই) প্রেরণ করুন (এবং তাকে নবৃত্য দান করুন, যাতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা হলে সে আমার সভ্যবান করে। এর ফলে আমার মন প্রহৃষ্ট ও জিহ্বা চালু থাকবে। আমার জিহ্বা কোন সময় বক্ষ হয়ে গেলে সে বক্তব্য পেশ করবে। হাক্কনকে নবৃত্য দান করা ছাড়াই সাথে রাখলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারত : কিন্তু নবৃত্য দান করলে এ উদ্দেশ্য আরও পূর্ণরূপে সাধিত হবে।) আর (ও একটি বিষয় এই যে,) আমার বিকলে তাদের একটি অভিযোগও আছে : (জনেক কিবর্তী আমার হাতে নিহত হয়েছিল। সূরা কাসাসে এর কাহিনী বর্ণিত হবে।) অতএব আমি আশৎকা করি যে, তারা আমাকে (রিসালত প্রচারের পূর্বে) হত্যা করে ফেলবে। (এমতাবস্থায়ও আমি তাবলীগ করতে সক্ষম হব না। সুতরাং এরও কোন বিহিত ব্যবস্থা করে দিন।) আল্লাহ বললেন, কি সাধা (এরপ করার ? আমি হাক্কনকেও পয়গস্থী দান করলাম। এখন তাবলীগের উভয় বাধা দূর হয়ে গেল।) তোমরা উভয়ে আমার নির্দশনাবলী নিয়ে যাও (কারণ, হাক্কনও নবী হয়ে গেছে)। আমি (সাহায্য দ্বারা) তোমাদের সাথে আছি (এবং তোমাদের ও তাদের

যে কথাবার্তা হবে, তা) শনব। অতএব তোমরা ফিরাউনের কাছে যাও এবং (তাকে) বল, আমরা বিশ্বপালনকর্তার রাসূল (এবং তাওহীদের প্রতি দাওয়াতসহ এ নির্দেশও নিয়ে এসেছি) যেন তুমি বনী ইসরাইলকে (বেগোর খাটুনি ও উৎপীড়নের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের ঘাতভূমি শাম দেশের দিকে) আমাদের সাথে যেতে দাও। (এই দাওয়াতের সারমর্ম হলো আস্তাহুর হক ও বাস্তার হকে উৎপীড়ন ও সীমান্তসন বর্জন করা। 'সেইতে তারা গমন করল এবং ফিরাউনকে সব বিষয়বস্তু বলে দিল।) ফিরাউন [এসব কথা শনে প্রথমে মূসা (আ)-কে চিনতে পেরে তাঁর দিকে মনোযোগ দিল এবং বলল, (আহা, তুমই মাকি) আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে তোমার সেই জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি তো নিজের সেই অপরাধ যা করবার করেছিলে (অর্থাৎ কিবর্তীকে হত্যা করেছিলে)। তুমি হলে বড় কৃতজ্ঞ। (আমারই খেয়ে-দেয়ে আমার মানুষকে হত্যা করেছ। এখন আবার আমাকে অধীনস্থ করতে এসেছ। অথচ তোমার কর্তব্য ছিল আমার সামনে নত হয়ে থাকা।) মূসা (আ) জওয়াব দিলেন, (বাস্তবিকই) আমি তখন সেই কাজ করেছিলাম এবং আমার থেকে ভুল হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি। তার অত্যাচার সুলভ আচার-ব্যবহার দেখে তাকে বিরত রাখা আমার উদ্দেশ্য ছিল এবং ঘটনাক্রমে সে মারা গিয়েছিল।) এরপর যখন আমি শংকিত হলাম, তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। এরপর আমাকে আমার পালনকর্তা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গস্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (এই প্রজ্ঞা ছিল নবুয়তের জরুরী অংশবিশেষ জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আমি পয়গস্বরের পদমর্যাদা নিয়ে আগমন করেছি। কাজেই নত হওয়ার কোন কারণ নেই। পয়গস্বরী এই হত্যা-ঘটনার পরিপন্থী নয়; কেননা, এই হত্যাকাও ভূলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল। এটা নবুয়তের যোগ্যতা ও উপযুক্তভাব পরিপন্থী নয়। এ হচ্ছে হত্যা সম্পর্কিত আপত্তির জওয়াব। এখন রইল লালন-পালনের অনুরূপ প্রকাশের ব্যাপার। এর জওয়াব এই যে,) আমার প্রতি তোমার যে অনুরূপের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী ইসরাইলকে কঠোর অপমানে (ও উৎপীড়নে) নিষ্কেপ করে রেখেছিলে। (তাদের ছেলে-সন্তানকে হত্যা করতে, যার ভয়ে আমাকে সিদ্ধুকে ভরে নদীতে নিষ্কেপ করা হয়েছিল এবং তুমি আমাকে পেয়েছিলে। এরপর আমি তোমার লালন-পালনে ছিলাম। অতএব তোমার মূলমই লালন-পালনের আসল ক্ষরণ। এমন লালন-পালনেরও কি অনুরূপ প্রকাশ করতে হয়? বরং এই অশালীল কাজের কথা ক্ষরণ করে তোমার লজ্জাবোধ করা উচিত।) ফিরাউন (এতে নির্মলতার হয়ে গেল এবং কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে) বলল, (যাকে তুমি) 'রাবুল আলায়ীন (বল, যেমন বলেছ মানুন্ন-রবুল আলায়ীন এ) আবার কি? মূসা (আ) বললেন, তিনি নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তুমি এর বিশ্বাস (অর্জন) করতে চাও, (তবে এতটুকু সন্তান যথেষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন হলে-গুণাবলীর মাধ্যমেই জওয়াব দেওয়া হবে।) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কিছু শনছ? (প্রশ্ন কিছু, জওয়াব অন্য কিছু) মূসা (আ) বললেন, তিনি পালনকর্তা তোমার এবং তোমার পূর্বপুরুষদের। (এই জওয়াবে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের পুনরুৎস্থি আছে : কিছু) ফিরাউন (বুঝল না এবং) বলল, তোমাদের

এই রাসূল যে (নিজ ধারণা অনুযায়ী) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে, বক্ষ পাগল (মনে হয়)। মূসা (আ) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের পালনকর্তা এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যবর্তী আছে, তারও যদি তোমরা বৃক্ষিমান হও (তবে এ কথা মেনে নাও)। ফিরাউন (অবশ্যেই বাধ্য হয়ে) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য প্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারাগারে নিষ্কেপ করব। মূসা (আ) বললেন, যদি আমি প্রকাশ্য প্রমাণ পেশ করি, তবুও (মানবে না); ফিরাউন বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে সেই প্রমাণ পেশ কর। তখন মূসা (আ) লাঠি নিষ্কেপ করলে তা মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশ্য অজগর হয়ে গেল এবং (বিভীষণ মুজিয়া প্রদর্শনের জন্য) নিজের হাত (বুকের কলারে দিয়ে) বের করতেই তা তৎক্ষণাত দর্শকদের সামনে সুতৃত্ব হয়ে গেল। (অর্থাৎ একেও সবাই চর্চকে দেখল।)

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অবেষণ নয় :

قَالَ رَبُّ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي - وَيَضْبِقُ مَسَدْرِيَ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي
— فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ - وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبِ فَلَاحَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ -

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অবেষণ নয়, বরং বৈধ। যেমন মূসা (আ) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলস্বরূপ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিলেছেন। কাজেই এখানে এ কথা বলা ভূল হবে যে, হ্যারত মূসা (আ) আল্লাহর আদেশকে নির্দিষ্ট শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন; কারণ, মূসা (আ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হ্যারত মূসা (আ)-এর জন্য শব্দের অর্থ : قَالَ مُتَنَبِّئًا إِذَا وَأَنْتَ مِنَ الْفَالَّيْنِ قَالَ مُتَنَبِّئًا তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ; ফিরাউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মূসা (আ) বললেন : হ্�য়া, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাও ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভূল বৃক্ষিয়ে দেওয়ার জন্য ঘূর্ষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুবুঝে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাও নব্যতের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাও অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে শব্দের অর্থ অঙ্গাতে তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাও সংঘটিত হওয়া হ্যারত কাতাদাহ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্তেই এর অর্থ পথভৃষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ ‘পথভৃষ্ট’ করা ঠিক নয়।

মহিমাবিত আল্লাহর সভা ও বরুপের জ্ঞান সাক্ষ করা মানবের জন্য সত্ত্বপর নয় : —এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমাবিত আল্লাহর বরুপ জ্ঞান সত্ত্বপর নয়। কারণ, ফিরাউনের পশ্চ ছিল আল্লাহর বরুপ সম্পর্কে। মূসা (আ) বরুপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার শুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বরুপ অনুধাবন করা সত্ত্বপর নয় এবং এরপ পশ্চ করাই অযোধ্যা। (ক্লৃত্ত মা'আনী)

—بَنِي إِسْرَائِيلَ هِلْ شَاءَ دُشْنَهُرَ الْبَاسِنَا । تَادِرَكَهُ
বনী ইসরাইল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা । তাদেরকে
বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত । এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফিরাউনের বন্দীশালায়
গোলাহির জীবন-যাপন করছিল । তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল হয় সাথ ত্রিশ হাজার ।
মূসা (আ) ফিরাউনকে সত্ত্বের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাইলের প্রতি
নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন হেড়ে দেওয়ার নির্দেশ
দিলেন ।—(কুরআনী)

পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী সীমান্তিঃ দুই ভিন্নমুখী
চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতর্ক যাকে পরিভাষায় মুনাফারা
বা বিতর্ক বলা হয়, প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে । কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক
একটি হারজিতের খেলায়-পর্যবসিত হয়ে গেছে । মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই
যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভাসি নিজেরও জানা হয়ে
যায় । এই দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রয়াগ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রয়াগ ও মেধাশক্তি
নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে । এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা
খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে । ইসলামই এই বিতর্কে
বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে । এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে
প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে ।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন । হ্যরত মূসা ও হাকিম
(আ) যখন ফিরাউনের অত বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্ত্বের
পয়গাম পৌছালেন, তখন সে মূসা (আ)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী
আলোচনা ও তক্বিতর্কের সূত্রপাত করল; যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল
বিষয়ের জওয়াব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা থোঁজ করে
এবং বর্ণনা করে, যাতে সে সজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় ।
এখানেও ফিরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল । এক, তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং
আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ । তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ
আছে । কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল ? দুই, তুমি একজন
কিবর্তীকে অহেতুক হত্যা করেছ । এটা যেমন যুলুম, তেমনি নিয়কহারামি ও কৃতস্ফুতা । যে
সম্প্রদায়ের সেই লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ তাদেরই একজনকে
তুমি হত্যা করেছ । এর বিপরীতে হ্যরত মূসা (আ)-এর পয়গম্বরসূলভ জওয়াব দেখুন ।
প্রথমত তিনি জওয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবর্তীর হত্যাকাণ্ডের জওয়াব প্রথমে
দিলেন; যা ফিরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা
ফিরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জওয়াব পরে দিলেন । এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য
একপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল । আজকালকার
বিতর্কে একপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু আল্লাহর রাস্তা এর জওয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন

এবং জওয়াবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় হেনে নিশ্চেহেন, এদিকে তিনি মোটেই স্বরূপে করেননি।

হযরত মুসা (আ) জওয়াবে এ কথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদুদেশ্য প্রণোদিত পদপক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি শান্ত করে ফেলে। শক্য ছিল, কিবর্তীকে ইসরাইলীর প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যেই তাকে একটি সুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভাষ্টিপ্রসূত। কাজেই আমার নবৃত্য দাবির সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আস্তরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আস্তাহু তা'আলা অতৎপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবৃত্য ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করলেন, শত্রুর বিপক্ষে তখন মুসা (আ)-এর সোজা ও পরিকার জওয়াব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি কিবর্তীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তাঁকে মিথ্যারূপ করার মতও কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মুসা (আ)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তাই করত। কিন্তু সেখানে তো আস্তাহু তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্ত্যমান প্রতীক পয়গম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাবীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্ছিন্ন স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবৃত্য ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জওয়াব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত হস্তাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফিরাউনের দরবার কোথায়। যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিকার হয়ে যাবে। তৃষ্ণি বনী ইসরাইলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও বিশ্রাপ্ত ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যিক তোমার এই যুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিষ্কেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুর দরিয়া থেকে উঁকার করে আমাকে ব্রহ্মে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আস্তাহু তা'আলার বিজ্ঞমোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শান্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশংকা থেকে আস্তরক্ষার জন্য তৃষ্ণি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আস্তাহু তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গম্বরসূলত জওয়াব থেকে উপস্থিত শ্রোত্মগুলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি ধর্মগত নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মুজিয়া দেখে এ কথার সত্যতা আরও পরিক্ষুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুইজন ব্যক্তি, যাদের অঞ্চ-পচাতে তৃতীয় কোন সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে

দরবার ফিরাউনের, শহর ও দেশ ফিরাউনের; কিন্তু তার ও আশংকা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিকার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহু প্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গঢ়ারগণের বাকবিততা ও বিতর্ক এবং সততা ও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। একাগ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভৃত করে ছাড়ে।

قَالَ لِلْمَلِائِكَةِ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلَيْهِمْ ۝ يَرِيدُونَ تَخْرِيجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسُحْرٍ ۝
 فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا رَجِهٌ وَأَخَاةٌ وَابْعَثُ فِي الْمَدَائِنِ حُشْرِينَ ۝ يَا تُولِّ
 بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ ۝ فَجَمِيعُ السَّحَّرَةِ لِمِيقَاتٍ يَوْمٌ مَعْلُومٍ ۝ وَقَيْلَ لِلنَّاسِ
 هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝ لَعَلَّنَا نَتَبِعُ السَّحَّرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِيبُونَ ۝
 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَّرَةُ قَالُوا لِفَرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا بِجُرَارٍ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيبُونَ ۝
 قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ أَذَلُّ أَهْلَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ۝ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامُ أَنْتُمْ
 مُلْقُونَ ۝ قَالَ الْقَوَافِلُ جَاهِلُهُمْ وَعَصِيرُهُمْ وَقَالَ الْأَيْزُرَةُ فِرْعَوْنُ إِنَّنَّنْحُنُ
 الْغَلِيبُونَ ۝ فَالْقَوْيَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ ۝ فَالْقَوْيَ
 السَّحَّرَةُ سِجِّدُونَ ۝ قَالُوا أَمْنَارِبُ الْعَالَمِينَ ۝ رَبُّ مُوسَى وَهَرُونَ ۝ قَالَ
 أَمْنَتُمْ لِهِ قَبْلَ أَذْنَنَّكُمْ ۝ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمَكُمُ السِّحْرَةُ فَلَسْوَفَ
 تَعْلَمُونَ ۝ لَا قَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۝ لَا وَصِلْبَيْكُمْ
 أَجْمَعِينَ ۝ قَالُوا أَلَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝ إِنَّا نَطْمَمْ أَنْ يَغْفِرَ
 لَنَارَبِّنَا خَطِيئَنَا إِنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিকার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে অত্যেকটি দক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নিদিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হলো, তোমরাও সমবেত হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারাই বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরুষকার পাব তো? (৪২) ফিরাউন বলল, হ্যাঁ এবং তখন তোমরা আমার লৈকট্যশীলদের অঙ্গৰ্ভ হবে। (৪৩) মুসা (আ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের রাশি ও সাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরাউনের ইয়বতের শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মুসা তাঁর সাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অঙ্গীক কীর্তিশোভকে ধ্বস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সিজদায় নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রাস্কুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস হাপন করলাম, (৪৮) যিনি মূসা ও হারানের রব। (৪৯) ফিরাউন বলল, আমার অনুমতিদানের প্রবেই তোমরা কি তাকে যেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীত্রেই তোমরা পরিগাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তৃ করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালন-কর্তাৰ কাছে অত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ঝুঁটি-বিছুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অর্থনী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হ্যবত মুসা (আ) কর্তৃক এসব মুজিয়া প্রদর্শিত হলো। ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইনি একজন সুদক্ষ জাদুকর। তার (আসল) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর জাদু বলে (নিজে শাসক হয়ে যাবেন এবং) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিকার করে দেবেন, (যাতে বিনা প্রতিবন্ধকর্তায় স্থগোত্রকে নিয়ে রাজ্য শাসন করতে পারে,) অতএব তোমরা কি পরামর্শ দাও? পারিষদবর্গ বলল, আপনি তাঁকে ও তাঁর ভাইকে (কিঞ্চিৎ) অবকাশ দেন এবং (নিজ দেশের) শহরে শহরে সংখ্যাহকদেরকে (হকুমনামা দিয়ে) প্রেরণ করুন, যাতে তারা (সব শহর থেকে) সব সুদক্ষ জাদুকরকে (একত্র করে) আপনার কাছে উপস্থিত করে। অতঃপর এক নিদিষ্ট দিনে বিশেষ সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। (নিদিষ্ট দিন অর্থাৎ সাজসজ্জার দিন এবং বিশেষ সময় অর্থাৎ চাশ্তের সময়; যেমন সূরা তোয়াহার তৃতীয় রূপুর শুরুতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত সবাইকে সমবেত করা হলো এবং ফিরাউনকে এর সংবাদ জানিয়ে দেয়া হলো।) এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে) জনগণকে বলে দেওয়া হলো যে,

তোমরাও কি (অমৃক হানে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য) একজ হবে ? (অর্থাৎ একজ হয়ে যাও।) যাতে জাদুকররা জয়ী হলে (যেমন প্রবল ধারণা ভাই) আমরা তাদেরই পথ অনুসরণ করি। (ফিরাউন এ পথে ছিল এবং অপরাকেও এ পথে রাখতে চাইত)। উক্তভ্য এই যে, একজ হয়ে দেখ। আশা করা যায় যে, জাদুকররাই বিজয়ী হবে। তখন আমাদের পথ যে সত্য তা সপ্রমাণ হয়ে যাবে।) অতঃপর যখন জাদুকররা (ফিরাউনের সামনে) আগমন করল, তখন ফিরাউনকে বলল যদি আমরা [মুসা (আ)-এর বিশকে] বিজয়ী হই, তবে আমরা কোন বড় পুরুষার পাব তো ? ফিরাউন, বলল, হ্যা, (আর্থিক পুরুষাগ্রণ বড় পাবে) এবং (তদুপরি এই ঘর্যাদাও লাভ করবে যে) তোমরা আমার নেকট্যালীমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। [এইরূপ কথাবার্তার পর তারা প্রতিযোগিতার হানে আগমন করল এবং অপরদিকে মুসা (আ) আগমন করলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হলো। জাদুকররা বলল, আপনি প্রথমে লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমরা নিক্ষেপ করব। মুসা (আ) বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, (য়াবানে) নিক্ষেপ কর। অতএব তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল, (যা জাদুর অভাবে সর্প মনে হচ্ছিল) এবং বলল, ফিরাউনের ইয়বতের কসম, নিচয় আমরাই জয়ী হব। অতঃপর মুসা (আ) আদ্বাহী আদেশে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা (অঙ্গর হয়ে) তাদের সব অঙ্গীক কীর্তিকে গ্রাস করতে লাগল। অতঃপর (এ দৃশ্য দেখে) জাদুকররা (এমন মুঠ হলো যে,) সবাই সিজদাবন্ত হয়ে গেল এবং (চিৎকার করে) বলল, আমরা রাক্ষুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করলাম যিনি মুসা ও হারুন (আ)-এরও রব। ফিরাউন (অক্ষত বিচলিত হলো যে, কোথাও সবচেয়ে প্রজাসাধারণই মুসলমান না হয়ে যায়। সে একটি বিষয়বস্তু চিন্তা করে শাসনির সুরে জাদুকরদেরকে) বলল, তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মুসার প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করলে ? নিচয় (মনে হয়) সে (জাদুবিদ্যায়) তোমাদের সবার ওকাদ, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। (আর তোমরা তার শিষ্য)। তাই পরম্পর গোপনে চক্রান্ত করেছ যে, তৃতীয় এমন করলে আমরা এমন করব এবং এভাবে হারাজিত প্রকাশ করব, যাতে কিরতীদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে বাজেন্দে বাজেন্দ করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে আছে : *إِنْ مَذَا لَمْكُرْ مَكْرُشُوهُ فِي الْأَيْنَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهُ* (অতএব) শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জ্ঞানতে পারবে। (তা এই যে) আরি তোমাদের একদিকের জ্ঞান ও অন্যদিকের পা কর্তৃন করব এবং তোমাদেরকে শূলে ঢ়াব (যাতে আরও শিক্ষা হয়)। তারা জওয়াব দিল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব (সেখানে সব রকমের শাস্তি ও সুখ আছে)। সুতরাং একল মৃত্যুতে ক্ষতি কি ?) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা (এ হলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে) সর্বাত্মে বিশ্বাস হ্রাপন করেছি (সুতরাং এতে একল সন্দেহ হতে পারে না যে, তাদের পূর্বে ‘আনিয়া’ ফিরাউন বংশের সুপ্রিম ও বর্মী ইসরাইল বিশ্বাস হ্রাপন করেছিল)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَوْمَامَا أَنْتُمْ مُلْفُونْ — অর্থাৎ হয়রত মূসা (আ) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সঙ্গেই হয় যে মূসা (আ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এটা মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না। বরং তাদের যা কিন্তু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যক্তি বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন কোন আপ্তাহ্নিকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আপ্তাহ্নিকার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহ্য্য, একে আপ্তাহ্নিকে সম্মতি বলা যায় না।

بِعِزْرَةِ فَرَعَونَ — এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্থতা যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিভাষের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহৰ কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েথ। বরং এগুলো সম্পর্কে এ কথা বলা ভুল হবে না যে, আপ্তাহ্নুর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়। (জুহু মা'আনী)

فَأَلْوَى لِأَصْبَرَ إِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا مُنْقَبِونْ — অর্থাৎ যখন ফিরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস হ্রাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তৃত ও শূলে চড়ানোর হৃষকি দিল, তখন জাদুকরো অত্যন্ত ভাঙ্গিল্যভরে জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, কর। আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিখে, ফিরাউনের উপাস্যতা হীকারকারী এবং ফিরাউনের পূজা-অচন্নাকারী এই জাদুকরো মূসা (আ)-এর মু'জিয়া দেখে বিজাতির বিপক্ষে ফিরাউনের মত দ্বৈরাচারী স্মার্টের বিরুদ্ধে ইমানের কথা ঘোষণা করল কিরণে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ইমানের ঘোষণাই নয়; বরং ইমানের এমন গভীর রংগও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উজ্জ্বলিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা ফাঁচ্স মান্ত ফাঁচ্স তোমার যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে মূসা (আ)-রই মু'জিয়া যা শাঠি ও সুগ্রস্ত হাতের মু'জিয়ার চাইতে কেোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের খিয় রাস্তা যুহুম্বদ (সা)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক ফিলিটের মধ্যে সত্ত্ব বছরের কাফিরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মু'মিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ اسْرِيَّادِيَّ إِنَّكُمْ مُبْعَدُونَ ⑤٦ فَارْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي
 الْمَدَائِنِ حِشْرِينَ ⑤٧ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرُذْمَةٌ قَلِيلُونَ ⑤٨ وَرَاهِئُمْ لَنَا
 لَغَلِظُونَ ⑤٩ وَإِنَّ الْجَمِيعَ حِلَارُونَ ⑥٠ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَعِيُونِ ⑥١
 وَكُنُزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ⑥٢ كَذَلِكَ وَأَرْتَهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ⑥٣ فَاتَّبَعُوهُمْ
 مُشْرِقَيْنَ ⑥٤ فَلَمَّا سَرَأَ الْجَمِيعَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ⑥٥
 قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّنَا سِيدُنَا ⑥٦ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ اضْرِبْ بِعَصَابَكَ
 الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فُوقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ ⑥٧ وَأَرْلَفَنَا تَمَّ الْأَخْرَيْنِ ⑥٨
 وَأَعْيَنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمِيعُنَ ⑥٩ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ ⑦٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَذِيَّةً دُوْمًا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنُينَ ⑦١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑦٢

(৫২) আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বাস্তাদেরকে নিয়ে রাখিয়োগে বের হবে যাও, নিচৰ তোমাদের পচাক্ষাৰণ কৰা হবে। (৫৩) অতঃপৰ কিৱাউন শহৰে শহৰে সংখ্যাহকদেৱকে প্ৰেৰণ কৰল, (৫৪) নিচৰ এৱা (বনী ইসরাইল) ক্ষুদ্ৰ একটি দল। (৫৫) এবং তাৰা আমাদেৱ ক্ষেত্ৰে উদ্বেক কৰেছে। (৫৬) এবং আমৰা সবাই সদা শক্তি। (৫৭) অতঃপৰ আমি কিৱাউনেৱ দলকে তাদেৱ বাগবাগিচা ও বাৰনাসযুহ থেকে বহিকাৰ কৰলাম। (৫৮) এবং ধনভাণীৰ ও ঘনোৱম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) একলাই হৱেছিল এবং বনী ইসরাইলকে কৱে দিলাম এ সবেৱ মালিক। (৬০) অতঃপৰ সূর্যোদয়েৱ সময় তাৰা তাদেৱ পচাক্ষাৰণ কৰল। (৬১) যখন উভয় দল পৰম্পৰাকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীৱা বলল, আমৰা তো ধৰা পড়ে গেলাম। (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকৰ্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপৰ আমি মূসাকে আদেশ কৰলাম, তোমার শাঠি দ্বাৰা সমুদ্ৰকে আঘাত কৰ। ফলে, তা বিদীৰ্ঘ হৱে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পৰ্বতসমূহ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেখাৱ অপৰ দলকে পৌছিয়ে দিলাম। (৬৫) এবং মূসা ও তাৰ সঙ্গীদেৱ সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) অতঃপৰ অপৰ দলটিকে নিয়মজিত কৰলাম। (৬৭) নিচৰ এতে একটি নিৰ্দৰ্শন আছে এবং তাদেৱ অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। (৬৮) আপনাৰ পালনকৰ্তা অবশ্যই পৰাক্রমশালী, পৰম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন ফিরাউন এ ঘটনা থেকেও হিদায়াত লাভ করল না এবং বনী ইসরাইলের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করল না, তখন) আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাগণকে (অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে) রাখিয়োগে (মিসর থেকে) বাইরে নিয়ে যাও এবং (ফিরাউনের পক্ষ থেকে) তোমাদের পচাক্ষাবন করা হবে। (সেমতে তিনি আদেশ মত বনী ইসরাইলকে সাথে নিয়ে রাখিয়োগে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সকালে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে) ফিরাউন (পচাক্ষাবনের জন্য আশেপাশের) শহরে শহরে সঞ্চাহক দৌড়িয়ে দিল এবং বলে পাঠাল) যে, তারা (অর্থাৎ বনী ইসরাইল আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্র দল। (তাদের শুকাবিলা করতে কেউ যেন ভয় না করে) তারা (নিজেদের কার্যকলাপ দ্বারা) আমাদের ক্ষেত্রের উদ্বেক করেছে। (কার্যকলাপ এই যে, গোপনে চাতুরী করে বের হয়ে গেছে অথবা ধারের বাহানায় আমাদের অনেক অলংকারও সাথে নিয়ে গেছে। মোটকথা, তারা আমাদেরকে বোকা বানিয়ে গেছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করা উচিত। আমরা সবাই একটি সশ্রেষ্ঠ দল (এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনী)। মোটকথা, (দৃঢ়ার দিনে সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে বনী ইসরাইলের পচাক্ষাবনে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা যে ফিরে আসতে পারবে না, এ কল্পনাও তাদের ছিল না। এ-দিক দিয়ে যেন) আমি তাদেরকে বাগ-বাণিজা, ঝরণাসমূহ থেকে, ধনভাণ্ডার এবং সুরম্য অট্টালিকাসমূহ থেকে বহিকার করে দিলাম। (আমি তাদের সাথে) এক্ষেপই করেছি এবং তাদের পরে বনী ইসরাইলকে এগুলোর মালিক করে দিয়েছি। (এ ছিল মধ্যবর্তী বাক্য। অতঃপর আবার কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে :) মোটকথা, (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় তাদের পচাক্ষাবন করল (অর্থাৎ কাছাকাছি পৌছে গেল। বনী ইসরাইল তখন ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার ফিকিরে ছিল)। অতঃপর যখন উভয় দল (এমন নিকটবর্তী হলো যে,) পরম্পরাকে দেখল, তখন মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা (অস্ত্রির হয়ে) বলল, (হে মূসা,) আমরা তো তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়; কারণ, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি এখনই আমাকে (সাগর পাড়ি দেয়ার) পথ বলে দেবেন। (কেননা, রওয়ানা হওয়ার সময়ই মূসা (আ)-কে বলে দেয়া হয়েছিল যে, সমুদ্র শুক পথ সৃষ্টি হবে فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا স্থান করে দেবেন। তবে শুক কিরণে হবে, তা তখন বলা হয়নি। সুতরাং মূসা (আ) এই ওয়াদার কারণে নিশ্চিত ছিলেন এবং বনী ইসরাইল উপায় জানা না থাকার কারণে অস্ত্রির ছিল।) অতঃপর আমি মূসা (আ)-কে আদেশ করলাম, লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। সেমতে (তিনি আঘাত করলেন। ফলে) তা বিদীর্ণ হয়ে (কয়েক অংশ হয়ে) গেল। (অর্থাৎ কয়েক জ্যাগা থেকে পানি সরে গিয়ে মাঝখানে একাধিক সড়ক খুলে গেল।) প্রত্যেক অংশ বিশাল পর্বতসদৃশ (বড়) ছিল। (তারা নিরাপদে ও শাস্তিতে সমুদ্র পার হয়ে গেল।) আমি অপর দলকেও তথায় পৌছিয়ে দিলাম (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার দলবলও সমুদ্রের কাছে পৌছে গেল এবং এই সাবেক ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী সমুদ্র তখন পর্যন্ত তদবস্থায়ই ছিল। তারা খোলা পথকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অগ্ন-পচার চিন্তা না করে গোটা বাহিনীকে পথে নামিয়ে দিল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে পানি নেমে আসতে লাগল এবং সমগ্র বাহিনী সলিল সমাধি শাত করল। বাহিনীর

পরিণাম হলো এই যে,) আমি মূসা (আ)-কে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে (নিমজ্জিত হওয়া থেকে) উদ্ধার করলাম এবং অন্যদেরকে (অর্থাৎ তাদের প্রতিপক্ষকে) নিমজ্জিত করে দিলাম। এ ঘটনায়ও বড় শিক্ষা আছে (অর্থাৎ কাফিররা এর দ্বারা যেন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী ও পয়গম্বরদের বিরোধিতা আয়াবের কারণ। একথা বুঝে তারা বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।) কিন্তু (এডসন্ট্রেও) তাদের (অর্থাৎ মুক্তির কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত পরাক্রমশালী (ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই আয়াব দিতেন; কিন্তু) পরম দয়ালু। (তাই ব্যাপক দয়ার কারণে আয়াবের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াবের বিলম্ব দেখে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাইলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাইল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফির জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাইল এই আদেশ পালনে অস্থীকৃত হয়। কলে আয়াব হিসেবে তীব্রে উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চালুশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীব্র প্রাক্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হয়রত মূসা ও হারুন (আ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসঘন্ট থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাইল কোন সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিষয় সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাইলের অধিকার কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রাহল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুইটি জওয়াব তফসীরবিদ হয়রত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে। হয়রত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে ফিরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফিরাউনের ধ্বংসের তাঙ্কণিক পর ঘটবে। তীব্র প্রাক্তরে ঘটনার চালুশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনকূপ তফাঁ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহন্দী ও খ্রিস্টনদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কোরআনের আয়াতে কোনকূপ সদর্শ করার প্রয়োজন নেই। হয়রত কাতাদাহ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা ও'আরার আলোচ্য ১৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব

আয়াত থেকে বাহ্যত বুৰূা যাই যে, বনী ইসরাইলকে বিশেষভাবে ফিরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাইলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, নবী ইসরাইলকে ফিরাউন সম্প্রদায়ের অনুকূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়। বরং অনুকূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত **الْتَّيْ** **بَارْكَنْتُ** **شَكْ** থেকে বাহ্যত আনা যাব যে, শামদেশই বুৰূানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে **بَارْكَنْتُ** ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফিরাউনের ধৰ্মের পর বনী ইসরাইল কোন সময়ই সংষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহুর তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বুৰূানো যেতে পারে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

—قَالَ أَصْنَابُ مُوسَى إِنَّا لَمْ نَرَكُونَ — قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِي رَبِّي سَيِّدِنَا — পশ্চাদ্বাবনকারী ফিরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাইল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অগ্রিম সেনাবাহিনী এবং সমূখে সমূদ্র অঙ্গরায়। এই পরিস্থিতি মূসা (আ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আঞ্চাহু তাঁআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন **كَلَّا** আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, **إِنْ مَعِي رَبِّي سَيِّدِنَا**, আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা একপ স্থলেই হয়ে থাকে। মূসা (আ)-এর চোখেয়ুথে ত্যজীতির চিহ্নাত্মক ছিল না। তিনি যেন উক্তারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হবহ এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওৰ গিরিশহায় আজগোপনের সময় আমাদের রাসূলে মকবুল (সা)-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্বাবনকারী শক্ত এই গিরিশহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অস্ত্ররতা প্রকাশ করলে তিনি হবহ এই উজ্জ্বল দেন **أَنَّ اللَّهَ مَعَنِي** চিন্তা করো না, আঞ্চাহু আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে সামুনা দেয়ার জন্য বলেছিলেন **إِنْ مَعِي رَبِّي** ; আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) জওয়াবে **مَعَنِي** বলেছেন অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আঞ্চাহু আছেন। এটা উদ্ধতে মূহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উদ্ধতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে আঞ্চাহুর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

وَلَئِنْ عَلِيَّهُمْ بِمَا أَبْرَهِيمَ ۝ إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَهُ مَا نَعْبُدُ وَنَنْعَدُ ۝ قَالُوا نَعْبُدُ
 أَهْنَامًا فَنَظَلَ لَهَا عَكْفِينَ ۝ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝ أَوْ يَنْفَعُونَ
 كُمْ أَوْ يَضْرُبُونَ ۝ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ قَالَ
 أَفَرَءَيْدُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ انْتُرُوا بَأْؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۝ فَإِنَّهُمْ
 عَدُوٌّ لِّلَّهِ أَلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيَنِي ۝ وَالَّذِي
 هُوَ يُطْعِمُنِي وَيُسْقِيَنِي ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يُشْفِيَنِي ۝ وَالَّذِي يَمْتَنِي
 ثُمَّ يَحْمِيَنِي ۝ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطَايَايِّي يَوْمَ الدِّينِ ۝
 رَبِّ هَبْلِي حَكْمًا وَالْعِقْنَى بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي إِسَانَ صِدْقِي فِي
 الْأَخْرِيْنَ ۝ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَتَةِ جَنَّةِ التَّنْعِيْمِ ۝ وَاعْفُ لِيَ إِنَّهُ
 كَانَ مِنَ الصَّالِيْنَ ۝ وَلَا تَغْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ۝ يَوْمَ لَا يَفْعَمُ مَالٌ وَلَا
 بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقُلْبٍ سَلِيْمٍ ۝ وَازْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝
 وَبِرِزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوِيْنَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ مَا هُلِّ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝ فَكُبُرُكُمْ أَفِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝
 وَجَنُودُ إِبْرَاهِيمَ أَجْمَعُونَ ۝ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعْتَصِمُونَ ۝ قَالَ اللَّهُ أَنْ كُنَّا
 لِفِي ضَلَالٍ مُّسِيْرُونَ ۝ إِذْ سُوِّيْكُمْ بَرِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَمَا أَضْلَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝
 فَمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ فِيْنَ ۝ وَلَا صَدِيقٌ حَسِيْمٌ ۝ فَلَوْا نَّنَاكِرَةً فَنَكُونُ مِنْ

الْمُؤْمِنُونَ ⑩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذِيَّةٍ وَمَا كَانَ أَكْرَمُهُمْ مُؤْمِنُونَ ⑪ وَإِنَّ

رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑫

- (৬) তার ভাসেরকে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত পরিয়ে দিন। (৭) বখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর স্ত্রীরকে বললেন, তোমরা কিসের ইবদুত কর ? (৮) তারা বলল, আমরা অতিশায় পূজা করি এবং সারাদিন এসেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি। (৯) ইবরাহীম (বা) বললেন, তোমরা বখন আহবান কর, তখন তারা থোলে কি ? (১০) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করে কিংবা কৃতি করতে পারে ? (১১) তারা বলল : না, তবে আমরা আহাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেরেছি তারা এয়েশি করত। (১২) ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি তাসের সম্পর্কে তবে সেখেছ, বাসের পূজা করে আসছ। (১৩) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের ? (১৪) বিষ পালনকর্তা ব্যক্তিত তারা সবাই আমার শক্ত, (১৫) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপদর্শন করেন, (১৬) যিনি আমাকে আহার দেন এবং পানীয় দান করেন, (১৭) বখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, (১৮) যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। (১৯) আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিন আমার জীবি-বিচারি যাক করবেন। (২০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এক দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অতর্কৃত কর (২১) এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাবী কর (২২) এবং আমাকে শিয়াবত উদ্যানের অধিকারীদের অতর্কৃত কর। (২৩) এবং আমার পিতাকে কসা কর। সে তো পথচারীদের অন্যত্যম। (২৪) এবং পুনর্জীবন দিবসে আমাকে সাহিত করো না, (২৫) বে দিবসে ধনসম্পদ ও সত্তান-সভাতি কোন উপকারে আসবে না, (২৬) কিন্তু যে সুহ সত্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে। (২৭) জারাত আল্লাহতীকদের নিকটবর্তী করা হবে। (২৮) এবং বিপর্যাসীদের সাথে উন্মোচিত করা হবে জাহানায়। (২৯) তাসেরকে বলা হবে : তারা কোথায়, তোমরা বাসের পূজা করতে পারে ? (৩০) আল্লাহর পরিবর্তে ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা অতিশোধ নিতে পারে ? (৩১) অতঃপর তাসেরকে এবং পথচারীদেরকে অথোমুবি করে নিকেশ করা হবে জাহানায়। (৩২) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৩৩) তারা তখার কথা কাটাকাটিতে শিষ্ঠ হয়ে বলবে, (৩৪) আল্লাহর কসর আমরা প্রকাশ বিভাসিতে লিখ ছিলাম। (৩৫) বখন আমরা তোমাদেরকে বিষ-পালনকর্তার সমষ্টুল্য গণ্য করতাম। (৩৬) আমাদেরকে দুর্কর্মীরাই গোমরাহ করেছিল। (৩৭) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (৩৮) এবং কোন সহদয় বন্ধুত্ব নেই। (৩৯) হায়, যদি কোনকাপে আমরা পৃথিবীতে অভ্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা

বিশ্বাস ছাপনকারী হবে বেতাম। (১০৩) নিষ্ঠৱ, এতে বিদর্শন আছে, এবং তাদের অধিকাণ্ডেই বিশ্বাসী নয়। (১০৪) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশাস্ত্রী, পদ্মম দস্তালু।

তফসীরের শার-সংক্ষেপ

আপনি ভাদের সামনে ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন (যাতে তারা শিরক নিষ্পন্নীয় হওয়ার প্রমাণাদি আমতে পারে বিশেষত ইবরাহীম (আ) থেকে বর্ণিত প্রমাণাদি। কেননা, আরবের এই মুশর্রিকরা নিজেদেরকে খিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী বলে দাবি করে। এই বৃত্তান্ত তখনকার) যখন তিনি তাঁর পিতাকে এবং তাঁর (প্রতিমাপূজারী) সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি (অলীক) বন্ধুর পূজা কর? তারা বলল, আমরা প্রতিমাদের পূজা করি এবং তাদের (পূজা)-কেই আঁকড়ে থাকি। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যখন (তোমাদের অজ্ঞাব-অনটন দূর করার জন্য) তাদেরকে আহত্বান কর, তখন তারা শোনে কি অথবা (তোমরা যে তাদের পূজা কর,) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করে কিংবা (যদি তোমরা তাদের পূজা বর্জন কর, তবে কি) ক্ষতি করতে পারে? (অর্থাৎ পূজনীয় হওয়ার জন্য পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা জন্যরী। তারা বলল, (তা তো নয়। তারা কিছুই শোনে না এবং কোন লাভ ক্ষতি করতে পারে না। তাদের পূজা করার কারণ এটা নয়,) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক্ষণই করতে দেখেছি। (তাই আমরাও এই পূজা করি)। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি তাদের (অবস্থা) সম্পর্কে তেবে দেখেছ; যাদের পূজা করতে তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা? তারা (উপাস্যরা) আমার (অর্থাৎ তোমাদের) জন্য ক্ষতিকারক (অর্থাৎ তাদের পূজা করলে; আমি করি কিংবা তোমরা কর)। তাদের ইবাদতে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই।) কিছু হ্যাঁ, বিশ্বপালনকর্তা (এমন যে, তিনি তাঁর উপাসনাকারীদের বন্ধু। তাঁর ইবাদত আদ্যোগ্যাত উপকারী।) যিনি আমাকে (এমনভাবে সবাইকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে (আমার উপকারিতার দিকে) পথপ্রদর্শন করেন (অর্থাৎ জ্ঞানবুদ্ধি দান করেন, যদ্বারা লাভ-লোকসান বৃক্ষি। এবং যিনি আমাকে পানাহার করান। আমি বৈগোক্তিক হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন এবং তিনি আমাকে (যথাসময়ে) মৃত্যু দেবেন, অতঃপর (কিয়ামতের দিন) আমাকে জীবিত করবেন এবং যিনি কিয়ামতের দিন আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান মাঝ করবেন বলে আমি আশা করি। (আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে উৎসুক করার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম (আ) এসব উপরে কথা বর্ণনা করলেন। এরপর আল্লাহর ধ্যান প্রবল হয়ে ধ্যানার কারণে মুনাজাত শুরু করে দিলেন।) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পূজা (অর্থাৎ ইল্য ও আমলে পূর্ণতা) দান কর। (কেননা, যুল প্রজ্ঞা তো দোরার সময়ও অর্জিত ছিল)। এবং (নৈকট্যের জন্যে) আমাকে (উচ্চ স্তরের) সংকরণপ্রায়গদের অস্তর্ভুক্ত কর (অর্থাৎ যাদে পরমগবরণদের অস্তর্ভুক্ত কর।) এবং আমার আলোচনা ভবিষ্যত বৎসরদের স্বত্যে অব্যাহত রাখ (যাতে তারা আমার পথে চলে। কলে আমি বেশি সওদাব পাব।) এবং আমাকে নিয়ামত উদ্যানের অধিকারিগণের শামিল কর এবং আমার পিতাকে (ইমানের তত্ত্বাবলীক দিয়ে) ক্ষমা কর। সে তো পথচার্টদের অন্যান্য। যেদিন সবাই পুনরুদ্ধিত হবে, সেদিন আমাকে লাঙ্ঘিত করো না। (অতঃপর সেদিনের কিছু লোহস্বরূপ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন, যাতে মাঝে আরেফুল কুরআন (৬৪)।—৬৬

সম্প্রদায়ের লোকেরা শোনে এবং সাবধান হয়। এবং সেই দিনগুলো এমন হবে যে,) সেদিন (মৃত্তির জন্ম) অর্থ-সম্পদ ও সত্ত্বান-সম্মতি কোন উপকারে আসবে না। তবে (সে মৃত্তি পাবে,) যে (কুকুর ও শিরক ধেকে) পবিত্র অস্তুর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে এবং (সেদিন) আল্লাহ-ভীকুন্দের (অর্থাৎ ইমানদারগণের জন্য জাহান নিকটবর্তী করা হবে (যাতে তারা দেখে এবং তারা তথায় যাবে জেনে আলশিত হয়।) এবং পথজ্ঞদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য দোয়া সম্মুখে প্রকাশ করা হবে (যাতে তারা তাদের অবস্থানস্থল দেখে দৃঢ়বিত হয়) এবং (সেদিন) তাদেরকে (পথজ্ঞদেরকে) বলা হবে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে তারা কোথায় ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা আবারক্ষা করতে পারে ? অতঃপর (একথা বলে) তাদেরকে (উপাসকগণকে) ও পথজ্ঞ লোক এবং ইবলীস বাহিনীর সবাইকে অধোমুর্বী করে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে (সূত্রাং প্রতিমা ও শয়তানরা নিজেদেরকে এবং উপাসকদেরকে বাঁচাতে পারবে না)। কাফিররা জাহানামে কথা কাটাকাটিতে লিখ হয়ে (উপাস্যদেরকে) বলবে, আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিজ্ঞানিতে লিখ ছিলাম, যখন তোমাদেরকে (ইবাদতে) বিশ্ব পালনকর্তার সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে তো (গোমরাহীর প্রতিষ্ঠাতা) বড় দুর্বর্মাই পোমরাহ করেছিল। অতএব (এখন) আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (যে ছাড়িয়ে নেবে) এবং কোন সহনয় বস্তুও নেই (যে কেবল ঘরবেদনাই প্রকাশ করবে।) যদি আমরা (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম। [এ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য সমাপ্ত হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :] নিচয় এতে (অর্থাৎ ইবরাহীমের বিতর্কে ও কিয়ামতের ঘটনায় সত্যাবেষী ও পরিপামদশীদের জন্য) শিক্ষা রয়েছে। (বিতর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করলে তাওহীদের বিশ্বাস লাভ হয় এবং কিয়ামতের ঘটনাবলী থেকে তয় অর্জিত হয় এবং ইমানের পথ প্রশংস্ত হয়।) কিন্তু তাদের (অর্থাৎ মুক্তার মুশরিকদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিচয় আগন্তুর পালনকর্তা এবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (তিনি আয়াব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاجْعَلْ لِي سُانَ مِدْقَنِي : سَانَ مِدْقَنِي :
এই আয়াতে বলে আলোচনা বুঝানো হয়েছে এবং এর লাভ উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ, আমাকে এমন সুন্দর তরীকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সদগুণবলী দ্বারা স্বরূপ করে। -(ইবনে কাসীর, রহস্য মা'আনী) আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা ঘূর করেছেন। ফলে ইহুদী, ক্রিস্টান এমনকি মুক্তার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুকুর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে।

খ্যাতি ও যশপ্রীতি নিম্ননীয়, কিন্তু কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ : যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরীরতের দৃষ্টিতে নিম্ননীয়। কোরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে : ﴿لَمْ يُرِيدُنَّ لِلذِّينَ نَجَّعْلُهَا لِلْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلذِّينَ لَا يُرِيدُونَ عَلَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ —আলোচ্য আয়াতে হয়রত ইবরাহীম (আ) দোয়া করেছেন যে, ত্বিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এই দোয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়। বরং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তওঁফীক দান করুন, যা আমার আধিকারের সহিত হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও সৎকর্মের প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে। সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোন সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কোরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিম্ননীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তদ্বারা পার্থিব মুশাফা অর্জন।

ইমাম তিরিয়মী ও নাসায়ী হয়রত কা'ব ইবনে মালেকের জবানী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। এক অর্থসম্পর্কের ভালবাসা এবং দুই সম্মান ও যশ অবেষণ। দায়লামী হয়রত ইবনে আব্দুস থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অক্ষ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অবেষণ বুঝানো হয়েছে, যা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য অথবা কোন গুনাহ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিম্ননীয় নয়। হাদীসে বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে : ﴿إِنَّمَا جَعَلْنَا فِي عِينِي صَفِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا﴾ আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন। এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক বলেন, যে বাকি বাস্তবে সৎকর্মপ্রায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন রিয়াকারী না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালবাসে, তবে তা নিম্ননীয় নয়।

ইবনে আরাবী বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অবেষণ করা জায়েয়। ইমাম গায়যালী বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। এক, যদি উদ্দেশ্য নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছেট ও হেয় প্রতিপন্ন করা না হয়;; বরং এরপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, আনুব তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। দুই, যিন্ধ্য গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই। তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। তিনি, যদি তা অর্জন করার জন্য কোন গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

مَكَانَ لِلْنُّبُيُّ وَالذِّينَ أَمْنَوْا أَنْ يُسْتَغْفِرُوا ۚ وَلَوْكَانُوا أُولَئِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَاتَبْيَنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحْنَمِ ۝
এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মু’মিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কাননা করা দ্ব্যর্থীনয়নে নাজায়েয়; যদিও তারা নিকটাঞ্চীরও হয়, যদিও তাদের জাহানারী হওয়া সুপ্রট হয়ে যায়।

— وَأَغْفِرْ لَأَبِيْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ — এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাঞ্জার পর হ্যরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাকবুল ইয়্যাত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন:

وَمَا كَانَ أَسْتَغْفَارُ ابْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مُؤْعَدَةٍ وَعُدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ أَنَّهُ عَدُوَّ لِلَّهِ شَرِّاً مَنْهُ أَنَّ ابْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيمٌ ۝

জওয়াবের সারমূল এই যে, হ্যরত ইবরাহীম (আ) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্ধশায় ইয়ানের তওকীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা’আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ইয়ানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে দৈয়ান কুবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্ণিতভা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্ধশায়েই হ্যরত ইবরাহীম (আ) জানতে পেরেছিলেন; না তার মৃত্যুর পর, না কিয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লিখিত হয়েছে।

— يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ - لَا مَنْ أَنَّ اللَّهَ يَتَّقِبِ سَلِيمٌ ۝ — অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কানও কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মৃত্যি পাবে, যে সুহ অস্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছবে। এই আয়াতের কে
استَّنَا، منْقَعِ سَاوَيْتَ করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কানও অর্থ-সম্পদ ও
সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুহ অস্তঃকরণ, যাতে
শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দ্রষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েন সম্পর্কে কানও কাছে
জিজ্ঞেস করে যে, যাবদের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আছে কি? জিজ্ঞাসিত
ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুহ অস্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর
অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার
কাছে তার নিজের সুহ অস্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু
দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে
আসবে তধু নিজের ইয়ান ও সৎকর্ম। একেই ‘সুহ অস্তঃকরণ’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।
অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের এবং মতস্থ টি এবং

অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অঙ্গকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ইমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ইমানদারের জন্যই উপকারী হবে—কাফিরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে بَلَى وَبِنْزَنْ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সত্ত্বত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা সন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সত্ত্ববনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতে বিশেষ করে পুত্র সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হতো।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে، قَلْبٌ سَلِيمٌ এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অঙ্গকরণ। হ্যরত ইবনে আবুস বলেন, এতে সেই অঙ্গকরণ বুঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পৰিবে। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অঙ্গকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফিরের অঙ্গকরণ ঝগ্গ হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ইমানের শর্তে উপকারী হতে পারে : আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্থীর অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ইমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মু'মিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যক্তির অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশেরের ময়দান ও হিসাবের দাড়িপোক্তায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না কর্মন-মৃত্যুর পূর্বে বেইমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়নরপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশেরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; বিশেষত অপ্রাপ্যবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে تَعْلَمُهُمْ دُرِّيْتَهُمْ، অর্থাৎ আমি আমার সৎ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يُوْمُ يَرَأُ الْمُرْسَلُونَ مِنْ أَخْبَرِهِ — إِذَا نَفَعَ فِي السُّورَ مُلَأَ أَشْبَابُ بَيْتِهِمْ لَأَجْزِنَى وَالدُّونَ عَنْ وَلْدِهِ — وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كَذَّبُتْ قَوْمٌ بِنُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقَوَّنَ ۝ أَتَيْتُ
كُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَا فَانْتَقَلُوا إِلَيْهِ وَأَطِيعُونَ ۝ وَمَا أَعْلَمُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَرَبِ الْعَلَمِينَ ۝ فَانْتَقَلُوا إِلَيْهِ وَأَطِيعُونَ ۝ قَالُوا
أَنَّوْمُنْ لَكُمْ وَأَتَبْعَكُمُ الْأَرْذُلُونَ ۝ قَالَ وَمَا عَلَيْيِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
إِنْ حَسَابَهُمُ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّهِ لَوْشَعْرُونَ ۝ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ آنَّا
إِلَّا نَذِيرٌ مِّنْنِي ۝ قَالُوا لِئِنْ تَنْتَهِي بِنُوحٍ لَتَكُونَ مِنَ
الْمُرْجُومِينَ ۝ قَالَ رَبِّي إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي ۝ فَانْتَهِ بِيَتِي
وَبِيَنْهُمْ فَتَحَوَّلُنَّ عَجَّىٰ وَمَنْ مَعَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي
الْقَلْبِ الْمَسْحُونِ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَيْقَيْنَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

(১০৫) নৃহের সম্মান পয়গতবরগণকে শিখ্যারোপ করবে। (১০৬) যখন তাদের
আতা নৃহ তাদেরকে বললেন, ‘তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য
বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১০৮) অতএব তোমরা আশ্চর্যকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য
কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন অভিদান চাই না; আমার অভিদান
তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব তোমরা আশ্চর্যকে ভয় কর এবং আমার

আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে যেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা ? (১১২) নৃহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানি আমার কি সরকার ? (১১৩) তাদের হিসাব মেওয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে ! (১১৪) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেওয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো তখু একজন সুল্টান সর্তককারী।' (১১৬) তারা বলল, হে নৃহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।' (১১৭) নৃহ বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (১১৮) অতএব আমার ও তাদের যথে কোন ক্ষয়সালা করে দিব এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মু'মিনগণকে রক্ষা করুন।' (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তার সঙ্গীগণকে বুঝাই করা নৌকার রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিচর এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) নিচর আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নৃহ (আ)-এর সম্পদায় পয়গত্যরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (কেননা একজনকে মিথ্যারোপ করা সবাইকে মিথ্যারোপ করার শাখিল)। যখন তাদের জাতিভাই নৃহ (আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বত পয়গত্য। (আল্লাহর পয়গাম কম-বেশি না করে হবহ তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দেই)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোন (পার্থিব) প্রতিদান (ও) চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। অতএব (আমার এই নিঃবৰ্ধপ্রভৃতার পরিপ্রেক্ষিতে) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা কি তোমাকে যেনে নেব, অথচ ইতরজনেরা তোমার সঙ্গী হয়ে আছে। (তাদের সাথে একাত্তায় তদ্বজনেরা লজ্জাবোধ করে। এছাড়া এমন হীমবল লোকেরা অর্থ-সম্পদ অথবা প্রত্যাব-প্রতিপত্তি লাভের লক্ষ্যেই কারও সঙ্গী হয়ে থাকে। অতএব তাদের ইমানের দাবি ধর্তব্য নয়।) নৃহ (আ) বললেন, তারা (পেশাগতভাবে), কি কাজ করছে, তা জানি আমার কি দরকার ? (তদ্ব হোক কিংবা ইতর, ধর্মের কাজে এ তফাতের কি প্রতিক্রিয়া ; তাদের ইমান আন্তরিক কি না, সে সম্পর্কে) তাদের হিসাব প্রহণ করা আমার পালনকর্তারই কাজ। কি চমৎকার হতো, যদি তোমরা তা বুঝতে। (নীচ-পেশা লোকদেরকে বিশ্বাস হ্যাপনে বাধা সাধ্যত করার কারণে ইঙিতে এই আবেদন বুঝা যায় যে, আমি তাদেরকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেই। এর জওয়াব এই যে) আমি মু'মিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (তোমরা ইমান আন বা না আন, আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আমি কেবল সুল্টান সর্তককারী। (প্রচারকার্য দ্বারা আমার কর্তব্য সম্বাদ হয়ে যায়। নিজেদের জাত-লোকসান তোমরা দেখে নাও।) তারা বলল, হে নৃহ, যদি তুমি (এই বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করা হবে। (যোটকথা, যখন বছরের পর বছর এভাবে অতিবাহিত হয়ে

গেল, তখন) নৃহ (আ) দোঁআ করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্পদায় আমাকে (সর্বসা) মিথ্যাবাদী বলেছে। অতএব আপনি আমার ও তাদের মধ্যে একটি (কার্যগত) শীঘ্ৰাংসা করে দিন (অর্থাৎ তাদেরকে নিপাত করুন।) এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুশিনগণকে বৃক্ষ করুন। আমি (তাঁর দোয়া কৃতুল করলাম এবং) তাকে ও তাঁর সাথে যারা বোঝাই করা নৌকায় ছিল, তাদেরকে বৃক্ষ করলাম। এরপর অবশিষ্ট লোকগণকে আমি নিষ্পত্তি করলাম। এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়ও) বড় নির্দর্শন আছে; কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) তাদের (মুকার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। নিচয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (আয়াব দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

স্বকাজে পারিশ্বিক ধৰণ করার বিধান : وَمَا أَسْلَمْتُ مِلْيَّةً مِنْ أَجْرٍ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও পচারকার্যে পারিশ্বিক ধৰণ করা দুব্বল নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ জ্ঞানুরোগ অবহায় একে আয়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ **فَلَمْ يَشْتَرُوا إِيمَانَنَا** **لِمَلِكٍ** **لَا** **أَيْمَانَ** **لَا** **شَتَرُوا إِيمَانَنَا** আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জাতব্য : এ স্থলে আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একধা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বাসী ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল পচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

জন্মতা ও নীচতার ভিত্তি ও চরিত্র—পরিবার ও জাঁকজমক নয় : فَإِنَّمَا أَنْوَمْنَا لَكُمْ وَأَنْبَعْلَنَا — فَإِنَّمَا عَلِمْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ — এই আয়াতে প্রথমত মুশারিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্মান ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরণে একাত্ম হতে পারি। নৃহ (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস হাপনে অঙ্গীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নৃহ (আ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবহা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল, বরং সম্মান ও অগ্রমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা অকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিন্তু নয়। আমরা অত্যেক বাজির কর্ম ও চরিত্রের বুরুপ সম্পর্কে শয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না।—(কুরআনী)

كَلَّ بَتْعَادُ الْمُرْسَلِينَ ① إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ هُوَدُ الْأَنْتَقُونَ ② إِنِّي
لِكُمْ رَسُولٌ ③ لَا فَلَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ④ وَمَا أَسْلَكْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْرٍ

إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعُلَمَاءِ ۝ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ أَيَّةً تَعْجَلُونَ ۝
 وَتَتَخَذُونَ مَصَانِعَ لِعَلْمِكُمْ مَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
 جَبَارِينَ ۝ فَأَتَقُولُوا اللَّهُ وَآتِيَعُونَ ۝ وَأَتَقُولُوا إِنَّمَا يَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝
 إِنَّمَا كُمْ بِأَغْعَامِ وَبَنِينَ ۝ وَجِنَّتِ وَعِيُونَ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا أَسَوَاءُ عَلَيْنَا أَوْ عَظَّمَتْ أَمْرُ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعْظَيْنِ ۝
 إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا نَحْنُ بِمُعْلِمٍ بَيْنَ ۝ فَكَذَّبُوهُ
 فَاهْلَكْتُهُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْهَ ۝ وَمَا كَانَ أَكْرَهُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

(১২৩) আদ সম্প্রদায় প্রগতির পথকে বিদ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হন তাদেরকে বললেন : তোমাদের কি ভয় নেই ? (১২৫) আমি তোমাদের বিশ্বাস আসুন। (১২৬) অতএব তোমরা আশ্চর্যকে ভয় এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্ছবানে অবধা নির্দর্শন নির্মাণ করছ ? (১২৯) এবং বড় বড় আসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল ধাকবে ? (১৩০) যখন তোমরা আশাত হান, তখন জালিয় ও নিষ্ঠুরের মত আশাত হান। (১৩১) অতএব আশ্চর্যকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব বন্ধু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুর্মুদ্র জন্ম ও পুরু-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও ঘরনা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য মহা দিবসের শান্তির আশঁকা করি।' (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে বিদ্যাবাদী বলতে দাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নির্দর্শন আছে ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিদ্যাবাদী নয়। (১৪০) এবং আমার পালনকর্তা, তিনি তো এবল প্রকারমশালী, প্রকৃত দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সন্ত্রাদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে, যখন তাদেরকে তাদের (জাতি) ভাই হৃদ (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর (অর্থাৎ প্রচারকাদের) জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা কি (শিরক ছাড়াও অহঙ্কার ও গর্বে এতটুকু লিঙ্গ যে) প্রতিটি উচ্চ স্থানে অথবা স্থৃতিসৌধ নির্মাণ করছ (যাতে খুব উচ্চ দৃষ্টিগোচর হয়)। যাকে তথ্যাত্ম অথবা (অপর্যোজনে) তৈরি করে থাক এবং (এ ছাড়া অয়োজনীয় বস্তবাসের গৃহেও এতটুকু বাড়াবাড়ি কর যে) বড় বড় প্রাসাদ ও সুরম্য স্থৃতিসৌধ তখনই উপযুক্ত হতো, যখন দুনিয়াতে তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হতো। তখন তোমরা ভাবতে পারতে যে, প্রশংস্ত গৃহ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা সংকীর্ণতা অনুভব না করে। কেননা, তারাও আমাদের সাথে এখানে থাকবে এবং এগুলো উচ্চতা বিশিষ্টভাবেও নির্মাণ করতে হবে, যাতে নিচে স্থান সংকুলান না হলে উপরে বস্তবাস করা যায় এবং ঘজর্বৃত্তও করতে হবে, যাতে আমাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং স্থৃতিসৌধও নির্মাণ করতে হবে, যাতে আমাদের চৰ্চা চিরকাল অব্যাহত থাকে। এখন তো সবাই অথবা। সুরম্য স্থৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, অথচ নির্মাণকারীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। মৃত্যু সবাইকে ধাস করে ফেলেছে। কেউ ত্বরায় এবং কেউ বিলম্বে মৃত্যুবরণ করেছে। এই অহংকারের কারণে তোমরা মনে এত কঠোরতা ও নির্দয়তা পোষণ কর যে) যখন কাউকে আঘাত হান, তখন হৈরাচারী (ও জালিয়) হয়ে আঘাত হান। (এসব মন্দ চরিত্র বর্ণনা করার কারণ এই যে, মন্দ চরিত্র অনেক সময় দ্রীমান ও আনুগত্যের পথে প্রতিবক্ষক হয়ে থাকে।) অতএব (শিরক ও মন্দ চরিত্র যেহেতু আল্লাহ তা'আলার অসম্মতি এবং শান্তির কারণ, তাই) আল্লাহকে ভয় কর এবং (যেহেতু আমি রাসূল, তাই) আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বন্ধু দিয়েছেন, যা তোমরা জান (অর্থাৎ চতুর্পদ জন্ম, পুত্রসন্নান, উদ্যান ও ঝরনা তোমাদেরকে দিয়েছেন (সুতরাং অনুরঘদাতার নির্দেশাবলী সংহিত করা যোটেই সমীচীন নয়))। আমি তোমাদের জন্য (যদি তোমরা এসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত না হও, তবে) এক মহাদিবসের শান্তির আশংকা করি (এ হচ্ছে ভীতি প্রদান এবং তুম্কু এ উৎসাহ প্রদান ছিল)। তারা বলল, আমাদের জন্য তো উভয় বিষয় সমাম—তুমি উপদেশ দান কর অথবা উপদেশ দান না-ই কর। (অর্থাৎ আমরা উভয় অবস্থাতেই আমাদের কর্মকাণ্ড পরিস্তায়গ করব না। তুমি যা কিছু বলছ) এ তো পূর্বপূরুষদের একটি (সাধারণ) অভ্যাস (ও ধৰ্ম)। প্রতি যুগেই মানুষ নবৃত্যত দাবি করে অস্যদেরকে এসব কথা বলে।) এবং (তুমি যে আমাদেরকে আঘাতের ভয় দেখাচ্ছ, শোন) আমরা কখনও আঘাতের ভয় না। যোটকথা, তারা হৃদ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল। এবং আমি তাদেরকে (ভীষণ বাড়-বাজার আঘাত দ্বারা) নিপাত করে দিলাম। নিচয় এতে (ও) বড় নির্দর্শন আছে (অর্থাৎ নির্দর্শনাবলী অমান্য করার কি পরিণতি হতে পারে) এবং

(এতদসন্দেশ) তাদের (অর্থাৎ মকার কাফিরদের) অধিকাংশই বিশ্বাস হ্রাপন করে না। নিচয়, আপনার পাশনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়াশূল (তিনি আবাব দিতে সক্ষম; কিন্তু দয়াবণ্ণত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—أَتَبْتَقِنُ بِكُلِّ رِبْعٍ أَيْهَا تَعْبُدُونَ وَتَسْخِدُونَ مَصَانِعَ لِتُكُمْ تَخْلُدُونَ :
—ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আবাস ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই উভ্যে হয়েছে অর্থাৎ বৃক্ষশীল উজ্জিল। আবাস এর আসল অর্থ নির্দর্শন। এহসে সুউচ্চ শৃঙ্খলোধ বুরোনো হয়েছে। এখানে অর্থ এই যে, তারা অবধা সুউচ্চ অটোলিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। এর বহুচল। হযরত কাতাদাহ বলেন মصانع—মصانع শব্দটি হযরত কাতাদাহ বলেন পানির সৌরাষ্ট্র বুরোনো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বুরোনো হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে অর্থ এই যে, তারা অর্থাৎ সুউচ্চ অটোলিকা নির্মাণ করত, যার প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত।—(রহল মা'আনী)

বিনা প্রয়োজনে অটোলিকা নির্মাণ করা নিষ্পন্নীয় ; এ আয়াত থেকে প্রয়াপিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অটোলিকা নির্মাণ করা শরীয়ত যতে দৃষ্টগীয়। হযরত
النفقة كلها في سبيل الله
আনাসের জবানী ইমাম তিরিয়ী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই। হযরত আর্থাত্ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার ঘട্যে কোন মঙ্গল নেই। হযরত
অন কল بناء و بمال على ماله
আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সাহেবের আর্থাত্ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ; কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রহল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিষ্পন্নীয় ও দৃষ্টগীয়।

كَذَّبَتْ ثَمُودَ الْمَرْسِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ صَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَا تَنْقُونَ
إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي ۝ وَمَا أَعْلَمُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنْ أَجْرِيَ الْأَعْلَمُ بِالْعَلَمِينَ ۝ أَتُؤْكُنُ فِي مَا هُنَّا أَمِينُ ۝

جَنْتٍ وَعِيُونٍ ④ لَا وَرُوعٌ وَنَحْلٌ طَلَعَهَا هَضِيمٌ ⑤ وَتَنْجُونَ مِنَ الْجَبَالِ
 بِيُوتٍ فَرِهِينَ ⑥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ⑦ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ السَّرِفِينَ ⑧
 الَّذِينَ يَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ⑨ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
 الْمُسْحَرِينَ ⑩ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۝ فَأَتَ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّدِيقِينَ ⑪ قَالَ هُنْ هُنَّ نَاقَةٌ لَهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ⑫
 وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خُذْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ فَعَرَوْهَا فَاصْبِحُوا
 نِمِينَ ⑭ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاءٍ ۝ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ ⑮ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑯

- (১৪১) সামুদ সংশ্দার পয়গতের গণকে শিখা বাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলছেন, ‘তোমরা কি ভয় কর না ?’ (১৪৩) আমি তোমাদের বিশ্বত পয়গতের। (১৪৪) অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেওয়া হবে ? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং কর্নাসমূহের মধ্যে ? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঙ্গলিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে ঝাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ শাল্য করো না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি দ্বারা করে না।’ (১৫৩) তারা বলল, তুমি তো জাদুগুল্ডের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।’ (১৫৫) সালেহ বললেন, ‘এই ঝুঁটী, এর জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা-নির্দিষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কেব কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে যদ্যপিবসের আবাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুকূল হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আবাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিচে এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু

তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আগনীর পালনকর্তা এবল পর্যাকৃমশালী, পরম মহাত্মা।

তফসীলের সার-সংক্ষেপ

সামুদ্র সম্প্রদায় (ও) পয়গভৱগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদের ভাই সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদেরকে কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। (তোমরা সুখ-স্বাক্ষরের কারণে আল্লাহ থেকে অত্যন্ত গাফিল, অতএব) তোমাদের কি এসব বন্ধুর মধ্যেই নির্বিজ্ঞ থাকতে দেয়া হবে ? অর্থাৎ উদ্যানসমূহের মধ্যে, ঝরনাসমূহের মধ্যে এবং মঙ্গুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে ? (অর্থাৎ যে খেজুর বাগানে প্রচুর কল আসে।) এবং (এই গাফিলতির কারণেই) তোমরা কি পাহাড় কেটে কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ ? অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি স্থাপন করে না (এখানে কাফির সরদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করত। ‘অনর্থ’ করা ও শাস্তি স্থাপন না করা’ বলে তাই বুঝানো হয়েছে।) তারা বলল তোমার উপর কেউ জান করেছে। (ফলে বিবেক-বৃক্ষ নষ্ট হয়ে গেছে এবং নবৃত্য দাবি করছ। অর্থাত) তুমি তো আমাদের যত একজন (সাধারণ) মানুষ। (মানুষ নবী হয় না।) অতএব তুমি যদি (নবুত্বের দাবিতে) সত্যবাদী হও তবে কোন মুঁজিয়া উপস্থিত কর। সালেহ (আ) বললেন, এই যে উদ্ধৃতি (অবাভাবিক পশ্চার জন্মগ্রহণের কারণে এটা মুঁজিয়া, যেমন অস্ট্র পর্যার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা আমার বিসালতের প্রমাণ হওয়া ছাড়াও এর কিছু প্রাপ্য আছে। এক এই যে) পানি পান করার নির্ধারিত এক পাশা এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে এক পাশা তোমাদের (অর্থাৎ তোমাদের জন্মদের। দুই-এই যে), (তোমরা এর অনিষ্ট (এবং কষ্ট প্রদানের) উদ্দেশ্যে হাতও সাগাবে না। তাহলে তোমাদের স্বহাসিবসে আযাব পাকড়াও করবে। অতঃপর তারা (বিসালতও মানল না এবং উদ্ধৃতির প্রাপ্যও আদায় করল না; বরং) উদ্ধৃতকে বধ করল। এরপর (যখন আযাবের চিহ্ন প্রকাশ পেল, তখন দুর্কর্মের জন্য অনুত্ত হলো। (কিন্তু অথবত, আবাব মেধার পর অনুভাপ নিফল, দ্বিতীয়ত, নিছক অনুভাপে কিছু হয় না; যে পর্যন্ত ইচ্ছাধীন অতিকার অর্থাৎ তপো ও ইমান না হয়।) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। বিচ্ছয় অতে নির্দশন রয়েছে। কিন্তু (অত্মসন্দেশ) তাদের (অর্থাৎ যত্কারী কাফিসদের) অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না। নিচয়ই আগনীর পালনকর্তা এবল পর্যাকৃমশালী, পরম মহাত্মা। (ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অবকাশ দেন।)

আনুবদ্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—هَيْرَانٌ مِّنَ الْجِبَالِ بِيُوتَنِ فَرِيقِينَ— এর তফসীলে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম বাগিরের মতে ফারহিন হানফিন এর তফসীল অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিবেছেন

যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্বিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহু তাঅলার অনুসৃত স্বরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহু তাঅলার নিয়ামত এবং তদ্বারা উপকার লাভ করা জায়েছ। কিন্তু তা ধারা যদি শুন্নাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েয়; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

كَذَبَتْ قَوْمٌ بِوَطِ الْمُرْسِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ لَوْطٌ أَلَا تَتَقَوَّنُونَ
 إِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَأَنْتُمْ لَا تَعْبُدُونِي ۝ وَمَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
 أَجْوِهِ ۝ إِنْ أَجْرِيَ أَعْلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَأْتُونَ اللَّهَ كَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ
 وَمَذْرُونَ مَأْخَلَقَ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۝ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَدُونَ ۝ قَالُوا
 لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلْوَطُ لَتَكُونُنَّ مِنَ الْمُخْرِجِينَ ۝ قَالَ إِنِّي لَعَمِلْكُمْ مِنْ
 الْقَالِينَ ۝ رَبِّنِحْيٍ وَاهْلِيٍّ مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝ فَجَعَلْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ
 إِلَّا عِجْوَازًا فِي الْغَيْرِينَ ۝ ثُمَّ دَمْرَنَا الْأَخْرِينَ ۝ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرَأً
 فَسَاءَ مَطْرَأُ الْمَنْذِرِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْةً ۝ وَمَا كَانَ الْكَثِيرُمُ مُؤْمِنِينَ ۝
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

(১৬০) সূতের সম্প্রদায় পরম্পরাগগতকে যিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) বখন তাদের ভাই সূত তাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কি ভয় কর না ?’ (১৬২) আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পরম্পরার। (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুর্কর্ম কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্তীর্ণগকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমান্তবনকারী সম্প্রদায়।’ (১৬৭) তারা বলল, ‘হে সূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিক্ষণ করা হবে।’ (১৬৮) সূত বললেন,

‘আমি তোমাদের এই কাজকে সৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা থা করে, তা থেকে রক্ষা কর।’ (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক বৃক্ষ ব্যাণ্ডীত, সে ছিল খৎসপ্রাণদের অস্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিশ্চাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। তীক্ষ্ণ-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) নিচয়ে আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লৃতের সম্প্রদায় (ও) পয়গবরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন তাদেরকে তাদের ভাই লৃত (আ) বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ; আমি তোমাদের বিশ্বত পয়গস্বর। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বপালনকর্তার দায়িত্বে। সারাজ্ঞাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি শুধু এ আচরণ কর যে, পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে ঝীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর ? (অর্থাৎ তোমরা ছাড়া এই কুকুর আর কেউ করে না। এরপ সয় যে, এটা মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে;) বরং (আসল কথা এই যে,) তোমরা (মানবতার) সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তারা বলল, হে লৃত, তুমি যদি (আমাদেরকে এসব বলা-কওয়া থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে (জনপদ থেকে) বহিকার করা হবে। লৃত (আ) বললেন, (আমি এই হমকিতে বিরত হব না। কেননা) আমি তোমাদের এই কাজকে সৃণা করি (কাজেই বলা-কওয়া কিন্তু ত্যাগ করব; তারা যখন কিছুতেই শান্ত না এবং আমাক আসবে বলে মনে হলো তখন) লৃত (আ) দেয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার (বিশেষ) পরিবারবর্গকে তাদের এই কাজ (অর্থাৎ কাজের বিপদ) থেকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে রক্ষা করলাম একজন বৃক্ষ ব্যাণ্ডীত। সে খৎসপ্রাণদের মধ্যে রয়ে গেল। এরপর আমি [লৃত (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়া] অন্য সবাইকে খৎস করে দিলাম। আমি তাদের উপর বিশেষ প্রকারের (অর্থাৎ প্রস্তরের) বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং কত নিকৃষ্ট বৃষ্টি বর্ষিত হলো তাদের উপর, যাদেরকে (আল্লাহর আখ্যা�বের) ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। নিচয় এতে (ও) শিক্ষা আছে। কিন্তু (একসম্মতেও) তাদের (অর্থাৎ মকার কাফিরদের), অধিকাংশই বিশ্বাস ছাপন করে না। নিচয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী পরম দয়ালু (আমার দিতে পারতেন; কিন্তু এখনও দেননি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবাভাবিক কর্ম ঝীর সাথেও হারাম।^۱ আমাতের অব্যয়টি বর্ণনাবোধ হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের বৌদ্ধ অভিজ্ঞান পূরণের জন্য আল্লাহ ত'আলা ঝীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে হেতো সমস্ত পুরুষদেরকে

ହୋଲ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବମେର ଶକ୍ତ୍ୟବନ୍ଧୁତେ ପରିଣମ କରାଇ । ଏଠା ହୀନବ୍ୟନ୍ତାର ପରିଚାଯକ । ମିଳିବାରେ ଅବସାନ୍ତ ଏଥାନେ ଏହି ଅନ୍ୟକୁ ହତେ ପାରେ । ଏମଭାବଙ୍କାର ଇଞ୍ଜିନ ହବେ ଯେ, ତୋଆଦେର ଝୁଦେର ଯେ ହାନ ତୋଆଦେର ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରା ହେଁଥେ ଏବଂ ଯା ବାତାବିକ, ସେଇ ହାନ ଛେଡ଼େ ଝୁଦେର ସାଥେ ଏହି ଅଶ୍ଵାଭାବିକ କାଜ ତୋମରା କର, ଯା ଲିଖିତ ହାରାମ । ଏହି ଦିଗ୍ଭୀଯ ଅର୍ଥେର ଦିକ୍ ଦିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନିତ ହୁଏ ଯେ, ନିଜ ଝୁର ସାଥେ ଅଶ୍ଵାଭାବିକ କର୍ମ କରା ହାରାମ । ହାନ୍ତିକେ ରାମ୍‌ପୁରୁଷ (ସା) ଏହିପରିବାର ପ୍ରତି ଅଭିସମ୍ପାଦ କରେଛେ । (କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।)

এখানে صبوراً في الفايرين এবলে স্তুত (আ)-এর ক্ষীকে বুঝানো হয়েছে। সে কওমে স্তুতের এই কৃকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফির ছিল। স্তুত (আ)-এর এই কাফির ক্ষী যাত্ত্বে বৃক্ষ হলে তাৰ জন্য শব্দেৱ ব্যবহাৰ যথোৰ্ধী। পক্ষান্তৰে বয়সেৱ দিকে দিয়ে সে যদি শুধু না হৰে থাকে, তবে তাকে শব্দ ঘোষণা কৰার কাৱণ সঠিকত এই যে, পঞ্জগন্নেৱ ক্ষী উচ্চতেৰ জন্য মাতাৱ স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানেৱ জননীকে বৃক্ষ বলে অভিহিত কৰা অসম্ভৱ নহয়।

—এই আবাস্ত থেকে প্রয়াপিত হয় যে, সমকামীকে
পাঠীর চাপা দিয়ে অথবা উক ছান থেকে নিচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েয়।
হানাফী আলিমদের মাঝহাব তাই। কেননা সৃত-সম্বন্ধানকে এমনভাবে নিপাত করা
হয়েছিল। তাদের অনপদকে উপরে তুলে উঠ্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।—(শারীঃ
কিতাবুল হৃদ)

كَذَبَ أَصْحَابُ نَيْدِكَةَ الْمُرْسِلِينَ وَرَجَطَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِيبُ الْأَسْقُونَ
إِنِّي لِكُمْ بِرَسُولٍ أَمِينٍ لَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
أَجْرٍ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ افْوُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِطْعَاسِ السَّتْقِيمِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ
هُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأَ
وَلِيَنَ قَالُوا إِنَّا أَنَا مِنَ الْمُسْحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا
وَإِنْ تَظْنُنَكَ لَيْسَ الْكَذِيفُنَ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كَسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّابِرِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَلَكُنْ بُوهَ فَلَخَنْ هُمْ عَذَابُ

يَوْمَ الظِّلَّةِ إِذْ كَانَ عَنَّا بَأَبِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥٢٣٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيَّةً لِّوَمَا كَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنُونَ ⑥٢٤٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥٢٥٠

(১৭৬) বনের অধিবাসীরা পরগনারগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন ত'আয়ার তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তার কর না ? (১৭৮) আমি তোমাদের বিশ্বাস পরগনার। (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহকে তার কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের কাছে এবং জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৮১) যাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাণে কর দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাও। (১৮২) সোজা দাঁড়িপাল্লার ওয়দ কর। (১৮৩) মানুষকে তাদের বন্ধু কর দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে কিরো না। (১৮৪) তার কর তাকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্পদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল, তুমি তো জানুয়ারদের অন্যত্যম। (১৮৬) তুমি আমাদের মত মনুষ বৈ তো নও। আমাদের ধৰণা—তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) অতএব যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর কেলে দাও। (১৮৮) ত'আয়ার বললেন, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালভাবে অবহিত। (১৮৯) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। কলে তাদেরকে বেষাল্জি দিবসের আবাব পাকঢাও করল। নিচয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আবাব। (১৯০) নিচয় এতে নির্দশন হয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাখণই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিচয় আপনার পালনকর্তা এবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আসছাবে আইকা (ও যাদের কথা সূরা হিজরের শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে) পরগনারগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। যখন ত'আয়ার (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি (আল্লাহকে) তার কর না ? আমি তোমাদের বিশ্বাস পরগনার। অতএব তোমরা আল্লাহকে তার কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে এবং জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তার দায়িত্বে। তোমরা পুরোপুরি পরিমাপ করবে এবং (কাপকের) ক্ষতি করবে না। (এমনিভাবে ওয়নের বন্ধুময়হৈ) সোজা দাঁড়িপাল্লার ওয়দ করবে এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে না। তোমরা তাকে (অর্ধাং সর্বশক্তিযান আল্লাহকে) আর কর, যিনি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ বড় আকারের জানু করেছে (কলে তোমার মতিজ্ঞ হয়ে গেছে এবং তুমি নবৃত্ত দাবি করতে তাক করেছ)। তুমি আমাদের মত মনুষ বৈ তো নও। আমরা যদি কফি যে, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের উপর আসামানের কোন টুকরা ফেলে দাও (যাতে আমরা জানতে পারি যে, তুমি বাস্তবিকই পরগনার ছিলে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৬৮

এবং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলার কারণে আমাদের এই শাস্তি হয়েছে ।) ৪'আয়ার (আ) বললেন, (আমি আবাব আনন্দনকারী অথবা তার অবস্থা নির্ধারণকারী নই,) তোমাদের কিয়াকর্ম আমার পালনকর্তা (ই) ভাল জানেন । (এই কিয়াকর্মের কারণে কি আবাব ইওয়া দরকার, কবে ইওয়া দরকার, তাও তিনিই জানেন । সব তাঁরই ইচ্ছা ।) অতঃপর তারা (হরহামেশাই) তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল । এরপর তাদেরকে যেখাজ্জন্ম দিবসের আবাব পাকড়াও করল । নিচিতই সেটা শীঘ্ৰ দিবসের আবাব ছিল । এতে (ও) বড় শিক্ষা আছে । কিন্তু (এতদস্ত্রেও) তাদের (অর্থাৎ মৃকার কাফিরদের) জীবকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করে না । নিচয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রয়ম দয়ালু (আবাব দিতে পারেন, কিন্তু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) ।

আনুবাদিক জ্ঞানব্য বিবর

وَرَبُّنَا بِالْفَلْسَلِ الْمُسْتَقِيمِ قَسْطَطْ শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার । কেউ কেউ একে আরবী শব্দ طَقْ থেকে উদ্ভৃত বলেছেন ।

এর অর্থও সুবিচার । উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িগাল্লা এবং এমনি ধরনের ধাগ ও শয়নের অন্যান্য যত্নপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম ইওয়ার আশংকা না থাকে । طَقْ—أَرْثَى لَوْكَدেরকে তাদের প্রাপ্য বন্ধু কম দেবে না । উদ্দেশ্য এই যে, তুঃকি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেওয়া হারাম; তা কোন মাপ ও শয়নের বন্ধু হোক অথবা অন্য কিছু । এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় ছবি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে । ইয়াম মালিক মুয়াত্তা থেছে বর্ণনা করেন, হ্যরত উমর ফারুক (রা) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজেস করলেন । সে কিছু অঙ্গুহাত পেশ করল । হ্যরত উমর (রা) বললেন, طَقْ অর্থাৎ তুমি শয়নে কম করেছে । যেহেতু নামায শয়নের বন্ধু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ভৃত করার পর ইয়াম মালিক বলেন : طَقْ অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে; তবু মাপ ও শয়নের সাথেই এই বিধান সংপ্রস্তুত নয় । বরং কারও হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না কেন--হারাম আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে ।

আল্লাহর অপরাধী নিজ পারে হেঁটে আসে—ছেক্তারী পরোয়ানা দৱকার হয় না : فَلَذْهَمْ مَذَابِ يَمِّ اللَّهِ—এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্বন্ধায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন । ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শাস্তি পেত না । এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঝে প্রেরণ করেন । এই মেঘের নিচে সুশীল বাহু ছিল । গরমে অঙ্গের সম্পদামুক্ত দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমারেত হয়ে গেল, তখন মেহমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ করল । কলে সবাই ছাই-ভুক হয়ে গেল ।—(মহল মাআলী)

وَإِنَّهُ لَتَزَيْلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ طَقْ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٦﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لَفِي ذِرَالْأَوْلَىٰ
 أَوْلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيَّةً أَنْ يَعْلَمُهُ عَلَمُوا إِنَّهُ أَسْرَارُهُمْ لَهُمْ
 كَذِيلَةٌ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ كَذِيلَةٌ سَلَكْنَاهُ فِي
 قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٩﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿١٠﴾ فَيَأْتِيهِمْ
 بُغْثَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ فَيَقُولُوا أَهْلَنَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿١٢﴾ أَفَيَعْدُنَا
 يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٣﴾ أَفَرَعِيتَ أَنْ مَتَعْنَهُمْ سَيِّئَاتٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا
 يَوْعَدُونَ ﴿١٥﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيبَةِ إِلَّا
 لَهَا مِنْذِرُونَ ﴿١٧﴾ ذِكْرًا قَادِمًا كُنَّا ظَلَمِينَ ﴿١٨﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ
 وَمَا يَنْتَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢٠﴾ فَلَا
 تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَفَتْكُونَ مِنَ الْمُعْذَبِينَ ﴿٢١﴾ وَانْذِرْ عَشِيرَتَكَ
 الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٢﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ
 فَقُلْ إِنِّي بِرِّي عِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢٥﴾ الَّذِي يَرِيكَ
 حِينَ تَقُومُ ﴿٢٦﴾ وَتَقْلِبُكَ فِي الشَّجَدَيْنَ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٨﴾ هَلْ
 أَنْتُمْ كُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٩﴾ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ وَأَثَمِّ ﴿٣٠﴾ يَلْقَوْنَ
 السَّمْعَ وَأَكْرَهُمْ لَذِيَّوْنَ ﴿٣١﴾ وَالشَّعَرَاءَ يَدِعُهُمُ الْغَاوَنَ ﴿٣٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ
 فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ

اَمْنُوا وَعَلِمُوا الصِّلَاحُتِ وَذَكِرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرُو اِمْنَ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَىٰ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ⑯

(১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জগতের পালনকর্তার নিকট থেকে অবঙ্গীর্ণ। (১৯৩) বিশ্বত ফেরেশতা একে নিরে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি উত্তি-পদর্শনকারীদের অস্তরূপ হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরোহী ভাবার। (১৯৬) নিচৰ এর উত্ত্বে আছে পূর্ববর্তী কিভাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্য এটা কি নির্দর্শন নয় যে, বনী-ইসরাইলের আশিসগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিরুভাবীর প্রতি অবঙ্গীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস হ্রাপন করত না। (২০০) এমনিভাবে আমি জনাহণারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস হ্রাপন করবে না, যে পর্বত প্রত্যক্ষ না করে মর্মসূদ আবাব; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি তেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বহুবের পর বহু তোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিশ্বে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পাঠ, (২০৭) তখন তাদের তোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ খৎস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী হিল (২০৯) স্বরূপ করামোর জন্য, এবং আমার কাজ অন্যান্যাচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শরতানন্দা অবঙ্গীর্ণ করে নি। (২১১) তারা এ কাজের উপরূপ নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখেনা। (২১২) তাদেরকে তো অবশের জায়গা থেকে দূরে রাখো হয়েছে। (২১৩) অতএব আপনি আন্তরুর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আর্দ্ধীয়দেরকে সৈত্রক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মুঘ্যদের প্রতি সদর হোল। (২১৬) যদি তারা আপনার অগ্রাধ্যতা করে, তবে বলে দিন তোয়োরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি তরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন বৰ্বন আশলি নামাবে দত্তাত্ত্বান হন। (২১৯) এবং নামাবীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিচৰ তিনি সর্বজ্ঞাতা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শরতানন্দা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবঙ্গীর্ণ হব প্রত্যক্ষ যিখ্যাবাদী, জনাহণারের উপর। (২২৩) তারা ঝুঁত কথা এসে দেয় এবং তাদের অধিকাখণ্ডই যিখ্যাবাদী। (২২৪) বিজ্ঞান সোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) ঘৃণি কি দেখ না যে, তারা প্রতি মরদানেই উদ্বাপ্ত হবে কিরে? (২২৬) এবং এবল কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা তির, যারা বিশ্বাস হ্রাপন করে ও সংকর্ম করে এবং আন্তরুর খুব স্বরূপ

করে এবং নিম্নীভূতি হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিম্নীভূতকারীরা শীঘ্ৰই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যহুল কিৱেন?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কোরআন বিখ্যালনকর্তা প্রেরিত। একে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে আগমন করেছে আপনার অন্তরে সুস্পষ্ট আৱৰ্বী ভাষায়, যাতে আপনি (ও) সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থান। (অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন তাদের উচ্চতের কাছে আল্লাহৰ সির্দেশ্বাবলী পৌছিয়েছেন, আপনিও তেমন পৌছান।) এবং এর (কোরআনের) উচ্চে পূর্ববর্তীগম্বের (আসমানী) কিতাবে (ও) আছে (যে, একপ গুণসম্মত পয়গম্বর হবেন, তার প্রতি একপ কালাম নাখিল হবে। এ হলো তফসীরে হাকানীর টিকায় পূর্ববর্তী কিতাব তত্ত্বাত ও ইনজীলের কতিপয় সুমুখোদ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এই বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা আছে। অর্থাৎ তাদের জন্য এটা কি প্রমাণ নয় যে, একে (অর্থাৎ ভবিষ্যতবাণীকে) বনী ইসলাইলের পতিতরা জানে। (সেবতে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা প্রকাশে একথা বীকার করে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তারাও বিশেষ লোকদের সামনে এর বীকারোড়ি করে। প্রথম পারার চতুর্থাংশ *أَتُرْسِنُ النَّاسَ بِالْبَلْزَارِ* আয়াতের তফসীরে একথা বিবৃত হয়েছে। এই প্রমাণটি অলিঙ্গিত আৱৰ্বদের জন্য।) নতুন শিক্ষিত লোকেরা আসল কিতাবেই তা দেখে নিতে পারত। এতে জরুরী নয় যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কোন পরিবর্তন হয়নি। কেননা, পরিবর্তন সত্ত্বেও একপ বিষয়বস্তু বাকি থেকে যাওয়া আৱণ অধিকতর প্রসাধ। পরিবর্তনের ফলেই এসব বিষয়বস্তু হান পেয়েছে একথা বলা ভুল। কেননা, নিজের ক্ষতির জন্য কেউ পরিবর্তন করে না। এসব বিষয়বস্তু পরিবর্তনকারীদের জন্য যে ক্ষতিকর তা তো স্পষ্ট। এ পর্যন্ত *إِنَّ دَافِرَ الدُّعَى* দা঵ির দুইটি ইতিহাসগত প্রমাণ বর্ণিত হলো অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উচ্চে এবং বনী ইসলাইলের জানা ধারণা এগুলোর মধ্যেও হিতীয়টি প্রথমটির দলীল। অতঃপর অবিষ্কাসকারীদের হঠকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এই দা঵ির যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কোরআনের অলৌকিকতা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা এখন হঠকারী যে,) যদি (মেনে নেওয়ার পর্যায়ে) আৰি এই কোরআন কোন আজমী (অনাবৰ) ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তিনি তাদের সামনে তা পাঠ করতেন, (এতে এর মুজিয়া হওয়া আৱণ দেখি প্রকাশ পাব; কেননা, যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি আৱৰ্বী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।) তখনও তারা (চূড়ান্ত হঠকারিতার কারণে) তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (অতঃপর *رَأَسْكُلْتَاهُ* (সা)-এর সাজ্জনার জন্য তাদের বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে লৈয়াগ্য প্রকাশ কৰা হচ্ছে। অর্থাৎ এখনিভাবে আমি অবাধ্যদের অন্তরে (এই জীব্র) অবিষ্কাস সংজ্ঞার কৰেছি। (এই জীব্রতার কারণে) তারা এর (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কৰবে না, যে পর্যন্ত যত্নগাদায়ক শাস্তি (মৃত্যুর সময় অধিবা বৰবথে অধিবা পৰকালে) প্রত্যক্ষ না কৰে, যা আকস্মিকভাবে তাদের সামনে উপস্থিত হবে এবং তারা (পূর্বে) টেরও পাবে না। (তখন মৃত্যুর আশক্তা দেখে) তারা বলবে, আমরা কি (কোনোরূপে) অবকাশ পেতে পাবি? কিন্তু সেটা অবকাশ ও ঈমান কূল হওয়ার সময় নয়। কাফিস্রাও আয়াবের বিষয়বস্তু শুনে অবিষ্কাসের ছলে

আয়াব চাইত এবং বলত, এবং
وَإِنْ كَانَ هَذَا مُوْلَعْ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا عَجْلَ لَنَا قُلْنَا
ঢাক্কা অর্থাৎ হে আস্ত্রাহ, এটা যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর
প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ কর। তারা অবকাশকে আয়াব না হওয়ার প্রমাণ ঠাওরাত। পরবর্তী
আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে : তারা কি (আমার সতর্কবাণী ঘনে) আমার আয়াব
ভুরাবিত করতে চায় ? (এর আসল কারণ অবিশ্বাস। অর্থাৎ একজন মহৎ ব্যক্তির খবর
সন্দেশ তারা অবিশ্বাস করে ? অবকাশকে এই অবিশ্বাসের ভিত্তি করা নেহায়েত ভুল।
(কেননা) হে সর্বোধিত ব্যক্তি, বলুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগবিলাস
করতে দেই, অতঃপর তাদেরকে ধার (অর্থাৎ যে আয়াবের) ওয়াদা দেওয়া হতো, তা
তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কি উপকারে আসবে ? অর্থাৎ
ভোগবিলাসের এই অবকাশের কারণে তাদের আয়াব কোনোর হালকা অথবা ত্রাসজ্ঞান
হবে না। আর (হেকমতের কারণে কমবেশি কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া তাদের জন্যই
নয়; বরং পূর্ববর্তী উদ্বৃত্তাও অবকাশ পেয়েছে। সেমতে অবিশ্বাসীদের) যত জনপদ আমি
(আয়াব দ্বারা) খাস করেছি, সবগুলোর মধ্যে উপদেশের জন্য সতর্ককারী (পঞ্চমংস)
আগমন করেছেন। (যখন তারা মান্য করেনি, তখন আয়াব নাবিল হয়েছে।) আমি
(দৃশ্যতও) যুলুমকারী নই। (উদ্দেশ্য এই যে, দলীল সম্পূর্ণ করা এবং ওয়াবের পথ বঙ্গ
করার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশ সবার জন্যই ছিল। পঞ্চমবরদের আগমনও
এক অকার অবকাশ দেওয়াই। কিন্তু এরপরও খৎসের আয়াব এসেছেই। এসব ঘটনা
থেকে অবকাশ দানের রহস্যও জানা গেল এবং অবকাশ ও আয়াবের মধ্যে বৈপরীত্য না
ধাকাও প্রমাণিত হলো। 'দৃশ্যত' বলার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন অবস্থাতেই যুলুম
হয় না। অতঃপর আবার আল-শুরু-আল-কান্দু-এর বিষয়বস্তুর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে। মধ্যবর্তী
বিষয়বস্তু অবিশ্বাসীদের অবস্থার উপযোগী হওয়ার কারণে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী
আয়াতসমূহের সারবর্ষ কোরআনের সত্যতা সম্পর্কিত সন্দেহ নিরসন করা। প্রথমত কোরআন
আস্ত্রাহ কালাম প্রবর্ত তাঁর প্রেরিত—এ সম্পর্কে কাফিরদের মনে সন্দেহ ছিল। এই
সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, আরবে পূর্ব থেকেই অতীন্দ্রিয়বাদী লোক বিদ্যমান ছিল।
তারাও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলত। নাউয়ুবিদ্বাহ, রাসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কেও কোন
কোন কাফির অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার কথা বলত। (দুররে মনসুর-ইবনে যায়দ থেকে
বর্ণিত) বুখারীতে জনেকা ঘটিলার উভি বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর
কাছে শহীদ আগমনে বিলু দেখে সে বলল, তাঁকে তাঁর শয়তানের শিকার ফল ছিল। এর উত্তরে বলা
হয়েছে যে, এই কোরআন বিষয়াভাবের পালনকর্তার অবজীর্ণ। একে শয়তানরা (যারা
অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে আগমন করে) অবজীর্ণ করেনি। (কেননা, শয়তানের দুইটি
শক্তিশালী অন্তরায় বিদ্যমান আছে। প্রথমত তার শয়তানী শণ, যার কারণে) এটা (অর্থাৎ
কোরআন) তাদের উপযুক্তই নয়। (কেননা, কোরআন পুরোপুরিই হিদায়াত এবং শয়তান
পুরোপুরিই পথভ্রষ্টতা। শয়তানের প্রতিকে এ ধরনের বিষয়বস্তু আসতেই পারে না এবং এ
ধরনের বিষয়বস্তু প্রচার করে শয়তান তার উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে) সকল
হতে পারে না। ষষ্ঠীয় অন্তরায় এই যে,) তারা (শয়তানরা) এর সামর্থ্যও রাখে না।

তাদেরকে (ওই) খবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সেমত্তে অঙ্গীক্ষিয়বাদী ও মুশরিকদের কাছে তাদের শয়তানরা তাদের ব্যর্থতার কথা নিজেরাই শীকার করেছে। এরপর মুশরিকরা অন্যদেরকেও একথা জানিয়েছে। বৃথাবীতে হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম ঘৃহণের অধ্যায়ে এ ধরনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং শয়তানদের শিক্ষা দেয়ার কোন সত্ত্ববনাই রইল না। এই জওয়াবের অবশিষ্টাংশ এবং অপর একটি সন্দেহের জওয়াব সুরার শেষভাগে বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ হওয়ার শাখা হিসেবে একটি বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, যখন প্রমাণিত হলো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ, তখন শিক্ষা ওয়াজিব হয়ে গেল। তন্মধ্যে একটি উচ্চতৃপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তা(ওইদ) অতএব (হে পয়গহর, আমি এক বিশেষ পদ্ধতিতে আপনার কাছে তা(ওইদের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছি এবং আপনাকে সরোধন করে বলছি,) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করবেন না। করলে শান্তি ভোগ করবেন। (অথব নাউয়ুবিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে শিরক ও শান্তির কোন সত্ত্ববনাই নেই। তবে এর মধ্যমে অন্যদেরকে একথা বলা উচ্চেশ্য যে, যখন অন্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যও শান্তির বিধান আছে, তখন অন্যদের কোন কথাই নেই। তাদেরকে শিরক করতে নিষেধ কেন করা হবে না এবং তারা শিরক করে শান্তির ক্রম থেকে ক্রিয়ে বাঁচতে পারবে ? (এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে) আপনি (সর্বপ্রথম) আপনার নিকটতম পরিবারবর্গকে সতর্ক করুন। (সেমত্তে রাসূলুল্লাহ (সা) সরাইকে ডেকে একজিত করলেন এবং শিরকের কারণে আল্লাহর শান্তি সম্পর্কে ছশিয়ার করে দিলেন। অতঃপর নবুয়তের দাওয়াত অহংকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে ব্যবহারের পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে) যারা আপনার অনুসারী মু'মিন তাদের প্রতি বিনোদ হোন (তারা পরিবারভূক্ত হোক কিংবা পরিবারবহির্ভূত) যদি তারা (বাদেরকে আপনি সতর্ক করেছেন) আপনার অবাধ্যতা করে (কুফরকে আঁকড়ে থাকে), তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তার জন্য আমি দায়ী নই।—এই দুইটি আদেশসূচক বাক্যে) ‘আল্লাহর জন্য ভালবাসা’ এবং ‘আল্লাহর জন্য শক্তাত্ত্ব পূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। কোন সময় এই শক্তদের পক্ষ থেকে কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের আশংকা করবেন না !) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর ভরসা করুন, যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দশায়মান হন এবং (নামায শুরুর পর) নামায়দের সাথে উঠাবসা করেন। (নামায ছাড়াও তিনি আপনার দেখাশোনা করেন। (কেননা,) তিনি সর্বশ্রেতা সর্বদ্রষ্টা। (সুতরাং আল্লাহর জ্ঞানও পূর্ণ, যেমন হার্দিন এবং স্লিম ও স্লিম থেকে জানা যায়। তিনি আপনার প্রতি দয়ালুও, যেমন হার্দিন থেকে বুঝা যায় এবং তিনি সব কিছুর উপর সাধাৰ্যবানও, যেমন হার্দিন থেকে অনুমিত হয়। এমতাঙ্গায় তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। তিনি আপনাকে অবশ্যই সত্যিকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ভরসাকারীর ক্ষতি হয়, তা বাহ্যত। এর অধীনে হাজারো উপকার নিহিত থাকে, যেগুলো কোন সময় দুনিয়াতে এবং কোন সময় পৰকালে প্রকাশ পায়। এরপর অঙ্গীক্ষিয়বাদ সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াবের পরিপিট বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে পয়গহর, লোকদেরকে বলে দিন,) আবি তোমাকে বলব কি, কার উপর শয়তানরা অবতরণ করে? (শোন,) তারা অবজীর্ণ হয় এমন লোকদের উপর, যারা (পূর্ব

(থেকে) মিস্ত্রীবাদী, দুর্ভাগ্যে এবং ধারা (শয়তানদের অসার সময় তাদের দিকে) কান পাতে এবং (মানুষের কাছে সেসব বিষয় বর্ণনা করার সময়) তারা আচুর মিথ্যা বলে ; (সেমতে নিম্ন স্তরের আগিমদেরকে একনও একপ দেখা যায়) এর কারণ এই যে, উপকারণগ্রহিতা ও উপকারদাতার মধ্যে যিনি ধারা অত্যাৰ্থ্যক। সেমতে শয়তানের শিষ্যও এমন ব্যক্তি হবে, যে মিথ্যাবাদী ও জনাহানার। এছাড়া শয়তানের দিকে সর্বাঙ্গকরণে ঘনেলিবেশও করতে হবে। করণ, ঘনেলিবেশ ব্যক্তিত উপকার লাভ করা যায় না। শয়তানের অধিকাংশ জান সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই এগুলোকে চটকদার ও ভাবপূর্ণ করার জন্য কিছু প্রাপ্তিহৃত টীকা-তিক্কনৌড় অনুমান ধারা সংযোজিত করতে হব। অভিন্নিয়বাদী কার্যকলাপের জন্য স্বত্ত্বাবত্ত এটা জনুরী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে এসব বিষয়ের উপস্থিতির কোন দুরবর্তী সত্ত্ববন্দণ নেই। কেবল, তিনি যে সত্যবাদী, তা আবাল-বৃক্ষ-বনিতা সবাইই জানা ছিল। তিনি যে পরাহিয়ালার ও শয়তানের দুশ্মন ছিলেন, তা প্রত্যেকাংশ বীকার করত। অঙ্গের তিমি অভিন্নিয়বাদী হতে পারেন কিন্তু ; এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবি হওয়া সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব দেয়া হচ্ছে যে, তিনি কবিও নন যেমন কাফিররা বলত, “অর্থাৎ তার বক্তব্য ছন্দমুক্ত না হলেও কাল্পনিক ও অবাস্তব। এ ধারণা এ জন্য অস্ত যে” (বিভাস্ত লোকেরাই কবিদের পথ অনুসরণ করে)। (“পথ” বলে কাব্যচর্চা বুঝানো হয়েছে) অর্থাৎ কবিসুলভ কাল্পনিক বিষয়বস্তুর গদ্দৈ অথবা পদে বলা তাদের কাজ, ধারা সত্যানুসরানের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে। এরপর এই দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে,) তুমি কি জান না যে, তারা (কবিয়া কাল্পনিক বিষয়বস্তুর প্রতি) ময়দানে উদ্ভাস্ত হয়ে (বিষয়বস্তুর কাজে) যোদ্ধাদেরা করে এবং (যখন বিষয়বস্তু পেরে যায়, তখন অধিকাংশই বাস্তবতাবর্জিত হওয়ার কারণে) এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (সেমতে কবিদের প্রলাপেভিত্ব একটি নমুনা দেখা হলো) :

اے رشک مسیحانتری رفتار کے قربان
تھو کرسے مری الاش کنی بار جلادی
اے باد صبامہم تجھے کیا باد کرینکے
اس گل کی خبر تو نے کبھی هم کونه لادمی

আরও—

صباۓ اسکے کوچے سے ار اکر
خدا جانے ہماری خناک کیا کسکی

এমনকি, তারা মাঝে মাঝে কুফৰী কথাবার্তা বকতেও উহু করে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, কবিতার বিষয়বস্তু কাল্পনিক ও অবাস্তব হওয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে কোরআনের বিষয়বস্তু যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক-সবই বাস্তবসম্বত ও অকল্পিত। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কবি বলা কবিসুলভ উন্নাদনা বৈ কিছু নয়। পদে যেহেতু অধিকাংশই এ ধরনের বিষয়বস্তু স্থান পায়, তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ছন্দ রচনার সামর্থ্য দান করেন নি। কিন্তু সব কবিই এক রূপ নয়। কোন কোন কবিতায় যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও সত্যানুসরানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে কবিদের নিক্ষার আগতায়

সব কবিই এলে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে সুধী কবিদের ব্যক্তিকৰ্মী বক্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে ১) তবে তাদের কথা ডিন, (কবিদের মধ্যে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (অর্থাৎ শরীরত্বের বিকলকে কথাও বলে না, কাজও করে না। তাদের কবিতায় বাজে বিষয়বস্তু স্থান পায় না)। এবং তারা (তাদের কবিতায়) আল্লাহকে খুব শ্রদ্ধ করে (অর্থাৎ তাদের কবিতা ধর্মের সমর্থন ও জ্ঞান প্রচারে নিবেদিত)। এসব কাজ আল্লাহর শরণের অস্তর্ভুক্ত। এবং (যদি কোন কবিতায় কারও কৃৎসন্নার মত বাহ্যিক চরিত্রবিরোধী কোন অশালীন বিষয়বস্তু থাকে, তবে তার কারণও এই যে,) তারা উৎসীড়িত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ শ্রহণ করেছে (অর্থাৎ কাফির ও পাপাচারীরা প্রথমে তাদেরকে মৌখিক কষ্ট দিয়েছে, যেমন তাদের কৃৎসা রটনা করেছে অথবা ধর্মের অবমাননা করেছে, যা ব্যক্তিগত কৃৎসার চাইতেও অধিক কষ্টদায়ক অথবা তাদের জান কিংবা সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে। এ ধরনের কবিগণ ব্যক্তিক্রমভূক্ত। কেননা, প্রতিশোধমূলক কবিতার মধ্যে কতক বৈধ এবং কতক আনুগত্য ও জওয়াবের কাজ। এ পর্যন্ত রিসালাত সম্পর্কিত সঙ্গেহের জওয়াব পূর্ণ হলো। এর আগে বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা রিসালাত প্রমাণিত হয়েছিল। অতঃপর এতদসম্বন্ধেও যারা নুবয়ত অঙ্গীকার করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। (অর্থাৎ) যারা (আল্লাহর হক, রাসূলের হক অথবা বান্দার হকে) যুলুম করেছে, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, কিরণ (মন্দ ও বিপদের) জায়গায় তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ জাহানামে)।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀତବ୍ୟ ବିଷୟ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُذَدِّرِينَ - بِإِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ - وَأَنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ -

শব্দ ও অর্থসম্ভাবনের সমষ্টির নাম কোরআন ৪ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না । وَأَنَّ لِفِي زِبْرٍ لَا مُلِينٌ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে এ কথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভাবন অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা ৫১ এর সর্বনামটি বাহ্যত কোরআনকে বুঝাই । শব্দটি শব্দে শব্দে শব্দে এর বহুবচন । এর অর্থ কিংতোব । আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিংতাবসমূহেও আছে । বলা বাহ্য্য, তওরাত, ইনজীল, যবুর ইত্তাদি পূর্ববর্তী কিংতাব আরবী ভাষায় ছিল না । কেবল কোরআনের অর্থসম্ভাবন সেসব কিংতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিংতাবসমূহেও আছে । অধিকাংশ উচ্চতরে বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শত্রু কোরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেওয়া হয় । কারণ, কোন কিংতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । পূর্ববর্তী কিংতাবসমূহে কোরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে । অনেক হাদীস ঘাস্তা এবং সমর্থন পাওয়া যাবে ।

ଶାରୀରକ କୁଳାଚାନ (୬୪) — ୬୯

মুজাদরাক হাকিমে বর্ণিত মাকাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে সূরা বাকারা “প্রথম আলোচনা” থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহ ও যেসব সূরা মাঝে দুর্বল হয় এবং যেসব সূরা মাঝে দুর্বল হয়, সেগুলো মূসা (আ)-এর থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নিচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তত্ত্বাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাকিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে, *إِنْهَا لَغُونِ الصَّحْفِ الْأُولَى مَكْتُوبٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى*, এই সূরার বিষয়বস্তু হ্যারত ইবরাহিম ও মূসা (আ)-এর সহিতসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমূর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিভাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিভাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসভারের নাম নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চলন করে নিষ্ক্রিয় বাক্য গঠন করে, *كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعْنَى*, তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্ভিক্ষ্যে আবেদ : এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে ফরয তিলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলী অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন কোন ইহায় থেকে এ সম্পর্কে তিনি উকিল বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উকিল প্রত্যাহাৰও প্রয়োগিত রয়েছে।

কোরআনের উর্দু অনুবাদকে ‘উর্দু কোরআন’ বলা জায়েব নয় : এমনিভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় দেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েব নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু অনুবাদকে ‘উর্দু কোরআন’ ইংরেজী অনুবাদকে ‘ইংরেজী কোরআন’ বলে দেয়। এটি নাজারেয় ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার ‘কোরআন’ নামে প্রকাশ করা এবং তা জ্ঞান-বিকল্প করা নাজারেয়।

—*أَفَرَأَيْتَ أَنْ مُتَّعْنَا هُمْ سَفِينَ*—এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন সাড়ে করাও আয়াহ তা’আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশকারী করে, বিশ্বাস হ্যাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইহায় যুহুরী (র) বর্ণনা করেন, হ্যারত উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রতিদিন সকালে তার শুশ্রাব, ধরে নিজেকে সর্বোধন করে এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন *إِنْهَا لَغُونِ الصَّحْفِ الْأُولَى مَكْتُوبٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى*—এরপর অবোরে কাঁদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন —

نہار بالغرور سهو و غفلة
ولیک نوم والردی لک لازم

فَلَا أَنْتَ فِي الْإِيقَاظِ يُقْظَانَ حَازِمٍ
وَلَا أَنْتَ فِي النَّوْمِ نَاجٌ وَسَالِمٌ
وَتَسْعَى إِلَى مَا سُوفَ تَكْرَهُ غَبَّةً
كَذَّلِكَ فِي الدِّنِ بِعِيشِ الْبَهَائِمِ

অর্থাৎ—তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্চর্ষ নও তোমার চেষ্টাচরিত্ব এমন কাজের জন্য, যার অভ্যন্তর পরিণাম শীত্রাই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুর্পদ জন্মরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

أَفْرِينْ عَشِيرَة — وَأَنْذِرْ عَشِيرَةَ الْأَفْرِينْ শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উচ্চতরের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারম্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত করুল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আর্থীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহযোগিতা ও সাহায্য ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। শোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আর্থীর ও বজ্জনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায়। এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : فُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِكُمْ نَارًا — অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহানামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহানামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের কক্ষে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সৎকর্ম ও সচরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা ব্রহ্মবগতভাবে সভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামায পড়তে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হ্যারাম বিশ্যাদি থেকে বেঁচে থাকা দুর্ক্ষ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠী

যে ক্ষেত্রে শুনাই শিষ্ট, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আঘাতকা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্ত্বের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্ত্বকে মেনে নিতে অঙ্গীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ইমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতৃব্য হযরত ইব্রাহিম প্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফলে।

কবিতার সংজ্ঞা ৪—وَالشُّعْرُ أَبْيَعُهُمُ الْفَانِيْنَ—অভিধানে এমন বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্য ছন্দ, ওয়ন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে “কবিতাধর্মী প্রয়াণ” এবং কবিতা-দারিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গবলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের “شاعر تربص بن”—شاعر“—বল্মুশাউর”—مجنون—“—ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মুক্তির কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ওয়নবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফিরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার গীতিনীতি সংযুক্তে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহ্যিক, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়। একজন অনা঱্বে ব্যক্তিও একেপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষ্যী আরবব্রাহ বলা দূরের কথা; বরং কাফিররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউয়ুবিস্তাহ) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং بارباز তথা মিথ্যাবাদীকে شعر বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রয়াণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনন্দানন্দিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওয়নবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহ্ল বারীর এক রেওয়ায়েত খেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রমনৰত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপারয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও আস্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারণগ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, পথভৃষ্ট

লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ভিত জিল তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত—(ফতহল বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মাম : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিম্না এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বুঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে অমানিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয় ; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরুদ্ধ গাঢ়া হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিম্না ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলভাবে প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিম্নীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা শুনাই ও অপছন্দনীয় বিষয়বাদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হ্যরত উবাই ইবনে কাবের রেওয়ায়েতে আছে : ان منْ أَنْتَ مُنَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الشَّفَر حَكْمَةً অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ত হয়ে থাকে।--(বুখারী) হায়েয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে ‘হিকমত’ বলে সত্য ভাষণ বুঝানো হয়েছে। ইবনে বাতাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এক্লপ কবিতাই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিম্নীয়। এর আরও সবর্থন নিজবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্বেত করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কৃক্ষা থেকে বসরা পর্যন্ত ইয়ালান ইবনে জসাইন (রা)-এর সাথে সফর করেছি। প্রতি অন্যিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেঝী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শুনাতেন। (৪) ইমাম বুখারী বলেন, হ্যরত আয়েশা (রা) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়ালা ইবনে উমর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উকি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও শুনাহের হলে কবিতা মন্দ।--(ফতহল বারী)

তফসীরে কুরআনীতে আছে, মদীনা ঘুনাওয়ারার দশজন জ্ঞান-গরিমায় সেরা ফিকাহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কার্য ঘুরায়র ইবনে বাক্তারের কবিতাসমূহ একটি দ্বত্ব ঘৰে সংরক্ষিত ছিল। কুরআনী আবু আমরের উকি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সংরক্ষিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি। অথবা, অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিম্না বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কোরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিম্নীয়।

ইহাম বুখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হুয়ায়রার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন :

—لَنْ يُمْكِنْ جَوْفَ رَجُلٍ قَيْحَايِرِهِ خَيْرٌ مِّنْ إِنْ يَعْتَصِي شَرِّهِ—অর্থাৎ পুঁজি দ্বারা পেটভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উপর । ইহাম বুখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর অরণ, কোরআন ও জ্ঞান চর্চার উপর অবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত ধাকলে মন্দ নয় । এমনিভাবে যেসব কবিতা অঙ্গীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্তসনা-বিন্দুপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত বিরোধী বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজারেয় । এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্দে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম ।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত উমর (রা) প্রশাসক আলী ইবনে নয়লাকে অঙ্গীল কবিতা বলার অপরাধে পদচার্য করে দেন । হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহমেদাসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন । অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয় ।—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্তি আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে পার্কিল করে দেয়, তা মিলনীয় । ইবনে আবী জমরাহ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্তি অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার অরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আঘাতিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও মিলনীয় কবিতার অনুরূপ ।

আর ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হয়ে যায় : ﴿إِنَّمَا يُعَذِّبُ اللَّهُمَّ أَنْشَأْتَ مِيقَاتَهُمُ الْغَائِبَنَ﴾—এই আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট । এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ কবিদের প্রতি কিন্তু আরোপ করা হলো ? এর কারণ এই যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে । হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানজী (র) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে । উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিদ্রা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয় । তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয় । সে বাধা-নিষেধ করে না । ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিদ্রার অভ্যাস গড়ে উঠেছে । এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ ব্যয়ৎ অনুসৃতের গুনাহের আলামত হয়ে যাবে । কিন্তু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার ফে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না । উদাহরণত এক ব্যক্তি বিশ্বাস ও মাস'আলা-মাসাম্রেলের ব্যাপারে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোন পথভ্রষ্টতা নেই । কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলিমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট । এক্ষেত্রে তার কর্মগত ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলিমের পথভ্রষ্টতার দলীল হবে না ।

سُورَةُ النَّمْلٍ

সূরা আন-লাম্ল

মকাব অবজীর্ণ, ১৩ আগস্ট, ৭ জুন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

لَسْ قَاتِلُكَ أَيْتَ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ① هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ②
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقَنُونَ ③
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ
يَعْمَلُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمُ الْأَخْسَرُونَ ⑤ وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيهِ ⑥

পরম করুণাময় আল্লাহু তা'আলার নামে ওক !

- (১) ভা-সীন ; এগুলো আল- কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুন্দর কিভাবের ;
(২) মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ, (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিখ্যাস করে, (৪) যারা পরকালে বিখ্যাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাঙ্ককে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা উত্তুল হয়ে সুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্য ময়েহে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিপ্রাপ্ত। (৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হলে প্রজাময়, জ্ঞানময় আল্লাহুর কাছ থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ভা-সীন (এর অর্থ আল্লাহু তা'আলাই জানেন), এগুলো কোরআন ও সুন্দর কিভাবের আয়াত। মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশক ও (এই পথনির্দেশক কলে) সুপ্রতিদানের সুসংবাদসংতা; যারা (মুসলমান) এমন যে, (কার্যক্রমেও হিদায়াত অনুসরণ করে চলে। সেমতে) নামায কায়েম করে (যা দৈহিক ইবাদতের অধ্যে সেরা এবং বিখ্যাসের দিক দিয়েও হিদায়াতপ্রাপ্ত।

সেমতে) পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (এ হচ্ছে মু'মিনদের গুণাবলী এবং) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব তারা (মূর্খতাবশত সত্য থেকে দূরে) উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (তাদের বিশ্বাস ও কর্ম কিছুই সঠিক নয়। ফলে তারা কোরআনও মানে না। কোরআন মু'মিনদেরকে যেমন সুসংবাদ দ্বারা, তেমনি অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে যে,) তাদের জন্যই রয়েছে (দুনিয়াতে যত্থুর সময়ও) কঠিন শাস্তি এবং তারাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত (কোন সময় মুক্তি পাবে না। অবিশ্বাসীরা কোরআন না মানলেও) নিচরাই আপনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহর কাছ থেকে কোরআন লাভ করেন (এই নিয়ামতের আনন্দে আপনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক আতর্য বিষয়

—**অর্থাৎ যারা আবিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি।** ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথচার্টভায় লিঙ্গ ধাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে **أَعْمَالَهُمْ** বলে তাদের সৎকর্ম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু জালিয়রা এদিকে জঙ্গেপও করেনি; বরং কুকর্ম ও শিরকে লিঙ্গ রয়েছে। ফলে তারা পথচার্টভায় মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু অথবোক তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, অথবত সুশোভিত করার কাহাটি অধিকাংশ **رِبِّيْنَ لَكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ** — **رِبِّيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا** কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন **حَبِّ الْنَّعْمَ** সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার কুই কম; যেমন **رِبِّيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ** ইতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত **أَعْمَالَهُمْ** (তাদের কর্ম) শব্দও এ কথা বুঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম—সৎকর্ম নয়।

إِذْ قَالَ مُوسَى لِهِلَلَهَ أَنِّي أَنْسَتُ نَارًا إِسَاطِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَرِّاً وَإِتَّيْكُمْ رِيشَهَابِ
قَبِّسٌ لَعْلَكُمْ تَصْطَلُونَ ⑨ فَلَمَّا جَاءَهَا نَوْدِي أَنْ بُورَادَ مَنْ فِي التَّارِدِ مَنْ
حَوْلَهَا مَوْسِبُنَ اللَّهِ رِبِّ الْعَلَمِينَ ⑩ يَمْوَسِي إِنَّهُ أَنَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑪
وَالْقِعْدَ عَصَابَكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهَبَّ كَانَهَا جَانِيَّ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يَعْقِبْ ⑫
يَمْوَسِي لَأَنَّهُ غَفُّ قَنِّي لَأَنَّهُ غَافُ لَدَيِّ الرُّسُلِوْنَ ⑬ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ

بَدْلَ حَسَنًا بَعْدَ سُوءِ فَلَمْ يَدْكُنْ فِي جَيْدِكَ
 تَخْرُجٌ بِيَضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ قَفْ في تَسْعَ آيَتٍ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ طَانُهُمْ
 كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيْتَنَا مُبَصِّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ وَجْهُنَّدُ وَابْنَهَا وَاسْتَيْقَنْتُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

(١٨)

(৭) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন : ‘আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আসতে পারব অথবা তোমাদের জন্য জুলন্ত অঙ্গায় লিয়ে আসতে পারব, যাতে তোমরা আত্ম পোহাতে পার।’ (৮) অতঃপর যখন তিনি আঙ্গনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হলো, ধন্য তিনি, যিনি আঙ্গনের ছানে আছেন এবং যায় আঙ্গনের আশেপাশে আছেন। বিষ জাহানের পাদনকর্তা আল্লাহ পবিত্র ও মহিমাবিত। (৯) হে মূসা, আমি আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার সাঠি।’ অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং শেষে কিরণেও দেখলেন না। ‘হে মূসা, তুম করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পর্যবেক্ষণ তর করেন না।’ (১১) তবে সে বাড়াবাড়ি করে, এরপর মন্ত্র কর্তৃর পরিবর্তে সংকর্ষ করে; নিচের আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে চুকিয়ে দিন, সুতর হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়।’ এগুলো ফিরাউন ও তার স্বপ্নদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিচে তারা হিল পাপাচালী স্বপ্নদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল—এটা তো সুশ্রাব জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্কারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তখনকার ঘটনা করুন) যখন (মাদইয়ান থেকে ফিরার পথে রাখিকালে তূর পাহাড়ের নিকটে পৌছেন এবং মিসরের পথে ঝুলে যান, তখন) মূসা (আ) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি (তূর পাহাড়ের দিকে) আত্ম দেখেছি। আমি এখনই (যেয়ে) সেখান থেকে (হয় পথের) কোন খবর আনব, না হয় তোমাদের কাছে (সেখান থেকে) আঙ্গনের জুলন্ত কাট্টখণ্ড আনব, যাতে তোমরা আঙ্গ পোহাতে পার। অতঃপর যা ‘আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৭০

যখন তার (আগুনের) কাছে পৌছলেন, তখন তাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আওয়াজ দেওয়া হলো, যারা এই আগুনের মধ্যে আছে (অর্ধাং ফেরেশতা) এবং যারা এই আগুনের পার্শ্বে আছে [অর্ধাং মূসা (আ)]। তাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ হোক। [অভিবাদন ও সালামের হৃলে এই দোয়া করা হয়েছে : যেমন সাক্ষাৎকারীরা পরম্পরে সালাম করে। মূসা (আ) জানতেন না যে, এটা আল্লাহর নূর, তাই তিনি সালাম করেননি। তাঁর ঘনসমৃষ্টির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম করা হলো। ফেরেশতাগণকে যুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, ফেরেশতাগণকে সালাম যেমন আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যের আলামত হয়ে থাকে, তেমনি এই সালামও মূসা (আ)-এর বিশেষ নৈকট্যের সুসংবাদ হয়ে গেছে। আগুনকারের এই নূর যে আল্লাহ তা'আলার সন্তা নয়, এ কথা ব্যক্ত করার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে,] বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহ (বর্ণ, দিক, পরিমাণ ও সীমিত হওয়া থেকে) পবিত্র। [এই নূরের মধ্যে এসব বিষয় আছে। সুতরাং এই নূর আল্লাহর সন্তা নয়। এই ব্যাপার সহকে মূসা (আ) পূর্বে অভ্যাত থাকলে এটা তাঁর জন্য শিক্ষা। আর যদি যুক্তি ও বিতর্জন ইত্তাবাধর্মের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই জানা ছিল, তবে এটা অতিরিক্ত বুঝানো। এরপর বলা হয়েছে,] হে মূসা, (আমি যে নিরাকার অবস্থায় কথা বলছি) আমি আল্লাহ প্রয়োগাত্মক অভ্যাসী, প্রজ্ঞাময়। (হে মূসা) তুমি তোমার সাঠি (শাঠিতে) নিক্ষেপ কর। (তিনি সাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অঙ্গগুলি হয়ে দুলতে লাগল)। অতঃপর যখন সে তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছাটি করতে দেখল; তখন সে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল এবং পিছন ফিরে দেখল না। (বলা হলো,) হে মূসা, তব করো না (কেননা আমি তোমাকে পরমগত্বী দিয়েছি)। আমার কাছে পয়গত্বর্গণ (পয়গত্বর্গীর অবস্থায় অর্ধাং মু'জিয়া দেখে) ভয় করে না, (কাজেই ভূমিতে ভয় করো না)। তবে যার ধারা কোম ঝটি (পদার্থলন) হয়ে যায় (এবং সে এই পদার্থলন প্রবণ করে ভয় করে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু তার ব্যাপারেও এই নীতি আছে যে, যদি ঝটি হয়ে যায়) এবং ঝটি হয়ে যাওয়ার পর ঝটির পরিবর্তে সংকর্ম করে (তওবা করে,) তবে আমি (তাকেও ক্ষমা করে দেই কেননা, আমি) ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (এটা এজন্য বলেছেন, যাতে সাঠির মু'জিয়ার ব্যাপারে নিচিত হওয়ার পর আবার কোন সময় কিংবতী হত্যার ঘটনা ঘৰণ করে পেরেশান না হয়। হে মূসা, সাঠির এই মু'জিয়া ছাড়া আরও একটি মু'জিয়া দেওয়া হচ্ছে, তা এই যে,) তুমি তোমার হাত বগলে শুকিয়ে দাও(অতপর বের কর, তা হলে) তা দোষক্রটি ছাড়াই (অর্ধাং ধৰ্ম কুণ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই অত্যন্ত) সুন্দর বের হয়ে আসবে। এগুলো (এই উভয় মু'জিয়া) সেই নয়টি মু'জিয়ার অন্যতম, যেগুলো (দিয়ে) ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি (তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে)। তারা বড়ই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। যখন তাদের কাছে আমার (দেওয়া) উজ্জ্বল মু'জিয়া পৌছল (অর্ধাং প্রথমাবস্থায় দুই মু'জিয়া দেখানো হয়। এরপর সময়ে সময়ে অন্যান্য মু'জিয়াও দেখানো হয়।) তখন তারা (এগুলো দেখে) বলল, এ তো প্রকাশ্য জানু। (সর্বনাশের কথা এই যে,) তারা অন্যায় ও অহংকার করে মু'জিয়াগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল, অর্থচ (ভিতর থেকে) তাদের অস্ত্র এগুলোকে সত্য বলে বিখ্যাস করেছিল। অতএব দেখুন, অর্ধকারীদের কি (মন) পরিগাম হয়েছে (দুনিয়াতে সলিল সমাধি লাভ করেছে এবং পরকালে আগুনে পোড়ার শাস্তি পেয়েছে)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إذْقَالَ مُوسَىٰ لَاهِلَّمْ إِنِّي أَفْسَنْتُ نَارًا سَأْتِبْكُمْ مَنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتَيْكُمْ
بِشَهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَمْنَطِلُونَ -

যানুবের নিজের প্রয়োজন ঘটানোর জন্য দ্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় : মূসা (আ) এ স্থলে দুইটি প্রয়োজনের সম্মতীন হন। এক বিশৃঙ্খল পথ জিজ্ঞাসা। দুই অংশ থেকে উভাপে আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কলকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বাল্মীকি বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বুবা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সত্ত্বত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত—পথ পাওয়া এবং উভাপে আহরণ করা। —(কুহল মা'আনী)

এ স্থলে হযরত মূসা (আ) ক্রিয়াপদ্ধতি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্ধাংশ শোয়ায়ব (আ)-এর কল্যাণ ছিলেন। তাঁর জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সংক্ষেপ লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্মুখে করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পঢ়ীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উভয় : আরাতে مُوسَىٰ শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও শামিল থাকে। এ স্থলে মূসা (আ)-এর একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না ; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে এ কথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক এ কথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ - يَامُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

মূসা (আ)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ : মূসা (আ)-এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তা সম্পেক্ষ—প্রথম بُورِكَ مَنْ এবং أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। সূরা তোয়াহার এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বুলা হয়েছে কৃতীয় থেকে।

نُؤْدِي يَامُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَالْأَخْلُعْ نَعْلِيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوْلِيْ
- وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْلِحِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ -

এ সব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তা সাপেক্ষ প্রথম এবং দ্বিতীয় অন্তৰ্ভুক্ত আছে :
সুরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
يَأْمُونُ لِي أَنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ -

এই সুরাত্রয়ে বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হয়রত মুসা (আ)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহর তা'আলা তুর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শুনা গেল যা—**إِنَّمَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْكَبِيرُ — إِنَّمَا اللَّهُ رَبُّ الْمَالِمِينَ إِنَّمَا اللَّهُ لَا يَنْهَا**—এটা সম্বর্পণ যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে—একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহরে মুহীতে আবু হাইয়ান এবং রহল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ অবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপ্রয়োগ ছিল না। অবগত বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে—তথু কর্ণ নয়; বরং হাত পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা যুক্তিযা বিশেষ।

এই পায়েবী আওয়াজ নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শুনত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। একপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভাসি ও স্তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিশয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে **سُبْحَانَ اللَّهِ** শব্দ এই হশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহুর প্রাপ্তি এবং সূরা কাসাসে **إِنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ** এই বিশয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্থ এই যে, হ্যরত মুসা (আ) তখন আগুন ও আশোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুনা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর স্তুতির কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টি বস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টি বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : **أَنْ بُوْلَكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَرَّقَهَا** অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারকদের উকি বিভিন্নভাবে হয়ে গেছে। তফসীরে জাহল মাঝানীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হ্যরত ইবনে আবৰাস, মুজাহিদ ও ইকবারা থেকে বর্ণিত আছে যে, **مَنْ فِي النَّارِ** বলে হ্যরত মুসা (আ)-কে বুবানো হয়েছে। কেবল অগ্নিটি তো সত্ত্বিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মুসা (আ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দুর থেকে সেটা সম্পূর্ণ

অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মুসা (আ) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا بَلِّهَ الْأَشْهَادَ বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উভয়ের বলেছেন যে, وَمَنْ فِي النَّارِ بَلِّهَ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا بَلِّهَ বলে হ্যরত মুসা (আ)- কে বুঝানো হয়েছে। সার-সংক্ষেপে এই উক্তিই বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

হ্যরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (রা)-এর একটি রেওয়ারেত ও তার পর্যালোচনা । ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ প্রযুক্ত হ্যরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সাইদ ইবনে জ্বালুর থেকে এবং- مَنْ فِي النَّارِ -এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, مَنْ فِي النَّارِ বলে ব্যাং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও মহান সন্তা বুঝানো হয়েছে। বলা বাহ্য্য, অগ্নি একটি স্কৃত বস্তু এবং কোন স্কৃত বস্তুর মধ্যে স্কৃতার অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তা আগনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল ; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মৃশরিক প্রতিমার অঙ্গিত্বে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তার অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে। এটা তাওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়ায়েতের অর্থ আজ্ঞাপ্রকাশ করে। উদাহরণঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকে না--তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আজ্ঞাপ্রকাশকে 'তজলী' তথা জ্যোতিবিকীরণও বলা হয়। বলা বাহ্য্য, এই তজলী ব্যাং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তার তজলী ছিল না। নতুন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তা মুসা (আ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, رَبُّ أَرْنَىٰ أَنْظَرَ إِلَيْكَ لَنْ تَرَانِيْ এবং হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সন্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে لَنْ تَرَانِيْ বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বুঝা গেল যে, হ্যরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ্ তা'আলার আজ্ঞাপ্রকাশ অর্থাৎ অগ্নির আকারে জ্যোতিবিকীরণ বুঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমন সন্তার তজলীও ছিল না। বরং উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বক্তৃজগতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তাগত তজলী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আজ্ঞাপ্রকাশ ও তজলীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে,, এটা 'মিছালী' তথা দৃষ্টান্তগত তজলী ছিল, যা সূক্ষ্ম—বৃুগদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর ব্রহ্ম বুঝা কঠিন। প্রয়োজনমাফিক কিঞ্চিৎ বোধগ্য করার জন্য আমি আয়ার আরবী ভাষায় সিখিত 'আহকায়ুল-কোরআন' থেছে সুরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। لَأَنَّ ظَلَمَتْ بَدْلَ حُسْنَتْ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّىْ فَفَوْرَ رَحِيمٌ । এর পূর্বের আয়াতে মুসা (আ)-এর সাঠির মু'জিয়া উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মুসা (আ). নিজেও ডয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মুসা (আ)-এর হিতীয় মু'জিয়া সুন্দর হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যক্তিক্রম কেন উল্লেখ করা হলো এবং এটা না সঠিত এবং স্পষ্টকৃত তফসীরকারকগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কেউ একে সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে

এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ডয় না ধাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাদের দ্বারা কোন ঝটি-বিচুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সৎকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ঝটি-বিচুতি যদিও আল্লাহ'র তা'আলা ক্ষমা করে দেন; কিন্তু ক্ষমার পরেও শুনাহের কোন কোন টিক অবশিষ্ট ধাকার সংজ্ঞা আছে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ'র রাসূল ডয় করেন না তাদের ব্যভীত, যাদের দ্বারা ঝটি-বিচুতি অর্থাৎ সগিরা শুনাহ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগিরা শুনাহ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদব্ধলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগিরা বা কবিতা কোন অকার শুনাহ নয়। তবে আকার থাকে শুনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজতিহাদী ভাষ্টি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ)-এর দ্বারা কিবরী-হত্যার যে পদব্ধলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ'র তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদব্ধলন না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও হতো না।—(কুরআনী)

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَأْدَ وَسَلِيمَنَ عِلْمًا ۝ وَقَالَ لَا يَحْسُدُ اللَّهُ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ
 كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَرَثَ سَلِيمَنَ دَأْدَ وَقَالَ يَا يَاهَا النَّاسُ
 عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هُنَّ الْهُوَ الْفَضْلُ السَّيِّنَ ۝
 وَحَشِرَ سَلِيمَنَ جِنُودَةً مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يَوْزِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا
 أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ التَّمْلِ لَا قَالَتْ نَسْلَةٌ يَا يَاهَا التَّمْلُ ادْخُلُوا مَسِكِنَكُمْ ۝
 لَا يَحْطِمُنَّكُمْ سَلِيمَنَ وَجِنُودَةٌ لَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ فَتَبَسَّمَ ضَاحِحًا مِّنْ
 قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعِنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ
 فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝

(১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জান দান করেছিলাম। তারা বলেছিলেন, 'আল্লাহ'র শশসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বাদ্দার উপর বেঠত্ব দান

করেছেন।’ (১৬) সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে শোকসকল, আমাকে উড়ি বিহংগকুলের ভাঙা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেওয়া হয়েছে। নিচ্য এটা সুস্পষ্ট ঝেঁঠত্ব। (১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো—জিন, মানুব ও বিহংগকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন বৃহে বিভক্ত করা হলো। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুবিত উপত্যকায় পৌছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অভ্যাতসারে তোমাদেরকে পিট করে ফেলবে।’ (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-কে (শরীয়ত ও দেশ শাসনের) জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা উভয়ই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। [দাউদ (আ)-এর ওফাতের পর] সুলায়মান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। (অর্থাৎ তিনি রাজত্ব লাভ করেন।) তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে) বললেন, হে শোকসকল। আমাকে বিহংগকুলের বুলি শিক্ষা দেয়া হয়েছে (যা অন্যান্য রাজা-বাদশাহকে শিক্ষা দেয়া হয়নি) এবং আমাকে (রাজ্য শাসনের আসবাবপত্র সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়) সবকিছুই দেয়া হয়েছে (যেমন সেনাবাহিনী, অর্থসম্পদ, সমরাত্ত্ব ইত্যাদি)। নিচ্য এটা (আল্লাহ তা'আলার) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের (কাছে রাজ্য শাসনের সরঞ্জামাদিও আচর্য ধরনের ছিল। সেহতে তাঁর) সামনে তাঁর (যে) বাহিনী সমবেত করা হলো—(হয়েছিল, যাদের মধ্যে) জিন, মানব ও বিহংগকুল (ও ছিল, যারা অন্য কোন রাজা-বাদশাহর অনুগত হয় না। তারা ছিলও এমন প্রচুর সংখ্যক যে) তাদেরকে (চলার সময়) আগলিয়ে রাখা হতো (যাতে বিছিন্ন না হয়ে যায়। প্রচুর সংখ্যক লোকের মধ্যেই স্বত্বাবত এক্ষেপ করা হয়। কেননা, অন্য সংখ্যকের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বড় সম্বাবেশ আগের লোকেরা পেছনের লোকদের খবরও রাখে না। তাই এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। একবার তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন।) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুবিত উপত্যকায় পৌছল, তখন একটি পিপীলিকা (অন্য পিপীলিকাদেরকে) বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গর্তে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তাঁর বাহিনী অভ্যাতসারে তোমাদেরকে পিট করে ফেলবে। সুলায়মান (আ) তার কথা শুনে (আচর্যাবিত হলেন যে, এই কুন্দু পিপীলিকারও এত সতর্কতা। তিনি) মুচকি হাসলেন এবং (পিপীলিকার বুলি বুঝে ফেলার নিয়ামত দেখে অন্যান্য নিয়ামতও অবগ হয়ে গেল। তাই তিনি) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সার্বক্ষণিক সামর্থ্য

দিন, যাতে আমি আপনার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন [অর্থাৎ ঈমান ও জ্ঞান সবাইকে এবং নবুয়ত আমাকে ও আমার পিতা দাউদ (আ)-কে]। এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি (অর্থাৎ আমার কর্ম যেনে মকবুল হয়। কেননা, কর্ম সৎ ইওয়ার পর যদি আদব ও শর্তের অভাবে মকবুল না হয়, তবে মেরুদণ্ড কর্ম উদ্বিষ্ট নয়।) এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে (উচ্চতরের) সৎকর্মপরায়ণ বাস্তাগণের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) অন্তর্ভুক্ত করুন (অর্থাৎ নৈকট্যকে দূরত্বে পর্যবসিত না করুন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—وَلَقَدْ أَتَيْنَا رَأْوِيَ وَسَلِيمَانَ عَلَىٰ
সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবাস্তর নয়; যেমন দাউদ (আ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হ্যরত দাউদ ও সুলায়মান (আ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়—জিন ও জলু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা যাবার এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উর্ধ্বে।—(কুরআনী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না : —وَبِرَثَ سَلِيمَانَ كُوَرَىٰ
এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে—আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : نَعَنْ مَعَاشِ الرَّبِّ نَبِيًّا وَلَا نَرِثُ
অর্থাৎ পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হল না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরিমিয়ী ও আবু দাউদে হ্যরত
الْعَلَمَاءِ وَرَبِّ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرِثُوا دِينَارًا وَلَا بِرْهَمًا
অর্থাৎ আলিমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী ;
কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হ্যরত আবু আবদুল্লাহ রেওয়ায়েতে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হ্যরত সুলায়মান (আ)-হ্যরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর উত্তরাধিকারী।—(জাহান যা'আলী)। যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো যেতে পারে না। কারণ, হ্যরত দাউদ (আ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বুঝানো হয়েছে, তাতে ভাতাচাৰ অংশীদার ছিল না ; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ)-ই উত্তরাধিকারী হল। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত দাউদ (আ)-এর রাজত্বও হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জলু-জানোয়ার ও বিহংগকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব

প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত আন্ত হয়ে যাও, যাতে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারের কোন কোন ইমামের বরাত দিতে আর্থিক উত্তরাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন।—(কুরআনী)

হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের মাঝখালে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সুলায়মান (আ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল।—(কুরআনী)

অহংকারবশত না হলে নিজের জন্য বছরচনের পদ ব্যবহার করা আয়োথ : **مَنْ** —**هُنَّ** —**الْمُطَبِّقُونَ** —**وَأُنْبَيْتُمَا** —**الْخَ** —**হ্যরত সুলায়মান (আ)** এক হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বছরচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুবায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে অজাদের মধ্যে তক্ষিত্যুক্ত তয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে শৈলিয় প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ তাদের অধীনস্থদের উপরিহিততে নিজেদের জন্য বছরচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতাত্ত্বিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়—অহংকার ও প্রের্তৃ প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহংগকুল ও চতুর্পদ জন্মদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশ্চপক্ষী ও সমস্ত জন্ম-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ঠ হতে পারে। মানব ও জিলকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনের ব্যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইয়াম শাফিউ (র) বলেন, পাখিদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়া বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার প্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রতিরোধী। যে কোন বীজ তার হাতে এসে সে ওটাকে বিখ্যাত করে ফেলে, তা অঙ্গুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার বাদোর ভাগার সংরক্ষণ করে রাখে।—(কুরআনী)

জাতব্য : আয়াতে দুদহদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে অর্থাৎ **مَنْ** —**বিহংগকুলের বুদ্ধির উল্লেখ** করা হয়েছে। দুদহদ পাখি জাতীয় প্রাণী। নতুন হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে সমস্ত পশ্চপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুদ্ধি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুদ্ধি বুঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াম কুরআনী তাঁর তক্ষণীয়ে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুদ্ধি ও সুলায়মান (আ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, আয় প্রত্যেক পক্ষীর বুদ্ধি কোন-না কোন উপরিদেশ বাক্য।

—**আঙ্গিধানিক দিক দিয়ে** **جَنَاحَةً** **শব্দের মধ্যে** কোন বজুর সমস্ত ব্যাপিস্তা শার্মিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামাজিক ব্যাপকতা বুঝানো হয় না : বরং কোন বিশেষ সম্পত্তি পর্যন্ত ব্যাপকতা বুঝানো হয় ; যেমন এখানে সেই সব বজুর ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুন একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে ছিল না।

মাঝারেফুল কুরআন (৬৪) — ৭১

যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে **فَهُمْ يَرْعَزُونَ** এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিজিত না হয়ে যায়।

—**وَإِنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تُرَضَاهُ**—এখানে রেয়ার অর্থ কবৃত। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে এমন সৎকর্মের তওঁকীক দিন, যা আপনার কাছে মকবূল হয়। রহস্য মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রযাগ করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবূল হওয়াই জরুরী নয় ; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই প্রয়োগের তাঁদের সৎকর্মসমূহ কবৃত হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন ; যেমন হ্যরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ) কাবা গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন এতে বুঝা গেল যে, কোন সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয় : বরং তা কবৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাহ্যনীয়।

সৎকর্ম মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যক্তিত জানাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না :—**وَأَخْلَقَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ**—সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবূল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জানাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জানাতে যাবে না। সাহাবায়ে কিমায় বললেন, আপনিও কি ? তিনি বললেন, হ্যা, আমিও। কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেঠেন করে আছে।—(রহস্য মা'আনী)

হ্যরত সুলায়মান (আ)-ও এসব বাক্যে জানাতে প্রবেশ করার, জন্য আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন ; অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যদিহারা জানাতের উপযুক্ত হই।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرِي الْهُدُوْهُ لَأَمْ كَانَ مِنَ الْغَالِبِينَ ⑩

لَا عَذِيلَ بِهِ عَذَابٌ أَبْشِرْ يَدِيَا وَلَا أَذْبَحْتَهُ أَوْ لَيْأَاتِيَ بِسُلْطِنِي مَيْنِ ⑪

فَكَثِيرٌ غَيْرُ بِعِيدٍ فَقَالَ أَحْطَثْ بِسَالِمٍ تُحْطِبِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَيِّئَ بِنِيَّا

يَقِيْنِ ⑫ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأَوْتِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

عَرْشٌ عَظِيمٌ ⑬ وَجَدْتُهَا وَقَبْرَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَذَنْ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ⑯
 الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
 تَحْفُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ⑰ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑱
 قَالَ سَنَنْظُرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتِ مِنَ الْكَذَّابِينَ ⑲ إِذْ هُبَتِ كَثِيرٌ هُنَّ أَفَالِقُهُ
 إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَإِنْظُرْمَا ذَلِكَ جِعْوَنَ ⑳

(২০) সুলায়মান পক্ষীদের খৌজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, ‘কি হলো, হৃদয়কে দেখছি না কেন ? না কি সে অনুপস্থিত ? (২১) আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শান্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ।’ (২২) কিছুক্ষণ পরেই হৃদয় এসে বলল, ‘আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার স্বামীকে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎ পথ থেকে নির্মত করেছে। অতএব তারা সৎ পথ পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সিজদা করে না কেন, যিনি নভোমগল ও ভূমগলের গোপন বলু প্রকাশ করেন এবং জানেন। যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর ? (২৬) আল্লাহ ব্যক্তিত্বে কোন উপাস্য নেই ; তিনি মহা-আরশের মালিক।’ (২৭) সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী ? (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।’

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(একবার এই ঘটনা সংঘটিত হয় যে,) সুলায়মান (আ) পক্ষীদের খৌজ নিলেন, অতঃপর (হৃদয়কে না দেখে) বললেন, কি হলো, আমি হৃদয়কে দেখছি না কেন ? সে অনুপস্থিত নাকি ? যখন বাস্তবিকই অনুপস্থিত জানতে পারলেন, তখন বললেন (আমি তাকে (অনুপস্থিতির কারণে) কঠোর শান্তি দেব কিংবা তাকে হত্যা করব অথবা সে কোন পরিকার প্রয়াণ (এবং অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত অজুহাত) পেশ করবে (এরপ করলে তাকে ছেড়ে দেব)। অল্লক্ষণ পরে হৃদয় এসে গেল এবং সুলায়মান (আ)-কে বলল, আমি এমন বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি অবগত নন। (সংক্ষেপে এর বর্ণনা এই যে,)

আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে (রাজত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অধ্য থেকে) সবকিছু দেয়া হয়েছে। তার কাছে একটি বিরাট সিংহাসন আছে। (তাদের ধর্মীয় অবস্থা এই যে,) আমি তাকে ও তার সম্পদায়কে দেখেছি যে, তারা আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতকে) পরিভ্যাগ করে সূর্যকে সিজদা করছে। শব্দতান তাদের দৃষ্টিতে তাদের (এই) কার্যাবলী সুশোভিত করে রেখেছে। অতএব (এই কুর্কর্মকে সুশোভিত করার কারণে) তাদেরকে (সত্তা) পথ থেকে নিষ্কুণ্ঠ করেছে। ফলে তারা (সত্ত্ব) পথে চলে না অর্থাৎ তারা আল্লাহকে সিজদা করে না, যিনি (এমন সামর্থ্যবান যে,) নভোগুল ও ভূগুলের গোপন বস্তুসমূহ (যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টি ও মৃত্তিকার উদ্ভিদও আছে) প্রকাশ করেন এবং (এমন জ্ঞানী যে) তোমরা অর্থাৎ সব সৃষ্টি জীব) যা (অন্তরে) গোপন রাখ, এবং যা (যুক্তে) প্রকাশ কর, তা সবই তিনি জানেন। (তাই) আল্লাহ-ই—এমন যে, তিনি ব্যক্তিত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ইহা-আরশের অধিপতি। হ্যরত সুলায়মান (আ) একথা শনে। বললেন, আমি এখন দেখব তুমি কি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? (আল্লা) আমার এই প্রতি নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর (সেখান থেকে কিছুটা ব্যবধানে)) সরে পড় এবং দেখ, তারা পরম্পরে কি সওয়াল-জিগ্যাব করে। (এরপর তুমি চলে এস। তারা যা করবে, তাতে তোমার সত্যমিথ্যা জানা যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنَفَّذَ الْمُلِيْر—এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খৌজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার মানব, জিন, জীব ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বত্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খৌজখবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়তে বলা হয়েছে **وَنَفَّذَ الْمُلِيْر**, অর্থাৎ হ্যরত সুলায়মান (আ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা সম্পর্কে খৌজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-তত্ত্বাবধারণা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং শীর-মুর্শিদের জন্য শিশ্য ও মুরিদদের খৌজ-খবর নেওয়া জরুরী। আলোচ্য আয়ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) সর্বত্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমনকি, যে হৃদহৃদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পার্থিত তুলনায় কম, সেই হৃদহৃদ পক্ষীর অগোচরে থাকেন। বরং বিশেষভাবে হৃদহৃদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হৃদহৃদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যাক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হ্যরত উমর ফারক (রা) তাঁর

বিলাক্ষণের আমলে পরগবরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অক্ষকারে তিনি ইদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াক্তিক্রম হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজ্ঞ ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি কোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যক্তি কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও উমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্য শাসন ও ধর্জা পালনের স্থিতিসূত্র, যা পয়ঃসন্ধির মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবারে কিরায় (রা) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অভিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশ্বের শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِيْلَهُدْمَدْمَأْ كَانَ مِنَ الْفَائِبِينَ—সুলায়মান (আ) বললেন, আমার কি হলো যে আমি হৃদয়দের সমাবেশে দেখতে পাইছি না ?

আস্তসমালোচনা : এখানে হান হিল একথা বলাৰ—“হৃদয়দেৱ কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই ?” বলাৰ ভঙ্গি পরিবৰ্তন কৰাৰ কাৰণ সভবত এই যে, হৃদয় ও অন্যান্য পক্ষীৰ অধীনস্থ ইওয়া আল্লাহু তা'আলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিল। হৃদয়দেৱ অনুপস্থিতি দেখে পুৰুষে হ্যৱত সুলায়মান (আ)-এৰ মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সভবত আমাৰ কোন ক্রটিৰ কাৰণে এই অনুগ্রহ ত্রাস পেয়েছে এবং এক শ্ৰেণীৰ পাখি অৰ্থাৎ হৃদয়দ গায়েৰ হয়ে পেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন কৰলেন যে, এক্ষণে কেন হলো? সূফী-বৃুৰ্গদেৱও অভ্যাস তাই। তাঁৰা যখন কোন নিয়ামত ত্রাস পেতে দেখেল অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনেৱ অন্য বৈৰায়িক উপায়াদিৰ দিকে মনোযোগ দানেৱ পূৰ্বে আস্তসমালোচনা কৰেন যে, আমাৰ ধাৰা আল্লাহু তা'আলার কৃতজ্ঞতা অকালে কি কোন ক্রটি হলো যদ্বৰুন এই নিয়ামত প্রভায়াৰ কৰা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আৱাবীৰ বৰাত দিয়ে এ হৃলে বৃুৰ্গদেৱ এই অবস্থা বৰ্ণনা কৰেছেন যে, আমাৰ অৰ্থাৎ তাঁৰ যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদেৱ কাৰ্যাবলীৰ খবৰ নেন যে, তাঁদেৱ ধাৰা কি ক্রটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আস্তসমালোচনা ও চিন্তাভাবনাৰ পৰ সুলায়মান (আ) বললেন, أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِبِينَ এখানে শব্দটি বল এৰ সমাৰ্থবোধক। —(কুরতুবী) অৰ্থাৎ হৃদয়দকে দেখাৰ ব্যাপারে আমাৰ দৃষ্টি ভুল কৰেনি ; বৰং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলেৰ অধ্যে হৃদয়দকে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰাৰ কাৰণ এবং একটি উক্তপূৰ্ব শিক্ষা : হ্যৱত আবদ্ধান্ত ইবনে আকবাস (রা)-কে জিজেস কৰা হয়, এতসব পক্ষীৰ মধ্যে তথ্য হৃদয়দকে পৌঁজাৰ কি কাৰণ ছিল ? তিনি বললেন, সুলায়মান (আ) তখন এইন জ্ঞানগায় অবস্থানৱত হিলেন, যেখনে পানি ছিল না। আল্লাহু তা'আলা হৃদয় পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান কৰেছেন যে, সে ভূগৰ্জেৰ বদ্বুসমূহকে এবং ভূগৰ্জে প্ৰবাহিত ঝৱনাসমূহকে দেখতে পায়। হ্যৱত সুলায়মান (আ) হৃদয়দেৱ কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তৱে কতটুকু গভীৰতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথাৱ মাটি খনন কৰলে প্রচুৰ পানি

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহু তা'আলা কারণ জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যিকী। কোন ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

—প্রাথমিক চিত্ত-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসূলত নীতির প্রকাশ যে, অনপন্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্ম কাজে অসমতা করে, তাকে সুব্য শান্তি দেওয়া জারোয় ৪ হ্যৱত সুলায়মান (আ)-এর জন্ম আগ্নাহ তা'আলী জন্মদেরকে একপ শান্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উপত্যের জন্ম জন্মদেরকে ব্যাই করে তাদের গোশ্ত, চামড়া ইত্যাদি ধারা উপকৃত হওয়া এখনও হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্ম গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া উট ইত্যাদি কাজে অসমতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুব্য শান্তি দেওয়া এখনও জারোয় । অন্যান্য জন্মকে শান্তি দেওয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ ।—(কুরআন)

— অর্থাৎ হৃদয় যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজ্ঞাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আস্তরণ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত শব্দ পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

—**أَخْطَلَتْ بِسَالْمَ تُحَبُّ**— অর্থাৎ সুদহসু তার ওয়র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পঞ্চগঞ্জবৃক্ষগণ ‘আলিমুল গায়া’ নম ৩ ইয়াম কুরতুমী বলেন, এ থেকে পরিকার বৃক্ষা যায় যে, পঞ্চগঞ্জবৃক্ষগণ আলিমুল গায়া’র নম যে সবকিছি তাঁদের জ্ঞান ধার্কৰে।

‘সাবা’ ইয়ামনের একটি প্রিসিক শহর, যার অপর নাম
মাওরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনিদের দূরত্ব ছিল।

ହୋଟ କି ବଡ଼କେ ବଲାତେ ପାରେ ଯେ, ଆମାର ଜ୍ଞାନ ଆପନାର ଚାଇତେ ବେଶି? : ହଦୃଦେର ଉପରୋକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଯାଗ କରେନ ଯେ, କୋଣ ଶାଗରିଦ ତାର ଓତ୍ତାଦକେ ଏବଂ ଆଲିଯ ନୟ ଏମନ କୋଣ ସାଙ୍କି ଆଲିଯକେ ବଲାତେ ପାରେ ଯେ, ଏ ବିଷୟେର ଜ୍ଞାନ ଆପନାର ଚାଇତେ ଆମାର ବେଶି—ଯଦି ବାସ୍ତବିକଇ ଏ ବିଷୟେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟେର ଚାଇତେ ବେଶି ହେଁ ଥାକେ । କିନ୍ତୁ କ୍ରହ୍ଲ ମା'ଆନୀତେ ବଲା ହରେଛେ, ପୀର ଓ ମୁକୁରିଦେର ସାଥନେ ଏ ଧରନେର କଥାବାର୍ତ୍ତ ଶିଷ୍ଟାଚାର-ବିରୋଧୀ । କାଜେଇ ବର୍ଜନୀୟ । ହଦୃଦେର ଉତ୍କିଳେ ପ୍ରମାଣରୂପେ ପେଶ କରା ଯାଯୁ ନା । କାରଣ, ମେ ଶାନ୍ତିର କବଳ ଥେକେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୟରକେ ଜୋରଦାର କରାର ଜନ୍ୟ ଏ କଥା ବଲେଛେ । ଏହେଳ ପ୍ରୋଜନେ ଶିଷ୍ଟାଚାରେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରେଖେ ଏ ଧରନେର କୋଣ କଥା ବଲାଲେ ଭାତେ ଦୋଷ ନେଇ ।

— অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী
অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবাৰ এই সন্ধানজীৱ নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে
শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাৰ জননী জিন সম্প্রদায়তৃতীয়
ছিল। তাৰ নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।—(কুরতুবী) তাৰ পিতামহ হৃদাহৃদ ছিল
সমগ্র ইয়ামনেৰ একচন্ত্য সন্ত্রাট। তাৰ চতুর্পাটি পুত্ৰ সন্তান ছিল। সবাই সন্ত্রাট হয়েছিল।
বিলকীসেৰ পিতা শারাহীল জনেকা জিন নারীকে বিবাহ কৰেছিল। তাৰই গৰ্ভে বিলকীসেৰ
জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ কৰাৰ বিভিন্ন কাৰণ বৰ্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে,
সে সন্ত্রাঙ্গ ও রাজত্বেৰ অহংকারে অন্য লোকদেৱকে বলত, তোমাদেৱ কেউ কুলেকোলীন্যে
আমাৰ সম্মান নও। তাই আমি বিবাহই কৰব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ কৰি না। এৰ
ফলশ্ৰূতিতে লোকেৱা জনেকা জিন নারীৰ সাথে তাঁৰ বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। (কুরতুবী)
প্ৰকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তাৰ সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে কৰে তাৰ
সমান দীক্ষাৰ কৰেনি। সন্তুত এই অহংকারেৰ ফলেই আহৃত, তাৰ বিবাহ এমন নারীৰ
সাথে অবধাৰিত কৰে দেন, যে তাৰ সমানও ছিল না এবং বৰজাতিও ছিল না।

জিন নারীৰ সাথে মানুষেৰ বিবাহ হতে পাৰে কি ? : এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ
কাৰণে সন্দেহ কৰেছেন যে, তাৱা জিন জাতিকে মানুষেৰ ন্যায় সন্তান উৎপাদনেৰ যোগ্য
মনে কৰেন না। ইবনে আৱাবী তাঁৰ তফসীৰ এছে বলেন, এ ধাৰণা জ্ঞান। কাৰণ সহীহ
হাদীসমংহৃতে প্ৰমাণিত আছে যে, মানব জাতিৰ অনুৱৰ্গ জিনদেৱ মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও
নারী-পুৰুষেৰ যাৰতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

বিতীয় প্ৰশ্ন শৰীয়তেৰ দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ কৰা যানুমতেৰ
জন্য হালাল কি না? এতে ফিকাহবিদদেৱ মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয
বলেছেন। কেউ কেউ জন্ম-জানোয়াৱেৰ ন্যায় ডিন্ন জাতি হওয়াৰ কাৰণে হারাম সাব্যস্ত
কৰেন। এ বিষয়েৰ বিশদ বিবৰণ “আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান” কিতাবে
উল্পৰিষিত আছে। তাতে মুসলমান পুৰুষেৰ সাথে মুসলমান জিন নারীৰ বিবাহেৰ কৱেকতি
ঘটনাও বৰ্ণিত হয়েছে এবং তাদেৱ সন্তানাদি জন্মগ্রহণেৰ কথাৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে।
বিবাহকাৰী বিলকীসেৰ পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক
আলোচনাৰ প্ৰয়োজন নেই। তাৰ কৰ্ম দ্বাৰা এই বিবাহেৰ বৈধতা-অবৈধতা প্ৰমাণ কৰা
যায় না। শৰীয়তে সন্তান পিতাৰ সাথে সমৰুক্ত হয়। বিলকীসেৰ পিতা মানব ছিল। তাই
বিলকীস মানবনদিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়ায়েতে সুলায়মান (আ)
বিলকীসকে বিবাহ কৰেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বাৰা জিন নারীকে বিবাহ কৰাৰ
বৈধতা প্ৰমাণ কৰা যায় না। কাৰণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আ)-এৰ
বিবাহ সম্পর্কে আৱণ বৰ্ণনা পৱে আসুছে।

নারীৰ জন্য বাদশাহ হওয়া অখিলা কোন সম্প্রদায়েৰ মেঝী ও শাসক হওয়া জায়েয
কি না ? সহীহ বুখৰীতে হয়ৱত ইবনে আবুস (ৱা) থেকে বৰ্ণিত আছে, পারস্যবাসীৱা
তাদেৱ সন্ধাটেৰ মৃত্যুৱ পৱ তাৰ কল্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত কৰেছিল। রাসূলপ্ৰাহ
(সা) এ সংবাদ জনাব পৱ মন্তব্য কৰেছিলেন, قوم ولوا أمرهم امرأة لن يبلغن، অর্থাৎ যে জাতি
তাদেৱ শাসনক্ষমতা একজন নারীৰ হাতে সম্পৰ্ণ কৰেছে, তাৱা কখনও সাফল্য লাভ

করতে পারবে না । এ কারণেই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্ত্ত্ব, বিলাহত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না ; বরং নামাযের ইয়ামতির ন্যায় বৃহৎ ইয়ামতি অর্থাৎ শাসনকর্ত্ত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত । বিলক্ষিসের সন্ত্বাজী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রয়োগিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রয়োগিত না হয় যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) বিলক্ষিসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন । একথা কোম সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রয়োগিত নেই ।

—أَوْتَبِعْتُ مِنْ كُلْ شَيْءٍ—অর্থাৎ কোন সন্ত্বাট ও শাসনকর্ত্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল । সেই যুগে যেসব বস্তু অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয় ।

—رَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٍ—আবশ্যের শান্তির অর্থ রাজসিংহাসন । হ্যরত ইবলে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলক্ষিসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকৃত ও অণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখন্ডিত ছিল । তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের । একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল ।

—جَذَّبَنَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ—এতে জানা গেল যে, বিলক্ষিসের স্বাদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল । তারা সূর্যের ইবাদত করত । কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল ।—(কুরুতুবী)

—صَدَفُمْ عَنِ السَّبِيلِ زَيْنَ لَئِمُ الشَّبِطَانِ أَلْأَسْنَجُونَ—এর সাথে । অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিষ্পত্ত করল যে, আল্লাহকে সিজদা করবে না ।

—لَهُمْ بِكَثَارِيٍّ إِذْنَبْ—হ্যরত সুলায়মান (আ) সাবার সন্ত্বাজীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলীল সম্পর্ক করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন । এতে বুধা গেল যে, সাধারণ কাজকারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রয়োগ । যেক্ষেত্রে শরীয়তসম্বন্ধ সাক্ষ্যপ্রয়োগ জরুরী, ফিকাহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পতাকে যথেষ্ট মনে করেননি । কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না । সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে । এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে । এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না ।

—مُশَرِّكِينَ هُدَى وَ سَبَقَهُمْ مَا نَهَى—হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাস 'আলা এই প্রয়োগিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশর্ক ও কাফিরদের কাছে পত্র লেখা জায়েস । সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কাফিরদের কাছে পত্র লেখা প্রয়োগিত আছে ।

—كَافِرِينَ هُدَى وَ سَبَقَهُمْ مَا نَهَى—হ্যরত সুলায়মান (আ) হৃদয়কে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও পিছে দিলেন বে, সন্ত্বাজীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার

হয়ে থাকবে না, এবং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় যজ্ঞলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَالَتْ يَا يَهُهَا الْمَلَوْا إِنِّي أُقْرَأَ إِلَيْكَ كِتَبَ كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَا تَعْلُوْ أَعْلَىَ وَأَنْتُنِي مُسْلِمُونَ ۝ قَالَتْ
يَا يَهُهَا السَّلَوْا أَفْتَوْنِي فِي أَمْرِي ۝ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ
تَشَهَّدُونَ ۝ قَالُوا نَحْنُ أُولُوْ أَقْوَةٍ ۝ وَأُولُوْ أَبَاسٍ شَهِيدُهُ ۝ وَالْأَمْرُ إِلَيْكُ
فَانْظُرْ ۝ مَاذَا أَتَأْمِرُنَ ۝ قَالَتْ رَأَيْتُ السُّلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعْزَةَ أَهْلِهَا أَذْلَةً ۝ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ
إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنُظْرَةٌ بِعِرْجَمِ الْمُرْسِلِونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ
أَتَمْلَأُنَّ بِسَلَلٍ فِيمَا أَتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّنْ أَتَكُمْ ۝ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ ۝ إِرْجَمِ الْيَهِيمِ فَلَمَّا تَيَّنَّتْهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبْلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنْ خَرْجَنَهُ
مِنْهَا أَذْلَةً وَهُمْ صَغِرُونَ ۝

- (২৯) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে।'
- (৩০) সেই পত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : 'অঙ্গীকৃত দাতা, পরম দর্শালু আঙ্গীকৃত নামে তুম ; (৩১) আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যক্তিগতে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত ঘৃহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, 'আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর বোকা। এখন সিদ্ধান্ত ঘৃহণের ক্ষমতা আগন্তুরই। অতএব আপনি কেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহুরা যখন কোন জনপদে অবৈশ করে, তখন তাকে বিপর্শন করে দেব। এবং সেখানকার স্তুতি ব্যক্তিবর্গকে অপদষ্ট করে। তারাও এরূপই করবে।' (৩৫) আমি ডাঁৰ কাছে কিছু উপচৌকন পাঠাই ; দেবি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতঃপর যখন দৃত সুলাইমানের কাছে আগমন করল, তখন সুলাইমান বললেন, মা'আরেফুল কুরআন (৬৪) — ৭২

তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে অদ্বৃত বস্তু থেকে উত্তম । বরং তোমরাই তোমাদের উপটোকল নিয়ে সুবৃত্তি ধাক । (৩৭) কিরে যাও তাদের কাছে । এখন অবশ্যই আমি তাদের বিকলে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই । আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদ্রুত করে সেখান থেকে বহিত্বত করব এবং তারা হবে শার্হিত ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সুলায়মান (আ) হৃদয়দের সাথে এই কথাবার্তার পর একথানা পত্র লিখলেন, যার বিষয়বস্তু কোরআনেই উপস্থিতি আছে । পত্রটি তিনি হৃদয়দের কাছে সমর্পণ করলেন । হৃদয়দ পত্রটিকে চতুর্ভুজে নিয়ে রওয়ানা হলো এবং একাকিনী বিলকীসের কাছে অথবা মজলিসে অর্পণ করল ।) বিলকীস (পত্র পাঠ করে পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য ডাকল এবং) বলল, হে পারিষদবর্গ, আমার কাছে একটি পত্র (যার বিষয়বস্তু খুবই) সম্মানিত (এবং মহান) অর্পণ করা হয়েছে । (শাসকসূলভ বিষয়বস্তুর কারণে সম্মানিত বলা হয়েছে । পত্রটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সন্তোষ অলংকারপূর্ণ ছিল ।) এই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই, (প্রথমে) বিসিমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, (এরপর বলা হয়েছে) তোমরা (অর্থাৎ বিলকীস এবং জনগণসহ পারিষদবর্গ) আমার মুকাবিলায় অহমিকা করো না এবং বশ্যতা দ্বীকার করে আমার কাছে চলে আস । [উদ্দেশ্য সবাইকে দাওয়াত প্রদান । তারা হয়তো সুলায়মান (আ)-এর অবস্থা পূর্বেই অবগত ছিল, যদিও সুলায়মান (আ) তাদের অবস্থা জানতেন না । আরই এখন হয় যে, বড়ো ছেটদেরকে চেনে না এবং ছেটো বড়দেরকে চেনে । কিংবা পত্র আসার পর জেনে থাকবে । গত্তের বিষয়বস্তু অবগত করার পর] বিলকীস বলল, হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও (যে, সুলায়মানের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত) আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে (কখনও) কোন কাজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না । তারা বলল, আমরা (সর্বান্তকরণে উপস্থিত আছি । যদি যুদ্ধ করা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তবে আমরা) বিগাট শক্তিধর এবং কঠোর যোদ্ধা । অতঃপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই । অতএব আপনিই তোবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন । বিলকীস বলল, (আমার মতে যুদ্ধ করা উপযোগী নয় । কেননা সুলায়মান একজন বাদশাহ । আর) রাজা-বাদশাহগণ যখন কোন জনপদে (বিরোধী মনোভাব নিয়ে) প্রবেশ করেন, তখন বিপর্যক্ত করে দেন এবং সেখানকার সন্ত্বান্ত ব্যক্তিবর্গকে (তাদের শক্তি খর্ব করার জন্য) অপদ্রুত করেন । (তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে সন্ত্ববত তারা জয়লাভ করবে । তখন) তারাও একেপাই করবে । (অতএব অনর্থক পেরেশানী ভোগ করা উপযুক্ত নয় । কাজেই যুদ্ধ তো আপাতত মূলতৰী থাকবে এবং সমীচীন এই যে,) আমি তাঁর কাছে কিছু উপটোকল (কোন ব্যক্তির হাতে) পাঠাইছি, অতঃপর দেখব, প্রেরিত লোক (সেখান থেকে) কি জওয়াব নিয়ে আসে । (তখন যুদ্ধের বিষয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা হবে । সেমতে উপটোকল প্রস্তুত করা হলে দৃত তা নিয়ে রওয়ানা হলো) । যখন দৃত সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌছল, (এবং উপটোকল পেশ করল) তখন সুলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি (অর্থাৎ বিলকীস ও পারিষদবর্গ) ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য

করতে চাও? (তাই উপটোকন এনেছে যনে রেখ,) আস্তাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা শতগুনে উভয়, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। (কেননা, তোমাদের কাছে কেবল দুনিয়া আছে, আর আমার কাছে দীন ও দুনিয়া উভয়টিই আছে এবং দুনিয়া তোমাদের চাইতে অনেক অধিক আছে। কাজেই আমি এগুলোর প্রতি লোভ করি না।) তোমরাই তোমাদের উপটোকন নিয়ে উৎকৃষ্ট বোধ কর (সুতরাং এই উপটোকন আমি প্রহপ করব না)। তোমরা (এগুলো নিয়ে) তাদের কাছে ফিরে যাও। (তারা এখনও ইয়ান আললে সবই ঠিক। নজুব) আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি তাদেরকে সেখান থেকে অপদস্থ করে বের করে দেব এবং তারা (গাঙ্গনা সহকারে চিরতরে) পদানত (ও প্রজা) হয়ে যাবে (এরপ নয় যে, বের করার পর স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। বরং চিরকাল গাঙ্গনা তাদের কষ্টহার হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— قَالَتْ يَأْيُهَا النَّلَّا إِنِّي أَقْرِبُ إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ — এর শাব্দিক অর্থ সম্মানিত, সন্তুষ্ট। সাধারণ বাকগুচ্ছতিতে কোন পত্রকে তখনই সন্তুষ্ট বলা হয়, যখন তা মোহর্ণিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে **كتاب كريم** এর তফসীর হয়রত ইবনে আবুস, কাতাদাহ, মুহায়র অমুখ ‘মোহর্ণিত পত্র’ মোহর্ণিত পত্র, দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হয়রত সুলায়মান (আ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অক্ষিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল (সা) যখন অন্যান্য বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সর ও কিসরার পত্রে মোহর অক্ষিত করে দেন। এতে বুঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অক্ষিত করা প্রাপক ও দীর্ঘ পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনডিলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনডিলাপে পুরো প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল ; হয়রত সুলায়মান (আ) আরব ছিলেন না ; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বুঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহুগুলোর বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা যেতে অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে সুলায়মান (আ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ধৃত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সজ্ঞবনাও উরিয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। —(জহুল মা'আনী)

— أَنْهُ مِنْ سَلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ — কোরআন পাক মানবজীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েন। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারম্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি উন্মত্তপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার স্ত্রাজী বিলকীসের নামে হয়রত সুলায়মান (আ)-এর পত্র আদ্যোপাস্ত উন্মেশ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উন্মত্ত আদর্শ হিসেবে উন্মত্ত

করেছে। তাই এই পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর আপকের ১ এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পঞ্চটি সুলায়মান (আ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। আপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটিকুল জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পরম্পরাগতের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে-একেপ খোজার্থে করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পছাই অবজ্ঞন করেছেন। তিনি منْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَكْثَرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ حَمْدٍ

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অঞ্চে থাকলে তা আপনির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উত্তাদ, পীর অথবা কোন মূরব্বির কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অঞ্চে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার একেপ করা উচিত কি না? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম ধারা বিভিন্ন রূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্নতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বয়ৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অঞ্চে রেখেছেন। কৃত্তল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হ্যরত আনাস (রা)-এর এই উচ্চি উদ্ধৃত করা হয়েছে:

ما كان أحد اعظم حرمة من رسول الله ﷺ وكان اصحابه اذا كتبوا
الب كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على
ماروى -

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাইতে অধিক সশ্বানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে আলামী হায়রামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ দেয়।

তবে কৃত্তল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উভয় অনুসূত্য সম্পর্কে-বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয়। ফকীহ আবুল লাইস 'বুত্তান' ঘষে বলেন, যদি কেউ আপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিষ্ট নেই। কেননা, মুসলিম সম্পদায়ের মধ্যে এই পছাই নির্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পরম্পরাগতের সুন্নত: তফসীরে কুরআনীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেওয়া সময়টিন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হ্যরত ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।—(কুরআনী)

চিঠিপত্রে বিস্মিল্লাহ লেখা ও হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টি প্রয়াণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে ‘বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লেখা পরমগুরগণের সুন্নত। এখন বিস্মিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখিবে, না পরে, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রাবলী সাক্ষ দেয় যে, বিস্মিল্লাহ সর্বাপ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখিবে। কোরআন পাকে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্লাহুর পরে লিখিত আছে। বাস্তু এ থেকে বিস্মিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়ামীদ ইবনে কুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হ্যরত সুলায়মান (আ) অকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْيَهِيْقِينِ ابْنَةِ ذِي

شَرْحٍ وَقُومَهَا - ان لاتعلوا الخ

বিলকীস তাঁর সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উল্লিখিত উদ্ভৃত হয়েছে। সুলায়মান (আ)-এর আসল পত্রে বিস্মিল্লাহ আগে ছিল, না পরে, কোরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সত্ত্বপূর্ব যে, সুলায়মান (আ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিস্মিল্লাহ দ্বারা তরঙ্গ করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর নাম অঞ্চ উল্লেখ করেছে।

আস'আলা : প্রত্যেক পত্রের শুরুতে বিস্মিল্লাহ লেখাই পত্র-লিখনের আসল সুন্নত। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহুর বর্ণনা ও ইঙ্গিত থেকে ফিকাহবিদগণ এই সামগ্রিক নীতি লিপিবদ্ধ করেছেন যে, যে স্থানে বিস্মিল্লাহ অথবা আল্লাহ তা'আলার কোন নাম লিখিত কাগজকে বেয়াদবি থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেই, বরং পাঠান্তে যত্নত ফেলে রাখা হয়, সেখানকার পত্রে বিস্মিল্লাহ অথবা আল্লাহ তা'আলার কোন নাম লেখা জায়েয নয়। লিখলে লেখক বেআদবীর ঘনাহে শরীর হয়ে যাবে। আজকাল মানুষ একে অপরকে যেসব চিঠিপত্র লেখে, সেগুলোকে সাধারণত আবর্জনায় ও নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই সুন্নত আদায় করণার্থে মুখে বিস্মিল্লাহ বলে দেওয়া এবং কাগজে লিপিবদ্ধ না করা সমীচীন।

কোরআনের আয়াত সংশ্লিষ্ট লেখা কোন কাফির ও মুশর্রিকের হাতে দেওয়া জায়েয কি ? উপরোক্ত পত্র হ্যরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিত ছিল। এতে বুঝা গেল, এরপ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব অন্যান্য বাদশাহুর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশর্রিক ছিল। তাঁর পত্রে কোরআনের কোন কোন আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কোরআন পাক কোন কাফিরের হাতে দেওয়া জায়েয নয়; কিন্তু যে এস্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোন আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিস্থিতায় তাকে কোরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কোরআনের অনুকূল হবে না। এরপ এস্থ কাফিরের হাতেও দেওয়া যায় এবং শুধু ছাড়াও স্পর্শ করা যায়।—(আলমগিরী)

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাষ্পূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মল্পশী হওয়া উচিত ; হয়রত সুলায়মান (আ)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েক লাইনের মধ্যে সব শুরুত্বপূর্ণ ও জন্মবী বিষয়বস্তু সন্তুরেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কফিরের মুকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শুণকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহু তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলী ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আজ্ঞাতরিতার নিকাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কোরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হয়রত কাতাদাহ বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই।—(ঝুঁট মা'আনী)

শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত। এতে অপরের অভিযোগ দ্বারা উপকৃত
فَإِنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ فِي أَمْرٍ فَقُوْنِيْ فِيْ أَمْرٍ
মাক্ত— শব্দটি ফেনো থেকে উত্তৃত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বুঝানো হয়েছে। স্বার্জী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র পৌছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত ! সে তাদের অভিযন্ত জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যাতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রণয় করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্থীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল :
نَحْنُ أُولَئِكُوْ وَأُولَئِكُوْ بَاسٌ
—شীর্ষের ও অন্তর্দেশের স্থান— হয়রত কাতাদাহ বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের মেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ প্রাপ্তের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ শুরুত্ব দান করেছে এবং রাস্তার কর্মচারীদেরকে পরামর্শ প্রাপ্তের বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে শুরী আগমন করল এবং তিনি আল্লাহুর নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ প্রাপ্তের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না ; কিন্তু উচ্চতের জন্য সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে,
وَشَارِفُهُمْ فِي الْأَمْرِ
—অর্থাৎ আপনি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কিরামের সম্মতি বিধান করা হয়, অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাক্ষিদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া ও রাস্তার অমাত্যবর্গকে পরামর্শ শরীক করে তাদের সহযোগীতা অর্জন করার পর স্বার্জী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল : হয়রত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহুর পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহুর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সন্ত্রাট ? এই পরীক্ষা দ্বারা

বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদের দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মুকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পক্ষতি সে এইরূপ হ্রির করল যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে কিছু উপটোকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপটোকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বুঝা যাবে যে, তিনি একজন সন্ত্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ইমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হ্যরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : *إِنَّ مُرْسَلََ إِلَيْهِمْ بِهِدْيَةٍ فَنَظَرُوا لِمَ يَرْجِعُونَ—الْمُرْسَلُونَ*—অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপটোকন পাঠাইছি। এরপর দেখব যেসব দৃত উপটোকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের দৃতদের উপস্থিতি : ঐতিহাসিক ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দৃত ও উপটোকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টাকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপটোকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য, একশ' ত্রীতদাস এবং একশ বাঁদী ছিল। কিছু বাঁদীদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ত্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। উপটোকন নির্বাচনেও তাঁর পরীক্ষা কাম্য ছিল। হ্যরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা দৃতদের পৌছার পুরৈই উপটোকনসমূহের পূর্ণ বিবরণ বলে দিয়েছিলেন। সুলায়মান (আ) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরস্থ অর্ধাং প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-ঝপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অঙ্গুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্মদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। তাদের প্রদ্বাৰ পায়খানাও যেন সোনা-ঝপার বিছানার উপর হয়। এমনিভাবে তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্ন সহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পাতিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দৃতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্মদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপটোকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ত্রিয়ম্বণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানেই ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল দুই দিকে জীবজন্ম ও বিহংগকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহুল হয়ে পড়ল। কিছু যখন তারা দরবারে হ্যরত সুলায়মান (আ)-এর সামনে হায়ির হলো, তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিছু তাদের উপটোকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন।—(কুরুতুবী—সংক্ষেপিত)

فَلَمْ يَنْدُونَ بِمَا أَنْتَ فَمَا أَنْتَ
أَكْبَرُ مَنْ أَنْتَ إِنْ يَهْدِي إِنْ كُمْ
—اللّٰهُ خَيْرٌ مَّا أَنْتَ—অর্থাৎ যখন বিলকীসের দৃত উপটোকন নিয়ে সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌছল, তখন তিনি দৃতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আশ্চর্য যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগে বেশে। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ করব না। এগুলো কেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটোকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফিরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয কি না? : হ্যরত সুলায়মান (আ) সন্ত্রাঙ্গী বিলকীসের উপটোকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফিরের উপটোকন কবুল করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাস'আলা এই যে, কাফিরের উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিস্তৃত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফিরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয়।—(রহুল মা'আলী) হ্যাঁ, যদি উপটোকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফির বাস্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফিরের উপটোকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুধারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হ্যরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার তাই আমের ইবনে মালিক কাফির মুশরিক অবস্থায় কোন ধর্মীজনে মনীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে দুইটি অশ এবং দুইটি বন্দুজোড়া উপটোকন হিসাবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপটোকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপটোকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে আশ্চর্য তাঁ'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে একপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন মুশরিকের উপটোকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনেক খ্রিস্টান একটি অভ্যর্জন রেশমী বন্ধ উপটোকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ভৃত করে শামসূল-আয়েশা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কারও কারও উপটোকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটোকন কবুল করেছেন। —(উমদাতুল কারী)

বিলকীস উপটোকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপটোকন কবুল করা জায়েয নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘৃষ হিসাবে উপটোকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

قَالَ يَا يٰ إِنَّهَا الْمُلْوَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِيُنِي بِعِرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمٌ ⑥
 عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوْيٌ أَمِينٌ ⑦ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِيكَ بِهِ
 قَبْلَ أَنْ يُرْتَلَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ طَلَّمَسَاهُ مُسْتَقْرًا عِنْدَهُ قَالَ
 هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَطْلِي لِيَلُوِي إِشْكُورُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرْ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ⑧ قَالَ نَكِرُوا
 لَهَا عِرْشَهَا نَظَرًا تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ⑨

(৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ ‘তারা আস্তসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ?’ (৩৯) জনৈক দৈত্য জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বাস । (৪০) কিটাবের জ্ঞান দ্বার হিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পদক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব । অতঃপর সুলায়মান বখন তা সামনে রাখিত দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুরূপ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি । যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে সিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমূল্ক, কৃগাশীল । (৪১) সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সাহনে তার সিংহাসনের আকার আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বৃক্ষতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, বাদের দিশা নেই ?

তাকসীরের সার-সংক্ষেপ

(যোটকথা, দৃতরা তাদের উপটোকল নিয়ে ফিরে গেল : এবং আদ্যোগাত্মকতাতে বিলকীসের কাছে বর্ণনা করল । অবস্থা শুনে বিলকীসের পূর্ব বিশ্বাস হলো যে, তিনি একজন জ্ঞানী-শুণী পয়গম্বর । সেবতে তাঁর দরবারে হায়ির হওয়ার জন্য সে দেশ থেকে রওয়ানা হলো ।) সুলায়মান (আ) শহীর সাধ্যমে কিংবা কোন পরীক্ষার সাহায্যে তার রওয়ানা হওয়ার কথা জানতে পেরে) বললেন, হে পারিষদবর্গ, তারা আস্তসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে আর (বিলকীসের) সিংহাসন আমাকে এনে দেবে ? (আস্তসমর্পণের কথাটি বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে । কেননা তারা এই মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৭৩

উদ্দেশ্যেই আগমন করছিল । সিংহাসন আনার উদ্দেশ্য সত্ত্বত এই ছিল যে, তারা তাঁর মু'জিয়াও দেখে নিক । কেননা এত বিরাট সিংহাসন এত কঠোর পাহারার মধ্য থেকে নিশ্চুণে নিয়ে আসা মানবশক্তি বহির্ভূত ব্যাপার । এটা জিন অনুগত হওয়ার কারণে হয়ে থাকলে জিন অনুগত হওয়াও তো একটি মু'জিয়াই । যদি উচ্চতের কোন ওলীর কারামতের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তবে ওলীর কারামতও পয়গবরের একটি মু'জিয়া । কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে হয়ে থাকলে সেটা যে মু'জিয়া, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না । মোটকথা, সর্বাবস্থায় এটা মু'জিয়া ও নবৃত্যতের প্রমাণ । উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা অভ্যন্তরীণ উণ্বাবলীর সাথে সাথে এই এই মু'জিয়ার উণ্বাবলীও দেখুক, যাতে ইয়ান ও বিশ্বাস গাঢ় হয় ।) জনেক দৈত্য জিন (জওয়াবে) আরয করল, আপনি আপনার এজলাস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং (যদিও তা খুব ভারী ; কিন্তু) আমি এ কাজের (অর্ধাং তা এনে দেওয়ার) শক্তি রাখি (এবং যদিও তা মূল্যবান ও মোতি দ্বারা সজ্জিত : কিন্তু আমি) বিশ্বত (এতে কোনরূপ বিয়ানত করব না ।) যার কাছে কিতাবের (অর্ধাং তা ওরাতের কিংবা কোন প্রশ্নী প্রষ্ঠার, যাতে আল্লাহর নামের প্রভাবাদি হিল) জ্ঞান ছিল [অধিক সঙ্গত এই যে, এখানে স্বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে ।] সে (সেই জিনকে) বলল, (তোর শক্তি তো এতটুকুই) আমি চোখের পলক মারতে মারতে তা তোর সামনে এনে হায়ির করতে পারি । (কেননা মু'জিয়ার শক্তি বলে আনব । যে অতে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন । অমনিতেই কিংবা কোন “ইসমে ইলাহী”র মাধ্যমে সিংহাসন তৎক্ষণাং সামনে বিদ্যমান হয়ে গেল ।) সুলায়মান (আ) যখন তা সামনে রাক্ষিত দেখলেন, তখন (আনন্দিত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য) বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ (যে, আমার হাতে এই মু'জিয়া প্রকাশ পেয়েছে), যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না (আল্লাহ না করুন) অকৃতজ্ঞ হই । যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাতে (আল্লাহ তা'আলার কোন উপকার নেই) এবং (এমনিভাবে) যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (সে-ও নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই । কেননা) আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল । (এরপর) সুলায়মান (আ) বিলক্ষিসের বৃক্ষ পরীক্ষা করার জন্য) আদেশ দিলেন, তার জন্য (অর্ধাং তার বৃক্ষ পরীক্ষা করার জন্য) তার সিংহাসনের আকৃতি বদলিয়ে দাও (এর উপায় অনেক হতে পারে । উদাহরণত মোতির জায়গা পরিবর্তন করে দাও কিংবা অন্য কোন ভাবে) দেখব, সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের (এ ব্যাপারে) দিশা নেই । (প্রথমাবস্থায় জানা যাবে যে, সে বুক্ষিমতী । ফলে সত্য কথা বুঝাবে বলে অধিক আশা করা যায় । তার সত্য বুঝাবার প্রভাব দ্রু পর্যন্ত পৌঁছবে । প্রেরোক্ত অবস্থায় তার কাছ থেকে সত্য বুঝাব আশা করই করা যায়) ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর সরবরারে বিলক্ষিসের উপাহিতি : কুরআনী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলক্ষিসের দৃতগত নিজেরাও ভীত ও হতভব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল । সুলায়মান (আ)-এর মুদ্র ঘোষণার কথা শনিয়ে দিলে বিলক্ষিস তার সম্মানায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে সুলায়মান দুনিয়ার স্ম্রাটদের ন্যায় কোন স্ম্রাট নন;

বরং তিনি আল্লাহ'র কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহ'র পয়গম্বরের বিরক্তে যুদ্ধ করা আল্লাহ'র বিরক্তে যুদ্ধ করার নামাঞ্চর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির ইওয়ার প্রস্তুতি দেন করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ' তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজেস করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহ'র নবী সন্ন্যাজী বিলকীস সদস্যবলে আগমন করছেন। কোন কোন রেওয়ারেতে আছে, তখন সে সুলায়মান (আ)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্ধাং প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সঙ্ঘোধন করে বললেন :

بِكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعْرَشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ

সুলায়মান (আ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুক্ত হয়ে আস্তসম্পর্গ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শাস-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসূলত মুঝিয়াও প্রত্যক্ষ করুন। এটা তাঁর বিশ্বাস হ্রাপনে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ' তা'আলা জিন বশীভৃত রাখার সাধারণ মুঝিয়া দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ' তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তাঁর সিংহাসন কোনোরূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সঙ্ঘোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তাঁর সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অঙ্গস্তরে একটি সুরক্ষিত ঘরে তালাবক্ষ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আগন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ডেন্দে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী হালে পৌছে যাওয়া আল্লাহ' তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ' তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস হ্রাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যব্যবি ছিল যে, সুলায়মান (আ) আল্লাহ'র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

—**مُسْلِمِيْنَ — قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ —** এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আস্তসম্পর্গকারী। পরিভাষায় ইমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আবুস (রা)-এর ঘতে আভিধানিক অর্থ বুঝালো হয়েছে অর্ধাং আস্তসম্পর্গকারী, অনুগত। কারণ, তখন সন্ন্যাজী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাবা থেকে তাই বুঝা যায়।

—**عَلَى الَّذِي عَنْهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكَتَابِ**—অর্ধাং যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সত্ত্ববলা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

বয়ং সুলায়মান (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জিয়া এবং বিলকীসকে পয়গহস্তলভ মু'জিয়া দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদাহু প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কৃতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সুলায়মান (আ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ারেত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আয়ম' জানতেন। ইসমে আয়মের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চাবণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সুলায়মান (আ) ইসমে আয়ম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, সুলায়মান (আ) তাঁর এই মহান কৌর্তি তাঁর উপরতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা 'আরও বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্মোধন করে বলেছেন ।

মু'জিয়া ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জিয়ার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দর্শন থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِيٌ—কারামতের অবস্থাও হৃষি তদ্বপ।

এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দর্শন থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জিয়া ও কারামত—এ উভয়টিও মু'জিয়া ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাদীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওইর অধিকারী পয়গহস্তের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জিয়া বলা হয়। পক্ষান্তরে একপ কাজই নবী ব্যক্তিত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ারেত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সুলায়মান (আ)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর শুণাবলী তাঁর পয়গহস্তের শুণাবলীর প্রতিবিপ্র এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উচ্চতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গহস্তের মু'জিয়ারাপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনারের ঘটনা কারামত, মা'তাসারকুফ ? : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসারকুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসারকুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিপক্ষি প্রয়োগ করে বিশ্বাসকর কাজ প্রকাশ করা। এই জন্য নবী, ওলী এমনকি মুসলিমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুক্রম একটি প্রক্রিয়া। সূর্যী বৃহস্পতি মুরীদদের সংশোধনের নিষিদ্ধ মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গহস্তে তাসারকুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক এই তাসারকুফকে ।

ফলশ্রূতি বলেছে। এতে এই অধিই অঁথগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আওয়ামের ফল ছিল, যার তাসারক্ষকের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সম্ভাৰ্যবোধক।

—আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এমে দেব—আসিফের এই উকি থেকে বুৰা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসারক্ষকের আলামত। কেননা কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সম্পদের জওয়াব এই যে, সম্ভবত আল্লাহু তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুম ইচ্ছা করলে আমি এ কাজ এত স্ফুর্ত করে দেব।

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلُّ أَهْكَذَ اعْرُشُكَ قَالَتْ كَانَهُ هُوَ وَأُوتِينَا
 الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ④٢
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفَّارِينَ ④٣
 الصَّحْ حَفَلَّا رَأَتْهُ حِسْبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيْهَا قَالَ إِنَّهُ
 صَحْ مُرَدٌ مِنْ قَوَّابِرِهِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمْتُ
 مَمْ سُلَيْমَنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ④٤

(৪২) অতঃপর যখন বিলক্ষ্মীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এক্ষণ্টই ? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সম্ভত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহও হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহর পরিবর্তে সে বার ইবাদত করত, সেই তাকে ঈশ্বান থেকে নির্বৃত করেছিল। নিচয় সে কাফির সম্পদাম্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে ঘৰেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিগাত করল সে ধীরণা করল যে, এটা অচ জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো অচ ক্ষটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলক্ষ্মীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি ব্যুত্ত করেই। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আস্তসমর্পণ করলাম।

তফসীরের সাথ-সংক্ষেপ

[সুলায়মান (আ) সব ব্যবহাৰ সম্পন্ন কৰে বেঁধেছিলেন] অতঃপর যখন বিলক্ষ্মীস এসে গেল, তখন তাকে (সিংহাসন দেখিয়ে) বলা হলো, [সুলায়মান (আ) নিজে বলেছেন কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে বলিয়েছেন,] তোমার সিংহাসন কি এক্ষণ্টই ? সে বলল, হঁয়া

এক্ষণপই তো । (বিলকীসকে এক্ষণ প্রশ্ন করার কারণ এই যে, আসলের দিক দিয়ে তো এটা সেই সিংহাসনই ছিল, কিন্তু আকৃতি বদলিয়ে দেওয়া হয়েছিল । তাই এক্ষণ বলা হয়নি যে, এটা কি তোমার সিংহাসন? বরং বলা হয়েছে, তোমার সিংহাসন কি এক্ষণই? বিলকীস সিংহাসনটি চিনে ফেলে এবং আকার বদলিয়ে দেওয়ার বিষয়ও অবগত হয়ে যায় । তাই জওয়াবও জিজ্ঞাসার অনুরূপ দিয়েছে । সে এ কথাই বলল,) আমরা এ ঘটনার পূর্বেই (আপনার নবুয়তের বিষয়) অবগত হয়েছি এবং আমরা (তখন থেকেই মনেথাগে) আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি, যখন দূতের মুখে আপনার শুণাবলী জ্ঞাত হয়েছিলাম । সুতরাং মু'জিয়ার মোটেই প্রয়োজন ছিল না । যেহেতু মু'জিয়ার পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করা চূড়ান্ত বৃক্ষির পরিচায়ক, তাই আল্লাহ তা'আলা তার বৃক্ষিমতা ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সে বাস্তবিকই বৃক্ষিমতী নারী ছিল । তবে কিছুকাল সে বিশ্বাস স্থাপন করেনি; এর কারণ এই যে,) আল্লাহর পরিবর্তে যার পূজা সে করত, সেই তাকে (ঈমান থেকে) নিবৃত্ত করেছিল । (পূজার এই অভ্যাসের কারণ এই যে,) সে কাফির সম্মানের অন্তর্ভুক্ত ছিল । [সুতরাং সবাইকে যা করতে দেখেছে, সে তাই করেছে । জাতীয় অভ্যাস অনেক সময় মানুষের চিন্তা-ভাবনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু বৃক্ষিমতী হওয়ার কারণে সর্তর্ক করা যাই সে বুঝে ফেলেছে । এরপর সুলায়মান (আ) ইচ্ছা করলেন যে, মু'জিয়া ও নবুয়তের শান দেখানোর সাথে সাথে তাকে সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শুণকৃতও দেখানো দরকার, যাতে সে নিজেকে পার্থিব দিক দিয়েও মহান মনে না করে । তাই তিনি একটি ক্ষটিকের প্রাসাদ মির্মাণ করালেন এবং তার বারান্দায় চৌবাচ্চা তৈরি করালেন । তাতে পানি ও মাছ দিয়ে ভর্তি করে ক্ষটিক ধারা আবৃত করে দিলেন । ক্ষটিক এত ব্রহ্ম ছিল যে, বাহ্যত দৃষ্টিগোচর হতো না । চৌবাচ্চাটি এমন স্থানে নির্মিত ছিল যে, প্রাসাদে যেতে হলে একে অতিক্রম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না । এসব বন্দোবস্তের পর) বিলকীসকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর (সভ্বত এই প্রাসাদই অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল । বিলকীস চলল । পথিবিধে চৌবাচ্চা পড়ল ।) যখন সে তার বারান্দা দেখল, তখন সে তাকে পানিভর্তি (জলাশয়) মনে করল এবং (এর ভেতরে যাওয়ার জন্য কাপড় টেনে উপরে তুলল এবং) সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল । (তখন) সুলায়মান (আ) বললেন, এ তো (বারান্দাসহ সম্পূর্ণটুকু) ক্ষটিক নির্মিত প্রাসাদ । চৌবাচ্চাটিও ক্ষটিক ধারা আবৃত । কাজেই কাপড়ের অঁচল টেনে উপরে তোলার প্রয়োজন নেই ।) বিলকীস [জেনে গেল যে, এখানে পার্থিব কারিগরির অত্যাচর্য বন্ধুসমূহও এমন রয়েছে, যা সে আজ পর্যন্ত বচক্ষে দেখেনি । ফলে, তার মনে সবদিক দিয়েই সুলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল । সে বহুৎকৃতভাবে] বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি (এ পর্যন্ত) নিজের প্রতি যুলুম করেছিলাম (যে, শিরকে লিঙ্গ ছিলাম) । আমি (এখন) সুলায়মান (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ তাঁর অনুসূত পথে) বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি ? : এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল । এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে

কোরআন পাক নিশ্চৃণ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজেস করল, সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার **أَسْلَمَتْ مَعَ سَلْبِيْمَانَ لِلّهِ بْنَ الْمَلِمِ بْنَ** পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিয়াগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোজ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকবারা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাথে বিলকীস পরিষয়স্থে আবক্ষ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিমাসে হযরত সুলায়মান (আ) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের জন্য ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুগম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ شُوٰدَ أَخَاهُمْ صَلِحًا إِنَّ أَعْبُدُ وَا اللَّهُ فِي كَذَاهُمْ
فَرِيقٌ يَخْصِمُونَ ④٤١ قَالَ يَقُومٌ لَمْ تَسْتَعِجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۝ كُوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ④٤٢ قَالُوا إِلَيْنَا
إِنَّكُمْ وَبِمَنْ مَعَكُمْ قَاتَلَ طَرِيكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ④٤٣
وَكَانَ فِي السَّابِعِينَ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ④٤٤
قَالُوا تَقْسِمُوا بِاللَّهِ لِنَبِيَّنَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَا لَوْلَيْهِ مَا شَهَدْنَا مِنْهُ لَكَ
أَهْلِهِ وَإِنَا لَصَدِّقُونَ ④٤٥ وَمَكْرُوْمَكْرُوْمَكْرُوْمَكْرُوْمَأَوْهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ④٤٦
فَإِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لَا أَنْ دَمْرَنْهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ④٤٧
فَتِلْكَ بِيَوْمِهِمْ خَা وَيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذِلِكَ لَذِيْلَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ④٤٨
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ امْنَوْا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ④٤٩

(৪৫) আবি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। অতঃপর তারা বিধানিতক হয়ে বিতর্কে থ্রুত হলো।

(৪৬) সালেহ বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে স্মৃত অকল্যাণ

কামনা করছ কেন ? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন ? সত্যবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে ।' (৪৭) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাগের প্রতীক মনে করি ।' সালেহ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে ; বরং তোমরা এমন সম্পদার যাদেরকে পরিচাক করা হচ্ছে । (৪৮) আর সেই শহরে হিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশের অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না । (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরম্পরারে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাজ্ঞিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব । অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি । আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী । (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম । কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি । (৫১) অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিপাপ, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্পদারকে মাত্তানামুদ করে দিয়েছি । (৫২) এই তো তাদের বাড়িবর—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থার পড়ে আছে । নিশ্চয় এজে জ্ঞানী সম্পদারের জন্য নির্দশন আছে । (৫৩) যারা বিশ্বাস হাপন করেছিল এবং পরাইয়গার হিল, তাদেরকে আমি উভার করেছি ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সামুদ সম্পদারের কাছে তাদের (জাতি) ভাই সালেহকে (প্রয়গস্তর করে) প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা (শিরক ত্যাগ করে) আল্লাহর ইবাদত কর । (এমতাবস্থায় তাদের সবারই ঈমান আনা উচিত ছিল : কিন্তু এ প্রত্যাশার বিপরীতে) অতঃপর দেখতে দেখতে তারা দ্বিবিক্ষণ হয়ে বিতর্ক করতে লাগল । (অর্থাৎ একদল ঈমান আনল এবং একদল ঈমান আনল না । তাদের অধ্যে যেসব কথাবার্তা ও আলোচনা হয়, তার কিয়দংশ সূরা আ'রাকে বর্ণিত হয়েছে— এবং কিয়দংশ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে— তারা যখন কুকুর ত্যাগ করতে সম্মত হলো না, তখন সালেহ (আ) প্রয়গস্তরগণের ক্ষেত্রে অনুযায়ী তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন ; যেমন সূরা আ'রাকে আছে— قَالُوا إِنَّا مَسَالِحُنَا بِمَا تَعْدَنَا إِنْ فَوْمٌ فَيَأْخُذُنَّكُمْ عَذَابَ الْيَمِّ— এর পরিশেক্ষিতে) সালেহ (আ) বললেন, ভাই সকল, তোমরা সুরক্ষ (অর্থাৎ তওবা ও ঈমান)-এর পূর্বে দ্রুত আযাব কামনা করছ কেন ? (অর্থাৎ আযাবের কথা তখন ঈমান আনা উচিত ছিল ; কিন্তু তোমরা ঈমান আনার পরিবর্তে উল্টো আযাবই কামনা করে চলেছ । এটা খুবই ধৃতিতার কাজ । দ্রুত আযাব চাওয়ার পরিবর্তে) তোমরা আল্লাহর কাছে (কৃত ধেকে) ক্ষমা প্রার্থনা কর না কেন ; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (অর্থাৎ আযাব ধেকে নিরাপদ থাক) । তারা বলল, আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে অগত লক্ষণ মনে করি । (কারণ, যখন ধেকে তোমরা এই ধর্ম বের করেছ এবং তোমাদের এই দল সৃষ্টি হয়েছে, সেদিন ধেকেই জাতি বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনৈক্যের ক্ষতিকারিতা মাধ্বাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এসব অনিষ্টের কারণ তোমরা) । সালেহ (আ) জওয়াবে বললেন, তোমাদের এই অমঙ্গল (অর্থাৎ অঙ্গলের

কারণ) আল্লাহর গোচরীভূত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কুফরী কাজকর্ম আল্লাহ জানেন। এসব কাজকর্মের ফলেই অনিষ্ট দেখা দিয়েছে। বলা বাহ্য, সেই অনেকজয়ই নিন্দনীয়, যা সত্যের বিরোধিতা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং ইমানদারগণ এ জন্য অভিযুক্ত হতে পারে না, বরং কাফিররা দোষী হবে। কোন কোন তফসীরে আছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। তোমাদের কুফরের অনিষ্ট এখানেই শেষ হয়ে যায়নি,) বরং তোমরা এমন সম্পদায়, যারা (এই কুফরের কারণে) আব্যাবে পতিত হয়ে গিয়েছ। এই সম্পদায়ের মধ্যে কাফির তো অনেকেই ছিল ; কিন্তু দলপতি সেই শহরে (অর্থাৎ হিজরে) ছিল নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় (অর্থাৎ জনপদের বাইরে পর্যন্তও) অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াত এবং (সামান্যও) সংশোধন করত না। (অর্থাৎ কোন কোন দুর্ভিক্ষিকারী তো এমন যে, কিন্তু দুর্ভিক্ষিও করে এবং কিছু সংশোধনও করে ; কিন্তু তারা বিশেষ দুর্ভিক্ষিকারীই ছিল। তারা একবার এই অনর্থ করল যে) তারা (একে অপরকে) বলল, তোমরা পরম্পরে আল্লাহর নামে শপথ প্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে সালেহ (আ) ও তাঁর সংশ্লিষ্টবর্গের (অর্থাৎ মু'মিনগণের) উপর হানা দেব। অতঃপর (তদন্ত হলে) তার দাবিদারকে বলব যে, তার সংশ্লিষ্টদের (এবং স্বয়ং তার) হত্যাকাণ্ডে আমরা উপস্থিতিও ছিলাম না। (হত্যা করা দূরের কথা। এবং তাকীদের জন্য আরও বলে দেব) আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। (চাকুর সাক্ষিদাতা তো কেউ থাকবে না। ফলে বিষয়টি চাপা পড়ে যাবে।) তারা এক গোপন চক্রান্ত করেছিল (যে, রাত্রিবেলায় এ কাজের জন্য রওয়ানা হবে) এবং আমিও এক গোপন ব্যবস্থা করেছিলাম ; কিন্তু তারা টের পায়নি। (তা এই যে, পাহাড়ের উপর থেকে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাদের উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তারা সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। দুরুরে মনসূর) অতএব দেখুন তাদের চক্রান্তের পরিণাম। আমি তাদেরকে (উল্লিখিত উপায়ে) এবং তাদের (অবশিষ্ট) সম্পদায়কে (আসমানী আব্যাব ধারা) নাঞ্জানাবুধ করে দিয়েছি।) অন্য আয়াতে এ ঘটনা বর্ণিত আছে যেকে থেকে **فَأَخْذَتْهُمُ الرُّجْفَةُ وَأَخْذَ النِّينَ طَلَّبُوا الصِّنْعَةَ فَمَعَفَرُوا الْأَنْفَقَ** (পর্যন্ত।) এই তো তাদের বাড়িয়র জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের কুফরের কারণে (মকাবাসীরা শামের সকরে সেগুলো দেখতে পায়)। নিচ্য এতে জনীনের জন্য নির্দশন আছে। আমি ইমানদার ও পরহিয়গারদেরকে (পরিকল্পিত হত্যা থেকে এবং আল্লাহর আব্যাব থেকে) রক্ষা করেছি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রুফত—**شَدِّي**— শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই রুফত বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-পতিপন্নির কারণে সম্পদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে তিনি তিনি দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنْبَيْتَهُ وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لَوْلِيْمَ فَأَشَهَدْنَا مَهْلَكَ أَهْلَهُ وَأَنَا لَصَادِقُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অক্ষকালে তার উপর ও তার জাতিগোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে মাঝারেকুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৭৪

আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অক্কারে কে কাকে ঘোরেছে, তা আমরা নিদিষ্ট করে আনবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফিরদের এই বনামধ্যাত বাছাই করা বদমায়েশেরা কুফর, শিরক, হত্যা ও জৃঢ়নের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুযান করুন যে, মিথ্যা কত বড় শুনাহ। বড় বড় অপরাধীরাও আয়সম্ভান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে হিতীয় প্রণিধানমোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ (আ)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো সালেহ (আ)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যাত্মিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফির ছিল এবং কাফিরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ (আ) ও তাঁর বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু ধৰ্মাবশাসী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্মদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

وَلُوطٌ أَذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاجِحَةَ وَإِنْتُمْ تَبْصِرُونَ^(৫)
 أَيْشُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ^(৫)
 تَجْهَلُونَ^(৫) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهَا إِلَى لَوْطٍ مِّنْ
 قَرِبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَظَاهِرُونَ^(৫) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَاتُهُ زَ
 قَدْرَنَاهَا مِنَ الْغَيْرِينَ^(৫) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا هَفَّاسَةَ مَطَرٌ
 الْمُنْذَرِينَ^(৫) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلِّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أُصْطَفَيْ^(৫)
 اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا مَا يَشِيرُ كُونَ^(৫)

(৫৪) স্বরণ কর স্তৰের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অন্ধীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি কামতৃষ্ণির জন্য নারীদেরকে হেঢ়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্ষের সম্মদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, ‘স্তৰ পারিবারিকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা তখু পাক পবিত্র সাজতে চায়।

(৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পারিবারবর্গকে উজ্জ্বার করলাম তাঁর জ্বি ছাড়া। কেননা, তাঁর জন্য খন্সপ্রাণদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুহূর্তখারে বৃষ্টি। সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না ঘারাঞ্জক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে ! আল্লাহ না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (আমি) সূত (আ)-কে (প্রয়গস্থর করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম !) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি জেনে-তনে অঙ্গীল কাজ কর ? (তোমরা এর অনিষ্ট বুঝ না। অতঃপর এই অঙ্গীল কাজ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) তোমরা কি পুরুষদের সাথে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর নারীদেরকে ছেড়ে ? (এর কোন কারণ নেই;) বরং (এ ব্যাপারে) তোমরা (নিছক) মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাঁর সম্প্রদায় (এই বক্তব্যের) কোন (যুক্তিসংক্রত) জওয়াব দিতে পারল না—এ কথা ছাড়া যে, তারা পরম্পরে বলল সূত (আ)-এর লোকদেরকে (অর্থাৎ তাঁকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীগণকে) তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত কর। (কেননা) তারা বড় পাক-পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর (যখন ব্যাপার এতদূর গড়াল তখন) আমি (তাদের প্রতি আবাব নাহিল করলাম এবং সূতকে ও তাঁর জনদেরকে (এই আবাব থেকে) উজ্জ্বার করলাম তাঁর জ্বি ব্যৱীত। তাকে (ইমান না আনার কারণে (আমি খন্সপ্রাণদের মধ্যে অবধারিত করে রেখেছিলাম। (তাদের আবাব ছিল এই যে) আমি তাদের উপর নতুন এক প্রকার বৃষ্টি বর্ষণ করলাম (অর্থাৎ প্রত্তর বৃষ্টি)। অতঃপর তাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি কর মন্দ ছিল, যাদেরকে (পূর্বে আবাব থেকে) কর্তৃ প্রদর্শন করা হয়েছিল। তারা সেদিকে জ্ঞানে করেনি। আপনি (তাওহীদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভূমিকাস্থকপ) বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য (উপযোগী), এবং তাঁর সেই বান্দাগণের প্রতি শান্তি (অবজীর্ণ) হোক, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (অর্থাৎ নবী ও নেককার বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর তাওহীদের বিষয় বর্ণিত হচ্ছে : আপনি আমার তরফ থেকে বর্ণনা করলেন এবং লোকদেরকে জিজেস করলেন, তোমরাই বল তো, মহিমা মাহাজ্যে এবং অনুগ্রহে) আল্লাহ তা'আলাই উত্তম—না সে সকল পদার্থ (উত্তম) যাদেরকে (ইবাদতের যোগ্য মনে করে) আল্লাহ তা'আলার শরীক সাব্যস্ত করছ। (মেটিকথা, এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলাই উত্তম। সেবতে উপাস্য হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন একমাত্র তিনিই। অধিকতু দয়া ও ক্ষমতায় আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব কাফিররাও শীকার করতো। সুতরাং সকল কিছু থেকে শ্রেষ্ঠতর হওয়ার কারণে যে তিনিই ইবাদত-আরাধনা করার একমাত্র যোগ্য সভা, তা সাধারণ জ্ঞানেও ধরা পড়ে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই কাহিনী সশর্কে কোরআনের একাধিক জ্ঞানগায় বিশেষ করে সূরা আ'রাফে জরুরী বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। **فَلِأَنْفَسَهُ** পূর্ববর্তী প্রয়গস্থর ও তাদের উদ্দতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে করীম

(সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আগনীর উভ্যতকে দুনিয়ার ব্যাপক আয়াব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আল্লাহর মনোনীত বাসাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারণ কারণ মতে এই বাক্যটিও লৃত (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে **الَّذِينَ أَنْصَطُفَيْ** পয়গম্বরগণকেই বুঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে **وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ** বলা হয়েছে। হ্যুরাত ইবনে আকাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সউরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে **الَّذِينَ أَنْصَطُفَيْ** বলে সাহাবারে-কিরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্য 'আল্লায়াহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সুরা আহ্যাবের **صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُ** আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

মাস 'আলা : এই আয়াত থেকে খোতবার রীতিমীতিও প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পয়গম্বরগণের প্রতি দরদ ও সালাম দ্বারা খোতবা শুরু হওয়া উচিত। রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের সকল খোতবা এভাবেই শুরু হয়েছে। বরং প্রত্যেক শুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে আল্লাহর হাম্দ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি দরদ ও সালাম সুন্নাত ও মৌস্তাহাব।—(রহল মা'আনী)

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ دَأْنَزَ لِكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
 مَآءَ ؟ فَإِنْبَتَنَا بِهِ حَدَّاً يَقِنَّ ذَاتَ بَهْجَةٍ ؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا
 شَجَرَهَا كَعَاءَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ طَبَّلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ⑩ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ
 قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْلَهَا آنْهِرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
 الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا طَاءَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ طَبَّلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑪ أَمَّنْ
 يُحِبُّ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشَّوَّاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلْفَهَا الْأَرْضَ طَ
 طَءَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ طَقْلِيًّا مَّا تَنَزَّلَ كَرُونَ ⑫ أَمَّنْ يَهْدِي كُمْ فِي ظُلْمَتِ
 الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يَرِسُلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ طَ

ءَالَّهُ مَعَ اللَّهِ طَّعْلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑥٦٠ أَمَّنْ يَبْدَدُ الْخَلْقَ ثُمَّ
 يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَءَالَّهُ مَعَ اللَّهِ طَّقْلُ
 هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥٦١ .

(৬০) বল তো কে সৃষ্টি করেছেন নভোমগুল ও ভূমগুল এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি ; অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি । তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই । অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তারা সত্য বিচ্ছুর্য সম্পদায় । (৬১) বল তো কে পৃথিবীকে বাসোগয়োগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদনদী ধ্বনিহিত করেছেন এবং তাকে হির রাখার জন্য পর্যট স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অঙ্গরায় রেখেছেন । অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না । (৬২) বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের হস্তান্তিষ্ঠিত করেন, সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর । (৬৩) বল তো কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অক্ষকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন ? অতএব আল্লাহর অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক উর্ধ্বে । (৬৪) বল তো কে অথর্মাবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও মর্ত্য থেকে নিযিক দান করেন । সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, ﴿أَرْبَعَةٌ خَيْرٌ أَمْ أَمْأَشْرِكُونَ﴾ অর্থাৎ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না সেইসব প্রতিমা ইত্যাদি, যাদেরকে তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে ? এটা মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা বরং বক্রবুদ্ধিতার সমালোচনা ছিল । এরপর তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হচ্ছে : লোকসকল (তোমরা বল,) না তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি নভোমগুল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি, (নতুবা) তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করা তোমাদের দ্বারা সম্ভবপর ছিল না । (একধা শব্দে এখন বল,) আল্লাহর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার ঘোষ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু মুশরিকরা এর পরও মানে না,) বরং তারা এমন সম্পদায়, যারা (অপরকে) আল্লাহর সমভূল্য সাব্যস্ত করে । (আজ্ঞা, এরপর আরও শুণাবলী শব্দে বলল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি পৃথিবীকে (সৃষ্টি জীবের) বাসোগয়োগী করেছেন এবং তার মাঝে

মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তার (অর্থাৎ তাকে হির রাখার) জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন (যেমন সূরা ফুরকানে مَرْجَ الْبَخْرِين् বলা হয়েছে। এখন বল,) আল্লাহর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু মুশারিকরা মানে না,) বরং তাদের অধিকাংশই (ভালজুপে) বুঝে না। (আচ্ছা, আরও গুণবলী শুনে বল যে, এসব প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি নিঃসহায়ের দোয়া শৰণ করেন যখন সে তার কাছে দোয়া কুরে এবং (তার) কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কিন্তু) তোমরা অতি সামান্যই শরণ রাখ। (আচ্ছা, আরও গুণবলী শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থল ও জলের অক্ষকারে পথ দেখান এবং যিনি বৃষ্টির প্রাকালে বায়ু প্রেরণ করেন, যে (বৃষ্টির আশা দিয়ে মনকে) আনন্দিত করে। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার জন্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (কখনই নয়,) বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের শিরক থেকে উৎরে। (আচ্ছা, আরও গুণ ও অনুগ্রহ শুনে বল যে, এই প্রতিমা শ্রেষ্ঠ,) না তিনি, যিনি সৃষ্টি জীবকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং যিনি আকাশ ও মর্ত্য থেকে (বৃষ্টি বর্ষণ করে ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করে) তোমাদেরকে রিযিক দান করেন। (একথা শুনে এখন বল,) আল্লাহর সাথে (ইবাদতে শরীক হওয়ার যোগ্য) অন্য কোন উপাস্য আছে কি ? (যদি তারা একথা শুনেও বলে যে, অন্য কোন উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য আছে, তবে) আপনি বলুন, (আচ্ছা) তোমরা (তাদের ইবাদতের যোগ্যতার উপর) তোমাদের প্রয়াণ উপহিত কর, যদি তোমরা এ (দাবিতে) সত্যবাদী হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اضطِرَارٌ شَدِيدٌ مُضطَرٌ — أَمْنٌ بِجَبَبِ الْمُضْطَرِ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ — এর অর্থ কোন অভাব হেতু অপারক ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয়, যখন কোন হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে "مضطر" বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তার প্রতি নিনোয়েগী হয়। এই তফসীর সূচী, যুনুন মিসরী, সহল ইবনে আবদুল্লাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। (কুরআনী) রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন :

إِلَّهُمَّ رَحْمَنْتَكَ أَرْجُوا فَلَأَتَكْنِي إِلَى طَرْفَةِ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّا إِلَّا أَنْتَ
আল্লাহ, আমি আপনার রহমত আশা করি। অতএব আশাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।—(কুরআনী)

নিঃসহায়ের দোয়া একান্ত আনুষঙ্গিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় : ইয়াম কুরআনী বলেন, আল্লাহ তা'আলা নিঃসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোক্তারকারী

মনে করে দোয়া করা এখলাস। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এখলাসের বিরাট মর্তবা। মু'মিন, কাফির, পরাহিয়গার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছ থেকেই এখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহ্‌র রহমত নির্দিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল চেতের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডয়ান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ এখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উকার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দোয়া কবৃল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিঙ্গ হয়ে পড়ে। **دَعُوا اللَّهَ مُؤْلِمِينَ لَهُ الَّذِينَ** (এই পূর্বে নিয়ে আসেন তাদেরকে লিঙ্গ হয়ে পড়ে) এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবৃল হয়—এতে কোন সদ্দেহ নেই। এক, উৎপীড়িতের দোয়া, দুই, মুসাফিরের দোয়া এবং তিনি, সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উন্নত করে বলেন, এই দোয়াত্ত্বের মধ্যেও কবৃল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি যখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আজীয়বজ্জন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসূলভ স্বেহ-ময়তা ও বাত্সল্যের কারণে কখনও বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উকার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হয়রত আবু যর (রা)-এর জবানী রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ্‌র উকি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফির হয়। (কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম ; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবৃল হয়নি, তবে কুরআনের বশবতী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, যাবে যাবে দোয়া কবৃল হলেও রহস্য ও উপকারিভাবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগে কোন ঝটি আছে কি না। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الغَيْبَ رَلَا اللَّهُ طَوْمَا يَشْعُرُونَ
 أَيَّانَ يُبَعْثُونَ⑩ بَلْ اذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ هُمْ فِي شَلَّٰتِ
 مِنْهَا تَبَلَّهُمْ مِنْهَا عَمُونَ⑪ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا أَكَتُّا
 تُرْبَىٰ وَابْأَوْنَىٰ أَبْنَاهُنَا لَمْخَرْجُونَ⑫ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ

وَابَأْوُنَا مِنْ قَبْلٍ ۝ إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ
 سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَا
 تَحْزِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى
 هَذَا الْوَعْدُ ۝ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ۝ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدْفَ لَكُمْ
 بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوْنَ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 وَلِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ
 صُدُورُهُمْ وَمَا مَا يُعْلَمُونَ ۝ وَمَا مِنْ غَايَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

(৬৫) বলুন, আশ্চর্য ব্যতীত নভোমগল ও ভূমগলে কেউ গায়েবের ধরন জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে। (৬৬) বরং পরকাল সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে গেছে বরং তারা এ বিষয়ে সম্বেদ পোষণ করছে বরং এ বিষয়ে তারা অক্ষ। (৬৭) কাফিররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্যু হয়ে যাবে, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদা আশ হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দৃশ্যিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃস্থুল হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন অসত্ত্ব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিম্বাদংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অসত্ত্ব যা গোপন করে এবং যা ধর্কাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জ্ঞানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ক্ষেত্র নেই, যা সুস্পষ্ট কিভাবে না আছে।

তফসীরের সার্জ-সংক্ষেপ

পূর্বাপর সম্পর্ক ও নবুয়তের পর তাওহীদের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত ও পরকালের কথা বলা হচ্ছে। তাওহীদের প্রামাণ্যাদিতে বলে এর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতও করা হয়েছিল। যে যে কারণবশত কাফিররা কিয়ামতকে অবাক্তব বলত, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় জিঞ্চা করলেও বলা হয় না। এ থেকে বুরো যায় যে, এটা কোন কিছুই না। অর্থাৎ তারা অনির্ধারণকে অব্যাক্তবতার প্রমাণ মনে করছে। তাই এই বিষয়বস্তুকে এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাহ জানেন (عَلَّمَ لِلْأَنْبَيِّبِ) এতে আদেশ সন্দেহের জওয়াবও হয়ে গেছে—) কিয়ামত কূবে হবে, এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাহ জানেন। এরপর এর্দাবুল বলে তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিজ্ঞ সম্ভালোচ্ছা করা হয়েছে (إِذْنَنَ كَفَرُوا) অতঃপর (عَلَّمَ لِلْأَنْبَيِّبِ) যালে অর্কারের কারণে শাসানো হয়েছে এবং এই অর্কারের ডিঙ্গিতে রাজুল্লাহ (সা) কে ক্ষেত্রে বলে সামুলা দান করা হয়েছে। অতঃপর (وَقَوْلُوا) বলে শাসানো সম্পর্কে তাদের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং (إِنْ يَكُونُ مُعْلِمًا) বলে শাসানোর তাকীদ করা হয়েছে।

(তারা কিয়ামতের সময় নির্ধারণ না করাকে কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ মনে করে। এর জওয়াবে) আগনি বলুন, (এই প্রমাণ ভাস্ত।) কেবলা, (এ থেকে অধিক) পক্ষে এতটুকু জরুরী যে, আমার ও তোমাদের কাছে এর নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান অসুপস্থিত। সুজ্ঞারাং এ ব্যাপারে এরই কি বিশেষজ্ঞ? অদৃশ্য ও অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কে তো আমগুলি নীতি এই যে,) নভোগতল ও ভূজলের (অর্থাৎ বিশ্ব জগতের) কেউ গায়েবের খবর জানে না আল্লাহ যাতীত এবং (এ কারণেই) তারা (এ খবরও) জানে না যে, তারা কখন পুনরুৎস্থিত হবে। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তো বলা ছাড়াই সব কিছু জানেন এবং অন্য কেউ বলা ছাড়া কিছুই জানে না।) কিন্তু দেখ যাও যে, অনেক বিষয় পূর্বে জানা না থাকলেও সেগুলো বাস্তবে পরিষেত হয়। এতে জানা গেল যে, কেবল বিষয় জানা না থাকলে তার অতিভুলীমতা জরুরী হবে পড়ে না। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীয়া রহস্যের কারণে কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান ব্যবনিক্তার অন্তর্বলে রাখতে চান। কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ও এসব বিষয়ের অন্যতম। তাই মানুষকে এর জ্ঞান দান করা হয়েন। এতে এর অবাক্তবতা কিন্তু জরুরী হয়। সঠিক সময়ের জ্ঞান সা থাকা সবার পক্ষেই অভিন্ন বিষয়। কিন্তু অবিশ্বাসী কাফিররা শুধু নির্দিষ্টভাবে কিয়ামতকেই অমান্য করে না) বরই (তদুপরি) পরকাল সম্পর্কে তাদের (মূল) জ্ঞান নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। (অর্থাৎ স্বয়ং পরকালের বাস্তবতা সম্পর্কেই তারা জ্ঞান রাখে না, যা নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান না থাকার চাইতেও ক্ষত্রিয়) বরই (তদুপরি) তারা এ বিষয়ে (অর্থাৎ বাস্তবতা সম্পর্কে) সন্দিক। বরই (তদুপরি) এ বিষয়ে তারা অক্ষ কেবল পথ দেখে না, ফলে গত্ব্যহলে পৌছা অসম্ভব হয়, তেখন তারা চূড়ান্ত হস্তকরিতার কারণে পরকালের সত্ত্বায় বিতর্ক প্রামাণ্য সম্পর্কে চিন্তাবনাই করে না, ফলে হৃষাণাসি অদের দৃষ্টিগোচর হয় না, যদ্বারা উদিষ্ট বিষয় পর্যন্ত পৌছার আশা করা যেত। সুজ্ঞারাং এটা সন্দেহের চাইতেও শুরুতর। কারণ, সন্দিক যা আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৭৫

ব্যক্তি মাঝে মাঝে প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে সম্মেহ দ্বারা করে নেয়। তারা চিন্তাভাবনাই করে না। কাফিরদের এই বিরূপ সমালোচনার পর সম্মুখে তাদের একটি অবিশ্বাসযুক্ত উক্তি উচ্ছৃত করা হচ্ছে) কাফিররা বলে, যখন আমরা (মরে) মৃত্তিকা হয়ে যাব এবং (এমনিভাবে) আমাদের পিতৃপুরুষরাও, তখনও কি আমাদেরকে (করুর থেকে) পুনরুত্থিত করা হবে? এই ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং (মুহাম্মাদের) পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। (কারণ, সব প্রয়গস্থানের এই উক্তি সুবিদিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়নি এবং কবে হবে তাও কেউ বলেনি। এ থেকে জানা যাই যে,) এগুলো পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথাবার্তা। আপনি বলে দিন, (যখন এর সম্ভাব্যতা) সম্পর্কে ঘৃত্তি-প্রমাণ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ইতিহাসগত প্রমাণাদি স্থানে স্থানে বারবার তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে, তখন একে ধিখ্যারোপ করা থেকে তোমাদের বিরুদ্ধ হওয়া উচিত। সত্ত্বা অন্য ধিখ্যারোপকারীদের যে অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তৈমাদেরও তাই হবে। যদি তাদের দুর্ভবস্থা সম্পর্কে কোনোরূপ সম্মেহ হবে থাকে তবে) তোমাদের পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিপোজ কি হয়েছে। (কারণ তাদের অসংখ্যাত্ম হওয়া এবং আধার আসার ছিক এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে। এ সব সামগ্র্য উপদেশ সত্ত্বেও যদি তারা বিবেচিতাই করে যায়, তবে) তাদের কারণে আপনি দুর্ভিতি হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করছে, তজ্জন্যে যনঃকুর হবেন না। (কারণ, অন্যান্য প্রয়গস্থানের সাথেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। আরুণ আরুণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে যে শান্তিবাহী শোনানো হয়, এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তরে ইমান ঝাকাই কারণে) তারা (সির্জিকভাবে) বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এই (আধার ও গবেষণা) ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? আপনি বলুন, অঙ্গভূকি, তোমরা যে আধার দ্রুত কামনা করছে, তার ক্ষিয়দৎ তোমাদের লিকটেই পৌছে গেছে। (তবে এখন পর্যন্ত দেরি হওয়ার কারণ এই যে,) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল (এই ব্যাপক অনুগ্রহের কারণে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন) কিন্তু আদের অধিকাংশই (এ জন্যে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না (যে, বিলুপ্তকে সুযোগ মনে করে এতে সত্য অন্বেষণ করবে। এভাবে তারা আধার থেকে চিন্তাবৃক্ষ পেতে পারত। বরং তারা উচ্চ অবিশ্বাস ও পরিহাসের ভঙ্গিতে দ্রুত আধার কামনা করছে। এই বিকল যেহেতু উপকারিতাবশত তাই একই একই বৃক্ষ উচিত নয় যে, এসব কর্মের শান্তিই হবে না। কেননা) তাদের অন্তর যা গোপন করে, এবং যা অপ্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা অবশ্যই জানেন। (এটা শধু আল্লাহর জানাই নয়, বরং আল্লাহর দফতরে লিখিত আছে। তাতে শধু তাদের ক্রিয়া করবই নয়, বরং) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন তেজ নেই, লগহে মাহফুয়ে স্ব আছে। (এই লগহে মাহফুয় আল্লাহ তা'আলার দক্ষতা। কেউ জানে না, এখন সব গোপনভেদে যথব্য তাতে বিদ্যমান আছে, তখন রাস্তিক বিবরণসমূহ আরও উন্নয়নপে বিদ্যমান রয়েছে। যোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তাদের কুকর্ম অক্ষমত আছেন এবং আল্লাহ তা'আলা র দক্ষতারেও সংরক্ষিত আছে। এসব কুকর্ম সাজার দাবিদারণও। সাজা যে বাস্তবক্ষণ সাজ করবে এ সম্পর্কে প্রয়গস্থানগণ প্রদত্ত সত্য সংবাদগুলোও একমত ও অভিন্ন। এমতাবস্থায় সাজা হবে না—এখন পুরুষের অবকাশ আছে কি? তবে বিলু হওয়া সত্যবপর। সেবক্ষে অবিশ্বাসীদের কতক

শান্তি দূনিয়াতেও হয়েছে; যেমন দুর্ভিক্ষ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কবরে ও বরষাখে হবে, যা বেশি দূরে নয় এবং কিছু পরকালে হবে।

আনুবঙ্গিক জাতব্য বিষয়

—**لَيُنْبَلِّغُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْفَتْيَةُ أَلْأَنْ**—রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে। যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যক্তিত। আলোচ্য অয়াত পূর্ব ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিকল্পনাবাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ-এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও খরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সুরা আন-আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

—**بِلِ الدَّارِكَ عَلَمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بِلِ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ**—কেরাওয়াতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নাম উকি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীলের কিভাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতক্ষেত্রে বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীলকারক এডারক শব্দের অর্থ নিয়েছেন নিয়ে অর্থাৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং এডারক কে ফি-الآخرة এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সার্বান্ত করেছেন যে, পরকালের এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রতেকে বৃত্তির বর্জন পরিস্কৃট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে সাগবে না। কারণ, দূনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীলকারকের মতে এডারক শব্দের অর্থ এবং এডারক শব্দটি ফি-الآخرة এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেন।

**إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ
فِيهِ يُخْتَلِفُونَ ⑤ وَإِنَّهُ لَهُدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ⑥
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بِمَا تَحْكُمُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑦
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ⑧**

(৭৫) এই কোরআন বনী ইসরাইল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৬) এবং নিচিতভাবে এটা সুমিলদের জন্য হিদায়েত ও মহম্মত। (৭৭) আপনার পাশনকর্তা নিজ শাসনকূম্ভ অনুবাদী তাদের মধ্যে ফয়সালা

করে দেখেছে। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭১) অতএব আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিচের আপনি সত্য ও সুস্থ পথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচ্য এই কোরআন বনী ইসরাইল যেসব বিষয়ে ঘতভেদ করে, তার অধিকাংশ (অর্থাৎ অধিকাংশের স্বরূপ) তাদের কাছে বিবৃত করে এবং এটা মুমিনদের জন্য (বিশেষ) হিদায়াত ও (বিশেষ) বৃহমত। (ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে হিদায়াত এবং কলাফল ও পরিণামের ক্ষেত্রে রহমত)। নিচিতই আপনার পালনকর্তা নিজ বিচার অনুযায়ী (কার্যত) ফয়সালী তাদের মধ্যে (কিয়ামতের দিন) করবেন। (তখন জানা যাবে কোন্টি সত্য ধর্ম এবং কোন্টি মিথ্যা ধর্ম ছিল। অতএব তাদের জন্য পরিতাপ কিসের) তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না।) অতএব আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন (আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করবেন। কেননা) আপনি সুস্থ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কর্মতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্তরাগ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে শৃঙ্খলের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কেবল যুক্তিগত জঠিলতা নেই। শৈক্ষিক সজ্ঞব্যতার সাথে এর অবশ্যিকী বাস্তবতা পরগন্ধরণের ও ঐশ্বী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারী সত্যবাদিঙ্গোর উপর সংবাদের বিশুর্ণ ও আগাম হওয়া নির্ভরশীল। তাই আরাত্তে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনন্তরীকর্য। এমনকি, বনী ইসরাইলের আশিমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জন্মায়। এতে বুবা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাম্মানের জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনচক্র হবেন না। আল্লাহ তা'আলা দ্বয়ই আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি বে-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিচিত।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَدَ الدُّعَاءَ إِذَا دَلَّا وَلَوْا

مُلْبِرِينَ ③ وَمَا أَنْتَ بِهِدْيَى الْعَيْ بِعِنْضِ الْمُلْتَكِلِّتِمُونَ ④ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا

من يَقُولُ مِنْ بِإِيمَانٍ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ⑤

(৮০) আপনি আহবান শোনাতে পারবেন স্বামৃতদেরকে এবং বধিয়কেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠাপদশৰ্ণ করে চলে যায়। (৮১) আপনি অক্ষদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে কিরিয়ে সৎপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব তারাই আজ্ঞাবহ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি স্বামৃতদেরকে ও বধিয়দেরকে আপনার আওয়াজ শোনাতে পারবেন না। (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠাপদশৰ্ণ করে চলে যায়। আপনি অক্ষদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে (কিরিয়ে) সৎপথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস রাখে (এবং) এরপর তারা মান্য (গ) করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মালব জাতির প্রতি আমাদের রাসূলে করীম (সা)-এর স্বেচ্ছ মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আস্তাহর পয়গাম শনিয়ে জাহানাম থেকে উদ্ভার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবৃণ না করলে তিনি নিদারূপ ঘর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তাঁর কথা অমান্য করে অপ্রিয়ে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন হানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্তোষ প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এবং *وَمَنْ يُكَفِّرْ فِي مُسْلِقٍ* এবং *وَمَنْ يُكَفِّرْ فِي مُسْلِقٍ* বাক্যসমূহ এই সান্তোষ প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্তুরার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম শৌচিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পর্ক করেছেন। যারা এই পয়গাম কবৃণ করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ঝটি নেই, যদ্বন্ম আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবৃণ করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক, তারা সত্য কবৃণ করার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বত্ত্বদেহের অনুরূপ। স্বত্ত্বদেহ কারও কথা শনে লাভবান হতে পারে না। দুই, তাদের উদাহরণ বধিয়ের মৃত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠাপদশৰ্ণ করে পলায়ন করে। তিনি তারা অক্ষের মত। অক্ষকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে :

—*أَنْ شَنِعَ أَنْ يُؤْتِنَ بِإِيمَانِهِمْ شَلِيقَ*—অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আস্তাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিষ্কৃত কানে আওয়াজ পৌছা যায়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলঘাস হয়। যে শ্রবণ ফলঘাস নয়, ক্ষেত্রবান উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিয়তাঙ্গপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হতো, তবে কোরআনের এই উচ্চি চাকুর অভিজ্ঞতা ও

বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেতে। কেননা, কাফিরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জওয়াব দেওয়ার প্রয়োগ অসম্ভব। কেউ এটা অঙ্গীকার করতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল কে, এখানে ফলদারীক শ্রবণ বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এবং অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও কেলে এবং তখন তা কৃত্যেও করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযুক্ত ও হাশেরের মরদানে তো সব কাফিরই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শনতেই পারে না। অকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিচুপ। মৃতরা কারও কথা শনতে পারে কি না, এটা ব্যাখ্যানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কিরাম (রা) যেসব বিষয়ে পরিস্পরে যতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মু মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেরীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামল এবং দ্বিতীয়ত সূরা কুমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিস্তৃত হয়েছে : *وَمَا أَنْتُ بِمُسْتَشِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُوْرِ* —অর্থাৎ ধারা ক্ষবরহৃ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতত্ত্বের লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই একপ বলা হয়লি যে, মৃতরা শনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের ঘোঘ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্ত্বের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত এ কথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপর্যোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আস্তীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আন্দুহুর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই :

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا بِلَّ أَحْيَاهُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
بِرْزَقُونَ فَرَحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
بَلْ حَقُّوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাজ্ঞার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য অবোজ্ঞ—সাধারণ মৃতদের জন্য নয়—তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সংশয়ণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাজ্ঞার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক থাকি

ধাকতে পারে। আস্ত্রাহু তা'আলা শহীদদেরকে বেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আজ্ঞার সম্পর্ক দেহ ও কবরের জায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আস্ত্রাহু তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃতদের প্রবাণের মত দানের প্রবণ্ণ হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীস এই :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَرَى بَقْبَرَ إِخْرِيَّهُ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرَفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ
عَلَيْهِ الْأَرْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّىٰ يَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আস্ত্রাহু তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আজ্ঞা তাঁর মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তাঁর মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তাঁর সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আস্ত্রাহু তা'আলা তখন তাঁর আজ্ঞা দুনিয়াতে ক্ষেত্রত পাঠিয়ে দেন। এতে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হলো। এক, মৃতরা তন্তে পারে এবং দুই তাঁদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আস্ত্রাহু তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, তাঁনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আস্ত্রাহু তা'আলা মৃতের আজ্ঞা ক্ষেত্রত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো তন্তবে কি না। তাই ইহাম গায়শালী ও আস্ত্রামা সুবৰ্কী প্রযুক্তের সুচিক্ষিত অভিযন্ত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, যাকে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, অভ্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ামেতসমূহের মধ্যে বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্বৃপ্ত যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় তন্তে পারে না। এটাও সত্য যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নামল, সূরা কুম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আস্ত্রাহু যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে প্রবণের বিষয়স রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাট্য ক্ষেত্রে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِنَ الْأَرْضِ سُكَّلْمَمْ لَا

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِأَيْتَنَا لَا يُوْقَنُونَ ۖ

(৮২) যখন ওয়াদা তাদের কাছে এসে যাবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব । সে মানুষের সাথে কথা বলবে এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (কিয়ামতের) ওয়াদা তাদের প্রতি পূর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূগর্ভ থেকে এক (অস্তুত) জীব নির্গত করব । সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে । কেননা, (কাফির) মানুষ আমার (অর্থাৎ আদ্ধার তা'আলার) আয়াতসমূহে (বিশেষ করে কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে) বিশ্বাস করতো না । (কিন্তু এখন কিয়ামত এসে গেছে । তার আলামতসমূহের মধ্যে জন্মুর আবির্ভাবও একটি আলামত) ।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে ? মুসলিমে আহমদে হ্যরত হ্যায়ফা (রা)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না । ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধূম্র নির্গত হওয়া, ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ৫. ইসা (আ)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জাল, ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ-এক. পশ্চিমে, দুই. পূর্বে এবং তিনি. আরব উপরীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদম থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশেরের আঠে লিয়ে যাবে । মানুষ যে হালে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নি সেখানে থেবে যাবে । এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে উঠবে ।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে । সে মানুষের সাথে কথা বলবে । ২. শব্দের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অস্তুটি অস্তুতি আকৃতি বিশিষ্ট হবে । আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্মুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুভাবিক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাত ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে । এই হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম । এরপর অন্তিবিলেবেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে । ইবনে কাসীর, আবু দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হ্যরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মৃক্ষার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে । সে মন্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ প্রতির ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌছে যাবে । মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে । একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে । এই জন্মু তাদের মুখ্যমন্ত্র তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে । এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফিরের মুখ্যমন্ত্রে কুফরের চিহ্ন একে দেবে । কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না । সে প্রত্যেক মুক্তি ও কাফিরকে চিনবে ।—(ইবনে কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে একটি অবিশ্বাসীয় হাদীস প্রবণ করেছি । রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে

উদ্দিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামভূয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রথমে হওয়ার অব্যবহৃত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

শায়খ জালালুদ্দীন মহম্মদী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সুয়ার 'সৎ কাজে প্রাদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফির ইসলাম প্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বলু পাওয়া যায়।—(মাঝহারী) এ হলো ইবনে কাসীর প্রশ্নে ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উন্নত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিছুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। একে মৌকারমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর এ সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রষ্ট করবে। সে কাফির ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারণও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লিখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُبَلِّغُونَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ এই বাক্যটিই সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই: অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনত ধর্জ্য হবে না। হযরত ইবনে আবুসান, জ্ঞান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাশার্তের অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে।—(ইবনে কাসীর)

وَيَوْمَ نَحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْ يِكْدِبُ بِإِيمَنَّا فَهُمْ
يُؤْزَعُونَ ⑩ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُهُمْ وَقَالَ أَكْدِبْتُمْ بِإِيمَنِي وَلَمْ
تُعِظِّطُوْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْ تَعْلُوْنَ ⑪ وَقَوْمَ الْقُولُ عَلَيْهِمْ
بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ⑫ إِنَّمَا يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيلَ لِيَسْكُنُوا
فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ⑬
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ

فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ دَوْلَةٌ كُلُّ أَتَوْهُ دُخْرِينَ ⑥ وَتَرَى
 الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ طَصْنَعُ اللَّهِ
 الَّذِي أَتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا فَعَلُوا ۗ ⑦ مَنْ جَاءَ
 بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَهُمْ مِنْ فَرْعَوْنَ يُمَيِّدُ أَمْوَانَ ۗ ⑧ وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَكَبِيتْ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تَجْزُونَ الْأَمَانَاتِ ۗ ۸

- (৮৩) যেদিন আমি একজিত করব একেকটি দলকে সেইসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপর্যুক্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে ? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না ! না তোমরা অন্য কিছু করছিলে ? (৮৫) যুগ্মের কারণে তাদের কাছে আবাবের শয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি ইতি সৃষ্টি করেছি, তাদের বিশ্বাসের জন্য এবৎ দিনকে করেছি আলোকময়। নিচত্র এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন শিলায় কৃত্কার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইহা করবেন, তারা ব্যক্তিত নভোমঙ্গলে ও তৃতীয়লো যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহীন হয়ে পড়বে এবৎ সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিলীত অবস্থায়। (৮৮) তৃতীয় পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সে-দিন এগুলো যেবমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহর ক্ষয়িগ্রহি, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন। (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবৎ সেইদিন তারা উকুতর অহিংসা থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) এবৎ যে মন কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধোমুখে নিষেগ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিক্রিয়া তোমরা পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন (কবর থেকে জীবিত করার পর) আমি প্রত্যেক উন্নত থেকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী উন্নতসমূহ থেকে এবৎ এই উন্নত থেকেণ) তাদের একটি দল সম্ববেত করব, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত (অতঃপর তাদেরকে হাশমের মাঠের দিকে হিসাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু তারা ধৰ্ম সংখ্যক হবে, তাই) তাদেরকে (চলার পথে পেছনের লোকদের সাথে মিলিত থাকার জন্য) বিরত রাখা হবে, যাতে আগে-পিছে না থাকে-সবাই একসাথ হয়ে হিসাবের মাঠের দিকে চলে। এতে আধিক্য বর্ণনা করা

উদ্দেশ্য। কেননা, বড় সমাবেশে হত্তাবতই একপ হয়—বাধা প্রদান করা হোক বা না হোক। ১) যখন (চলতে চলতে ভারা হাশরের মাঠে) উপরিত হবে, তখন (হিসাব শুরু হয়ে যাবে এবং) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা আর্মার আরাতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে; ২) অর্থাৎ তোমরা এগুলোকে তোমাদের জানের পরিধিতে আনতে না (যার ফলে চিন্তা করার সুযোগ ইতো এবং চিন্তা করার পর কোন ঘটামত কায়েম করতে পারতে)। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা না করেই শোনামাত্র সেগুলোকে মিথ্যা বলে দিয়েছিলে এবং শুধু মিথ্যা বলাই নয়;) বরং (শ্রবণ করে দেখ, এছাড়া) তোমরা আরও কত কিছু করছিলে। (উদাহরণত প্রয়োগসমূহকে ও মু'মিনগণকে কষ্ট দিয়েছ, যা মিথ্যা বলার চাইতেও শুরুতর অন্যায়। এমনিভাবে আরও অনেক কুফরী বিশ্঵াস ও পাপাচারে লিঙ্গ ছিলে। এখন) তাদের উপর (অপরাধ কায়েম হয়ে যাওয়ার কারণে আযাবের) ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেছে (অর্থাৎ শাস্তির যোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে)। এ কারণে যে, (দুনিয়াতে) তারা (শুরুতর) সীমালংঘন করেছিল (যা আজ প্রকাশ হয়ে গেছে)। অতএব (যেহেতু প্রমাণ শক্তিশালী, তাই) তারা (ওয়াদ সম্পর্কে) কোন কিছু বলতেও পারবে না। (কোন কোন আয়াতে তাদের ওয়াদ পেশ করার কথা আছে, সেটা অথবাবস্থায় হবে। এরপর প্রমাণ কায়েম হয়ে গেলে কেউ কথা বলতে পারবে না। তাদের কিয়ামত অবীকার করাটা নিরেট নির্বিজ্ঞিত। কেননা, ইতিহাসগত প্রয়াণাদি ছাড়াও এর পক্ষে যুক্তিগত প্রমাণ কায়েম আছে। যেমন) তারা কি দেখে না যে, আমি বিশ্বাসের জন্য রাত সৃষ্টি করেছি। (এই বিশ্বাস মৃত্যুর সমতুল্য) এবং দিনকে করেছি আলোকময়। (এটা জাগরণের উপর নির্ভরশীল। জাগরণ মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের সমতুল্য। সুতরাং) নিচরাই এজে (অর্থাৎ দেনবিন নিদ্রা ও জাগরণে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা এবং আয়াতসমূহের সত্যতার উপর)- বড় বড় প্রমাণ রয়েছে। (কেননা, মৃত্যুর হৃদরপ হচ্ছে আস্তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং পুনরুত্থানের হৃদরপ হচ্ছে এই সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হওয়া। নিদ্রাও এক দিক দিয়ে এই সম্পর্কের ছিন্নতা। কারণ, নিদ্রার এই সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। তার অঙ্গিতের স্তরসমূহের ঘন্থে কোন একটি স্তরের বিশুষ্টির ফলেই সম্পর্ক দুর্বল হয়। এই বিশুষ্ট স্তরের পুনরাবর্তনকেই জাগরণ বলা হয়। কাজেই উভয়ের ঘন্থে পূর্ণ সামঝস্য রয়েছে। নিদ্রার পর জাগত করতে যে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম, তা প্রত্যহ আমরা দেখতে পাই। মৃত্যুর পর জীবন দানও এরই নজির। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম হবেন না কেন? এই যুক্তি প্রত্যোকের জন্যই। কিন্তু এর দ্বারা উপকার লাভের দিক) তাদের জন্য (ই), যারা ঈমানদার। (কেননা, তারা চিন্তা-ভাবনা করে, অন্যায় করে না। কোন ফল লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। তাই অন্যায় এর দ্বারা উপকৃত হয় না। হাশরের পূর্বে একটি সোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর ভয়াবহতা ও অর্থব্যঃঃ) যেদিন শিখগায় ফুর্দকার দেওয়া হবে (এটা প্রথম ফুর্দকার। ছিতীয় ফুর্দকারের পরে হাশর হবে।) অতঃপর আকাশে ও পৃথিবীতে যারা (ফেরেশতা, মানুষ ইত্যাদি) আছে, তারা সবাই ভৌতিকিত্ব হয়ে পড়বে (অতঃপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের আস্তা অজ্ঞান হয়ে যাবে) কিন্তু যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন (সে এই জীবি ও মৃত্যু থেকে নিরাপদ থাকবে। সহীহ হাদীস দৃষ্টে এরা হবেন জিবরাইল, মীকাজিল, ইসমাইলীল, আয়রাইল এবং আরশ বইনকারীগণ। এরপর

ফুৎকারের প্রভাব ছাড়াই তাদেরও ওফাত হয়ে যাবে।—(দূরের মনসুর) আর (দুমিয়াতে ভরের বস্তু থেকে পলায়নের অভ্যাস আছে। সেখানে আস্তাহুর কাছ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না; বরং) সকলেই স্তার কাছে অক্লত অস্তকে হায়ির থাকবে; (এমনকি জীবিতরা যৃত এবং যৃতরাই অজ্ঞান হয়ে যাবে। ফুৎকারের এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শাশীদের মধ্যে হবে। অতঃপর জগাধীসের উপর এর কি প্রভাব পড়বে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে : হে সম্মোধিত ব্যক্তি,) তুমি (তখন) পর্বতমালাকে (বাস্তিক দৃঢ়তার কারণে বাহ্যদৃষ্টে) অচল (অর্থাৎ সর্বদা একই থাকবে এবং সহ্যান থেকে বিচ্যুত হবে না) মনে কর। অথচ সেইদিন এদের অবস্থা হবে এই যে,) এগুলো মেঘমালার মত (শূন্যগর্ভ, হালকা ও ছিমুবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্য পরিমণ্ডলে) চলমান হবে। (যেমন আস্তাহু বলেন, **وَيَسْتَعْلِمُ الْجِبَالُ بِسُّقُنَّتِهِ مِنْ بَعْدِ مَنْبَأِ**—এজন্য আশ্চর্যাবিত হওয়া উচিত নয় যে, একগু ভারী ও কঠোর বস্তুর অবস্থা একপ হবে কেবল করে ? কারণ এই যে,) এটা আস্তাহুর কাজ, যিনি সব কিছুকে (উপযুক্ত পরিমাণে) সুসংহত করেছেন। অথমাবস্থায় কোন বস্তুর মধ্যে মজবুতি ছিল না। কারণ কোন বস্তুই ছিল না। সুতরাং মজবুতি না থাকা আরও উন্নতরূপে বুঝা যায়। তিনি অনন্তিভুক্ত যেমন অস্তিত্ব এবং দুর্বলকে শক্তিদান করেছেন, তেমনি এর বিপরীত কর্মও তিনি করতে পারেন। কেননা, আস্তাহুর শক্তিসামর্থ্য সবকিছুর সাথে সমান সমস্কুলীল; বিশেষত যেসব বস্তু একটি অপরাদির সাথে সামঞ্জস্যশীল, সেগুলোতে এটা অধিক সূচ্পষ্ট। এমনিভাবে আকাশ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্তূপ বস্তুর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন হওয়ার কথা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে **وَكُلُّ أَنْفُسٍ وَالْجِبَالُ فَدَكْتَانِ دَكْتَانِ وَأَحَدٌ**—এরপর শির্গার দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে। এর ফলে আস্তাসবুহ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং সমগ্র জগৎ যথাযথ ও নতুনভাবে ঠিকঠাক হয়ে যাবে। শূর্ববর্তী আয়াতে যে হাশেরের কথা বলা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। অতঃপর আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ কিয়ামতে প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অথবে ভূমিকাবকল বলা হয়েছে;) নিচ্য তোমরা যা কিছু করছ, আস্তাহু তা'আলা তা অবগত আছেন। (প্রতিদান ও শাস্তির এটাই প্রথম শর্ত। অন্যান্য শর্ত যেমন ক্ষমতা ইত্যাদি বিত্তন্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে। ভূমিকার পর এর বাস্তবতা আইন ও পদ্ধতি সহ বর্ণনা করা হচ্ছে;) যে ব্যক্তি সৎকর্ম (অর্থাৎ ইমান) নিয়ে আসবে (ঈমানের কারণে যে প্রতিদান সে পেতে পারে) সে (তার চাইতেও) উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। এবং সেদিন তারা শুক্রতর অঙ্গুরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (যেমন সুরা আবিয়ায় বলা হয়েছে) এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক), তাকে অগ্নিতে অধোযুগে নিক্ষেপ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে;) তোমাদেরকে তো সেসব কর্মেরই শাস্তি দেওয়া হচ্ছে যেগুলো তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। (এই শাস্তি অহেতুক নয়।)

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রَدْعٌ فِيهِمْ يَوْمٌ مُّرْجُونٌ
এর অর্থ বাধা দেওয়া। অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে যাতে পেছনে পড়া শোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ

শর্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্ধাং তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহু ভালার আয়াতসমূহে যিথ্যা বলা স্বরং একটি উর্ফতর অপরাধ ও খুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বুঝা-শোনার চেষ্টা না করেই যিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা হিতুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে আমা যায় যে, ধারা চিন্তাভাবনা করা সত্ত্বেও সত্ত্বের সম্মান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথচার্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লম্ব। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অন্তিজ্ঞ ও তাওহীদে যিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুম্ভ, পথচার্টতা ও চিরহৃষ্টী আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্জল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভাস্তি ক্ষমা করা হবে না।

— وَيَوْمَ يَنْتَهُ فِي الْمَسْوَى فَقَرْعَ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ الْخَلْقُ —
অন্য এক আয়তে এ স্থলে পরিবর্তে ফের মুক্ত ফের শব্দের অর্থ অস্থির হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়তকে শিংগার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমূল হবে এই যে, শিংগা ফুক দেশীয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে; এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে যাবে যাবে। কাতোদাহ প্রমুখ তফসীলকার এই আয়তকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন শান্ত করবে। আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভৌত-বিহুল অবস্থায় উদ্বিগ্ন হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিমিয়ার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে যাবে যাকে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কালোম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়ত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেই ধ্যান পাওয়া যায়।—(কুরআনী, ইবনে কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চলিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরআনী)

৩১। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত-বিহৃত হবে না। ইয়রত আৰু দুরায়রা (ৱা)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন শাড়ের সময় তাঁরা মোটেই অধিক হবেন না।—(কুরআন) সাহেব ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সংবেদে হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গ়বরণণ আরও উন্মুক্তপে এই শ্ৰেণীভুক্ত। কীরণ, তৌদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা। এবং এর উপর নবৃত্তের মর্যাদাও।—(কুরআন)

وَنَفَخْ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مِنْ فِي السُّمَاوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى شَاءَ اللَّهُ شَاءَ
সূরা যুমারে আছে এখানে শব্দের পরিবর্তে মন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সংজ্ঞা হারানো। এখানে
সংজ্ঞা হারিয়ে মরে বাঞ্ছা রোকানো হয়েছে। এখানেও شَاءَ اللَّهُ شَاءَ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা
হয়েছে। এতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বুকানো হয়েছে। তাঁরা শিংগায়
ফুর্কার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে

প্রতিত হবেন। যে সকল তফসীরবিদ সম্মত ফরع কে একই অর্থ ধরেছেন, তাঁরা সূরা মুমারের অনুজ্ঞা এখানে ব্যতিক্রম দাওয়া নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন তাঁদের মতে শহীদগণ তথা অস্ত্রিভাব থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত হবেন যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَمَنْ فَرَّ مِنَ السَّحَابِ—উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ ছান্ছুত হয়ে যেখানাকার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক যেখানাকে বুঝানে হিল দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর উপর ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোন একসিকে চলমান হয় তখন তা যদই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও ছিতোলি মনে হয়। সুদূর শর্যাত বিস্তৃত ঘন কাল যেতে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও হিল মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই যেনের গতিশীলতা, দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

যেটোক্তা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তুর সভ্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আসারের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় বুঝান থেকে কখনও টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। এবং উভয়ে কথাটি কিরায়ত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোন কোন আলিয় প্রলেখে যে, কিরায়তের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কোরআন প্রাকের বিভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে : (১) চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকল্পিত হওয়া।

إِذَا دُكِتَ الْأَرْضُ دَكًا أَزْلَقَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا لَهَا

(২) পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধূলো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া—**وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ** এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তাঢ়ার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে ওঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নিচে প্রতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। (৩) **يَمْ نَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمِهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ** পাহাড়সমূহ ধূলো করা তুলার মত একত্রিত হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। (৪) **وَبَسْتَ الْجِبَالُ بِسَاسًا فَكَانَتْ هَبَّا، مُنْبَطِّ** ফুল প্রস্তুত রীন স্ফুরণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া। (৫) **চূর্ণ-বিচূর্ণ ও পুলিকণার ন্যায়** সারা বিশে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা যেখানাকার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে বুঝানে হিল দেখতে পাবে তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক ছিতোলি ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠাকে সমতল করের মত করে দেওয়া হবে। তাতে কোন ওয়া, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। (৬) **فَلَنْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ سَفَّا فَيَدِرْمَا قَاعًا صَفَنِيْلَا لَتَرَى فِيْهَا عَوْجَانَا وَلَأَنْتَا** (কুরআনী-জুলু মা'আনী)।

أَنْتَنَ صَنَعَ اللَّهُ الْذِي أَنْتَنَ كُلُّ شَيْءٍ
থেকে উভূত । এর অর্থ কোন কিছুকে যজ্ঞবৃত্ত ও সংহত করা । বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ; অর্থাৎ দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং শিংগায় ফুৎকার থেকে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা । উদ্দেশ্য এই যে এগুলো মোটেই বিশ্ব ও আকর্ষণের বিষয় নয় । কেননা, এগুলোর স্টো কোন সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা কেরেশতা নয় ; বরং বিশ্বজাহানের পালনকর্তা । যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম ওর্তে আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল ; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়াও মোটেই আকর্ষণজনক নয় । কেননা, এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম ।

أَنْ مِنْ جَمِيعِ الْخَسْنَةِ فَلِغَيْرِ مُنْهَا
বলে এখানে কালিমারে আ-ইলাহা ইল্লাহ বুঝানো হয়েছে (কাতাদাহুর উক্তি) । কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আল্লুগত্য অর্থ নিয়েছেন । অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে । বলা বাহ্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হব, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ঝীমান বিদ্যুতান থাকে । ‘উৎকৃষ্টতর প্রতিদান’ বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত (এবং আবাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরস্ফুর্তি বুঝানো) হয়েছে । কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ শত থেকে নিয়ে সাতশ শত পর্যন্ত পাওয়া যাবে । —(মাযহারী)

وَهُمْ مِنْ فَزِعٍ يُونَكُ أَمْنُونَ
উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভূক্ত পরাহিয়গারও পরিগামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয় : যেমন কোরআন পাক বলে
إِنْ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ
অর্থাৎ পালনকর্তার আবাব থেকে কৈড নিশ্চিত ও ভাবনাযুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে
না । এ কারণেই পরগবরণগ, সাহাবায়ে কিরাম ও উলীগণ সদাসর্বদা জীব ও কল্পিত
থাকতেন । কিন্তু সেইদিন হিসাব-নিকলে সমাপ্ত হলে ধারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে,
তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুঃস্থিতা থেকে মুক্ত ও অশ্রাপ্ত হবে، وَاللهُ أَعْلَمُ ।

إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَمَّلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأَمْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ① وَإِنْ أَتُوا الْقُرْآنَ فَنِّيْ
أَهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِفَسِيْهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقْلَ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ② وَقُلِّ الْحَمْدُ لِلّهِ
سَرِّيْكُمْ أَيْتَهُ فَنَعْرُفُونَهُمْ وَمَارْبَثُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَصْنَعُونَ ③

(১১) আমি তো কেবল এই নগরীর প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সমানিত করেছেন। এবং সবকিছু ত্বারই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, বেল আমি আজ্ঞাবহস্তের একজন হই। (১২) এবং যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পর্যবেক্ষণ হলে আপনি বলে দিন, ‘আমি তো কেবল একজন উচিতি প্রদর্শনকারী।’ (১৩) এবং আরও বলুন, ‘সমস্ত প্রশংসন আল্লাহর। সত্ত্বেই তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে এবং তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা গাফিল নন।’

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে পঞ্চমর (সা), আনুষকে বলে দিন,] আমি তো কেবল এই (মুক্তা) নগরীর (সত্ত্বিকার) প্রভুর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে (নগরীকে) সমানিত করেছেন। (এই সম্ভাবনের কারণেই একে হেরেম করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন ইবাদতে কাউকে শ্রীক না করি) এবং (তাঁর ইবাদত কেন করা হবে না, যখন) সবকিছু ত্বারই (যালিকানাধীন)। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি (বিশ্বাস ও কর্ম সবকিছুতে) তাঁর আজ্ঞাবহস্তের একজন হই। (এ হচ্ছে তাওহীদের আদেশ) এবং (আরও আদেশ এই যে,) যেন আমি (তোমাদেরকে) কোরআন পাঠ করে শুনাই (অর্থাৎ বিধানাবলী প্রচার করি, যা নবৃত্তের জরুরী অঙ্গ)। অতঃপর (আমার প্রচারকের পর) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে (অর্থাৎ সে আমার থেকে যুক্তি এবং জান্নাতের অঙ্গয় নিয়ামত শাল করবে)। আমি তাকে কাছে কোন অর্থিক অথবা প্রস্তাৱগত উপকৰণ চাই না।) এবং কেউ পথচারী হলে আপনি বলে দিন, (আমাকে কোন ক্ষতি নেই। কারণ,) আমি তো কেবল সতর্ককারী (অর্থাৎ আদেশ প্রচারকারী)-পঞ্জাবী। (অর্থাৎ আমার কাজ আদেশ পেশেছিয়ে দেওয়া। এরপর আমার দায়িত্ব শেষ। না যানলে তোমাদেরকেই শান্তি ভোগ করতে হবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, (তোমরা যে কিয়ামতের বিলম্বকে আর না হওয়ার প্রমাণ মনে করে কিয়ামতকে অঙ্গীকার করছ, এটা তোমাদের নির্বৃক্ষিতা। বিলম্ব কখনও প্রমাণ হতে পারে না যে, কিয়ামত কোনদিন হবেই না। এ ছাড়া তোমরা যে আমাকে দ্রুত কিয়ামত আনাব কথা বলছ, এটা তোমাদের জিন্নাত শান্তি। কেনন্তা আমি কোনদিন দাবি করিনি যে, কিয়ামত আমা আমার ক্ষমতাধীন। বরং সমস্ত প্রশংসন আল্লাহর। (ক্ষমতা, জ্ঞান, হিকমত সবই তাঁর। তাঁর হিকমত যখন চাইবে, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন। হ্যাঁ এতটুকু আমাকেও জানানো হয়েছে যে, কিয়ামতের বেশি বিলম্ব নেই। বরং) সত্ত্বেই তিনি নিদর্শনসমূহ (অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনাবলী) তোমাদেরকে দেখাবেন। তখন তোমরা সেগুলোকে চিনবে। (তবে চিনলেও কোন উপকৰণ হবে না) আর (তখন তোমরা সেগুলোকে হবে না ব্যরুৎ তোমাদেরকে মন্দ কর্মের শান্তি ও ভোগ করতে হবে। কেননা) আপনার পালনকর্তা স্ব সম্পর্কে গুরুত্ব নন। যা তোমরা কর।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ৪৪^১ বলে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। **أَنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الْعَزِيزُ** অর্থাৎ তা'আলা তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমগুল ও তৃতীয়গুলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। **حَرَمٌ** শব্দটি দ্বারা থেকে উত্তৃত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পরিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর অধৃত ভূমিতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয় নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয় নয়। এসব বিধানের কতকাংশ **وَمَنْ يَخْلُلْ كَيْانَ أَمْأَةً** আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়দার উক্ততে এবং কতকাংশ **لَا يَقْتُلُوا الصَّابِدِ وَلَا تَمْرِنُ** আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

سُورَةُ الْقَصْصِ

سূরা আল-কাসাস

মধ্য অবঙ্গীর, ৮৮ আংগাঞ্জি, ১ কক্ষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طَسْمٌ ① تِلْكَ آيَتُ الْكِتَبِ الْمُبِينُ ② سَلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبِيًّا مُّوسَى
 وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَّا فِي الْأَرْضِ
 وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ
 وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَهْمَنَ
 عَلَى الَّذِيْنَ اسْتَضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ
 الْوَرِثَيْنَ ⑤ وَنُسْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ
 وَجُنُودَهُمْ مِّنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدُرُوْنَ ⑥ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أَمْرِ مُوسَى أَنَّ
 أَرْضَهُمْ فَإِذَا خَفَتِ عَلَيْهِ فَالْقِيْمُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزِيْ
 إِنَّا رَآدُوْهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ⑦ فَالْتَّقْطَةُ إِلَّا فِرْعَوْنَ
 لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا
 كَانُوا أَخْطِيْرِيْنَ ⑧ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِيْ لِيْ وَلَكَ

لَا تَقْتُلُوهُ وَلَا عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعُنَا لَوْفَتِخِذَةٍ وَلَدًا وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ⑤ وَاصْبِرْهُ فَوَادِمُ مُوسَىٰ فِرِغَامًا إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي
بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبِطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِشَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑥ وَقَالَتْ
لِأُخْتِهِ قِصِّيَّهُ فِي صُرُوتِ بِهِ عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑦
وَحَرَّمْنَا مِنْ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَاتَتْ هَلْ ادْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نِصْحُونَ ⑧ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمَّهَهُ كَيْ تَقْرَئَ
عِنْهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلَتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑨

দয়াবদ্ধ পরম করণ্যাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

- (১) তা-সীন-ঝীম। (২) এগোলো সুস্পষ্ট কিভাবের আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে
মূসা ও কিরাউনের স্মৃতি সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ইয়ানদার সম্প্রদায়ের জন্য। (৪)
কিরাউন তার দেশে উজ্জ্বল হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের
একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং
নামীদেরকে জীবিত রাখত। নিচ্ছ সে হিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে বাদেরকে দুর্বল
করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতৃ করার এবং
তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। (৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতার আসীন করার
এবং কিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার যা তারা সেই দুর্বল
দলের তরক থেকে আশঁকা করত। (৭) আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে
তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন ফুঁমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঁকা কর, তখন
তাকে দরিদ্রার নিক্ষেপ কর এবং তার করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্য তাকে
তোমার কাছে কিরিয়ে দেব এবং তাকে পরগন্যরগন্যের একজন করব। (৮) অতঃপর
কিরাউন-পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শক্ত ও দুঃখের কারণ হয়ে
যান। নিচ্ছ কিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) কিরাউনের ঝী
মলল, এ শিখ আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উৎক্ষাত্রে
আসতে পারে অথবা আমেরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। অকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে
তাদের কেন খবর ছিল না। (১০) সকালে মূসা-জননীর অভিয় হয়ে পড়ল। যদি
আমি তাঁর কৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা-জনিত অহিংস্রতা ধ্বান করেই

দিতেন। দৃঢ় কবলাম, যাতে জিনি আকেন বিশ্বাসিগণের অধ্যে। (১১) তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছনে থেছেন যাও। সে-ভাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিত হয়ে তাঁকে দেখে যেতে আগল। (১২) পূর্ব থেকেই আমি খন্দাদেরকে মূসা থেকে বিস্ত রেখেছিলাম। মুসার ভগিনী বলল, ‘আমি তোমাদেরকে এমন একে পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্য একে শাশল-পাশল করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাঁকে জননীর কাছে কিম্বিনে দিলাম, যাতে তার চক্র ভুঁড়ার এবং তিনি দুঃখ করেন এবং বাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর উয়াদা সত্য; কিন্তু আনেক মাসুর ভাঁজানে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জনসীন-মীম—(এর অর্থ আল্লাহর তা'আলাই জানেন)। এতেরা (অর্থাৎ যেসব বিশ্ববত্তু আপনার প্রতি ওহী করা হয়) সুপ্রতি কিভাবের (অর্থাৎ কোরআনের) আয়াত। (তন্মধ্যে এ হলে) আমি মূসা (আ) ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত আপনারু কাছে সত্য সহকারে পাঠ করে (অর্থাৎ নায়িল করে), তানাছি ইমানদার সম্পন্নায়ের (উপকোরের) জন্য। (কেননা বৃত্তান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষা, নবুরতের প্রমাণ সংগ্রহ ইত্যাদি। এতেরা বিশেষত ইমানদারদের সাথেই সম্পর্ক রাখে—কার্যত ইমানদার হোক কিংবা ইমান আনতে ইচ্ছুক হোক। সংক্ষেপে বৃত্তান্ত এই যে,) ফিরাউন তার দেশে (মিসরে) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন প্রেরণাতে বিভক্ত করে রেখেছিল। (এভাবে সে কিবর্তী অর্থাৎ যিসরীয়দেরকে সখানিত করে রেখেছিল এবং কিবর্তী অর্থাৎ বৰ্তী ইসরাইলকে হেয় ও লালিত করে রেখেছিল।) সে তাদের (দেশের বাসিন্দাদের) এক দলকে (অর্থাৎ বৰ্তী ইসরাইলকে) দুর্বল করে রেখেছিল (এভাবে যে,) তাদের পুত্র-সন্তানকে (যারা মনুন জন্মগ্রহণ করত, জন্মাদের হাতে) ইত্যা করত এবং তাদের মারীদেরকে (অর্থাৎ কন্যা-সন্তানদেরকে) জীবিত রাখত (বাতে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তাদের তরক থেকে বিপদাশঙ্কাও ছিল না,) নিচিতই সে ছিল বড় দুর্ভুক্তকারী। (মোটকথা, ফিরাউন তো ছিল এই ধারণার বশবর্তী।) আর আমার ইচ্ছা ছিল দেশে (মিসরে) যাদেরকে মুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি (পার্থিব ও ধর্মীয়) অনুগ্রহ করার। (এ অনুগ্রহ এই যে,) তাদের (ধর্মীয়) নেতা করা এবং (দুনিয়াতে) তাদেরকে দেশের উজ্জ্বলাদিকারী করা এবং (মালিক হওয়ার সাথে সাথে) তাদেরকে দেশের ক্ষয়তায় আসীন করা এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে সেইসব (অবাঞ্ছিত) ঘটনা দেখিয়ে দেওয়া, যা তারা তাদের (বৰ্তী ইসরাইলের) তরক থেকে আশংকা করত [অর্থাৎ সাম্রাজ্যের পাতন ও ধ্বংস। এই আশংকায়ই বৰ্তী ইসরাইলের হেসেদেরকে ফিরাউনের দেখা একটি ইশ্প ও জ্যোতির্বীদের দেওয়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা ইত্যা করে যাচ্ছিল।—(দুরুরে মনসুর) সুতরাং আমার ফয়সালা ও তক্কদীরের সামনে তাদের সকল কৌশল ব্যর্থ হলো। এ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ঘটনা। এর বিশদ বিবরণ এই যে, মূসা (আ) যখন এমনি সংকটময় বয়নায় জন্মগ্রহণ করলেন, তখন] আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, (যে পর্যন্ত তাকে গোপন রাখা সম্ভবপর হয়,) তুমি তাকে জন্মদান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে (গুপ্তচরদের অবগত হওয়ার) আশংকা কর, তখন (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তাকে (সিন্দুকে ভর্তি করে) দরিয়াতে (নীল নদে) নিক্ষেপ

কর এবং (নিয়জিত হওয়ার) ভয় করো না, (বিজ্ঞদের কারণে) দুঃখও করো না। (কেননা) আমি অবশ্যই তাকে পুনরায় তোমার কাছে পৌছিয়ে দেব এবং (সময় এলে) তাকে পয়গ্রহণের একজন করব। (যোটকথা, তিনি এমনিভাবে সন্মান করতে লাগলেন। এরপর যখন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলো, তখন সিন্দুকে ভরে আস্থাহ্র নামে নীলনদে নিষ্কেপ করে দিলেন। নীলনদের কোন শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিংবা ফিরাউনের বজনরা নদীগ্রামে বের হয়েছিল। সিন্দুকটি কিনারায় এসে ভিড়ল।) তখন ফিরাউনের লোকেরা মূসা (আ)-কে সিন্দুকসহ কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শক্তা ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিচয় ফিরাউন, হ্যামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী (এ ব্যাপারে) ভুলকারী ছিল। (কারণ, তারা তাদের শক্তকে কোলে তুলে নিয়েছিল। যখন তাকে সিন্দুক থেকে বের করে ফিরাউনের সামনে পেশ করা হলো, তখন) ফিরাউনের ঝী (হ্যাত অসিয়া ফিরাউনকে) বলল, এ (এই ছেলে) আমার ও তোমার নয়নমণি (অর্থাৎ তাকে দেখে মন প্রকৃষ্ট হবে। অতএব) তাকে হত্যা করো না। (বড় হয়ে) এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। তাদের (পরিণামের) কোন ঘবরাই ছিল না (যে, এ সেই বালক, যার হাতে ফিরাউন-সাম্রাজ্যের পতন হবে। এদিকে এ ঘটনা হলো যে,) মূসা-জননীর অস্তর (বিভিন্ন চিন্তার কারণে) অস্থির হয়ে পড়ল। (অস্থিরভাবে যেনতেন নয়। বরং এজন নিদর্শন অস্থিরতা বে, যদি আমি তাকে (আমার ওয়াদার প্রতি) বিশ্বাসী রাখার উদ্দেশ্যে তার হন্দয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসা (আ)-এর অবস্থা (স্বার্থ সামনে) প্রকাশ করেই দিতেন। (যোটকথা, তিনি কোনৰূপে অস্তরকে সামলিয়ে নিলেন এবং কোশল উচ্চ করলেন। তা এই যে,) তিনি মূসা (আ)-এর ভগিনী (অর্থাৎ আপন কন্যা)-কে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। (সে চলল এবং রাজপ্রাসাদে সিন্দুক খোলা হয়েছে জেনে সেখানে পৌছল। হয় পূর্বেও যাতায়াত ছিল, না হয় কোন কোশলে সেখানে পৌছল এবং) মূসা (আ)-কে দূর থেকে দেখল, অথচ তারা জানত না (যে, সে মূসার ভগিনী এবং তাঁর খোজে এসেছে।) আমি পূর্ব থেকেই (অর্থাৎ সিন্দুক বের হওয়ার পর থেকেই) মূসা (আ) থেকে ধার্তাদেরকে বিরত রেখেছিলাম। (অর্থাৎ সে কারণ দুধ প্রহণ করত না।) অতঃপর সে (সুযোগ বুঝে) বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কि, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে (সর্বাঙ্গঃকরণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী। [শিশুকে দুধ পান করানো কঠিন দেখে তারা এ পরামর্শকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং সেই পরিবারের ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। মূসা-ভগিনী তার জননীর ঠিকানা বলে দিল। সেবতে তাকে আনা হলো এবং মূসা (আ)-কে তার কোলে তুলে দেওয়া হলো। কোলে যাওয়া মাত্রই তিনি দুধ পান করতে লাগলেন।] অতঃপর তাদের অনুস্থিতিক্রমে তাকে শিশুতে বাড়ি নিয়ে এল। মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদে নিয়ে তাদেরকে দেখিয়ে আনত।] আমি মূসা (আ)-কে (এভাবে) তাঁর জননীর কাছে (ওয়াদা জন্মায়ী) ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তাঁর সন্তানকে দেখে তাঁর চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি (বিজ্ঞদের) দৃঢ়ক্ষণ করেন এবং যাতে তিনি (প্রত্যক্ষরূপে) জানেন যে, আস্থাহ্র ওয়াদা সত্য; কিন্তু (পরিজ্ঞাপের বিষয়), অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না (এটা কাফিমদের প্রতি ইলিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মকায় অবর্তীণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাম সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মকা ও জুহফা (রাবেগ)-এর মাঝামানে এই সূরা অবর্তীণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন জুহফা অর্থাৎ রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাইল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাত্তুমির কথা আপনার মনে পড়ে কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যা, মনে পড়ে বৈ কি । অতঃপর জিবরাইল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মকা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভূক্ত হবে। আয়াতটি এই : ﴿أَنَّ الَّذِينَ فَرَضْنَا عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ لَرَاءِكُمْ إِلَى مَعَادٍ﴾ সূরা কাসামে সর্বপ্রথম মূসা (আ)-এর কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্থেক সূরা পর্যন্ত মূসা (আ)-এর কাহিনী ফিরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কোরনের সাথে উন্নিষিত হয়েছে।

হয়েরত মূসা (আ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফে তাঁর কাহিনী বিধির (আ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আল-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসামে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মূসা (আ)-এর জন্য বলা হয়েছে ﴿وَلَفَظْتُ مُرْتَلَهُ إِيمَامَ نَاسَارِيِّيِّيْنَ﴾ প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আমিও ইবনে কাসীরের বন্নাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা তোয়াহায় উল্লেখ করেছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরী যাস'আলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা তোয়াহায় এবং কিছু সূরা কাহফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের আয়াতে শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে। ﴿وَلَرِبَّ أَنْ تُمْنَعُ عَلَيِ الَّذِينَ أَنْشَأْنَا مِنْ نَفْرَاتِ أَنْفَلَهُمْ أَنْفَلَهُمْ﴾ এই আয়াতে বিধিলিপির মুকাবিলায় ফিরাউনী কৌশলের শুধু ব্যৰ্থ ও বিপর্যস্ত ইওয়ার কথাই নয়; বরং ফিরাউন ও তার প্রারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অক্ষ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সশর্কে শুপ্র ও বন্ধের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফিরাউন শৎকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাইলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জ্ঞানি করেছিল, তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফিরাউনেরই গৃহে তারই হাতে সালিত-পালিত করালেন এবং অনন্তর মনস্তুষ্টির জন্য তারই কোলে বিশয়কর পশ্চায় পৌছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফিরাউনের কাছ থেকে তন্যদানের খরচ, যা কোন কোন রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দিনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। তন্যদানের এই বিশয়য়ে একজন কাফির হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোজন ঝটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্পদায়ের উপর অত্যা঳ারের স্থীয় রোলার ঢালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে অল্পেয়েগিয়ির এক স্তরবর্কর শাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং বন্ধের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্চকে দেখিয়ে দিলেন। ﴿وَلَرِبَّ أَنْ يَعْذِرَنَّ مَرْجَعَنَّ وَهَامَانَ﴾

শব্দটি এখানে আতিথানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে... ক্ষমতের ওহী
বুকানে হয়নি। সূরা তোয়াহায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَاسْتَوَى إِتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَّلَكَ نَجَرِي
الْمُحْسِنِينَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا
رَجُلَيْنِ يَقْتَلِيْنِ ثَهْنَ اِمِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوَّهُ فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ لَا فَوْزَةُ مُوسَىٰ فَضَّلَّ عَلَيْهِ ۚ
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ وَمُضِلٌّ مُبِينٌ ۝ قَالَ رَبِّيْ ۖ إِنِّيْ ظَلَمْتُ
نَفْسِي فَاغْفِرْلِي فَعَفَّرَلَهُ طَرَانَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّيْ بِمَا آنْعَمْتُ
عَلَيْهِ فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَالِقًا يَتَرَقَّبُ
فِإِذَا الَّذِي أَسْتَغْصَنَ كَبِيلَ الْأَمْمِينِ يَسْتَغْصِنُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ۝ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ وَلَهُمَا لَا
قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْمِينِ فَإِنْ
تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْمُصْلِحِينَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهِ الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوَسَىٰ
إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِيُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكُمْ فَلَخَرَجَ إِلَيْكُمْ مِنَ النَّصْبِيْحِينَ ۝
فَخَرَجَ مِنْهَا خَالِقًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّيْ تَجْنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ ۝

(১৪) যখন মুসা বৌবলে পদার্পণ করলেন এবং পরিগত বরক হরে গেলেন তখন
আমি তাকে ধ্যান ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সকলীদেরকে প্রতিশ্রূত দিয়ে
থাকি। (১৫) তিনি শহরে অবেশ করলেন যখন তার অধিবাসীরা হিল বেখুবু

তিনি দুই ব্যক্তিকে সড়াইয়িত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন তাঁর শক্রদলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শক্রদলের লোকটির বিকলে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মুসা তাকে চুরি মারলেন এবং এতেই তাঁ-মুসুর হরে গেল। মুসা বললেন, আটা শরকাদের কাজ। নিষ্ঠর সে একাশ্য শক্র, বিজ্ঞানকারী। (১৬) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর যুদ্ধ করে কেলেছি। অতএব আমাকে করুন। আন্তর্ভুক্ত তাকে করুন। নিষ্ঠর তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৭) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুরোধ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শক্তি অবহার। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য দেরেছিল, সে টীককর করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মুসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন একাশ্য পথচারী ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মুসা যখন উভয়ের শক্রকে শায়েস্তা-করতে চাইলেন, তখন সে বলল, পতকল্য তুমি বেরন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সেরকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে বৈরাচারী হতে চাও এবং সক্ষি হাতগুরুকারী হতে চাও না। (২০) এ সমস্ত শহরের প্রাণ খেকে এক ব্যক্তি ঘুটে আসল এবং বলল, হে মুসা, যাজ্ঞের পারিবদ্বর্গ তোমাকে হত্যা করার প্রয়ার্থ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। (২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে তীক্ষ্ণ অবহার দের হয়ে পড়লেন শখ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিম সম্পন্নদারীর করল থেকে রক্ষা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মুসা যখন (শালিত পালিত হয়ে) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন এবং (অঙ্গ সোঠবে ও জ্ঞান-বৃক্ষিতে) পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম (অর্থাৎ নবুয়াতের পূর্বেই ভালম্ব বিচারের উপযুক্ত সুস্থ ও সরল জ্ঞানবৃক্ষ দান করলাম)। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীগণকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (অর্থাৎ সৎকর্মের মাধ্যমে জ্ঞানগত উন্নতি সাধিত হয়)। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা (আ) কখনও ফিরাউনের ধর্মবন্ত ঝুঁট করেননি; বরং তাঁর প্রতি বিত্তন্ত ছিলেন। এ সময়কারই এক ঘটনা এই যে, একবার মুসা (আ) সে শহরে (অর্থাৎ মিসরে (ক্রহল মা'আনী) বাইরে থেকে) এমন সময়ে ঝুঁটে করলেন, যখন তাঁর অধিবাসীরা বেখবর (নিম্রামগ্র) ছিল। (অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সময়টি ছিল বিশ্বহর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে রায়ির অংশ অভিবাহিত হওয়ার প্রবর্তী সময় জানা যায় (দুরৱৈ-মনসুর) তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে সড়াইয়িত দেখলেন। একজন ছিল তাঁর নিজ দলের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) এবং অপরজন তাঁর শক্রদলের। (অর্থাৎ ফিরাউনের বৈজ্ঞান ও কর্মচারী)। উভয়ে কোন ব্যাপারে ধন্তাধনি করছিল এবং বাঢ়াবাঢ়ি ছিল ফিরাউনীর।) অতঃপর যে তাঁর নিজে দলের, সে (মুসা (আ))-কে দেখে) তাঁর শক্রদলের লোকটির বিকলে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (মুসা (আ) প্রথমে তাকে বুরোলেন। যখন সে এতে বিরত হলো না) তখন

মূসা (আ) তাকে (শাসনের উদ্দেশ্যে যুক্ত প্রতিরোধ করার জন্য) ঘূরি মাঝলেন এবং তার ভবশীলা সাঙ করে দিলেন (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে সে মারাই গেল)। মূসা (আ) এই অগ্রত্যাশিত পরিষ্কত দেখে খুব অনুভূত হলেন এবং বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিচয় শয়তান (মানুষের) প্রকাশ্য দুশ্মন, বিভ্রান্তকারী। তিনি (অনুভূত হয়ে আল্লাহ'র দরবারে) আরয করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ'র তাকে ক্ষমা করলেন। নিচয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (এই ক্ষমার কথা সবুজত দান করার সময় মূসা (আ) নিচিতরপে জানতে পারেন; যেমন সূরা আল-নামলে আছে “مَنْ ظَلَمْ لِمَ بَدَلْ حُسْنَتْ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”। উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ইলহাম দ্বারা জানা হোক বা মোটেই জানা না হোক;) মূসা (আ) অতীতের জন্য তওবার সাথে ভবিষ্যাতের জন্য এ কথাও বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে (বিরাট) অনুগ্রহ করেছেন, (যা সূরা তোরাহায় ব্যক্ত হয়েছে، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى أَخْرَى وَلَقَدْ شَرَنَّ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى أَخْرَى পর্যন্ত) এরপর আমি কখনও অপরাধীদেরকে সাহায্য করব না। (এখানে ‘অপরাধী’ বলে তাদেরকে সুবানো হয়েছে, যারা অপরের দ্বারা শুনাহের কাজ করাতে চায়। কেননা, শুনাহের কাজ করানোও অপরাধ। এতে শয়তানও দার্খিল হয়ে গেছে। কারণ, সে শুনাহ করায় এবং শুনাহকারী ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাকে সাহায্য করে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে : وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَيْهِمْ طَغْيَارًا إِلَى اللَّهِسْطَانِ উদ্দেশ্য এই যে, আমি শয়তানের আদেশ কখনও মান্য করব না। ভুল-আঞ্চির জায়গায় সাবধানতা অবলম্বন করব। আসল উদ্দেশ্য এতটুকুই। কিন্তু অপরদেরকেও শামিল করার জন্য মুর্মুন বহুবচন পদ ব্যবহার করা হয়েছে। মোটকথা, ইতিমধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু ইসরাইলী ব্যতীত কেউ হত্যাকারীর রহস্য জানত না। ঘটনাটি যেহেতু ইসরাইলীর সমর্থনে ঘটেছিল, তাই সে প্রকাশ করেনি। কিন্তু মূসা (আ)-এর পরামর্শ শৎকিত ছিলেন। এভাবে রাত অতিবাহিত হলো।) অতঃপর শহরে মূসা (আ)-এর প্রভাত হলো ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থার। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে (কারণ সে অন্য একজনের সাথে বিবাদে শিষ্ট হয়েছিল)। মূসা (আ) এই দশ্য দেখে এবং গতকালকের ঘটনা অবরুণ করে অসম্ভুষ্ট হলেন এবং বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (কারণ, গ্রোজাই কারও না কারও সাথে কলাহে শিষ্ট হও। মূসা (আ) ইঙ্গিতে জেনে ধাকবেন যে, রাগারাগি তার পক্ষ থেকেও হয়েছে। কিন্তু ফিরাউনীর বাড়াবড়ি দেখে তাকে বাধা দিতে চাইলেন।) অতঃপর মূসা (আ) উভয়ের শর্করকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, [অর্থাৎ ফিরাউনীকে। কারণ, সে ইসরাইলী ও মূসা (আ) উভয়ের শর্কর ছিল। মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাইলের। আর ফিরাউনীরা সবাই বনী ইসরাইলের শর্কর ছিল। যদিও মূসা (আ)-কে নিদিষ্টভাবে ইসরাইলী বলে তার জানা না থাকুক। অথবা মূসা (আ) যেহেতু ফিরাউনের ধর্মবর্তের প্রতি বিত্রক ছিলেন, তাই বিষয়টি প্রচারিত হয়ে পিয়েছিল এবং ফিরাউনীরা তাঁর শর্কর হয়ে পিয়েছিল। মোটকথা, মূসা (আ) যখন ফিরাউনীর প্রতি হাত বাড়ানোর আগে ইসরাইলীর প্রতি রাগারিত হলেন, তখন ইসরাইলী মনে করল যে, মূসা সম্ভবত আজ আমাকে মারধর করবেন। তাই পেরেশান হয়ে] ইসরাইলী বগল, হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে

সেরকম (আজ) আমাকেও কি হত্যা করতে চাও ? (মনে হয়) তুমি পৃথিবীতে বৈরাচারী হতে চাও এবং সক্ষি স্থাপনকারী হতে চাও না । [এই কথা ফিরাউনী উন্নল । হত্যাকারীর সকান চলছিল । এতটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট ছিল । সে তৎক্ষণাৎ ফিরাউনের কাছে খবর পৌছিয়ে দিল । ফিরাউন তার নিজের লোক নিহত হওয়ায় এমনিতে রাগাভিত ছিল, এ সংবাদ তনে আরো অগ্রিশর্মা হয়ে পড়ল । সত্ত্বত এতে তার বন্দের আশুকা আরও জোরদার হয়ে গিয়েছিল । যা হোক, সে তার পারিষদবর্গকে পরামর্শের জন্য একত্রিত করল এবং শেষ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো । এই সভায়] এক ব্যক্তি [মূসা (আ)-এর বক্তু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল । সে] শহরের (সেই) প্রান্ত থেকে [যেখানে পরামর্শ হচ্ছিল, মূসা (আ)-এর কাছে নিকটতম গলি দিয়ে] ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে । অতএব আপনি (এখান থেকে) বের হয়ে যান । আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী । অতঃপর (এ কথা শনে) মূসা (আ) সেখান থেকে ভৌত-সন্তুষ্ট অবস্থায় (একদিকে) বের হয়ে পড়লেন । (পথ জান ছিল না, তাই দোয়ার ভঙ্গিতে) তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালিয়ে সম্মানের কবল থেকে রক্ষা করুন (এবং শাস্তির আয়গায় পৌছিয়ে দিন) ।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— وَلَا يَلْعَنْ أَشْتَهِ وَاسْتَوْى —
এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জ্ঞানের চরম সীমায় পৌছা ।
মানুষ বৈশ্ববের দুর্বলতা থেকে আত্মে আত্মে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয় । অতঃপর
এমন এক সময় আসে, যখন তার অভিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ
হয়ে যাব । এই সময়কেই —
বলা হয় । এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায়
অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে । কারণ এই সময় ভাড়াতাড়ি আসে এবং কারণ দেরীতে ।
কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হয়রত ইবনে আববাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত
আছে যে, তেক্ষিণ বছর বয়সে —
এর যমানা আসে । একেই পরিণত বয়স বলা হয় ।
এতে দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায় । এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত
বিবর্তিকাল । একে —
শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে । চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও
দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে । এ থেকে জানা গেল যে, —
তথা পরিণত বয়স তেক্ষিণ
বছর থেকে তরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে ।—(কুহল-মা'আনী, কুরুয়ী)

— أَتَيْتَهُ جَمَّا وَعْنًا —
বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং ৬ বলে বিধিবিধানের জ্ঞান
বোঝানো হয়েছে । অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে
মুবিন-বলে মিসর নগরী বুরানো হয়েছে । এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বুরা গেল যে, মূসা
(আ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন । অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে
প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল । অতঃপর কিবর্তী-হত্যার
ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মূসা (আ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে
তরু করেছিলেন । এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল । তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী
দল বঙ্গ হত্তো । من شيمـة
কর্তৃত এর সাক্ষ্য দেয় । এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও

ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, একটি রেওয়ামেতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মূসা (আ) যখন জ্ঞান-বৃক্ষি শাক করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শক্ত হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু শ্রী আহিমার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বাহিকারের আদেশ জারি করে। এরপর মূসা (আ) অন্যান্য বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন। عَلَى حِينٍ غَلَبَ مِنْ أَمْلَأِ
বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দ্বিতীয় বৃক্ষালো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। —(কুরআনী)

فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَاهُ وَفَعَلَهُ فَقَضَاهُ
— এই আয়তের অর্থ চুম্ব মারা। তখন বলা হয়, যখন কারও জবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। —(মাযহারী)

— এই আয়তের সারমর্ম এই যে, মূসা (আ) থেকে অনিষ্টায় প্রকাশিত কিংবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর মুয়াত্ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসূলত মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর শুনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিংবতী কাফির শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাফির ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যিকী তথা অধিক ছিল না এবং মূসা (আ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতোবছায় মূসা (আ) একে ‘শয়তানের কাজ’ ও শুনাহ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত সওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর যুরুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যিকীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শাস্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরক্তাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তি ও অবশ্য পালনীয় এবং বিরক্তাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার প্রাপ্তি।

কার্যগত চুক্তি একটি : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শাস্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হারালা করা অথবা কুটকরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ঘনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাঞ্চ ও আদান-প্রদানও এক প্রকার ক্ষার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরক্তাচরণ বৈধ নয়। হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইয়াম বুখারী ও অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম প্রবণের পূর্বে হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফিরের সাথে প্রক্রিয়াজ্ঞ হয়ে জীবন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন সম্পত্তি অধিকার করে নেন এবং

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে থান। তিনি কাফিরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **إِنَّمَا إِلَّا سَلَامٌ فَاقْبِلْ وَإِنَّمَا الْمَالُ فَلِسْتَ مَنْ فِي شَيْءٍ** আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ভাষা এরূপ : **إِنَّمَا السَّالِفُ فِيمَا غَدَرَ لِحَاجَةٍ لَنَا فِي بَعْدٍ** অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান ; কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেয় ইবনে হাজর বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের ধন-সম্পদ শাস্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েয় নয়। কেবল, এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা এক সাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চৃক্ষি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরয, সে কাফির হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফিরদের ধন-সম্পদ মুসলিমদের জন্য হালাল হয়। শাস্তিকালে যখন একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফিরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জারোয় নয়। বুখারীর টীকাকার কৃতৃলানী বলেন :

**أَنْ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِينَ إِنْ كَانَتْ مَغْنِيَةً عَنِّ الدُّقَرِ فَلَا يَحْلِلُ اخْذُهَا
عِنْدَ الْأَمْنِ فَلَا لِكَانَ الْإِنْسَانُ مَصْاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبٌ
فَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَاخْذُ الْمَالِ مَعَ ذَلِكَ غَدَرٌ حَرَامٌ إِلَّا إِنْ يَنْبَذِ الَّذِي هُمْ عَهْدُهُمْ
عَلَى سَوَاءِ -**

অর্থাৎ—নিষ্ঠয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুক্তবস্থায় হালাল; কিন্তু শাস্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফিরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোন কাফিরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে অর্ধ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চৃক্ষি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চৃক্ষির কারণে কিবর্তীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয় হতো না, কিন্তু হযরত মুসা (আ) তাকে আগে যারার ইচ্ছা করেন নি। বরং ইসরাইলী লোকটিকে তার যুদ্ধে থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা হস্তবন্ধ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবর্তী এভেই যারা পেল : মুসা (আ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কয় যাতার প্রহারও যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আয়ার জন্য জারোয় ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আঘাত দিয়ে ক্ষমা আর্দ্ধনা করেছেন।

জাতব্য : এটা হাকীমুল উচ্চত, মুজাহিদে যিন্নাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানজী (র)–এর সূচিতিত অভিস্ত, যা তিনি আরবী ভাষার ‘আহকামুল কোরআন’—সূরা কাসাস লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেবল,

১৩৬২ হিজরীর ২৩। রজব তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি... ...
রাজিউন।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিবরীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গম্বরণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করে না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহু তা'আলাৰ পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে মুসা (আ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ ধরণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে শুনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রহল-মা'আনী)

— قَالَ رَبُّهُ مَا أَنْفَثْتَ عَلَىٰ مِنْ أَكُونْ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ — হযরত মুসা (আ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহু তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করনার্থে আরয করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বুঝা গেল যে, মুসা (আ) যে ইসরাইলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ ধরণ করেছেন। হযরত ইবনে আবুস থেকে এ হলে (অপরাধী) এর তফসীরে (কাফির কাফির) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মুসা (আ) যে ইসরাইলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলিমান ছিল না, তবে মজল্লুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মুসা (আ)-এর এই উক্তি থেকে দুইটি মাস'আলা প্রমাণিত হয় :

১. মজল্লুম কাফির ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জারোয় নয়। আলিমগণ এই আয়াতদুষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে যত্নে অংশঘরণ বুঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীরীগুণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।—(রহল-মা'আনী) কাফির অথবা জালিমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পছন্দ বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকাহের ঘৃষাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কোরআন'-এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জানাবেষী বিষ্ণজন তা দেখে নিতে পারেন।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَعْصِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلُ
وَلَمَّا وَسَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَهُ
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرَاتٍ تَدْعُونَهُ ۝ قَالَ مَا يَحْبِبُكُمْ ۝ قَالُوا لَهُ
نَسْقِيٌّ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاعَ وَأَبُونَا شِيخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ

إِلَيْهِ الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَا أُنْزِلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ^(২৪) فَجَاءَتْهُ
 إِحْدًا هُنَّا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحِيَاءٍ^(২৫) قَالَتْ إِنِّي أَيْدِيْ يَدْ عَوْكَ لِيَعْزِيزَكَ
 أَجْرٌ مَا سَقَيْتَ لَنِّيْ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ^(২৬) قَالَ لَا تَغْفِيْ
 نَجْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(২৭) قَالَتْ إِحْدًا هُنَّا يَأْتِيْ أَسْتَاجْرَةً إِنَّ خَيْرَ
 مِنْ أَسْتَاجْرَةِ الْقَوْمِ الْأَمِينِ^(২৮) قَالَ إِنِّيْ أَرِيدُ أَنْ أَنْجَعَكَ إِحْدَى
 أَبْنَيَّ هَتَّيْنِ عَلَى أَنْ تَاجِرَنِيْ شَيْئًا حِجَّاجٌ^(২৯) فَإِنْ أَتَمْتَ عَشْرًا فَإِنْ
 عِنْدِكَ^(৩০) وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقُّ عَلَيْكَ سَتَّاجْرَةً^(৩১) إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الظَّالِمِينَ^(৩২) قَالَ ذَلِكَ بِيَتْنَى وَبِيَتَكَ^(৩৩) أَيْمَانُ الْأَجْلِينَ قَضَيْتُ
 فَلَا عُذْ وَإِنَّ عَلَى مَانِقُولٍ وَكِيلٍ^(৩৪)

(২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিযুক্তে রওমানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌছলেন, তখন কৃপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্মদেরকে পানি পান করার কাজে রংত। এবং তাদের পাচাতে দুইজন ঝীলোককে দেখলেন, তারা তাদের জন্মদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্মদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালুম্বা তাদের জন্মদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা শুই বৃক। (২৪) অতঃপর মুসা তাদের জন্মদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নথিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষি। (২৫) অতঃপর বালিকাদের একজন সজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকহেন যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরুকার প্রদান করেন। অতঃপর মুসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভর করো না, তুমি জালিয় সম্পদাদারের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদের একজন বলল, পিতঃ, তাকে ঢাকু নিযুক্ত করল। কেননা, আপনার ঢাকু হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।

(২৭) পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যারের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সহকর্মীরাখ পাবে। (২৮) মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি হিল হলো। দুইটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিজ্ঞে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর উপর ভরসা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বখন মূসা [(আ)] এই দোয়া করে আল্লাহর উপর ভরসা করে একদিকে রওয়ানা হলেন এবং অদৃশ্য ইঙ্গিতে মাদইয়ান অভিযুক্ত যাত্রা করলেন, তখন যেহেতু পথ জানা ছিল না, তাই ঘনোবল ও ঘনস্ফুটির জন্য নিজে নিজেই বললেন, আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন (সেমতে তাই হলো এবং তিনি মাদইয়ান পৌছে গেলেন)। এবং যখন মাদইয়ানের কৃপের ধারে পৌছলেন, তখন তাতে (বিভিন্ন) লোকজনের একটি দলকে দেখলেন, তারা (কৃপ থেকে তুলে তুলে জন্মদেরকে) পানি পান করাছে এবং তাদের পশ্চাতে দুইজন ঝীলোককে দেখলেন তারা (তাদের ভেড়াওলোকে) আগলিয়ে রাখছে। মূসা [(আ)] তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার ? তারা বলল (আমাদের অভ্যাস এই যে,) আমরা আমাদের জন্মদেরকে তত্ত্বণ পানি পান করাই না, যতক্ষণ না এই রাখলরা পানি পান করিয়ে (জন্মদেরকে) সরিয়ে নিয়ে যায়। (একে তো লজ্জার কারণে, বিভীত পুরুষদেরকে হচ্ছিয়ে দেওয়া আমাদের মতো অবলাদের পক্ষে সত্ত্বপূর্ণ নয়)। এবং (এই অবস্থায় আমরা আসতামও না; কিন্তু) আমাদের পিতা খুবই বৃক্ষ। (কাজের আর কোন লোকও নেই। কাজটি জরুরী। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে আসতে হয়।) অতঃপর (এ কথা শনে) মূসা [(আ)]-এর মনে দয়ার উদ্দেশ্য হয় এবং তিনি তাদের জন্যে (পানি তুলে তাদের জন্মদেরকে) পান করালেন (এবং তাদেরকে প্রতীক্ষা ও পানি তোলার কষ্ট থেকে বাঁচালেন)। অতঃপর (আল্লাহর দরবারে) দোয়া করলেন, হে আমার পালনকর্তা, (এ সময়) আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই (ক্ষম হোক কিংবা বেশি) নাখিল করবেন, আমি তার (তীক্ষ্ণ) মুখাপেক্ষী। (কেননা এই সফরে তিনি পানাহারের কিছুই পাননি। আল্লাহ তাঁরাকা এবং এই ব্যবস্থা করলেন যে রমণীদের গৃহে পৌছলে পিতা তাদেরকে অঙ্গভাবিক শীত্র চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা সমুদয় ঘটনা তুলে বলল। অতঃপর তিনি এক কন্যাকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন) মূসা (আ)-এর কাছে রমণীদের একজন সজ্জাজড়িত পদক্ষেপে আগমন করল; (এটা সম্ভাল পরিবারের ব্যাভাবিক অবস্থা। এসে) বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদের জন্য (আমাদের জন্মদেরকে) পানি পান করিয়েছেন, তার পুনর্মুক্ত প্রদান করেন। [কন্যা হয়তো পিতার অভ্যাস থেকে একথা জেনে থাকবে। কারণ, তার পিতা অনুগ্রহের প্রতিদান দিতেন। মূসা (আ) সঙে চললেন। তবে কাজের বিনিয়ন প্রাণে করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু এই বেগতিক অবস্থায় তিনি শাস্তির জায়গা ও একজন সহস্য সঙ্গীর অবশ্যই প্রত্যাশী ছিলেন। কুধার তীব্রভাবে যাওয়ার অন্যত্যও কারণ হলে

দোষ নেই। পারিশ্রমিকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আতিথেয়তার অনুরোধও নিরাগ্রহে প্রযোজনের সময় তদ্ব ও সন্তোষ লোকের কাছে অপমানের কথা নয়। অপরের অনুরোধে আতিথেয়তা অঙ্গ কর্তৃতে তো কোন কথাই নাই। পথিমধ্যে মূসা (আ) রমশীকে বললেন, তুমি আমার পচাতে আগমন কর। আমি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। বেগনা নারীকে কিন্তু কারণে বিন্দু ইচ্ছায়ও দেখা পছন্দ করি না। ঘোটকপা, এভাবে তিনি মৃত্যের কাছে পৌছলেন।] অতঃপর মূসা (আ) যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত কৃজ্ঞান বর্ণনা করলেন; তখন তিনি (সাম্মান দিলেন-এবং)-বললেন, (আর) আশংকা করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। [কেননা, এই স্থানে ফিরাউনের শাসন চলত না।—(জহল-মা'আনী)] বালিকাদায়ের একজন বলল, আক্রমাজান, (আপনার তো একজন লোক দরকার। আমরা প্রাণবন্ধক হয়ে গেছি। এখন গৃহে থাকা উচিত। অতএব) আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, উত্তম চাকর সে-ই, যে শক্তিশালী (ও) বিশ্বস্ত। (তাঁর মধ্যে উভয় শুণ বিদ্যমান আছে। পানি তেলা দেখে শক্তির পরিচয় এবং পথিমধ্যে নারীকে পচাতে আগমনের কথা বলা থেকে বিশ্বস্তভার পরিচয় পাওয়া গেছে। সে এ কথা তার পিতার কাছেও বর্ণনা করেছিল।) পিতা [মূসা (আ)-কে] বললেন, আমি আমার এই কন্যাদায়ের একজনকে তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরি করবে। (এই বিবাহই চাকরির প্রতিসন্দান। অর্থাৎ আট বছরের চাকরি এই বিবাহের মোহর্রানা।) অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা (অর্থাৎ অনুযোগ। আমার পক্ষ থেকে জবরদস্তি নেই।) আমি (এ ব্যাপারে) তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। (অর্থাৎ কাজ মেওয়া সময়ের অনুবর্তিতা ইত্যাদি ব্যাপারে সহজ আচরণ করব।) আস্থাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। [মূসা (আ) সম্ভত হলেন এবং] বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা (পাকাপাকি) হয়ে গেল। ক্ষুরিটি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিকল্পে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, আস্থাহ তা'আলা তার সাক্ষী (তাঁকে হাযির-নাথির জেনে ছুঁড়ি পূর্ণ করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ—**শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান।** মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফিরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনিয়েল। মূসা (আ) ফিরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্বাবনের বাভাবিক আশংকা বোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহ্য, এই আশংকাবোধ নবৃত্ত ও তোওয়াকুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সভবত এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মূসা (আ)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মূসা (আ) সম্পূর্ণ নিঃসন্ধান অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাজ্ঞীও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আস্থাহুর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, —عَسَى رَبِّي أَنْ يُمْكِنَنِي سَوَاءَ السَّيْفِ—অর্থাৎ আশা করি আমার

পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবৃল করলেন। তফসীরকারগণ বর্ণনা করেন এই সফরে মুসা (আ)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হ্যারত ইবনে আবাস বলেন, এটা ছিল মুসা (আ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহার একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا مِنْ مَدِينٍ وَلِمَا يَرْوَى مِنْهُنَّ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْمَةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্মদেরকে পানি পান করাত। وَجَدَ
অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগলাকে পানির
দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে যিশে না
যায়।

খন্দের অর্থ — قَالَ مَا خَطَبُكُمَا فَأَنْتَا لَا تَسْقُنَ حَتَّى يُمْسِرَ الرِّعَاءَ وَابْنُ نَاثِيَّعَ كَبِيرٌ
শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মুসা (আ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি
ব্যাপার ? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? অন্যদের
ন্যায় কৃপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন ? তারা জওয়াব দিল, আমাদের
অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আস্তরক্ষণ জন্য ছাগলগুলোকে
পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কৃপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা
ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন
পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে ? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের
জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃক্ষ। তিনি এ কাজ করতে
পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি শুল্কপূর্ণ বিষয় জানা গেল : (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য
করা পয়গঞ্চরণের সুন্তত। মুসা (আ) দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি
পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন।
(২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোন অনর্থের
আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয়
ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত
করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও
স্বত্বাবগত শুল্ক ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিধ্যমান ছিল। এ কারণেই
রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই
কষ্ট দ্বীকার করেছে। (৪) এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনও
পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওপর বর্ণনা করেছে।

فَسْقَى لَهُمَا
অর্থাৎ মুসা (আ) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কৃপ থেকে পানি তুলে
তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস
ছিল যে, তারা জন্মদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কৃপের মুখ বন্ধ
করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্চিষ্ঠ পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দশজনে
মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু মুসা (আ) একাই পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কৃপ থেকে পানি
যাবারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৭৯

উভোলন করেন। সম্বত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মূসা (আ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী।—**(কুরআনী)**

—**لَمْ يُرِيَ إِلَى الظُّلُمَ فَقَالَ رَبُّهُ أَنِّي بِأَنِّي لَمْ يُرِيَ إِلَى خَيْرٍ فَفَيْرِ**—মূসা (আ) সাত দিন থেকে কোন কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ্ তা'আলাৰ সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূচনা পদ্ধতি। শুধুটি কোন কোন সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন **إِنْ تُرَكْ خَيْرَانِ الرَّصْبَةِ** আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে : যেমন **أَمْ خَيْرٌ أَمْ قُوَّةٌ**—আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহাৰ। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য।—**(কুরআনী)**

—**فَجَاءَتْ أَخْدَمَةَ قَمْشِيَّ عَلَى اسْتِحْيَا**—কোরআনী সীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ : রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ি পৌছে গেলে বৃক্ষ পিতা এর কারণ জিজেস করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, সোকটি অনুযাহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবজীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা হিধায় কথাবার্তা বলত না। প্রয়োজনবশত সেখানে পৌছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখযন্ত্র আবৃত করে কথা বলেছে। তফসীরে আরও বলা হয়েছে যে, মূসা (আ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পচাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহ্য্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাক্কাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্বত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তফসীরকারকগণ অতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হ্যরত শোয়ায়ব (আ); যেমন এক আয়াতে আছে : **وَإِلَيْ مُنَّينَ أَخَاهُمْ شَعِيبٌ**—**(কুরআনী)**

—**إِنْ أَبِي يَدْعُونَ**—বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তাঁর পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে ব্যবহার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

—**إِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَاجَرْتَ الْقَوْيُ الْأَمِينُ**—অর্থাৎ শোয়ায়ব (আ)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরম্ভ করল; গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দুইটি শুণ থাকা আবশ্যিক। এক, কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং দুই, বিশ্বস্ততা। জামরা পাথৰ তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সামর্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পচাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোন চাকরি অধৰা পদ ন্যাস্ত করার জন্য জন্মগ্রী শৰ্ত দুইটি : হ্যরত শোয়ায়ব (আ)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ্ তা'আলা অভ্যন্তর বিজ্ঞসূলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা

হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ঝঁকেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসম্মতের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘূষ, বজ্জনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আফসোস! এই কোরআনী পথ নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

—**أَنْتَ أَرْبَدْتَنِي أَنْكَحْتَنِي اِنْتَ أَنْكَحْتَنِي**—অর্থাৎ বালিকাদের পিতা হ্যরত শোয়ায়ব (আ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হ্যরত মুসা (আ)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপর্যুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিবাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নাত। উদাহরণত হ্যরত উমর (রা) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হ্যরত আবু বকর (রা) ও হ্যরত উসমান গনি (রা)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন।—(কুরআনী)

হ্যরত শোয়ায়ব (আ) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেন নি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোন একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজ্জাব করুল ও সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিয়য়ে ভূমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। মুসা (আ) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে তৃতীয়সূত্রে আবক্ষ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বুঝা যায়। কোরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একপ সম্বেদ অযুক্ত যে, বিবাহিত স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরণে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিতি ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরণে সংঘটিত হলো? —(ঝুল মাইনী, বয়ানুল কোরআন)

—**عَلَى أَنْ تُجْرِيَنِي مُسَانِي حَجَّ**—এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কি না, এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আহকামুল কোরআনের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, মোহরানার এই ব্যাপারটি মোহাম্মদী শরীয়তে জায়েয় না হলেও শোয়ায়ব (আ)-এর শরীয়তে জায়েয় ছিল। বিভিন্ন শরীয়তে এ ধরনের শার্খাগত পার্থক্য হওয়া কোরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়; যেমন পশ্চাত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি—এ ধরনের কাজে ইজ্জারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে এই চাকরিকে মোহরানা করা জায়েয়; যেমন আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিচ্ছায় জরুরী। কাজেই একে মোহরানা গণ্য করা জায়েয়।—(বাদায়ে)

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর পিতা অথবা অন্য কোন বজ্জনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানা অর্থ হাতে হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না।

আলোচ্য ঘটনায় শব্দ সাক্ষ দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল শিতা লাভ করেছেন। এটা ঝীর মোহরানা কিন্তু পে হতে পারে; উভর এই যে, প্রথমত এটাও সন্তুষ্পর যে, এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি মূসা (আ) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার যিন্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরী হয় তবে মোহরানার এই টাকা কল্যার হয়ে যাবে এবং কল্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহ্য্য, আলোচ্য ব্যাপারটি কল্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

আস'আলা : **فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا**
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي أَنْتُ نَارٌ عَلَىٰ أَتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أُوْجَدْ وَهُوَ
مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ④ فَلَمَّا آتَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمْوَسَى إِنِّي
أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ⑤ وَأَنَّ أَنْقَعَ عَصَالَةً طَقْلَمَارَاهَا تَهْزَ كَانَهَا
جَاءَتِي وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعْقِبْ بِي مُوسَى أَقِيلُ وَلَا تَحْفُ فَإِنَّكَ
مِنَ الْأَلْمِنِينَ ⑥ أُسْلُكْ يَدِكَ فِي جَيْلِكَ تَخْرُجْ بِيَضَّاءَ مِنْ
غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمَمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بِرَهَانِ مِنْ رَبِّكَ
إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَائِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَا فِسْقِيْنِ ⑦ قَالَ رَبِّي قَتَلْتُ
مِنْهُمْ نَفْسًا كَآخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑧ وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَصْحَمِي

لَسَأَنِّي فَارِسُ سُلْطَنٍ مَعِيْ رُدْدًا يُصَدِّقُنِي زَانِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ④
 قَالَ سَنَشِدُ عَضْدَكَ بِإِخْرِيْكَ وَنَجَعَلُ لَكُمْ سُلْطَنًا فَلَا يُصَلُّونَ
 إِلَيْكُمَا هُنَّ يَأْتِيْنَا هُنَّ أَنْهَمَا وَمِنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَلِبُونَ ⑤

(২৯) অতঃপর মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সভ্বত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জুলন্ত কাঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোছাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপভ্যক্তার ভান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হলো, ভূমি তোমার লাঠি নিকেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ম্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন কিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং তয় করো না। তোমার কোন আশঁকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং তয় হেচু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দুইটি কিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিচয় তারা পাপাচারী সম্মাদায়। (৩৩) মূসা বলল, হে আয়ার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি তয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আয়ার ভাই হাকুম, সে আয়া অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাবী। অতএব তাকে আয়ার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশঁকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। আয়ার নির্দর্শনাবশীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মূসা (আ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং [শোয়ায়ব (আ)-এর অনুমতিক্রমে] সপরিবারে (মিসরে অথবা শাহদেশে) যাত্রা করলেন, তখন (শীতের রাতে অজানা পথে) তিনি তুর পর্বতের দিক থেকে (একটা আলো তথা) আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা (এখানেই) অপেক্ষা কর। আমি আগুন দেখেছি (আমি সেখানে যাই) সভ্বত আমি সেখান থেকে (পথের) কোন খবর নিয়ে আসব অথবা জুলন্ত

কাঠখণ্ড তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন তিনি আগুনের কাছে গেলেন, তখন উপত্যকার ডান প্রাণ হতে [যা মূসা আ-এর ডান দিক ছিল] পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে আওয়াজ দেওয়া হলো, হে মূসা, আমিই আল্লাহ-বিশ্ব পালনকর্তা। আর(ও বলা হলো) তুমি তোমার লাঠি নিঙ্কেপ কর (তিনি লাঠি নিঙ্কেপ করতেই তা সর্প হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল)। অতঃপর তিনি যখন লাঠিকে সর্পের ন্যায় হেলতে-দুলতে দেখলেন, তখন মুখ ফিরিয়ে পাল্লাতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (আদেশ হলো,) হে মূসা, সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। (এটা ভয়ের বিষয় নয়; বরং তোমার মু'জিয়া। আরেকটি মু'জিয়া লও) তোমার হাত বগলে রাখ (এরপর বের কর) তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে (লাঠির রূপান্তরের ন্যায় এই মু'জিয়া দেখতে যদি ভয় পাও, তবে) ভয় (দ্রীকরণ) হেতু তোমার (সেই) হাত (পুনরায়) তোমার (বগলের) উপর চেপে ধর (যাতে সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এবং স্বাভাবিক ভয়ও না হয়।) এই দুইটি ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি (যাদের কাছে যাওয়ার আদেশ তোমাকে করা হচ্ছে) তোমার পালনকর্তার তরক থেকে প্রমাণ। নিচয় তারা পাপাচারী সম্পদায়। মূসা (আ) বলেন, হে আমার পালনকর্তা, (আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন। কেননা) আমি তাদের এক ব্যক্তিকে খুন করেছিলাম। কাজেই আমার ভয় যে, তারা (পূর্বেই) আমাকে হত্যা করবে (ফলে, প্রচার কার্যও হতে পারবে না)। এবং (দ্বিতীয় কথা এই যে, আমার মুখও তত চালু নয়।) আমার ভাই হাজুন আমা অপেক্ষা অধিক প্রাঞ্জলভাষী। আগনি তাকেও আমার সাহায্যকারী করে আমার সাথে রিসালাত দান করুন। সে আমার (বক্তব্যের) সমর্থন (বিস্তারিত ও পুরোপুরিভাবে) করবে। (কেননা) আমি আশংকা করি যে, তারা (অর্থাৎ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ) আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (তখন বিতর্কের প্রয়োজন হবে। মৌখিক বিতর্কের জন্য প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত।) আল্লাহ বললেন, (ভাল কথা) আমি এখনই তোমার ভাইকে তোমার বাহ্যিক করে দিচ্ছি (এক অনুরোধ এভাবে পূর্ণ হলো) এবং (দ্বিতীয় অনুরোধ সম্পর্কে বলা হলো) আমি তোমাদের উভয়কে বিশেষ প্রাধান্য দান করব। ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। (সুতরাং আমার নির্দেশনাবলী নিয়ে যাও। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা (তাদের উপর) প্রবল থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— মুসাঁ ফাতেমী — অর্থাৎ মূসা (আ) যখন চাকরির নির্দিষ্ট আট বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মূসা (আ) আট বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের, সহীহ বুখারীতে আছে ইবনে আবাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও প্রাপককে তার প্রাপ্ত্যের চাইতে বেশি দিতেন এবং তিনি উভয়কেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরি, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ দ্বীকার করবে।

—এই বিষয়বস্তু সূরা তোমাহা ও
নূরী অন্বের মন্ত্রের পাদান্তরে (الى) অন্ত অন্ত রবِّ الْعَالَمِينَ
সূরা নামলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোমাহা অন্ত অন্ত রবِّ
এবং আলোচ্য সূরায় অন্ত অন্ত রবِّ الْعَالَمِينَ
অব্যাক্ত এসব
আয়াতের ভাষা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায়
টটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজাল্লী ছিল-রূপক তাজাল্লী। কারণ, সন্তাগত
তাজাল্লী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সন্তাগত তাজাল্লীর দিক দিয়ে ব্রহ্ম
মূসা (আ)-কে তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না—যানে,
আমার সন্তাকে দেখতে পারবে না।

সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায় :—তুর পর্বতের এই স্থানকে
কোরআন পাক 'বরকতময় ভূমি' বলেছে। বলা বাহ্য। এর বরকতময় হওয়ার কারণ
আল্লাহর তাজাল্লী, যা আগনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল
যে, যে স্থানে কোন উরুবৃপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

ওয়ায়ে বিতর্কতা ও প্রাঞ্জলতা কাম্য :—মুাফিস্খ মিন্নি سَأَتْ
—এ থেকে জানা গেল যে,
ওয়ায়ে ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে
প্রচেষ্টা চলানো নিন্দনীয় নয়।

فَلَيَّا جَاءُهُمْ مُوسَىٰ بِإِيمَانًا بِئْنَتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سُحُرٌ مُفْتَرٌ وَمَا
سِعْنَا بِهِنَّا فِي أَبَابِنَا الْأَوَّلِينَ ① وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ
جَاءَهُ بِالْهُدًى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ طَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ② وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَائِكَةُ أَعْلَمُ لَكُمْ مِنْ أَنْ أَلِمْ
غَيْرِي ۝ فَأَوْقِدُ لِيْ يَهَامِنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِيْ صَرْحًا عَلِيًّا
أَطْلِمُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَا أَظْنَهُ مِنَ الْكَذِّابِينَ ③ وَأَسْتَكْبِرُ
هُوَ وَجِنْدَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ④
فَأَخَذْنَاهُ وَجِنْدَهُ فَنَبَذْ نَهْمُو فِي الْيَمِّ فَانْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ⑤ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الشَّأْمِ ۝ وَيَوْمَ

**الْقِيمَةُ لَا يُنْصَرُونَ ④٥ وَابْتَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِعْنَةً ۚ وَيُوْمٌ
الْقِيمَةُ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ④٦**

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌছল, তখন তারা বলল, এ তো অঙ্গীক জানু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা উনিনি। (৩৭) মূসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন, যে তাঁর নিকট থেকে হিদায়াতের কথা নিয়ে আগমন করেছে, এবং যে প্রাণ হবে পরকালের গৃহ। নিচয় জালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যক্তিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে দামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে শাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে অক্ষয়বণ্ণিত হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে শাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিষ্কেপ করলাম। অতএব দেখ, জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহানার্থের দিকে আহবান করত। কিম্বামতের দিন তারা সাহায্য প্রাণ হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পাঞ্চাতে সাগিয়ে দিয়েছি এবং কিম্বামতের দিন তারা হবে দুর্দশাপ্রতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মূসা (আ) তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলেন, তখন তারা (মু'জিয়াসমূহ দেখে) বলল, এ তো এক জাদু, যা (মিছামিছি আল্লাহর প্রতি) আরোপ করা হচ্ছে (যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে মু'জিয়া ও রিসালাতের প্রমাণ)। আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের কালে এরূপ কথা কখনও উনিনি। (মূসা (আ) বললেন, (বিশুদ্ধ প্রমাণাদি কায়েম হওয়া এবং তাতে কোন সংক্ষত আপত্তি উত্থাপন করতে না পারার পরও যখন মান না তখন এটা হঠকারিতা। এর সর্বশেষ জওয়াব এই যে,) আমার পালনকর্তা সম্যক অবগত আছেন যে, তাঁর কাছ থেকে কে সত্য ধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কার পরিণতি এ জগত (দুনিয়া) থেকে শুভ হবে। নিচয় জালিমরা (যারা হিদায়াত ও সত্য ধর্মে কায়েম নয়) কখনও সফলকাম হবে না। [কেননা, তাদের পরিণাম শুভ হবে না। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কে হিদায়াতপ্রাপ্ত, কে জালিম এবং কার পরিণাম শুভ, কার পরিণাম ব্যর্থতা। সুতরাং মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের অবস্থা ও পরিণতি প্রকাশ পাবে। এখন না মানলে তোমরা জান। মূসা (আ)-এর নিদর্শনাবলী দেখে ও উনে] ফিরাউন (আশংকা করল যে, তার ভক্তবৃন্দ নাকি মূসার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবাইকে একত্রিত করে) বলল, হে

পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যক্তিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। (এরপর বিভাষিত সৃষ্টির জন্য তার উয়িরকে বলল, যদি এতে তাদের মনে শাস্তি না আসে, তবে) হে হামান, তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও অতঙ্গপর (এই পাকা ইট দ্বারা) আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, যাতে আমি (তাতে উঠে) মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। (আমি ব্যক্তিত অন্য উপাস্য আছে—মূসার এই দাবিতে) আমি তো তাকে পৃথিবীবাদীই মনে করি। ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে রেখেছিল এবং তারা মনে করত যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঙ্গপর (এই অহংকারের শাস্তি-স্বরূপ) আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করে দিলাম) অতএব দেখ, জালিমদের পরিণতি কি হয়েছে! (মূসা (আ)-এর এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পেল যে, مَنْ تَكُونَ لِهِ عَاقِبَةُ الدُّرُّ إِنَّمَا يُلْعَجُ الطَّالِبُونَ আমি তাদেরকে এমন নেতৃত্ব করেছিলাম, যারা (মানুষকে) জাহানামের দিকে আহবান করত এবং (এ কারণেই) কিয়ামতের দিন (অসহায় হয়ে পড়বে) তাদের কোন সহায় থাকবে না। (তারা ইহকালে ও পরকালে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। সেমত) আমি এই পৃথিবীতে অভিশাপকে তাদের পক্ষাতে সাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও তারা দুর্দশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ୍ୟ ବିଷୟ

—فَأَوْ قَدْلَنْ يَا مَامَانْ عَلَى الطَّيْنِ
কিরাউন সুউচ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল।
তাই সে উধির হামানকে আটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কঁচা ইট
প্রাপ্ত বিশাল ও সুউচ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফিরাউনের এই
ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফিরাউন এটা আবিক্ষা করেছে।
ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিট্টী
যোগাড় করল। মজুর এবং কঠ ও লোহার কাজ যারা করত তাদের সংখ্যা ছিল এর
অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ
কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পর আল্লাহ তা'আলা জিবরাইলকে
আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাং করে দিলেন। ফলে
ফিরাউনের হাজারো সিগাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে।—(কুরআনী)

—অর্থাৎ আহান্ত তা'আলা ফিরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ
ও জাতির নেতা কর্রে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভাস্তু নেতাবাঁ জাতিকে আহান্তামের দিকে
আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার আহান্তামের দিকে আহবান করাকে ঝপক
অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্তাম বলে কুফরী কাজকর্ম বুঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল
জাহান্তাম ভোগ করা। কিন্তু মওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর সুচিপ্রিয়
অভিযন্ত। (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হবহ কাজকর্ম পরিকালের প্রতিদান
হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযথে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন
করে পদার্থের ঝপ ধারণ করবে। সংকর্মসমূহ পুল ও পুঁজোদান হয়ে জাহান্তের নিয়মাতে
পর্যবসিত হবে এবং কুফর যুদ্ধের কর্মসমূহ সর্ব, বিজ্ঞ এবং নানাকরম আবাবের আকৃতি

ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও যুদ্ধের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও যুদ্ধ জাহান্নাম তথা আগন্তের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন ক্লপকতা নেই। এই অভিযন্ত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে ক্লপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণত এবং **وَجَدُوا مَاعِلًا حَاضِرًا** : ৪২ আয়াতে এবং **مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا** : ৩৫ আয়াতে।

شব্দের বহুবচন অর্থাৎ বিকৃত। উদেশ্য **مَقْبُوحِينَ** — **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَنْ مَقْبُوحِينَ** এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের যুখমঙ্গল বিকৃত হয়ে কালবর্ষ এবং চক্ষু নীলবর্ষ ধারণ করবে।

**وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونُ
الْأُولَى بِصَاحَبِ الرِّسَالَةِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ৪১
**وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبَى إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّهِيدِينَ** ৪২ **وَلِكُنَّا أَنْشَأْنَا قَرْوَنِي فَتَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْعَرْجَةِ وَمَا كُنْتَ
ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنٍ تَتَلَوَّ عَلَيْهِمُ أَيْتَنَا لَوْلِكُنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ** ৪৩
**وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِكُنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ
قَوْمًا مَا أَتَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لِعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** ৪৪
وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ إِيمَانَكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ৪৫
**فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَاتَلُوا إِلَّا أُوتَيْتَ مِثْلَ مَا أُوتَيَ
مُوسَى أَوْلَمْ يَكْفُرُ وَإِبْرَاهِيمَ أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ؟ قَالُوا سَاحِرُونَ
تَظْهَرَ أَقْتَهُ وَقَاتَلُوا إِنَّا بِكُلِّ كُفَّارٍ** ৪৬

اللَّهُ هُوَ أَهْلُى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُ صَدِيقُهُ ⑧ فَإِنْ لَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ
 أَتَيْمَهُوَنَّ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي النَّقْوَمَ
 الظَّلِيمِينَ ⑨ وَلَقَدْ وَصَلَنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعْنَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ⑩

(৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ঝর্স করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত, যাতে তারা স্বরূপ জাণে। (৪৪) মুসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম থাণ্ডে হিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও হিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদাইয়ানবাসীদের মধ্যে হিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মুসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে হিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রহমত স্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা স্বরূপ জাণে। (৪৭) আর এজন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশ্বাস হ্রাপনকারী হয়ে বেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মুসাকে যেন দেয়া হয়েছিল, এই রাসূলকে সেন্঱প দেয়া হলো না কেন? পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অবীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরম্পরার একান্ধ। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে যানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব আন, যা এতদৃতর থেকে উভয় পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা তখুন নিজের অবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ অবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথচারী আর কে? নিচৰ আল্লাহ জালিয় সম্প্রদায়কে পথ দেখান মা। (৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুক্তি বাণী পৌছিয়েছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত জরুরী বিধায় চিরকালই প্রয়গস্বর প্রেরণ করা

হয়েছে। সে মতে) আমি মূসা (আ)-কে (যার কাহিনী এইমাত্র বর্ণিত হলো) পূর্ববর্তী উক্তদের অর্থাৎ কওমে নৃ, আদ ও সামুদ্রের) ধর্মস্থানে হওয়ার পর (যখন সে সময়কার পর্যবেক্ষণের শিক্ষা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল, ফলে তারা হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল) কিন্তব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছি, যা মানুষের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমত ছিল, তাতে তারা (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে। (সত্যার্থীর প্রথমে বোধ শক্তি সঠিক হয়। এটা অস্তর্জন। এরপর সে বিধানাবলী করুল করে। এটা হিদায়াত। এরপর হিদায়াতের ফল অর্থাৎ নৈকট্য ও করুল দান করা হয়। এটা রহমত। এমনিভাবে যখন এই যুগও শেষ হয়ে গেল এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল, তখন আমি আমার চিরস্তন স্তৰ্ণি অনুযায়ী আপনাকে রাসূল করেছি। এর প্রয়াগাদির মধ্যে একটি হচ্ছে মূসা (আ)-এর ঘটনার নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করা। কেননা, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য জ্ঞানলাভের কোন-না-কোন উপায় জরুরী। এরপ উপায় চারটিই হতে পারে। ১. বৃক্ষিগত বিষয়াদির মধ্যে বৃক্ষ। মূসা (আ)-এর ঘটনা বৃক্ষিগত বিষয় নয়। ২. ইতিহাসগত বিষয়াদির মধ্যে জ্ঞানীদের কাছ থেকে শ্রবণ। রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞানীদের সাথে উঠাবসা, যেলামেশা ও জ্ঞানচর্চা করেননি। কাজেই এই উপায়ও অনুপস্থিত। ৩. প্রত্যক্ষ দর্শন। এটা অনুপস্থিত, তা বলাই বাহ্য। সেমতে এটা জ্ঞান কথা (যে,) আপনি (তুর পর্বতের) পাচিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি মূসা (আ)-কে বিধানাবলী দিয়েছিলাম (অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম)। তাদের মধ্যেও ছিলেন না, যারা (সেই যুগে) বিদ্যমান ছিল। (সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শনের সম্ভব্যতা রহিত হয়ে গেল); কিন্তু (ব্যাপার এই যে,) আমি [মূসা (আ)-এর পর] অনেক সম্মানের সূচি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। (ফলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আবার দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং মানুষ পুনরায় হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়। মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ আগমন করেছেন বটে; কিন্তু তাদের শিক্ষাও এমনিভাবে দুর্লভ হয়ে যায়। তাই আমি স্বীয় রহমত আপনাকে ওহী ও রিসালাত দ্বারা ভূষিত করেছি। এটা নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চতুর্থ উপায়। অন্যান্য উপায় দ্বারা ধারণাগত জ্ঞান অর্জিত হয়, যা এখানে আলোচ্য বিষয়ই নয়। কেননা, আপনার পরিবেশিত সংবাদসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য। সারকথা এই যে, নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশনের চারটি উপায়ের মধ্য থেকে তিনিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং চতুর্থটিই নিদিষ্ট হয়ে গেল এবং এটাই কাম্য। আপনি যেমন তওরাত প্রদান প্রত্যক্ষ করেননি, এর পরও বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত সংবাদ পরিবেশন করছেন, এমনিভাবে আপনি মূসা (আ)-এর মাদইয়ানে অবস্থানও দেখেননি। সেমতে এটা জ্ঞান কথা (যে,) আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যেও অবস্থানকারী ছিলেন না যে, আপনি (সেখানকার অবস্থা দেখে সেই অবস্থা সম্পর্কে) আমার আয়তসমূহ (আপনার সমসাময়িক) লোকদেরকে পাঠ করে শনাচ্ছেন; কিন্তু আমিই (আপনাকে) রাসূল করেছি। (রাসূল করার পর এসব ঘটনা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছি। এমনিভাবে) আপনি তুর পর্বতের (পচিম) পার্শ্বে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি [মূসা (আ)-কে] আওয়াজ দিয়েছিলাম (যে, **إِنَّمَا مُوسَى لِيَأْتِي أَنَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنَّ الَّذِي عَصَمَ**—এটা ছিল তাঁকে নবুরত দান করার সময়।) কিন্তু (এ বিষয়ের জ্ঞানও এমনিভাবে অর্জিত হয়েছে যে,) আপনি আপনার

পালনকর্তার রহমতবৃক্ষণ নবী হয়েছেন, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমসাময়িক লোকেরা বরং তাদের নিকটতম পূর্বপুরুষগণ কোন পয়গম্বর দেখেনি, যদিও শরীয়তের কোন কোন বিধান বিশেষত, তাওয়ীদ পরোক্ষভাবে তাদের কাছেও পৌছেছিল। সুতরাং **رَسُولُنَا** **وَلَقَدْ بَعَثْنَا** **فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا** আয়াতের সাথে কোন বৈপরীত্য রইল না।) আর (তারা সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারে যে, পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে আমার কোন উপকার নেই; বরং উপকার তাদেরই। তারা ভাল মন্দ সম্পর্কে অবগত হয়ে শাস্তির কবল থেকে বাঁচতে পারে। নতুনা যেসব মন্দ বিষয় জ্ঞানবৃক্ষি দ্বারা জানা যায়, সেগুলোর জন্য পরগম্বর প্রেরণ ব্যতিরেকেও শাস্তি হওয়া সম্ভবপ্র ছিল; কিন্তু তখন তারা পরিতাপ করত যে হায়। রাসূল আগমন করলে আমরা অধিক সতর্ক হতাম এবং এই বিপদের সম্মুখীন হতাম না; তাই রাসূলও প্রেরণ করেছি, যাতে এই অনুতাপ থেকে আঘাতকা করা সহজ হয়। নতুনা সজ্ঞাবনা ছিল যে,) আমি রাসূল নাও পাঠ্টাম, যদি এক্ষণ না হতো যে, তাদের কৃতকর্মের জন্য (যা মন্দ হওয়া বোধগম্য) তাদের কোন বিপদ (দুনিয়াতে অথবা পরকালে) হলে (যার সম্পর্কে বৃক্ষি অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে তারা নিশ্চিত জানতে পারত যে, এটা কৃতকর্মের শাস্তি) তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার বিধানসম্মতের অনুসরণ করতাম এবং (বিধানাবলী ও পরগম্বরের প্রতি) বিশ্বাসী হতাম। অতঃপর (এর দাবি ছিল এই যে, রাসূলের আগমনকে তারা সুযোগ মনে করত এবং সত্য ধর্ম কবৃল করে নিত; কিন্তু তাদের অবস্থা হয়েছে এই যে,) যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে সত্য (অর্থাৎ সত্য রাসূল ও সত্য ধর্ম) আগমন করল, তখন (তাতে আপনি তোলার জন্য) তারা বলল, মুসা (আ)-কে যেকুপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেকুপ কিতাব কেন দেওয়া হলো না (অর্থাৎ তওরাতের মত কোরআন এক দফায় নাখিল হলো না কেন? এরপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) পূর্বে মুসা (আ)-কে যা (অর্থাৎ যে কিতাব) দেওয়া হয়েছিল, তারা কি তা অঙ্গীকার করেনি? [সেমতে জানা কথা যে, মুশরিকরা মুসা (আ) এবং তওরাতকে মানত না। কারণ, তারা নবুয়তই মানত না।] তারা তো (কোরআন ও তওরাত উভয়টি সম্পর্কে) বলে, উভয়ই জাদু পরম্পরে একাত্ম। (একথা বলার কারণ এই যে, মূলনীতির ক্ষেত্রে উভয় কিতাবই একমত।) তারা আরও বলে আমরা উভয়কে মানি না। (এটাই তাদের উকি হোক কিংবা তাদের উকির অপরিহার্য উদ্দেশ্য হোক এবং তারা একসাথে উভয়কে অঙ্গীকার করুক কিংবা বিভিন্ন উকির সমাহার হোক সর্বাবস্থায় এ (থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই সন্দেহের উদ্দেশ্য তওরাতের সাথে যিনি থাকা অবস্থায় কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করা নয়; বরং এটাও একটা অপকৌশল ও দৃষ্টান্তি। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে: হে মুহাম্মদ,) আপনি বলুন, তোমরা (এই দাবিতে) সত্যবাদী হলে আল্লাহর কাছ থেকে (তাওরাত ও কোরআন ছাড়া) কোন কিতাব আনয়ন কর, যা এতদুর্ভয় থেকে উত্তম পথপ্রদর্শক হয়। আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (অর্থাৎ উদ্দেশ্য তো সত্ত্বেও অনুসরণ। সুতরাং আল্লাহর কিতাবাদিকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে এগুলোর অনুসরণ কর। কোরআনের সর্বাবস্থায় এবং তওরাতের তাওয়ীদ ও

মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদের ক্ষেত্রে অনুসরণ কর। পক্ষান্তরে এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস না করলে তোমরাই কোন সত্য পেশ কর এবং তাকে সত্যরূপে প্রমাণ কর। একে ‘উল্লম্প পথ প্রদর্শক’ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিদায়াতের উপায় হওয়া। যদি তোমরা প্রমাণ করে দাও, তবে আমি তার অনুসরণ করব। মেটকথা, আমি সত্য প্রমাণ করলে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তোমরা সত্য প্রমাণ করলে আমি তার অনুসরণ করতে সম্মত আছি।) অতঃপর (এই কথার পর) তারা যদি আপনার (فَأَنْ لِمْ بَكَّابِرْ) কথায় সাড়া না দেয়, (এবং সাড়া দিতে পারবেও না ; যেমন لِمْ بَكَّابِرْ ও لِمْ تَفَعَّلُوا) আয়াতে বলা হয়েছে এবং এরপরও আপনাকে অনুসরণ না করে,) তবে জানবেন, (এসব সন্দেহের উদ্দেশ্য সত্যাবেষণ নয় ; বরং) তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (তাদের প্রবৃত্তি বলে দেয় যে, যেভাবেই হোক অবীকারাই করা উচিত। সুতরাং তারা তাই করেছে।) তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ ছাড়াই নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা (এমন) জালিয় সম্মানয়কে (যারা সত্য পরিচুট হওয়ার পর বিশুদ্ধ প্রমাণ ছাড়াই পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হয় না) পথ প্রদর্শন করেন না। (এর কারণ এই ব্যক্তির স্বয়ং পথভ্রষ্ট থাকতে ইচ্ছুক হওয়া। ইচ্ছার পর কাজ সূচি করা আল্লাহর রীতি। ফলে, একজন ব্যক্তি সর্বদা পথভ্রষ্ট থাকে। এ পর্যন্ত তাদের উভয় মানুষের মাধ্যমে জওয়াব ছিল। অতঃপর বাস্তবভিত্তিক জওয়াব হচ্ছে, যাতে কোরআন এক দফায় অবর্তীর্ণ না হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে,) আমি এই কালায় (অর্থাৎ কোরআন) তাদের কাছে সময়ে সময়ে একের পর এক প্রেরণ করেছি, যাতে তারা (বারবার নতুন শুনে) উপদেশ প্রেরণ করে (অর্থাৎ আমি এক দফায় নাখিল করতেও সক্ষম ; কিন্তু তাদেরই উপকারার্থে অল্প অল্প নাখিল করি। এ কেবল কথা যে, তারা নিজেদেরই উপকারের বিরোধিতা করে)।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

‘পূর্ববর্তী সম্প্রদায়’ বলে মুহ, হৃদ, সালেহ ও লৃত (আ)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বুঝানো হয়েছে। তারা মূসা (আ)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধৰ্মসংগ্রাম হয়েছিল। এর পুরী শব্দটি এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান ও অস্তদৃষ্টি। এখানে সেই নূর বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অস্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর ব্রহ্মপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এখানে شَرِقَاتِ النَّاسِ শব্দ দ্বারা মূসা (আ)-এর উচ্চত বুঝানো হলে তাতে কোন ঘটকা নেই। কারণ, সেই উচ্চতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোক বর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি شَرِقَاتِ শব্দ দ্বারা উচ্চতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বুঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উচ্চতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উচ্চতে মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে ? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলিমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অর্থ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত

যে, হয়রত উমর ফারক (রা) একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জ্ঞান বৃক্ষির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) রাগাবিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মুসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গত্যন্তর ছিল না। এর সমরমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ। তওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্য ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কোরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হিফায়তের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত আল্লাহর গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিভাবসম্মতের যে যে অংশ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেইসব অংশ পাঠ করা ও উদ্ভৃত করা সাহাবায়ে কিরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কাব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজীলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারণে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহ্য্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং তত্ত্ব ও অঙ্গ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলিয় শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নজুব তাঁর বিপ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিথিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

—أَنَّمُ مِنْ نَذِيرٍ قُوْمًا مَا لَشَدَرَ فِيْهَا نَذِيرٌ—এখানে কওম বলে হয়রত ইসমাইল (আ)-এর বৎসর আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। হয়রত ইসমাইলের পর থেকে শেষ, নবী (সা) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পর্যবেক্ষণ প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : ﴿إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ بِالْحَقِيقَةِ لِتَعْلَمُوا مِنْهَا أَنَّمُ مِنْ نَذِيرٍ قُوْمًا مَا لَشَدَرَ فِيْهَا نَذِيرٌ﴾ অর্থাৎ এমন কোন উচ্চত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোন পর্যবেক্ষণ আসেননি। এই ইরশাদ, আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দীর্ঘকাল ধরে হয়রত ইসমাইলের পর তাদের মধ্যে কোন নবী আসেননি। কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উচ্চতও নয়।

—وَلَقَدْ وَصَلَّى لَهُمُ الْقَوْلُ لَعَلَمُ يَتَذَكَّرُونَ—শব্দটি থেকে উদ্ভৃত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূত্যায় আরও সূতা যিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর তা'আলা কোরআন পাকে একের পর এক হিদায়াত-অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাতে খ্রোতারা প্রভাবাবিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কঠিপয় শীঁতি । এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুক্তির বলা ও পৌছাতে থাকা পর্যবেক্ষণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের

অঙ্গীকার ও মিথ্যারূপ তাদের কাজে ও কর্মশক্তিতে কোনক্ষণ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না যালা হলে বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তারা পেশ করতে পারতেন। কারণ মধ্যে প্রকৃত অস্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোন সহদয় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্লাত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজ্ঞাকালও যাঁরা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ④٢٩ وَإِذَا تُلَقُّلُ عَلَيْهِمْ
 قَالُوا إِنَّا مُنَاهَّىٰ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ④٣٠ أُولَئِكَ
 يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَبَتِينَ بِمَا صَبَرُوا وَإِنَّ رَءُوفَوْنَ بِالْحُسْنَةِ السَّيْئَةَ
 وَمِسَارِزَفْنَهُمْ يَنْفَقُونَ ④٣١ وَإِذَا سِمِعُوا الْغَوَّاعِرْضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَأْنَا
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۝ لَا نَبْتَغِي الْجِهَلِيْنَ ④٣٢

(৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে।
 (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুরুষ্ট হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবাহিত বাজে কথাবার্তা অবগ করে, তখন তা থেকে মুখ কিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[তওরাত ও ইনজীলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বর্ণিত আছে। জ্ঞানীগণ কর্তৃক এইসব সুসংবাদের সত্যায়ন ঘারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত হয়। সেমতে] কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে (খোদায়ী) কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে যারা ন্যায়শিষ্ট) তারা এতে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিচয় এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) সত্য। আমরা তো এর (আগমনের) পূর্বেও (আমাদের কিতাবের সুসংবাদের ভিত্তিতে) একে ঘাসতাম। (এখন অবতীর্ণ হওয়ার পর নজুতভাবে অঙ্গীকার করছি। অর্থাৎ আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই, যারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তো

একে সত্য বলে বিশ্বাস করত, বরং এর আগমনের প্রতীক্ষায় উৎসুক ছিল; কিন্তু যখন আগমন করল, তখন অবীকার করে বসল। —**نَلَّا جَاءَكُمْ مَا عَرَفْتُمْ كُفُّرٌ بِمِ** এ থেকে পরিষ্কার বুর্বা গেল যে, তওরাত ও ইনজীলের সুসংবাদসমূহের প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সা) ই ছিলেন; যেমন সুরা আশ-শ'আরার শেষে বলা হয়েছে : **أَوْلَمْ يَكُنْ لِّهُمْ أَيْدٍ أَنْ يُعْلَمَ عَلَيْهِمْ بَنِي إِسْرَائِيلُ** অতঃপর আহলে কিভাবের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হচ্ছে(১) তাদেরকে তাদের দৃঢ়তার কারণে দুইবার পূরক্ত করা হবে। (কেননা তারা পূর্ববর্তী কিভাবে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথেও কোরআনে বিশ্বাসী ছিল এবং অবর্তীর্ণ হওয়ার পরেও এতে অটল রইল এবং এর নবায়ন করল। এ হচ্ছে তাদের বিশ্বাস ও প্রতিদানের বর্ণনা। অতঙ্গের তাদের কর্ম ও চরিত্র বর্ণনা করা হচ্ছে;) তারা ভাল (ও সহনশীলতা) ধারা মন (ও কষ্ট প্রদান)-কে প্রতিহত করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। (তারা যেমন কার্যত কষ্টের ক্ষেত্রে সবর করে, তেমনি) তারা যখন (কারণ কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে) অর্থহীন-বাজে কথাবার্তা শোনে, (যা উভিগত কষ্ট) তখন একে (ও) এড়িয়ে যায় এবং (নিরীহ আচরণ প্রদর্শনার্থে) বলে, (আমরা জওয়াব দেই না) আমাদের কাজ আমাদের সামনে আসবে এবং তোমাদের কাজ তোমাদের সামনে, (ভাই) আমরা তো তোমাদেরকে সালাম করি। (আমাদেরকে ঘণ্টা থেকে নিরাপদ রাখ।) আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—**أَلَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمِنْهُمْ يُمْنِئُنَ**—এই আয়াতে সেই সব আহলে কিভাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদের ভিত্তিতে কোরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালাবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আবুবাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্মাট নাজাশীর পারিবদরগের মধ্য থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হলো, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলো না। তারা যখন সাহাবায়ে-কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহর রহমতে ধনাচ্ছ ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে-কিরামের জন্য অর্থ-সম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত আয়াত **وَمِنْ رَزْقَنَا مُمْنِئُنَ** থেকে পর্যন্ত অবর্তীর্ণ হয়। (মাঝহারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের অভরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল প্রিষ্ঠান এবং তওরাত ও ইনজীল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত।—(মাঝহারী)

‘মুসলিম’ শব্দটি উচ্চতে মোহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, সা'ব উচ্চতের জন্য ব্যাপক ?
 مَنْ كُنْتَ مُسْلِمًا
 অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলিমগণ বলল, আমরা তো কোরআন
 অবঙ্গীর হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম । এখানে ‘মুসলিম’ শব্দের আভিধানিক অর্থ
 (অনুথত, আজ্ঞাবহ) নিলে বিশয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কোরআন ও
 শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ‘ইসলাম’ ও
 ‘মুসলিমীন’ শব্দ আরো ব্যক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম ।
 পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উচ্চতে মোহাম্মদীকে ‘মুসলিম’ বলা হয়, সেই অর্থ নিলে
 এতে প্রমাণিত হয় যে, ‘ইসলাম’ ও ‘মুসলিম’ শব্দ কেবলমাত্র উচ্চতে মোহাম্মদীর বিশেষ
 উপাধি নয়; বরং সব পয়গঘরের ধর্ম হিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম ।
 কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জনো যায় যে, ‘ইসলাম’ ও ‘মুসলিম’
 শব্দ এই উচ্চতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি
 হয়ঁ কোরআনেই আছে যে : مَوْسَىٰ كَمَ الْمُسْلِمِينَ
 আল্লামা সুযুতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা ।
 এই বিশেষবস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি বৃত্তি পৃষ্ঠিকা আছে । তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য
 এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম প্রহরের জন্য প্রস্তুত ছিলাম । চিন্তা করলে দেখা
 যায় যে, ইসলাম সব পয়গঘরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উচ্চতের জন্য বিশেষ
 উপাধি—এতদ্ভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । কেননা এটা সম্ভবপর যে, শুণগত অর্থের
 দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং ‘মুসলিম’ উপাধি শুধু এই উচ্চতের
 বিশেষ উপাধি হবে । উদাহরণত সিদ্ধীক, ফারুক ইত্যাদির উপাধির কথা বলা যায় ।
 এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবু বকর ও উমরের উপাধি; কিন্তু শুণগত অর্থের দিক দিয়ে
 অন্যরাও সিদ্ধীক ও ফারুক হতে পারেন । (هذا ماسخ لى وَالله أعلم)

أَوْلَئِكَ يَقْتَنُونَ أَجْرَهُمْ مَرْفُونَ — অর্থাৎ আহলে কিতাবের মু'মিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা
 হবে । কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রূতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিত্রা ভার্যাগণের
 সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে :

— وَمَنْ يَقْتَنِي مَنْ كُنْتُ لَهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْلَمُ مَا لَهُ بِنَبَأٍ أَجْرَهُمْ مَرْفُونَ —
 সহীহ বুখারীর এক হাদীসে
 তিনি ব্যক্তির জন্য দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । (১) যে কিতাবধারী
 পূর্বে তাঁর পয়গঘরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে । (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম
 এবং আপন প্রজুয়াও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে । (৩) যার
 মালিকানায় কোন বাঁদী ছিল । এই বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তাঁর জন্য
 জায়েয ছিল । কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্তৰী করে নিল ।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিশয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার
 কারণ কি ? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দুইটি, তাই
 তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে । কিতাবধারী মু'মিনের দুই আমল এই যে, সে
 পূর্বে এক পয়গঘরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি
 ইমান অনেছে । পরিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য
 ও হযরত রাসূল হিসাবেও করেন এবং বাঁদী হিসাবেও করেন । গোলামের দুই আমল
 তাঁর দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য । বাঁদীকে মুক্ত

করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরুষার ইনসাফ ভিত্তিক ইওয়াব কারণে সর্বার অন্য ব্যাপক। এতে কিংবাধারী মুঠিন অথবা পরিজ্ঞাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নাই : বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরুষার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকাশুল কোরআন সূরা কাসামে পূর্ণস্ত আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরুষার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কোরআনিক বিধি **يُضْبِعُ عَلَىٰ عَامِلٍ مُّنْكَمِ** অর্থাৎ আল্লাহু তাও'আলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সংকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরুষার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরুষারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামায়ের দ্বিগুণ, রোখা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরুষারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল **جَرِينْ**। কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে **أَجْرَفْ مَرْتَبَيْنْ** এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার মেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই সওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি ? এর সুল্টান জওয়াব এই যে, আল্লাহ তাও'আলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরুষার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারণ একপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাও'আলা রোখার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন ? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন ? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুর্দারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চাইতে কোন-না-কোন সিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরুষার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলিম যে দ্বিগুণ শব্দকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সত্ত্বাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য **إِنَّ مَصْبِرَنِ** এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ অমে সবর করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

—**وَيَدْ بَقْنَ بِالْمَسْتَبَةِ**— অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বুর্দানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে শুনাহু বুর্দানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হ্যরত মুরায় ইবনে জাবালকে বলেন : **لَدُخْلُ الْمَسْتَبَةَ** অর্থাৎ শুনাহুর পর নেক কাজ কর। নেক কাজ শুনাহুকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বুর্দানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এগুলো ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি তফসূলপূর্ণ পথনির্দেশ আছে : প্রথম, কারণ দ্বারা কোন শুনাহু হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ শুনাহের

কাফকারা হয়ে যাবে ; যেমন উপরে মুয়ায়ের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । বিভীষণ, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীরতের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ দেওয়া জায়েব আছে; কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের ভাল এবং উৎপীড়নের প্রভৃতিরে অনুগ্রহ করাই উত্তম । এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকাল ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক । কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে । বলা হয়েছে :

— اِنْفَعَ بِالْتَّقْبِيْفِ مِنْ اَخْسَنْ قَادِنَ الْذِيْ بَيْكَ وَبِيْتَهُ عَدَاوَةً كَانَهُ وَلَيْ حَمِيمٌ —
উৎকৃষ্ট পছায় প্রতিহত কর (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর) । এম্পে কুরআন যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শক্তি আছে, সে তোমার অস্তরজ বন্ধু হয়ে যাবে ।

— اَرْثَأْتَ تَادِئَرَ اَكْتَىْ عَلَيْكُمْ لَا يَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ —
অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শক্তির কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর । আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না । ইমাম জাস্সাস বলেন, সালাম দুই প্রকার । এক মুসলিমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম । দুই সংজ্ঞ ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নির না । এখানে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে ।

**إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ**

(৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারলেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন । কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করতে পারেন না ; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন । (অন্য কেউ হিদায়াত করতে সামর্থ্যবান হওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহ ব্যক্তীত অপর কেউ এ কথা জানেও না যে, কে কে হিদায়াত পাবে । বরং) যারা হিদায়াত পাবে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের সম্পর্কে জানেন ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হিদায়াত' শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয় । এক, শুধু পথ দেখানো । এর জন্য জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌছেই যাবে । দুই পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া । অর্থম অর্থের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বরং সব পয়গতৰ যে হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ছিলেন এবং হিদায়াত যে তাদের ক্রমতাখীন ছিল, তা বলাই বাহ্য । কেননা এই হিদায়াতই ছিল, তাদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য । এটা তাদের

ক্ষমতাধীন না হলে তারা নবৃত্য ও রিসালতের বর্তব্য পালন করবেন কিরণে ? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হিদায়াতের উপর ক্ষমতাশালী নন। এতে বিভীষ অর্থের হিদায়াত বুঝানো হয়েছে : অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌছিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাকে মু'মিন বালিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। হিদায়াতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ অলোচনা সুরা বাকারার উপরতে উল্লিখিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে আছে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতৃব্য আবু তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঙ্গুরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনোরূপে ইসলাম প্রহ্ল করুক। এর প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, কাউকে মু'মিন-মুসলিমান করে দেওয়া আপনার ক্ষমতাধীন নয়। তফসীরে রহস্য মাঝানীতে আছে, আবু তালিবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনোক্ষেত্রে সংজ্ঞান আছে।

وَقَالُوا إِنَّنَا نَتَّبِعُ الْهُدًى مَعَكُمْ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوْلَمْ نَسْكِنْ^{٢٩}
 لَهُمْ حِرَمًا أَمْ نَأْجِبُّ إِلَيْهِ تَسْرِفُ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَدُنْنَا وَلَكُنَّ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ④١ وَكُمْ أَهْلُكُنَا مِنْ قُرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا
 فَتِلْكَ مَسِكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمُ الْأَقْلِيلُادَ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثُينَ ④٢
 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِهَا سُولَادَ يَتَّلَوُ عَلَيْهِمْ
 أَيْتَنَا ۖ وَمَا كَنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَاهْلَهَا ظَلِيمُونَ ④٣ وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ
 شَيْءٍ فَتَنَعَّمُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرِزْقُنَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ۖ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ④٤

(৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আগমার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আয়াতের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্য একটি নিরাপদ 'হারম' প্রতিষ্ঠিত করিনি ? এখানে সর্বপ্রকার ফলসূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয়িক বকল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ খৎস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন

যাগনে মদমত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে শানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই শালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধূংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধূংস করি, যখন তার বাসিন্দারা যুক্ত করে। (৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও শ্রদ্ধা। তোমরা কি বুঝ না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বেশ দূর থেকে কাফিরদের ঈমান না আনার কথা বলা হয়েছিল। কাফিররা তাদের ঈমান আনার পথে যেসব বিষয়কে প্রতিবন্ধক মনে করত, আগোচ্য আয়াতসমূহে সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত একটি প্রতিবন্ধকের বর্ণনা এই যে,) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথী হয়ে (এই ধর্মের) হিন্দায়াত অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে অটিরেই উৎখাত হব। (ফলে প্রবাস জীবনের ক্ষতিও হবে এবং জীবিকার ব্যাপারেও পেরেশানী হবে। কিন্তু এই অজ্ঞাহাতের অসারতা সুন্পট) আমি কি তাদেরকে নিরাপদ হারমে স্থান দেইনি, যেখানে সর্বপক্ষ ফলমূল আমদানী হয় যা আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ আমার কৃদরত্তেও জীবিকা দানস্বরূপ) আহারের জন্য পেয়ে থাকে? (সূতরাং সবার কাছে সম্মানিত হারম হওয়ার ক্ষতির কোন আশংকা নেই এবং এ কারণে রিয়িক বিলুপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এই অবস্থাকে তাদের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ঈমান আনা উচিত ছিল।) কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না (অর্থাৎ এর প্রতি লক্ষ করে না।) এবং (বাছন্দ্যশীল জীবন নিয়ে গর্বিত হওয়া তাদের ঈমান না আনার অন্যতম কারণ। কিন্তু এটাও নির্বৃক্ষিতা। কেননা,) আমি আনেক জন্মপদ ধূংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ নিয়ে মদমত ছিল। অতএব (দেখে নাও) এগুলো এখন তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পর এগুলোতে শানুষ সামান্যক্ষণই বসবাস করেছে। (কোন পথিক ঘটনাক্রমে এদিকে এসে গেলে বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে অথবা তামাশা দেখার জন্য অল্পক্ষণ বসে যায় কিংবা রাত্রি অতিবাহিত করে যায়।) অবশেষে (তাদের এসব বাড়িবরের) আবিষ্ট শালিক রয়েছি। (তাদের কোন বাহ্যিক উত্তরাধিকারীও হলো না) আর তাদের আরেক সন্দেহ এই যে, কুফরের কারণে তারা ধূংসপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে আমরা দীর্ঘদিন যাবত কুফর করিছি। আমাদেরকে ধূংস করা হয়নি কেন? অন্য আয়তে বলা হয়েছে ——وَيَقُولُونَ مَنْ فِي الْعَدْلِ إِلَّا
—এই কারণে তারা ঈমান আনে না। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে,) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে (প্রথম বারেই) ধূংস করেন না, যে পর্যন্ত (জনপদসমূহের কেন্দ্রস্থলে কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং (প্রয়গ্যবর প্রেরণ করার পরেও তৎক্ষণাত) আমি জনপদসমূহকে ধূংস করি না; কিন্তু যখন তার বাসিন্দারা খুবই যুক্ত করে। (অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত বারবার উপদেশ দানের পরেও উপদেশ গ্রহণ না করে, তখন আমি ধূংস করে দেই। উপরে যেসব জনপদ ধূংস করার কথা বলা হয়েছে, তারাও এই আইন অনুযায়ী

অংসপ্রাণ হয়েছে। অতএব এই আইনদুটিই তোমাদের সাথে ব্যবহার করা হবে। তাই রাসূল আগমনের পূর্বেও খৎস করিনি এবং রাসূল আগমনের পরেও এখন পর্যন্ত খৎস করিনি। কিন্তু কিছুদিন অভিষাহিত হোক; তোমাদের এই হঠকারিতা অব্যাহত থাকলে শান্তি অবশ্যই হবে। সেমতে বদর ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। ঈমান না আনার আরেক কারণ এই যে, দুনিয়া নগদ, তাই কাম্য এবং পরকাল বাকি, তাই কাম্য নয়। দুনিয়ার কামনা থেকে অন্তর যুক্ত হয় না যে, তাতে পরকালের কামনা স্থান পেতে পারে এবং তা অর্জনের পছন্দ বরুপ ঈমানের চেষ্টা করা হবে। অতএব দুনিয়ার ব্যাপারে শব্দে রাখ) যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা (ক্ষণহায়ী) পার্থৰ জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয় (জীবন সমাঞ্জ ইত্যাদির সাথে সাথে এরও সমান ঘটবে) আর যা (অর্থাৎ যে শুরুকার ও সওয়াব) আল্লাহ'র কাছে আছে, তা বহুতর্ধে (এ থেকে অবহার দিক দিয়ে) উৎস এবং (পরিমাণের দিক দিয়েও) বেশি (অর্থাৎ চিরকাল) হারী (অতএব তোমরা কি (এই পার্থক্যকে অথবা এই পার্থক্যের দাবিকে) বুঝ না? (মোটকথা, তোমাদের শ্বেত এবং কৃফরকে আঁকড়িবে ধাকা সবই ভিত্তিহীন ও অসার। কাজেই বুঝ এবং মান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—وَقَالُوا إِنْ تُتَبِّعُ الْهُدًى مَعَكَ تُنْخَطِفُ مِنْ أَرْضِنَا —অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ মুকার কাফির তাদের ঈমান কৃত না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একত্ব হয়ে গেলে সমস্ত আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।—(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খৌজা অভ্যুত্তরে তিনটি জওয়াব দিয়েছে :

(১) —أَوْلَمْ يَمْكُنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمْ يُجْبِيُ إِلَيْهِ شَرَاثٌ كُلُّ شَيْءٍ— অর্থাৎ তাদের এই অভ্যুত্তর বাতিল। কারণ, আল্লাহ তাঁ'আলা বিশেষভাবে মুক্তাবাসীদের হিফাখতের জন্য একটি ব্যাড়াবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মুক্তাব ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারায় করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারম্পরিক শক্তি সন্ত্রেণ এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মুক্তাব হারামের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিহু ঘোরতর হারাম। হারামের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম অতিশোধ্যত্ব সন্ত্রেণ তাকে হত্যা করতে বা অতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রত্যু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সন্ত্রেণ তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কৃতুল করলে তিনি তাদেরকে খৎস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্দ্দতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহইয়া ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হারামের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিয়িক ইচ্ছাদে থেয়ে যাইলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না, উল্টা ভয় হলো আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে।—(কুরআনী) আলোচ্য আয়াতে হারামের দুইটি শুণ বর্ণিত হয়েছে : (১) এটা শান্তির আবাসহুল, (২) এখানে বিশেষ অতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমাদানী হয়, যাতে মুক্তাব বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মকার হারয়ে প্রত্যেক একার ফলমূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নির্দেশন : মকা মুকাররয়া, যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহের জন্য সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখনে পার্থিব জীবনে পক্ষণের কোন বন্ধু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মকার এসব বন্ধুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বৃজি বিমৃচ্ছ হয়ে পড়ে। প্রতি বন্ধু ইজ্জের মওসুমে মকার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনেরো লাখ মুসলমানের সংখ্যা রেড়ে যায়, ধারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শেলা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দ্বিবারাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের **نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ** শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় **نَمَرَاتُ شَيْءٍ**—এর পরিবর্তে **نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ**— বলার মধ্যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত আছে যে, **نَمَرَاتُ** শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয় ; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল-কারখানায় নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার **نَمَرَاتُ** তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্য হবে এই যে, মকার হারয়ে শুধু আহার্য ও পালীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না ; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সংরক্ষণ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মকার যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পের প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধ হয় তদ্দুপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মকার কার্কিনদের অজ্ঞহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশংকা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোন কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী এখানে এনে সম্মালেশ করেছেন, সেই বিশ্বস্তোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে—এরপ আশুক্কা করা চূড়ান্ত নিরুজিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজ্ঞহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই : **وَكُمْ أَمْلَأْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بِطَرْتَ مَعْيَشَتِهَا** এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফির সম্পদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাড়ি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশুক্কার বিষয়। এটা খৎসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর না, ইমানের কারণে বিপদাশংকা বোধ কর।

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই : **وَمَا أَوْتَبْعَمْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَنَاعَ الْحَيَاةَ النَّبِيَّ**—এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ইমান কবৃল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণহায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আহেশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণহায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণহায়ী-দ্রুত

নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিভা করা, যা চিরহ্রাস্যী, অঙ্গুল। চিরহ্রাস্যী ধন ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণহ্রাস্যী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

—لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلْبًا—অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আয়াব ধারা বিদ্ধি করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজাজের উচ্চি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসগৃহ ব্যতীত এসব অংসপ্রাণ জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হয়রত ইবনে আববাস থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে, যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিগিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

—مَنْ حَتَّىٰ يَتَعَثَّثُ فِي أَمْهَا رَسُولًا— শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বাহল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এর সর্বনাম ধারা ফরি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধৰ্ম করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রাস্তারে মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবৃল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আয়াব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এক্লপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অধীনতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোন বিষয় জড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি জড়িয়ে পড়ে; এ কারণেই কোন বড় শহরে রাস্তা প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবৃল করা ক্রয় হয়ে যেতো এবং অবীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আয়াব নেমে আসাই হিল ব্যতিকি।

নির্দেশ ও আইম-কাসুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অধীনতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি যিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওয়ার গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রম্যান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিল্কাহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সংস্ক্রত-প্রমাণ ধারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাঙ্গ-প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আসেন জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

—অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন সবই খৎসনীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে শুগত দিয়েও অনেক উভয় এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে খৎস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহ্য্য, কোন বৃক্ষিমান ব্যক্তি নিঃক্ষেত্রের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না।

বৃক্ষিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার আয়েশার কম যত্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বৃক্ষিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীরতসম্পত্তি প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে অশুল রয়েছেন। কেননা, বৃক্ষিমান দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের ঘട্টে সর্বাধিক বৃক্ষিমান তারাই। এই মাস'আলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

أَفْمَنْ وَعْدُنَّهُ وَعْدًا حَسِنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمْ مَتَعَنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمَحْضُورِينَ ⑥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ
 شَرَكَاءُ الدِّينِ كَنْتُمْ تَرْعَمُونَ ⑦ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبِّنَا
 هُوَ لَأَنَّ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا هُمْ تَبَرَّنَا إِلَيْكَ زَمَانًا كَانُوا
 إِيَّاكَ نَإِيمَانًا يَعْبُدُونَ ⑧ وَقِيلَ ادْعُوا شَرَكَاءَكُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ هُنَّ لَوْا نَهْرٌ كَانُوا يَهْتَدُونَ ⑨ وَيَوْمَ
 يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑩ فَعَيْدَتْ عَلَيْهِمُ
 الْأَنْبِيَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُوَ لَا يَتَسَاءَلُونَ ⑪ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ
 وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ⑫

(৬) যাকে আমি উভয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-স্তোর দিয়েছি, অতঃপর তাকে কিয়াবতের দিন অপরাধীরূপে হাদির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে আওয়াব দিয়ে বলবেন,

তোমরা তাদেরকে আমার শরীক মানি করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্য পাঞ্চিত আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথচার করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথচার করেছিলাম, যেমন আমরা পথচার হয়েছিলাম। আমরা আগলোর সামনে দায়বৃক্ত হচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই ইবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহবান কর। তখন তারা ডাকবে। অতঃপর তারা তাদের জাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আবাব দেখবে। হার! তারা যদি সংশেষণাত্ম হতো! (৬৫) যেনিল আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা মাসুলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিন্দে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বক হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওরা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সহকর্ম করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি যাকে উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সংসার দিয়েছি, অতঃপর সে কিয়ামতের দিন ঐ সকল লোকের মধ্যে হবে যাদেরকে প্রেক্ষণ করে আনা হবে? (প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে মু'মিন। তাকে জালাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে কাফির, যে অপরাধীজগে হায়ির হবে। পার্থিব ভোগ-সংসারই কাফিরদের প্রাণির কারণ, তাই তা স্পষ্টকরণে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুনা উক্ত ব্যক্তির সমান না হওয়ায় আসল কারণ এই যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রেক্ষণ করে আনা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি জালাতের নিয়মামত ভোগ করবে। অতঃপর এই পার্থিব্য ও প্রেক্ষণ করে হায়ির করার বিশদ দেওয়া হচ্ছে যে, সেই দিনটি শরণীয়,) যে দিন আল্লাহ কাফিরদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (অর্থাৎ শয়তান। শয়তানের অনুসরণে তারা শেরেকী করত। তাই তাদেরকে শরীক বলা হয়েছে। একথা শনে শয়তানরা অর্থাৎ যাদের জন্য (মানুষকে পথচার করার কারণে) আল্লাহর (শাস্তি) বাণী (অর্থাৎ مُلْكُنَ جَهَنَّمَ مِنْ جَهَنَّمَ وَالنَّاسُ) অবধারিত হয়ে গেছে, তারা (ওয়ার পেশ করে) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, এদেরকেই আমরা পথচার করেছিলাম (এটা জওয়াবের ভূমিকা। এই ঘটনা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা যাদের সুপারিশ আশা করত, তারাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা পথচার করেছি ঠিকই ; কিন্তু) আমরা তাদেরকে এমনি (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি না করে) পথচার করেছি, যেমন আমরা নিজেরা (জোর জবরদস্তি ছাড়া) পথচার হয়েছি। (অর্থাৎ আমরা যেমন বেচ্ছায় পথচার হয়েছি, কেউ আমাদেরকে এজন্য সাধ্য করে নি ; তেমনিভাবে তাদের উপর আমাদের কোন বৈরাচারী কর্তৃত ছিল না। আমাদের কাজ ছিল শুধু বিভ্রান্ত করা। এরপর তারা তাদের মত ও ইচ্ছায় তা করুণ করেছে ; যেমন সুরা ইবরাহীমে আছে : وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ إِلَّا أَنْ دَعَنَّكُمْ فَإِنْ تَسْتَجِبُنَّ مِنْ—উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অপরাধী বটে ; কিন্তু তারা ও নিরাপরাধ নয়।) আমরা আপনার সামনে তাদের (সম্পর্ক) থেকে মুক্ত হচ্ছি। তারা

(প্রকৃতগঙ্কে কেবল) আমাদেরই ইবাদত করত না (অর্থাৎ তারা যখন বেছায় পথচার হয়েছে, তখন তারা প্রবৃত্তিপূর্ণারীও হলো শুধু শয়তানপূজারী নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যাদের উপর ভরসা করত, তারা কিসানিকের দিন তাদের তরফ থেকে হাত ছুটিয়ে নেবে। যখন শরীকরা এভাবে তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তখন মুশরিকদেরকে) বলা হবে, (এখন) তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে ডাক। তারা (বিশ্বাসিতিশয়ে অহিত হয়ে) তাদেরকে ডাকবে। অতঃপর তারা জওয়াবও দেবে না এবং (তখন) তারা স্বচক্ষে আবাব দেখবে। হায়, তারা যদি দুনিয়াতে সৎপথে থাকত! (তবে এই বিপদ দেখত না।) সেদিন আল্লাহর কাফিরদের ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গন্ধরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলেন? সেদিন তাদের (মন) থেকে সব বিষয়বস্তু উধাও হয়ে যাবে এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে দুনিয়াতে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আশা করা যায় যে, পরকালে সে সর্কারকাম হবে (এবং বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাশরের যয়দানে কাফির ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যে সব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভাস্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভাস্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী; কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে হিদায়াতও করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গন্ধরগণ ও তাদের নায়েবগণ তাদেরকে হিদায়াতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি ঘারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা বেছায় পয়গন্ধরগণের কথা অঠাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিন্তু দোষমুক্ত হতে পারেন এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবৃল না করে পথচার হয়ে যাওয়া কোন ধর্তব্য শুরু নয়।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ۖ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑥٦ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُونَ صَدَقَهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ⑥٧ وَهُوَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّاهُ ۖ لَهُ الْحُسْنَىٰ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ ذَرْلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ⑥٨ قُلْ أَرَعِيهِمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَىٰ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ

الْقِيَمَةُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَا تَيَّبُوكُمْ بِرَضْيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ⑯ قُلْ أَرْءَيْتُمْ
إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ
يَا تَيَّبُوكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ ⑰ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑱

(৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহু পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহু। তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। ইহকালে ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাধীন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭১) বলুন, তেবে দেখ তো, আল্লাহু যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহু ব্যক্তিত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? (৭২) বলুন, তেবে দেখ তো, আল্লাহু যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহু ব্যক্তিত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিখ্যাম করবে? তোমরা কি তবুও তেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই দীর্ঘ রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাঁতে বিখ্যাম ধৰণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অবেষ্টণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার পালনকর্তা (এককভাবে পূর্ণতা ও গুণাবিত্ব। সেমতে তিনি) যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন (কাজেই সৃষ্টিগত ক্ষমতা তাঁরই) এবং যে বিধানকে ইচ্ছা পছন্দ করেন (এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে অবর্তীণ করেন। সুতরাং আইন জারির ক্ষমতাও তাঁরই।) তাদের (আইন জারির) কোন ক্ষমতা নেই (যে, যে আইন ইচ্ছা জারি করবে; যেমন মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে শিরককে বৈধ আইন মনে করছে। এই বিশেষ ক্ষমতা থেকে প্রয়াপিত হলো যে,) আল্লাহু পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্বে। (কারণ, তিনি যখন এককভাবে স্বষ্টি ও বিধানদাতা, তখন ইবাদতেরও তিনি একই যোগ্য। কেননা উপাস্য সে-ই হতে পারে, যে সৃষ্টি ও বিধান দান—উভয়েরই ক্ষমতা রাখে।) আপনার পালনকর্তা (এমন পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী যে, তিনি) জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। (অন্য কারও এমন জ্ঞান নেই। এ থেকেও তাঁর একত্ব প্রমাণিত হয়। অতঃপর তাই বলা হয়েছে :) তিনিই (পূর্ণতা ও গুণাবিত্ব) আল্লাহু। তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই প্রশংসার যোগ্য। (কেননা উভয় জাহানে তাঁর কাজকর্ম তাঁর সর্বশুণ্য গুণাবিত্ব ও প্রশংসার যোগ্য হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। তাঁর রাজ্য

শাসনক্ষমতা এমন যে,) রাজত্বও (কিয়ামতে) তাঁরই হবে। (তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি ও পরিধি এত-ব্যাপক যে,) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (বেঁচে যেতে পারবে না বা কোথাও আশয় নিতে পারবে না। তাঁর শক্তি-সমর্থ্য প্রকাশের জন্য) আপনি বলুন, তেবে দেখু তো, আল্লাহ যদি রাখিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে। (সূতরাং ক্ষমতায়ও তিনি একক।) তোমরা কি তাওহীদের এমন পরিষ্কার প্রমাণাদি অবগ কর নাঃ (এই ক্ষমতা প্রকাশের জন্যই) আপনি (এর বিপরীত দিক সংপর্কে) বলুন, তেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করে দেল, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাখি দান করতে পারে। তোমরা কি (কুদরতের এই প্রমাণ) দেখ নাঃ (কুদরত একক হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, উপাস্যতায়ও তিনি একক।) তিনিই কীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম কর ও দিবা ভাগে কৃষী অবেষণ কর এবং যাতে তোমরা (এ উভয় নিয়ামতের কারণে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (অতএব অনুগ্রহেও তিনি একক। এটাও উপাস্যতায় একক হওয়ার প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, **وَرَبِّكَ يُنْقَلِّبُ تَابِعَاتَهُ وَيَخْتَارُ** —এই আয়াতের এক অর্থ বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি জীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রহে এবং ইবনে কাইয়্যাম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, **إِنَّ رَبَّكَ** —এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব এবং **أَوْزِعُ مِنْهُ الدُّنْيَا** —অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দুইটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবর্তীর্ণ করা হলো না কেন? একেপ করলে এর প্রতি ব্যাধোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাযিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টি জগতকে কোন অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বাস্তুকে বিশেষ সম্মান দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়।

এক বদ্ধকে অপর বদ্ধের উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিভক্ত মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা ; হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম এই আয়াত থেকে একটি শুল্কশূণ্য বিধি উক্তার করেছেন। তা এই যে দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বদ্ধকে অন্য বদ্ধের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বদ্ধের উপার্জন ও কর্মের ফল নয় ; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্বষ্টির মনোনয়ন ও ইচ্ছার

ফলশ্রুতি। তিনি সঙ্গ-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যভোর উপর প্রেষ্ঠত্তু দান করেছেন। অর্থে সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জ্ঞানাত্মক ফিরদাউসকে অন্য সব জ্ঞানের উপর, জিবরাইল, মীকাইল, ইস্রাফীল প্রমুখ বিশেষ কেরেশ্বতাগণকে অন্য ফেরেশ্বতাদের উপর, পয়গংসুরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতো পয়গংসুরগণকে অন্য পয়গংসুরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অন্য দৃঢ়চেতো পয়গংসুরগণের উপর, ইসমাইল (আ)-এর বৎসধরকে সমগ্র মানব জাতির উপর, কুরায়শকে তাদের সবার উপর মুহাম্মদ (সা)-কে সব বনী ইশামের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর প্রেষ্ঠত্তু দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর প্রেষ্ঠত্তু দান করাও আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা প্রেষ্ঠত্তু ও অপ্রেষ্ঠত্তের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে প্রেষ্ঠত্তের অপর একটি কারণ মানবের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপরায়ণ বাসাদের বসবাসের কারণে পৰিত্ব ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই প্রেষ্ঠত্তু উপর্যুক্ত ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে প্রেষ্ঠত্তের মাপকাঠি দুইটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎ কর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়েয়ে এ সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হ্যরত আবু বকর, অতঃপর উমর ইবনে খাতাব, অতঃপর উসমান গনী ও আলী মুর্তজা (রা)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রয়াণিত করেছেন। হ্যরত শাহ আবদুল আয়ায় দেহলভী (র)-এরও একটি বৃত্ত পৃষ্ঠিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর কার্সী ভাষায় লিখিত আছে। “বোদ্দিত তাফসীল লি মাসজালাতিত তাফসীল” নামে বর্তমান লেখক এর উদূ তর্জমা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া আমি আহকামুল কোরআন সুরা কাসামে ও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

أَرْهَبْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَى سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَنْ
غَيْرِ اللَّهِ يَا تَبَّاكُمْ بِضَيَاءِ دَفَّ أَفَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِهِ بِلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ
أَفَلَا تُبَصِّرُونَ -

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাত্তির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন যে অর্ধাৎ রাত্তিতে মানুষ বিখ্যাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সন্তানগতভাবে উত্তম। অক্ষকার থেকে আলোকে যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, বর্ণনা করার ঘোটাই প্রয়োজন নেই। যাত্তি হচ্ছে অক্ষকার, যা সন্তানগতভাবে প্রেষ্ঠত্তের অধিকারী নয়, বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর প্রেষ্ঠত্তু। তাই একে

বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে **فَلَا شَمْعُونْ** বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শেষভাবে, বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই **فَلَا شَمْعُونْ** বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই **فَلَا شَمْعُونْ** বলা হয়েছে।—(মাযহারী)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءُ الدِّينِ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ ۝
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بِرُهَانَكُمْ فَعَلِمُوا ۝
أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَالٌ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

(৭৪) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উৎখাও হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, (যাতে সবাই তাদের লাল্লুনা শনে নেয়) যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে, তারা কোথায়? (প্রমাণ পূর্ণ করার জন্য তাদের স্বীকার করে নেওয়াই যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু বিশ্বরিটিকে আরও জোরদার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যও দাঁড় করানো হবে এভাবে যে,) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি এক-একজন সাক্ষীও বের করে আনব (অর্থাৎ পয়গম্বরগণকে, তারা তাদের কুফরের সাক্ষ্য দেবেন।) অতঃপর আমি (মুশরিকদেরকে) বলব, (খৰন শিরকের দাবির পক্ষে) তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা (চাকুর) জানতে পারবে যে, আল্লাহর কথাই সত্য ছিল (যা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলা হয়েছিল এবং শিরকের দাবি যিথ্যাদ্বারা ছিল।) তারা (দুনিয়াতে) যেসব কথাবার্তা গড়ত, (আজ) সেগুলোর কোন পাত্তা থাকবে না (কেননা সত্য প্রকাশের সাথে যিথ্যাদ্বারা উৎখাও হয়ে যাওয়া অবধারিত)।

জ্ঞাতব্য : পূর্ববর্তী আয়াতে **مَاذَا جَبَتْ** বলে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা পয়গম্বরগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? এখানে স্বয়ং পয়গম্বরগণ দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ানো উদ্দেশ্য। কাজেই একই প্রশ্ন বারবার করা হয়নি।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ سَوَّا تِبْيَانَهُ مِنَ الْكُنُوزِ
 مَا أَنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولَئِكُو الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا
 تَقْرَأْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ⑥ وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ
 الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ وَلَا تَسْبِغْ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ⑦
 قَالَ إِنَّمَا أَوْرَثْتَهُ عَلَيِ الْعِلْمِ عِنْدِي طَوْلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ
 قَبْلِهِ مِنَ الْقَرْوَنِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمِيعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ
 ذَنْبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ⑧ فَخَرَجَ عَلَى قَوْبَاهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْعِيَوَةَ إِنَّمَا يَلْتَمِسُ لَنَّا مِثْلَ مَا أَوْقَى قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ⑨
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمْنَ وَعَمِلَ
 حَسَالًا وَلَا يُلْقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ⑩ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ شَفَانًا
 كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَتَصْرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُنْتَصِرِينَ ⑪ وَاصْبَرَ الَّذِينَ تَسْنُو أَمْكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ
 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُهُ لَوْلَا أَنَّ مَنْ
 عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءً وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِمُ الْكُفَّارُونَ ⑫

(৭৬) কার্ল ছিল মুসার সম্পদারভূত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টানি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধনভাণীর দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্পদার তাকে বশল, সত্ত করো না, যা'আরেফুল কুরআন (৬৪)।—৮৩

আল্লাহ সান্তিকদেরকে তালিবাসেল না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তচ্ছারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ জুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিচ্য আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিষিদ্ধ জ্ঞান-গুরিয়া দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্পদায়কে ঝুঁস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধনসম্পদে অধিক প্রাচুর্যশালী? পাশীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারুন জ্ঞানক্ষমক সহকারে তার সম্পদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেওয়া হতো! নিচ্য সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পার, যারা সবরক্ষারী। (৮১) অতঃপর আমি কারুনকে ও তার ধাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যক্তিত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আস্তরঙ্গ করেত পারল না। (৮২) পতক্ষে যারা তার মত ইওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুভে বলতে শাগল, হায়, আল্লাহ তার বাসদের মধ্যে যার জন্য ইছ্যা রিযিক বর্ধিত করেন ও ত্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফিরয়া সকলকাম হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কারুন (-এর অবস্থা দেখ, কুফর ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে তার কি ক্ষতি হয়ে গেল! তার ধন-সম্পত্তি তার কোন উপকারে আসল না ; বরং সাথে সাথে তার ধন-সম্পত্তি ও বরবাদ হয়ে গেল। তার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই (৩ সে) মূল্য (আ)-এর সম্পদায়ভূক্ত ছিল। বিরং তাঁর চাচাত ভাই ছিল (দুররে ঘনসূর)। অতঃপর সে (ধন-সম্পদের আধিক্য হেতু) তাদের প্রতি অহংকার করতে শাগল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (চাবিই যখন এত বেশি ছিল, তখন ধন-ভাণ্ডার যে কি পরিমাণ হবে, তা সহজেই অনুযয়। সে এই বড়াই তখন করেছিল,) যখন তার সম্পদায় (বুঝানোর জন্য) তাকে বলল, দষ্ট করো না। আল্লাহ তা'আলা মান্তিকদেরকে পছন্দ করেন না। (আরও বলল,) তোমাকে আল্লাহ যা দান করেছেন, তদন্তারা পরকালও অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ (নিয়ে যাওয়া) জুলে যেয়ো না। (বিন্দু ও প্রাঞ্চিস এর উদ্দেশ্য এই যে,) আল্লাহ তা'আলা যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও (বাসদের প্রতি) অনুগ্রহ কর এবং (আল্লাহর অবাধ্যতা ও জরুরী দায়িত্ব নষ্ট করে) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। (অর্থাৎ তুমাহ করলে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন :

— ظهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ — (বিশেষ করে সংক্রান্ত শুনাই করলে) নিচয় আল্লাহু তা'আলা অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। [এসব উপদেশ মুসলমানদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। সত্ত্বত মুসা (আ) এই বিষয়বস্তু প্রথমে বলেছিলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানগণও তার পুনরাবৃত্তি করেছিল।] কাজল (একথা তনে) বলল, আমি এই ধন আমার নিজের জ্ঞান গরিবা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। (অর্থাৎ আমি জীবিকা উপার্জনের নিয়মপ্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আছি। এর বলেই আমি অগাধ ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছি। কাজেই আমার দশ অহেতুক নয়। একে অদৃশ্য অনুগ্রহও বলা যায় না এবং এতে কারও ভাগ বসানোরও অধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহু তা'আলা তার দাবি খণ্ডন করেন,) সে কি (খবর পরম্পরা থেকে একথা) জানে না যে, আল্লাহু তা'আলা তার পূর্বে অনেক সম্পদায়কে ধূঃস করেছেন, যারা (আর্থিক) শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং জনবলে ছিল তার চাইতে প্রাচুর্যশালী। (তাদের শুধু ধূঃস হওয়াই শেষ নয়; বরং কুফরের কারণে এবং আল্লাহু তা'আলার তা জানা থাকার কারণে কিয়ামতেও শান্তিপ্রাপ্ত হবে। সেখানকার সীতি এই যে,) পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে (অর্থাৎ তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে) জিজ্ঞাসা করতে হবে না। (কারণ, আল্লাহু তা'আলা সব জানেন। তবে শাসানোর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে; যেমন বলা হয়েছে—**لَنْ سَنَلَّهُمْ أَجْمَعِينَ**—উদ্দেশ্য এই যে, কাজল এই বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে এমন মূর্খতার কথা বলত না। কেননা, পূর্ববর্তী সম্পদায়সমূহের আয়াবের অবস্থা থেকে পরিকার বুঝা যায় যে, আল্লাহু তা'আলা সর্বশক্তিমান এবং পরকালীন হিসাব-নিকাশ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক। এমতাবস্থায় আল্লাহুর নিয়ামতকে নিজের জ্ঞান-গরিমার ফলশ্রুতি বলার অধিকার কার আছে?) অতঃপর (একবার) কাজল জাঁকজমক সহকারে তার সম্পদায়ের সামনে বের হলো। (তার সম্পদায়ের) যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, (যদিও তারা ঈমানদার ছিল; যেমন পরবর্তী বাক্য **يَكَانُ اللَّهُ بِإِيمَانِكُمْ إِنَّمَا**—খন্দে, থেকে বোঝা যায়।) তারা বলল, আহা! কাজল যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো। বাস্তবিকই সে বড় ভাগ্যবান। (এটা ছিল লোভ। এর কারণে কাফির হওয়া জরুরী হয় না। যেমন আজকালও কতক মুসলমান বিজাতির উন্নতি দেখে দিবারাত্রি লোভ করতে থাকে এবং এই চেটায়েই ব্যাপ্ত থাকে।) আর যারা (ধর্মের) জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা (লোভীদেরকে) বলল, ধিক তোমাদেরকে (তোমরা দুনিয়ার পেছনে যাচ্ছ কেন!) যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্য আল্লাহুর সওয়াবই শ্রেষ্ঠ। (ঈমানদার ও সৎকর্মীদের মধ্যেও) এটা (পুরোপুরি) তারাই পায়, যারা (দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে) সবর করে। (সুতরাং তোমরা ঈমান পূর্ণ কর এবং সৎকর্ম অর্জন কর। সীমাব স্তেতের থেকে দুনিয়া অর্জন কর এবং অতিরিক্ত লোভ-লালসা থেকে সবর কর।) অতঃপর আমি কাজলকে ও তার প্রাসাদকে (তার উদ্ধৃত্যের কারণে) ভুগ্রভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে তাকে আল্লাহু (অর্থাৎ আল্লাহুর আয়াব) থেকে রক্ষা করত (যদিও সে জনবলে বলীয়ান ছিল।) এবং সে নিজেও আঘাতক্ষা করতে পারল না। গতকল্য (অর্থাৎ নিকট অভীতে) যারা তার মত হওয়ার বাসনা-প্রকাশ করেছিল, তারা (আজ তাকে ভুগ্রভে বিলীন হতে দেখে) বলল, হায় (যনে হয় সচ্ছলতা ও অভাব-অনটন সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং এটা

সৃষ্টিগত রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ'র কর্তব্যগত ।) আল্লাহ'র তাঁর বাসাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয়িক বর্ধিত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) ত্রাস করেন। (আমরা ভুলবশত একে সৌভাগ্য মনে করতাম। আমাদের তওবা! বাস্তবিকই) আমাদের প্রতি আল্লাহ'র অনুগ্রহ না থাকলে তিনি আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। (কেননা লোভ ও দুনিয়াপ্রীতির দ্বারে আমরাও সিংড় হয়ে পড়েছিলাম।) ব্যস বুবা গেল, কাফিররা সফলকাম হবে না (ক্ষণকাল মজা লুটলেও পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকৃত সাফল্য ইমানদাররাই পাবে)।

আনুযায়ীক জ্ঞাতব্য বিষয়

মূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফিরাউন-বংশীয়দের সাথে মূসা (আ)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভূক্ত কারনের সাথে তাঁর হিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণহায়ী। সুতরাং এর মহকৃতে ভূবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় : *وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمُنْتَاعُ الْحَيَاةِ الْخِ* । কারনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভূলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ'র তাঁ'আলার সাথে কৃতঘৃত করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকীনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অঙ্গীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন-ভাণ্ডার সহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

—সম্ভবত হিত্র ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হ্যুরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাইলেরই অস্তর্ভূক্ত ছিল। মূসা (আ)-এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উকি বর্ণিত আছে। হ্যুরত ইবনে আবুবাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উকি আছে।—(কুরআনী, কুফল-মা'আনী)

কুফল মা'আনীতে যোহান্নেস ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারুন তওরাতের হাফেয় ছিল এবং অন্য সর্বার চাহিতে বেশি তার তওরাত মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ। মূসা (আ) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাইলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারুন (আ) ছিলেন তাঁর প্রাচীর ও স্বৃষ্টিতের অংশীদার। এতে কারনের মনে হিস্সা জাগে যে, আমিও তাঁর জ্ঞাতি এই এবং মিকট খজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মূসা (আ)-এর আছে মনের অভিধায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ'র প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কান হ্যাত নেই। কিন্তু কারুন এতে সমৃষ্ট হলো না এবং মূসা (আ)-এর প্রতি হিসাপরায়ণ হয়ে উঠল।

—فَبَعْثَى عَلَيْهِمْ كَي়োক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ যুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি যুলুম করতে লাগল। ইয়াহুয়া ইবনে সাঈদ ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, কারুন ছিল বিভশালী। ফিরাউন তাকে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী

ইসরাইলের উপর নির্যাতন চালায়।—(কুরআনী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারুন ধন-দোলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাইলের মুকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে সাহিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

كَنُوزٌ—وَأَتْيَاهُ مِنَ الْكُنُزِ—**কনুজ-এর বহবচন।** এর অর্থ শৃঙ্খল ধনভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় কনুজ-এমন ধনভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা খেকে বর্ণিত আছে যে, কারুন হযরত ইউসুফ (আ)-এর একটি বিরাট শৃঙ্খল ধনভাণ্ডার প্রাণ হয়েছিল।—(রহ)

لَتَقْرَبُوا إِلَيَّ بِالْمُصْبَنِ—**ত্বরণের অর্থ বোার তারে ঝুকিয়ে দেওয়া।** শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহ্য্য, চাবি সাধারণত হালকা ওথনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক ইওয়ার কারণে কারুনের চাবির ওফন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না।—(রহ)

فَرَحَ—لَا تَفْرَجَ—**ফ্রেজ-এর শান্তিক অর্থ আনন্দ, উত্তোলন।** কোরআন পাক অনেক আয়াতে এই ফ্রেজ-কে নিম্নীয়ন্ত্রণে ব্যক্ত করেছে : যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে : ﴿فَرَحُوا بِمَا أُتْهُوا بِهِ وَمَا فَرَحُوا بِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِيَوْمٍ يُفْرَجُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ অর্থাৎ আয়াতে আছে : ﴿فَرَحُوا بِمَا أُتْهُوا بِهِ وَمَا فَرَحُوا بِهِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِيَوْمٍ يُفْرَجُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে ; যেমন ﴿فَذَلِكَ فَلِيَغْرِبُوا هُنَّ أَهْلُ الْأَيْمَانِ﴾ এবং ﴿يُوْمَنِ يُفْرَجُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ আয়াতে এই আয়াতে এবং যে আনন্দ ও উত্তোলন নির্দেশ করে আয়াতে এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত শুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌছে না, তা নিরিঙ্গ নয় বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ, এতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَأَتَيْتُ قَبْلًا أَنَّكُمْ أَنْتُمُ الْأَوْلَى لِلْآخِرَةِ وَلَا تَنْسِيَنِي مِنَ النَّبِيِّ—**অর্থাৎ ইমানদারগণ কারুনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এবং দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।**

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ দুনিয়ার বহন এবং এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্ব্যাকুল, ধয়িরাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আবুআস সহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরুবী) এমতাবদ্ধায় বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাগিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ যা কিন্তু দিয়েছেন অর্থাৎ টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, বাস্তু ইত্যাদি—এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই, বতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো ওয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, বিতীয় বাক্যের

উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর ; কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভূলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাসাল হয়ে যাবে । বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্য রাখ । এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বুঝানো হয়েছে । **وَاللّٰهُ أَعْلَمُ**

—**أَنَّا أُوتِينَا عَلٰى عِلْمٍ عَذِيرٍ**—কারও কারও মতে এখানে ‘ইল্ম’ বলে তওরাতের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে । যেমন বেগুনায়েতে আছে যে, কান্নল তওরাতের হাফেয ও আলিম ছিল । মুসা (আ) যে সন্তরজনকে তুর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কান্নল তাদেরও অস্তর্ভুক্ত ছিল । কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে । তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত শুণের কারণে পেয়েছি । তাই আমি নিজেই এর প্রাপক । এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই । কিন্তু বাহ্যিক বুঝা যায় যে, এখানে ইল্ম বলে ‘অর্থনৈতিক কলাকৌশল’ বুঝানো হয়েছে । উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি । উদ্দেশ্য এই যে আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই । এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি । মূর্খ কান্নল একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ্ তা'আলারই দান ছিল ; —তার নিজস্ব শুণ-গরিমা ছিল না ।

—**أَوْلَئِمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهُ قَدْ أَمَّكَ مِنْ قَبْلِهِ**—কান্ননের উপরোক্ত উক্তির আসল জওয়াব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে ; অর্থাৎ যদি দ্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্তৃতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না । কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তি ও তো আল্লাহ্ তা'আলার দান । এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে । কিন্তু অবং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই । অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের প্রেক্ষিতের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে আগে না । প্রমাণ হিসাবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে । তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আয়াব তাদেরকে হঠাতে পাকড়াও করে । তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি ।

—**أَنَّذِينَ أُتْهَا الْعِلْمُ وَتَكُونُ الْإِيْرَادَةُ**—এই আয়াতে অর্থাৎ আলিমদের মুকাবিলায় বলা হয়েছে । এতে পরিকার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার তোগসভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য হ্তির করা আলিমদের কাজ নয় । আলিমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরহায়ী সুখের প্রতি নিবন্ধ থাকে । তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার তোগসভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সম্মুষ্ট থাকেন ।

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
 وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ۝

(৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে উদ্ভত অকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহ-ভীরুদের জন্য তত্ত্ব পরিণাম। (৮৪) যে সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরপে মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই পরকাল (যার সওয়াব যে উদ্দেশ্য, তা খীর' বাক্যে বর্ণিত হয়েছে) আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়াতে উদ্ভত্য হতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। (অর্থাৎ অহংকার তথা গোপন গুনাহ করে না এবং কোন প্রকাশ্য গুনাহেও লিঙ্গ হয় না, যদ্বারা দুনিয়াতে অনর্থ সৃষ্টি হতে পারে। শধু গোপন ও প্রকাশ্য মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং তত্ত্ব পরিণাম আল্লাহ-ভীরুদের জন্য (যারা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার সাথে সাথে সৎকর্মও করে থাকে। কর্মের প্রতিদান ও শান্তি এ ভাবে হবে যে,) যে (কিয়ামতের দিন) সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে তার (প্রাপ্তের) চাইতে উত্তম ফল পাবে। (কেননা সৎকর্মের প্রতিদান সম্মাননুপাতে হওয়া তার আসল চাহিদা; কিন্তু সেখানে বেশি দেওয়া হবে। এর সর্বিন্দি পরিমাণ হচ্ছে দশ তৃণ।) এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরপে মন্দ কর্মীরা মন্দ কর্মের পরিমাণেই প্রতিফল পাবে (অর্থাৎ প্রাপ্তের চাইতে অধিক শান্তি বা প্রতিফল দেওয়া হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে উদ্ভত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। ফসাদ বলে অগরের উপর যুক্ত বুঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান সওরী)

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, গুনাহ মাঝেই পৃথিবীতে কাসাদের শামিল। কারণ, গুনাহের কুকুলপুরুষ বিশ্বময় বরকত ত্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে যারা অহংকার, যুক্ত অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে, পরকালে তাদের অল্প নেই।

আত্মজ্ঞান যে অহংকারে নিজেকে অপরের চাইতে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য পাকে, আজোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কৃফুল বর্ণিত হয়েছে। নতুন অপরের সাথে গৰ্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভাল পোশাক পরা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুব্রহ্মণ্য বাসগৃহের ব্যবহাৰ নিম্নীয় নয়; যেমন সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

তনাহের দৃঢ় সংকলণ তনাহ : আয়াতে উক্তজ্ঞ ও কাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বর্ণিত হওয়ার বিষয় থেকে আনা পেল যে, কোন তনাহের বজ্পরিকরভাব পর্যায়ে দৃঢ় সংকলণ তনাহ । (রহ) তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকলন পরিত্যাগ করে, তবে তনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে তনাহ করতে সক্ষম না হয় ; কিন্তু চেষ্টা ঘোল আনাই করে, তবে তনাহ না করলেও তার আমলনামায় তনাহ লেখা হবে।—(গায়বালী)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَالْعَافِفُونَ لِلشَّتَّى এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মৃত্যি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। এক, উক্তজ্ঞ ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার এবং দুই, তাকওয়া তথা সংকর্ম সম্পাদন করা। এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যে সব ফুরয ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মৃত্যির জন্য শর্ত।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ ۖ فَلْ تَرْجِعْ
 أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدًى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ ۝ وَمَا كُنْتَ
 تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الرِّكْبَتُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا
 تَكُونُنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُفَّارِ ۝ وَلَا يَصْلَّنَكَ عَنْ أَيْتِ اللَّهِ بَعْدَ
 إِذْ أُنْزِلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 وَلَا تَدْعُ مَمَّ اللَّهِ إِلَّا هُوَ أَخْرَمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ
 هَالِكُ ۝ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۝

(৮৫) বিনি আপনার প্রতি কেবলআলেম বিধান পাঠিরেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে বদেশে কিন্তিয়ে আনবেন। বশুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে হিন্দোরাত নিয়ে আলেছে এবং কে ধর্মাণ্য জিজ্ঞাসিতে আছে। (৮৬) আপনি আশা করতেন না বে, আপনার প্রতি কিতাব অবর্তীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার ব্রহ্মত। অঙ্গএব আপনি

কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না। (৮৭) কাফিররা ফেল আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে সেগুলো আপনার প্রতি অবজীর্ণ হওয়ার পর। আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৮৮) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। তিনি ব্যক্তিত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যক্তিত সরকিছু খৎস হবে। বিধান তারই এবং তোমরা তাঁরই কাছে অত্যাৰ্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনার শক্ররা নির্যাতনের মাধ্যমে আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। স্বদেশ থেকে এই জবরদস্তিমূলক উচ্ছেদের কারণে আপনার অস্তরে ব্যথা আছে। অতএব আপনি সাম্রাজ্য লাভ করুন যে,) আল্লাহ আপনার প্রতি কোরআন (অর্থাৎ কোরআনের বিধানাবলী পালন ও প্রচার) ফরয করেছেন (যা আপনার নবৃত্যতের প্রমাণ) তিনি আপনাকে (আপনার) মাত্তুমিতে (অর্থাৎ হক্কায়) আবার ফিরিয়ে আনবেন। (তখন আপনি স্বাধীন, প্রবল এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন। এমতাবস্থায় বসবাসের জন্য অন্য স্থান মনোনীত করা হলে তা উপকারবশত ও ইচ্ছাকৃত করা হয়, ফলে তা কষ্টের কারণ হয় না। আপনার সত্য নবৃত্যত সঙ্গেও কাফিররা আপনাকে ভাস্ত এবং তাদেরকে সত্যপছী মনে করে। কাজেই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমার পালনকর্তা ভাল জানেন কে সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করেছে এবং কে প্রকাশ্য বিজ্ঞানিতে (পতিত) আছে। (অর্থাৎ আমি যে সত্যপছী এবং তোমরা যে মিথ্যাপছী এর অকাট্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে যখন কাজে লাগাও না তখন অগত্যা জওয়াব এই যে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তিনি বলে দেবেন। আপনার এই নবৃত্য নিছক আল্লাহর দান। এমন কি, স্বয়ং), আপনি (মর্বী হওয়ার পূর্বে) আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবজীর্ণ হবে। কেবল আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটা অবজীর্ণ হয়েছে। অতএব আপনি (তাদের বাজে কথাবার্তায় মনোনিবেশ করবেন না এবং এ পর্যন্ত যেমন তাদের থেকে আলাদা রয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমনিভাবে) কাফিরদের ঘোটেই সমর্থন করবেন না। আল্লাহর নির্দেশাবলী আপনার প্রতি অবজীর্ণ হওয়ার পর কাফিররা যেন এগুলো থেকে আপনাকে বিমুখ না করে (যেমন এ পর্যন্ত করতে পারেনি।) আপনি (যথারীতি) আপনার পালনকর্তার (ধর্মের) প্রতি (মানুষকে দাওয়াত দিন এবং (এ পর্যন্ত যেমন মুশরিকদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই, তেমনি ভবিষ্যতেও) কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (এ পর্যন্ত যেমন শিরক থেকে পরিত্র আছেন, এমনিভাবে ভবিষ্যতেও) আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করবেন না। (এসব আয়াতে কাফির ও মুশরিকদেরকে তাদের বাসনা থেকে নিরাশ করা হয়েছে এবং তাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বর্ধমে আনয়ন করার যে বাসনা পোষণ কর এবং তাকে অনুরোধ কর, এতে তোমাদের সাক্ষ্যের কোনই সভাবনা নেই। কিন্তু সাধারণ অভ্যাস এই যে, যার প্রতি বেশি রাগ মাঝেরফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৮৪

থাকে, তার সাথে কথা বলা হয় না, এবং প্রিয়জনের সাথে কথা বলে তাকে শোনানো হয়। মা'আলিম গ্রহে হযরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব আয়াত বাহ্যিক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্মুখে করা হলেও উদ্দেশ্য তিনি নন। এ পর্যন্ত রিসালতের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যদিও প্রসঙ্গতমে তাওহীদের বিষয়বস্তুও এসে গেছে। অতঃপর তাওহীদের বিষয়বস্তু মূল লক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনি ব্যক্তিত কেউ উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। (কেননা,) আল্লাহর সত্তা ব্যক্তিত সবকিছু ধৰ্মসংশীল। (কাজেই তিনি ব্যক্তিত কোন উপাস্য নেই। এ হচ্ছে তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর কিয়ামতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে।) রাজত্ব তাঁরই (কিয়ামতে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।) এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (তখন সবাইকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْقُرْآنَ لِرَأْدِكُمْ إِلَى مَعَادٍ—সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সার্বত্র দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল ধাক্কার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর বিভাগিত কাহিনী তথা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শক্রতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে শীয় কৃপায় তাঁকে ফিরাউন ও তার বাহিনীর বিজয়ে বিজয়ী করার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাবে শেষ নবী রাসূল (সা)-এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, যক্কার কাফিররা তাঁকে বিত্রুত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দৃঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরস্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে যক্কা থেকে কাফিররা তাঁকে বহিকার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْقُরْآنَ** অর্থাৎ যে পরিত্যক্ত সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন তথা তিলাওয়াত, প্রচার ও মেলে চলা ফরয করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে “মা'আদে” ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রহে হযরত ইবনে আবাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে ‘মা'আদ’ বলে যক্কা মোকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মান্তরি বিশেষত হারম ও বায়তুল্লাহকে পরিয্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেলে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাবিল বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের সময় রাত্তিবেলায় সওর পিরিশুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে যদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শক্রপক্ষ তাঁর পশ্চাকাবন করছিল। যখন তিনি যদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনষিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ ও

হৃদেশের স্মৃতি অনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাইল (আ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলপ্রাহ (সা)-কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিজ্ঞেদ শৃণুয়ায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় মক্কীও নয়, মাদানীও নয়।—(কুরতুবী)

কোরআন শর্কর বিক্রিকে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় : আলোচ্য আয়াতে রাসূলপ্রাহ (সা)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়ঘাষাই তঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পরিত্ব সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শর্কর বিক্রিকে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

‘**كُلُّ شَيْءٍ مَالِكٌ أَنَا وَجْهِي**’ এখানে ‘বলে আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তা ব্যক্তিত সবকিছু ধর্সনীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন : ‘**وَجْهِي**’ বলে এমন আমল বুঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহ্ জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহ্ জন্য ধাচ্চিতাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে—এছাড়া সব ধর্সনীল।

سُورَةُ الْعَنكُبُوتُ

সূরা আল-‘আনকাবুত

মকাব অবজীর্ণ, ৬৯ আয়াত, ৭ রক্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الْمَ ۝ أَحَسَّ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْتَأْ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَلَيَعْلَمَنَّ الْكُفَّارُ ۝ أَمْ حَسَّبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۝
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَآتٍ ۝
 وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ۝ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِهُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ
 لَغَنِيٌّ عَنِ الْعِلْمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَتُكَفَّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجُزِيَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

দ্বাময় পরম কর্মপাদ্য আল্লাহর নামে উচ্চ করছি।

- (১) আলিফ-লাম-য়ীম। (২) মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? (৩) আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিষ্ঠায়ই জেনে নেবেন যিষ্ঠুকদেরকে। (৪) যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে ? তাদের ফলসালা খুবই মন্দ। (৫) যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (৬) যে কষ্ট শীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট শীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে,

আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম—(এর অর্থ আল্লাহ তা’আলাই জানেন। কতক মুসলমান যারা কাফিরদের নির্যাতন দেখে ঘাবড়ে যায়। তবে) তারা কি মনে করে যে, তারা ‘আমরা বিশ্বাস করি’ বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে (নানা বিপদাপদ দ্বারা) পরীক্ষা করা হবে না ? (অর্থাৎ এরূপ হবে না ; বরং এ ধরনের পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে।) আমি তো (এমনি ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা) তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে (মুসলমান) ছিল। (অর্থাৎ অন্যান্য উপর্যুক্তের মুসলমানরাও এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনিভাবে তাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে। এই পরীক্ষায়) আল্লাহ তা’আলা প্রকাশ করে দেবেন কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী এবং আরও প্রকাশ করে দেবেন কারা যিথ্যাবাদী। (সেখানে যারা আস্তরিক বিশ্বাস সহকারে মুসলমান হয়, তারা এসব পরীক্ষায় অবিচল থাকে বরং আরও পাকাপোক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা সাময়িক বিপদ দূরীকরণার্থে মুসলমান হয়, তারা এই কঠিন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করে বসে। অর্থাৎ এটা পরীক্ষার একটি রহস্য। কারণ, আটি অর্থাটি মিথ্যিত থেকে যাওয়ার মধ্যে অনেক ক্ষতিকারিতা রয়েছে বিশেষত প্রাথমিক অবস্থায়। মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে :) যারা মন্দ কাজ করছে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়তের বাইরে কোথাও চলে যাবে ? তাদের এই সিদ্ধান্ত নেহাতই বাজে। (এটা মধ্যবর্তী বাক্য। এতে কাফিরদের কৃপরিণাম শুনিয়ে মুসলমানদের প্রতি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, তাদের এই নির্যাতনের প্রতিশোধ মেওয়া হবে। অতঃপর আবার মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে :) যে আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে (এসব বিপদাপদ দেখে তার পেরেশান হওয়া উচিত নয়। কেননা) আল্লাহর (সাক্ষাতের) সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে, (যার ফলে সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন : ﴿وَقَالُوا إِنَّهُ لِلَّهُ الْأَكْبَرُ عَنِ الْحَنْنَنِ﴾ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (কোন কথা ও কাজ তাঁর কাছ থেকে গোপন নয়। সুতরাং সাক্ষাতের সময় তোমাদের সব উত্তিগত ও কর্মগত ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে সব চিন্তা দূর করে দেবেন।) এবং (মনে রেখ, আমি যে তোমাদের কষ্ট শীকার করতে উৎসাহিত করছি, এতে আমার কোন লাভ নেই ; বরং) যে কষ্ট শীকার করে, সে নিজের (লাভের) জন্যই কষ্ট শীকার করে। (নতুবা) আল্লাহ তা’আলা বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নয়। (এতেও কষ্ট শীকারের প্রতি উৎসাহ রয়েছে। কেননা নিজের লাভ জানার কারণে তা করা আরও সহজ হয়ে যায়। লাভের বর্ণনা এই যে,) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের গুনাহ দূর করে দেব। (কুফর ও শিরুক তো ঈমান দ্বারা দূর হয়ে যায়। কতক গুনাহ তথ্য দ্বারা, কতক গুনাহ সৎ কাজ দ্বারা এবং কতক গুনাহ বিশেষ অনুযায়ী মাফ হয়ে যাবে।) এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চাইতে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেব (সুতরাং এত উৎসাহ দানের পর ইবাদত ও সাধনায় দৃঢ় থাকতে যত্নবান হওয়া জরুরী।)

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

شَهِيدٌ مُّمْلِكٌ لِّفَتْنَوْنَ— وَمُمْلِكٌ لِّفَتْنَوْنَ
থেকে উদ্ভৃত। এর অর্থ পরীক্ষা। ঈমানদার
বিশেষত পয়গঢ়রগণকে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে
বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এইসব পরীক্ষা কোন সময় কাফির ও পাপাচারীদের
শক্তি এবং তাদের নির্যাতনের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন অধিকাংশ পয়গঢ়র, শেষ নবী
মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার স্থূলীন হয়েছেন। সীরাত ও
ইতিহাসের প্রাচুর্যবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা রোগব্যাধি
ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে; যেমন হযরত আইমুব (আ)-এর হয়েছিল। কারও
কারও বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেওয়া হয়েছে।

রেওয়ায়েতদৃষ্টে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুয়ুল সেই সব সাহাবী, যাঁরা যদীনায়
হিজরতের প্রাকালে কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের
আলিম, সংকর্মপরায়ণ ও গৃহীণ বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার স্থূলীন হয়েছেন এবং হতে
থাকবেন।—(কুরআনী)

أَرْبَعَةِ مُّمْلِكٍ مُّلْكٍ لِّفَتْنَوْنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَنَعُوا
তা'আলা খাঁটি-অর্খাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন।
কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত
হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ অসৎ এবং খাঁটি-অর্খাঁটি পার্থক্য ফুটিয়ে
তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন কারা
সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও
মিথ্যাবাদিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই
যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ধানবী (র) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (র)
থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও
অর্খাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পক্ষতিতে জ্ঞান লাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই
পক্ষতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য
জানে। তাই তাদের কৃটি অনুবাদী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার
মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অর্থ অনাদিকাল থেকেই এসব
বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

وَوَصَّيْنَا إِلَإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدُكُمْ فَلَا تُطْعِمُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنِّي كُمْ بِمَا
مَالِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِمُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَإِنِّي كُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑦ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصِّرَاجَتِ لَنَدْ خِلْقَتْهُمْ

فِي الصِّرَاجِينَ ⑧

(৮) আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সংযোগ করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীর করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের অত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব, যা কিছু তোমরা করতে। (৯) যারা বিখ্যাস স্থাপন করে ও সংকৰণ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সংযোগ করার নির্দেশ দিয়েছি। (এবং এতদসঙ্গে একথাও বলেছি যে,) যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীর করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই (এবং প্রত্যেক বস্তুই যে ইবাদতের ঘোগ্য নয়, তার প্রমাণাদি আছে) তবে (এ ব্যাপারে) তাদের আনুগত্য করো না। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু (সৎ ও অসৎ কর্ম) তোমরা করতে। (তোমাদের মধ্যে) যারা বিখ্যাস স্থাপন করবে ও সংকরণ করবে আমি তাদেরকে সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতে দেব। এমনিভাবে কুকর্মের কারণে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেব। এর ভিত্তিতেই যারা পিতামাতার আনুগত্যকে আমার আনুগত্যের উপর অধ্যাধিকার দেবে, সে শাস্তি পাবে। যে এর বিপরীত করবে, সে শুভ প্রতিদান পাবে। মোটকথা, নিষিক্ষ কাজে পিতামাতার অবাধ্যতা করলে শুন্ধ হবে বলে ধারণা করা উচিত নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—**وَمَنِينَ إِلَّا نَسَانٌ** —হিতাকাঙ্ক্ষী ও সন্দুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে বলা হয়। —(মাযহারী)

—**حَسَنٌ** —শুভটি খাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উচ্ছেশ্য এই যে, আল্লাহু তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সংযোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

—**وَإِنْ جَاءَهُنَّا لَنُكَبِّرُ** —অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সংযোগ করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না ; যেমন হানীলে আছে : **نَعَلَ**

—**অর্ধাং আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা দৈখ নয় ।**

আলোচ্য আয়াত হয়রত সা'দ ইবনে আবু উয়াকাস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে । তিনি দশজন জালাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাত্তুক ছিলেন । তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুঁজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই ঘর্মাহত হয় । সে পুঁজেকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি প্রেত্ক ধর্মে ফিরে না আস । আমি এমনিভাবে কৃধা ও পিশাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাত্তুকাঙ্গপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও । (মুসলিম ও তিরমিয়ী) এই আয়াত হয়রত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল ।

বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, হয়রত সা'দের জন্মনী এক দিন এক রাত মভাস্তরে তিনি দিন তিন রাত শপথঅনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হয়রত সা'দ উপস্থিত হলেন । মাত্তুক পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মুকাবিলাস তা ছিল তুচ্ছ । তাই জন্মনীকে সমোধন করে তিনি বললেন : আস্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ' আজ্ঞা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না । এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার কর্তৃত অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যান । আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না । এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمْتَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَيْسُ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ سَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُفَّارٌ
مَعْكُمْ ۝ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمَيْنِ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ
اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَلَيَعْلَمَنَّ السُّفِيقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ أَمْنَوْا تَسْبِيعًا وَاسْبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَمِيلِينَ
مِنْ خَطَايَاكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۝ إِنَّهُمْ لَكُنْ بُونَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا
مِّمَّا أَتَقْلَلُهُمْ ۝ وَلَيَسْكُنَنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَنْهَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

(১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস হাপন করেছি ; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্বাচিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আয়াবের মত মনে করে । যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে

তখন তারা বলতে ধাকে, ‘আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।’ বিশ্ববাসীর অঙ্গে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন ? (১) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিচ্ছ জেনে নেবেন যারা মুশাফিক । (২) কাফিররা যুদ্ধবিদেরকে বলে, ‘আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।’ অর্থ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিচ্ছ তারা মিথ্যাবাসী । (৩) তারা নিজেদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উচ্চাবল করে, সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কতক গোক বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতঃপর আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আয়াবের ঘত (ত্বরৎকর) মনে করে। (অর্থ মানুষ এক্ষণ আয়াব দেওয়ার শক্তি রাখে না। এখন তাদের অবস্থা এই যে,) যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে (মুসলমানদের) কোন সাহায্য আসে, (উদাহরণত জিহাদে এরা যখন বন্দী হয়ে আসে,) তখন তারা বলে, আমরা তো (ধর্ম ও বিশ্বাসে) তোমাদের সাথেই ছিলাম। (অর্থাৎ মুসলমানই ছিলাম, যদিও কাফিরদের জোর-জবরদস্তির কারণে তাদের সাথে যোগদান করেছিলাম আল্লাহ বলেন,) আল্লাহ কি বিশ্ববাসীর মনের কথা সম্যক অবগত নন ? (অর্থাৎ তাদের অঙ্গেই ইমান ছিল না। এসব ঘটনা ঘটার কারণ এই যে,) আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন বিশ্ববাসীদের এবং জেনে নেবেন মুশাফিকদেরও। কাফিররা মুসলমানদের বলে, তোমরা (ধর্মে) আমাদের পথ অনুকরণ কর। (কিয়ামতে) তোমাদের (কুফর ও অবাধ্যতার) পাপভার আমরা বহন করব। (তোমরা মৃত্য থাকবে।) অর্থ তারা তাদের পাপভার কিছুতেই (তোমাদের মৃত্য করে) বহন করতে পারবে না। তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে। (তবে) তারা নিজেদের পাপভার (পুরোপুরি) এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। (তারা যেসব পাপের কারণ হয়েছিল, এগুলো সেই পাপ। তারা এসব পাপভার বহন করার কারণে আসল পাপমৃত্য হয়ে যাবে না। মোটকথা, আসল পাপীরা হালকা হবে না ; কিন্তু তারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে তাদের পাপের বুরো আরও ভরী হয়ে যাবে।) তারা যেসব মিথ্যা কথা উচ্চাবল করত সে সম্পর্কে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (অতঃপর এ ক্যারণে শাস্তি হবে)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ ঝুঁক করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সম্মেব ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপৰ্যাপ্তি করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উদ্দেশ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফিররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৮৫

শান্তির ভবে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শান্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজরের শেষ কর্তৃতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : ﴿فَرَأَيْتُ الْذِي تَوَلَّ وَأَعْطَلِي فَلَبِلًا وَأَكْدَى﴾—এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফির সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা জোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বক্ষ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজরে বিভারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কফিরদের এমনি ধরনের একটি উকি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে বলেছেন, যারা একপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী । ﴿وَمَا هُنْ بِحَامِلِينَ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾—অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা । সূরা নজরে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থী ।

হিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে—একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্ছুর্য করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ । এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও একসাথে বহন করবে ।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী ; আসল পাপীর যে শান্তি হবে তার প্রাপ্তি তাই । এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিঙ্গ করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সেও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী । হ্যারত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি সংকরের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত সোক তার দাওয়াতের কারণে সংকর করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আবলনামায়ও লেখা হবে এবং সৎকর্মীদের সওয়াব যোটেই ত্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত সোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিঙ্গ হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ যোটেই ত্রাস করা হবে না।—(কুরআনী)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ الْفَسْنَةُ الْأَخْمَسِينُ

عَامِمًا فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ⑯ فَإِنْجِينَهُ وَاضْحَبَ
 السَّفِينَةَ وَجَعَلَنَاهَا أَيَّةً لِلْعِلَمِينَ ⑰ وَإِبْرَاهِيمَ رَأَى قَالَ لِقَوْمِهِ
 أَعْبُدُ وَاللَّهَ وَآتَقُوَّةً ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑱
 إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِنْ كَيْفَا
 إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
 فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ هُوَ إِلَيْهِ
 تَرْجِعُونَ ⑲ وَإِنْ تُكَدِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أَمْمَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ⑳

(১৪) আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্মানের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কর্ম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্রাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নির্দর্শন করলাম বিশ্ববাসীর জন্য। (১৬) প্ররণ কর ইবরাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সম্মানের বললেন—তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ডয় কর। এটাই তোমাদের জন্য উভয় যদি তোমরা বুৰ। (১৭) তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কেবল প্রতিমারই পূজা করছ এবং মিথ্যা উচ্ছাবন করছ। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে শাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিযিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাসী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাসী বলেছে। স্পষ্টভাবে প্রয়োগ পোছিয়ে দেওয়াই তো রাস্তের দায়িত্ব।

তফসীলের সাম্র-সংক্ষেপ

আমি নূহ (আ)-কে তাঁর সম্মানের কাছে (পয়গবর করে) প্রেরণ করেছি। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ-কর্ম এক হাজার বছর অবস্থান করেছেন (এবং নিজ সম্মানেরকে বুঝিয়েছেন)। অতঃপর (তারা যখন ইমান কবুল করল সাঁও শখন) তাদেরকে মহাপ্রাবন গ্রাস করেছে। তারা ছিল বড় জালিম। (এত দীর্ঘ দিনের উপদেশেও তাদের স্বন গলজ

না ।) অতঃপর (প্লাবন আসার পর) আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে (যারা তাঁর সাথে আরোহণ করেছিল, এই প্লাবন থেকে তাদের) রক্ষা করলাম এবং এই ঘটনাকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষাপ্রদ করলাম । (তারা চিন্তাভাবনা করে বুঝতে পারে যে, বিরুদ্ধচরণের পরিণতি কি হয়) এবং আমি ইবরাহীম (আ)-কে (পয়গম্বর করে) প্রেরণ করলাম । যখন তিনি তাঁর (মৃত্তিপূজারী) সম্পদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে তুম কর (ভয় করে শিরক ভ্যাগ কর) । এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ (শিরক নিহক নিরুদ্ধিতা) । তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে কেবল (অক্ষম ও অকর্মণ্য) প্রতিমার পূজা করছ এবং (এ ব্যাপারে) মিথ্যা কথা উত্তোলন করছ (যে, তাদের দ্বারা আমাদের ইস্লাম রোজগারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়) । এটা নির্জলা মিথ্যা । (কেননা) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের কোন রিযিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না । কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছেই রিযিক তালাশ কর । (অর্থাৎ তাঁর কাছে চাও, রিযিকের মালিক তিনিই । তিনিই যখন মালিক, তখন) তাঁরই ইবাদত কর এবং (অতীত রিযিক তিনিই দিয়েছেন, তাই,) তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (এ হচ্ছে ইবাদত করার এক কারণ ; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তিনি ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখেন । সেমতে) তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে । (তখন কুফরের কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন ।) যদি তোমরা আয়াকে মিথ্যাবাদী বল, তবে (মনে রেখ, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই) তোমাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরগণকে এভাবে) মিথ্যাবাদী বলেছে (এতে সেই পয়গম্বরগণের কোন ক্ষতি হয়নি ।) এবং (এর কারণ এই যে,) (স্পষ্টভাবে) পয়গাম পৌছিয়ে দেওয়াই রাসূলের দায়িত্ব । (মানানো তাঁর কাজ নয় । সুতরাং পৌছিয়ে দেওয়ার পর পয়গম্বরগণ দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন । আমিও তেমনি । সুজরাং আমার কোন ক্ষতি নেই । তবে মেনে নেওয়া তোমাদের প্রতি ওয়াজিব ছিল । এটা ভরক করার কারণে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে ।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রাস্তুচ্ছাহ (সা)-কে সামুন্না দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উপরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপ্রাহীদের উপর কাফিরদের তরক থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে । কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সহজ সাহস হারাননি । তাই আপনিও কাফিরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালাতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন ।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হয়রত নূহ (আ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কৃফর ও শিরকের মুকাবিলা করেছেন । দ্বিতীয়ত তাঁর সম্পদায়ের তরক থেকে তিনি ষষ্ঠীকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি । কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুনীর্ধ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফিরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত

হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন বেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্রাবনের পরেও তাঁর আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুন্মীর্থ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবশীলে ব্যয় করা এবং অভিক্ষেত্রেই কাফিরদের তরফ থেকে মানারকম উৎপীড়ন ও মারাপিট সহ্য করা সম্ভেদে কোন সময় সাহস না হারানো—এগুলো সব নৃহ (আ)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমজ্জন্দের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে ইজরাত করে এক তরঙ্গতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ করার ঘটনা ইত্যাদি। হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হ্যরত লৃত (আ) ও তাঁর উদ্ধতের ঘটনাবলী এবং সুরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উদ্ধতের অবস্থা—এগুলো সব গ্রাসলুক্তাহ (সা) ও উদ্ধতে মুহাম্মদীর সাম্মানার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّلُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ إِنَّ ذَلِكَ
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
 بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ النَّشَاةَ الْآخِرَةَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۝
 وَإِلَيْهِ تُقْلِبُونَ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزَتِنِ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 فِي السَّمَاوَاتِ ۝ وَمَا كُلُّكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ وَلِقَاءُهُ أُولَئِكَ يَكُسُوا مِنْ رَحْمَتِ
 دَوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(১৯) তাদ্বা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম তরু করেন অতঃপর তাকে পুনর্বায় সৃষ্টি করবেন? এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) বলুন, ‘তোমরা শুধুবীভাবে জীবন কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম তরু করেছেন’ অতঃপর আল্লাহ পুনর্বায় সৃষ্টি করবেন। নিচের আল্লাহ সরকিলু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা পাওতি দেন এবং

যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করেন। তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা হলে শ অন্তরিক্ষে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঞ্জী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তার সাক্ষাৎ অব্ধিকার করে, তারাই আয়ার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যই যত্নগাদায়ক শান্তি আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি জানে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন (অনন্তিত্ব থেকে অঙ্গিত্বে অনিয়ন করেন), অতঃপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। (বরং প্রাথমিক দ্রষ্টিতে পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে অধিকতর সহজ, যদিও আল্লাহর সভাগত শক্তি-সামর্য্যের দিক দিয়ে উভয়ই সমান। তারা প্রথম বিষয় অর্থাৎ তা'আলা যে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি এ বিষয় তো স্বীকার করতো যেমন বলা হয়েছে : *وَلَنْ سَأْتَهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ* । কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করা স্বীকার করত না ; অর্থচ এটা করা অধিক স্পষ্ট। তাই *وَلَمْ يَرُوا* এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। গুরুত্বান্বিত উদ্দেশ্যে অতঃপর এই বিষয়বস্তুই পুনরায় ভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শোনানো হচ্ছে : আপনি (তাদেরকে) বলুন, তোমরা প্রথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিচয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (প্রথম বর্ণনায় একটি শুক্রিগত প্রমাণ আছে এবং দ্বিতীয় বর্ণনায় ইস্ত্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ আছে ; অর্থাৎ সৃষ্টি জগৎ প্রত্যক্ষ করা। এ পর্যন্ত কিয়ামত সপ্রমাণ করা হলো। অতঃপর প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছে যে, পুনর্বারের পর) তিনি যাকে ইচ্ছা শান্তি দিবেন (অর্থাৎ যে এর যোগ্য হবে) এবং যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করবেন। (অর্থাৎ যে এর হকদার হবে। এতে কারও কোন দখল থাকবে না। কেননা) তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (অন্য কারও দিকে নয়। তাঁর শান্তি থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।) তোমরা হলে (আজগোপন করে) ও অন্তরীক্ষে (উড়ে) আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না (যে, তিনি তোমাদেরকে ধরতে পারবেন না।) আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ; কোন সাহায্যকারীও (সৃষ্টির নিজ চেষ্টায়ও বাঁচতে পারবে না এবং অন্যের সাহায্যেও বাঁচতে পারবে না। উপরে যে আমি বলেছিলাম *يَعْذِبُ مَنْ يُشْتَرِكُ إِلَهًا* এখন সামগ্রিক নীতির মাধ্যমে এরা কারা—বর্ণনা করছি) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎকে অব্ধিকার করে, তারা (কিয়ামতে) আয়ার রহমত থেকে নিরাশ হবে। (অর্থাৎ তখন তারা প্রত্যক্ষ করবে যে, তারা রহমতের পাত্র নয়।) এবং তাদের জন্যই যত্নগাদায়ক শান্তি রয়েছে।

فَمَنْ كَانَ جَوَابَ قَوْمَهِ إِلَّا أَنْ قَاتَلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَإِنْ جَنَّهُ اللَّهُ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّقُوْمٍ مِّنْ نُوْنٍ ④ وَقَالَ إِنَّهَا أَنْخَدْتُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانًا لَا مَوْدَةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
شَمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا زَوْمَانِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَصْرٍ ۖ ۲۴ فَإِنَّ لَهُ
لُوْظٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤
وَوَهَبْنَا لَهُ رَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ
وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

لِمِنَ الصَّلِيعِينَ ⑥

(২৪) তখন ইবরাহীমের সম্মানের এ ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না বৈ, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদণ্ড কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিচ্য এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারম্পরিক ভালবাসা রক্তার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাত্রাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো। এরপর কিমামতের দিন তোমরা একে অপরকে অঙ্গীকার করবে এবং একে অপরকে শান্ত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহানাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার ধৃতি দ্বিতীয় হাপন করলেন শূন্ত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। নিচ্য তিনি পরাক্রমশীল, প্রজাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তার বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাকে পুরুষত করলাম। নিচ্য পরকালেও সে সংহিতাকের অঙ্গীকৃত হবে।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইবরাহীমের এই ক্ষয়গ্রাহী বক্তৃতার পর) তার সম্মানের (চূড়ান্ত) জওয়াব এটাই ছিল যে, তারা (পরম্পরে) বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদণ্ড কর। (সেমতে অগ্নিদণ্ড করার ব্যবস্থা করা হলো।) অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন (সূরা আবিয়ায় এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে)। নিচ্যই এই ঘটনায় ইমানদার সম্মানের জন্য

অনেক নিদর্শন রয়েছে)। [অর্থাৎ এই ঘটনা কয়েকটি বিষয়ের প্রমাণ ও আল্লাহর সর্বশক্তিমান হওয়া, ইবরাহীম (আ)-এর পদপথের হওয়া, কৃফর ও শিরকের অসামর্ত্য ইত্যাদি। তাই এক প্রয়াগই কয়েকটি প্রমাণের সূচাভিত্তিক হয়ে গেছে।] ইবরাহীম [(আ) ওয়ায়ে আরও] বললেন, পার্থিব জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিশ্রান্তদোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। (সেমতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ বজন, বন্ধু ও আর্দ্ধবন্ধুদের অনুসৃত পথে থাকে এবং এ কারণে সত্য-মিথ্যা চিন্তা করে না। সত্যকে সত্য জেনেও সত্য করে যে, বন্ধু-বন্ধুর ও আর্দ্ধবন্ধু-বজন হেঢ়ে যাবে।) এরপর কিয়ামতের দিন (তোমাদের এই অবস্থা হবে যে,) তোমরা একে অপরের শক্ত হয়ে যাবে এবং একে অপরকে অভিসম্প্রাপ্ত করবে। (যেমন সূরা আ'রাফে আছে : ﴿لَنْ تَأْتِيَنَا مُؤْمِنٌ بِمَا يَرَىٰ فَمِنْهُمْ إِلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنْتَفِعُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يَرْجِعُونَ﴾ সূরা সাথায় আছে : ﴿إِذْ تَبَرُّ أَذْلِينَ الَّتِي سَبَقُوا بِرِبِّيهِمْ إِلَى بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ أَنْتَفِعُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يَرْجِعُونَ﴾ সূরা বাকারার আছে : ﴿إِذْ تَبَرُّ أَذْلِينَ الَّتِي سَبَقُوا بِرِبِّيهِمْ إِلَى بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ أَنْتَفِعُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يَرْجِعُونَ﴾ সারকথি এই যে, আজ যেসব বন্ধু ও আর্দ্ধবন্ধুর কারণে তোমরা পথচর্টতা অবলম্বন করেছ, কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের শক্ত হয়ে যাবে।) এবং (তোমরা এই প্রতিমা পৃজ্ঞ থেকে বিরত না হলে) তোমাদের ঠিকনা হবে জাহানাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (এতে উপদেশের পরও তার সম্মান্য বিরত হলো না।) শুধু লৃত (আ) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি (তোমাদের মধ্যে থাকব না। বরং) আমার প্রতিপালকের (নির্দেশিত স্থানের) উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিচয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (তিনি আমার হিফায়ত করবেন এবং আমাকে এর ফল দেবেন।) আমি (হিজরতের পর) তাঁকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রাখলাম এবং তাঁর প্রতিদান তাঁকে দুনিয়াতেও দিলাম এবং পরকালেও তিনি (উচ্চতরের) সংখ্লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (এই প্রতিদান বলে নৈকট্য ও করুল বুঝানো হয়েছে; যেমন, সূরা বাকারায় রয়েছে : ﴿لَقَدْ أَصْطَفْنَاكَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত শৃত (আ) — فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ أَنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي — হযরত শৃত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্নীয়। নমুনদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আ)-এর মু'জিয়া দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং পঞ্চি সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী হন। কৃফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন : ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নবুয়ী ও কাতাদাহ বলেন হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য তো নিচিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোন কোন তফসীরকার এই উক্তি প্রতিপন্থ করেছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত শৃত (আ)-ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন;

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত শৃত (আ)-এর হিজরতের কথা ও বৎস্তুভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বথেম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম পয়গম্বর, যাকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। —(কুরআন)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যাবে : **وَأَتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا** অর্থাৎ আমি ইবরাহীম (আ)-এর আত্মজ্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রিস্টান, প্রতিমা পূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিগকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অঙ্গৰুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে ; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

وَلَوْطٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاجِحَةَ نَمَاءَ سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ ⑥ إِنِّي كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
السَّبِيلَ هُوَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا بَعْنَابَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑦ قَالَ رَبِّ
اَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ⑧ وَلَئَنَجَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ
بِالْبُشْرِيِّ لَا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلَ هَذِهِ الْقُرْيَةِ هُنَّ
أَهْلَهَا كَانُوا أَظْلَمِينَ ⑨ قَالَ إِنِّي فِيهَا لَوْطًا طَقَلَوْا نَحْنُ حُنْ أَعْلَمُ
بِمَنْ فِيهَا مَذْنَقَةٌ لَذِنْجِيَّةٌ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَكَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ⑩
وَلَئَنَجَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطًا سَقَيَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا
وَقَالُوا لَا تَخْفُ وَلَا تَحْزَنْ قَدِّرْتَ مَنْ جُوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

**اُمَّرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ⑥٠ إِنَّمَا مُنْذِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ
 الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ⑥١ وَلَقَدْ تَرَكُنا مِنْهُمَا
 آيَةً بَيْنَهُ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑥٢**

(૨૮) આર પ્રેરણ કરેછું લૃતકે । યથન સે તાર સંપ્રદાયકે બલલ, તોમરા એમન અશ્વીલ કાજ કરજ, યા તોમાદેર પૂર્વે પૃથ્વીર કેટ કરેનિ । (૨૯) તોમરા કિ પુંઘેધુને લિણ આજ, રાહાજાનિ કરજ એવં નિજેદેર મજલિસે ગર્હિત કર્મ કરજ? જગ્યાવે તાર સંપ્રદાય કેબળ એ કથા બલલ, આમાદેર ઉપર આસ્તાહર આયાર આન યદિ તુમિ સત્યવાદી હો । (૩૦) સે બલલ, હે આમાર પાલનકર્તા, દુઃક્રતકારીદેર વિરુદ્ધે આમાકે સાહાર્ય કર । (૩૧) યથન આમાર પ્રેરિત ફેરેશતાગળ સુસુખાદ નિમે ઇબરાહીમેર કાહે આગમન કરલ, તથન તારા બલલ, આમરા એહી જનપદેર અધિવાસીદેરકે ખરંસ કરવ । નિશ્ચર એર અધિવાસીરા જાણિય । (૩૨) સે બલલ, એહી જનપદે તો લૃતો રહ્યેછે । તારા બલલ, સેખાને કે આહે, તો આમરા ભાલ જાનિ । આમરા અબશ્યાઈ તાકે ઓ તાર પરિવારવર્ગકે રસ્કા કરવ તાર દ્વી બ્યાંગીત, સે અંસ્પ્રાંગદેર અસ્તર્ભૂત ધાકવે । (૩૩) યથન આમાર પ્રેરિત ફેરેશતાગળ લૃતેર કાહે આગમન કરલ, તથન તાદેર કારણે સે વિષય હયે પઢુલ એવં તાર યન સંકીર્ણ હરે ગેલ । તારા બલલ, શર કરવેન ના એવં દુઃખ કરવેન ના । આમરા આગમાકે ઓ આગમાર પરિવારવર્ગકે રસ્કા કરવઈ આપમાર દ્વી બ્યાંગીત ; સે અંસ્પ્રાંગદેર અસ્તર્ભૂત ધાકવે । (૩૪) આમરા એહી જનપદેર અધિવાસીદેર ઉપર આકાશ થેકે આયાર નાયિલ કરવ તાદેર પાપાચારેર કારણે । (૩૫) આમિ સુદ્ધિયાન લોકદેર જન્ય એતે એકટિ સ્પષ્ટ નિર્ધરણ રેખે દિરોછિ ।

તક්સීરેર સાર-સંક્ષેપ

આચિ લૃત (આ)-કે પરાગથર મળોનીત કરે પ્રેરણ કરેછું । યથન તિનિ તાર સંપ્રદાયકે બલલેન, તોમરા એમન અશ્વીલ કાજ કરજ, યા તોમાદેર પૂર્વે પૃથ્વીર કેટ કરેનિ । તોમરા કિ પુંઘેધુને લિણ આજ । (એટાઈ અશ્વીલ કાજ । એ હાડા અન્યાન્ય અયોધ્બીક કર્મકાગ્રણ કરજ ; યેમન) તોમરા રાહાજાનિ કરજ (સર્વનાશેર કથા એહી યે,) નિજેદેર મજલિસે ગર્હિત કર્મ કરજ । (શુનાહ પ્રકાશ કરા દ્વયં એકટિ શુનાહ । તોંર સંપ્રદાયેર (ચૂઢાણ) જગ્યાર એટાઈ છિલ યે, આમાદેર ઉપર આસ્તાહર આયાર આન યદિ તુમિ સત્યવાદી હો (યે, એસબ કાજ આયાવેર કારણ) લૃત (આ) દોયા કરલેન, હે આમાર પાલનકર્તા, દુઃક્રતકારીદેર વિરુદ્ધે આમાકે જર્યી (એવં તાદેરકે આયાર દારા ખરંસ) કર । તોંર દોયા કરુલ હઉયાર પર આસ્તાહ તા'આલા આયાવેર જન્ય ફેરેશતા નિયુક્ત કરલેન । એહી ફેરેશતાદેર યિશાય એહી કાજણ દેઓયા હલો યે, ઇબરાહીમ (આ)-કે

ইসহাক পয়দা হওয়ার সংবাদ দাও। সে ঘটে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন (কথাবার্তার মাঝখানে) তারা ইবরাহীম (আ)-কে বলল, আমরা (জৃত-সম্প্রদায়ের) এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধূংস করব। (কেননা) এর অধিবাসীরা বড় জালিয়। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেখানে তো জৃতও রয়েছে। (কাজেই সেখানে আয়াব এলে সে-ও ক্ষতিশূন্ত হবে।) ফেরেশতারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে (অর্থাৎ মু’মিনগণসহ) রক্ষা করব (আয়াব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে জনপদের বাইরে নিয়ে যাব। তাঁর দ্বী ব্যতীত, সে ধূংসপ্রাণদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। [সূরা হৃদ ও সূরা হিজরে এর আলোচনা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কথাবার্তা শেষ করে] যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ জৃত (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন জৃত (আ) তাদের (আগমনের) কারণে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কারণ, তারা ছিল অভ্যন্তর সুন্দী যুবকের আকৃতিবিশিষ্ট। জৃত (আ) তাদেরকে মানুষ মনে করলেন একই দ্বীয় সম্প্রদায়ের অপকর্মের কথা স্মরণ করলেন। এ কারণে তাদের আগমনে তাঁর মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। ফেরেশতারা (এ অবস্থা দেখে) বলল, আপনি ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। (আমরা মানুষ নই; বরং আয়াবের ফেরেশতা। এই আয়াব থেকে) আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব আপনার দ্বী ব্যতীত, সে ধূংসপ্রাণদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (আপনাদেরকে রক্ষা করে) আমরা এই জনপদে (অবশিষ্ট) অধিবাসীদের উপর একটি নৈসর্গিক আয়াব নাযিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (সেমতে সেই জনপদ উল্লে দেওয়া হলো এবং প্রতির বর্ষণ করা হলো)। আমি এই জনপদের কিছু শ্পষ্ট নির্দেশন বৃক্ষিমান সম্প্রদায়ের (শিক্ষার) জন্য (এখন পর্যন্ত) রেখে দিয়েছি (শিক্ষাবাসীরা শাম সফরে এসব জনশূন্য স্থান দেখত এবং বৃক্ষিমানরা তীত হয়ে ঈমানও কবূল করত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—وَلَوْلَا انْفَالَ لِقُوبَةِ الْكُمْ لَتَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ —এখানে জৃত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। অথবা, পুঁয়েথুন, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয় মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন শুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি হতত্ত্ব শুনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব শুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্জেজেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক খনি দেওয়া। উদ্যে হানী (রা)-এর এক ছাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অস্তীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। (নাউবিস্যাহ)

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম শুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বলের পত্তরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যক্তিচারের চাইতেও গুরুতর অসরাথ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিত নেই।

وَإِلَيْهِ مُدْعَىٰ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَقُولُ إِنِّي عَبْدُ رَبِّي وَأَرْجُو
 الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوْفِي إِلَّا رُضِيَّ مُفْسِدِيْنَ ⑥٦ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ
 تَهْمُمُ الرَّجُفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثَيْنَ ⑥٧ وَعَادَا وَشُودَا
 وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسِكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ⑥٨ وَقَادُونَ وَفَرْعَوْنَ
 وَهَامَنَ قَوْنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا
 كَانُوا سِيقِينَ ⑥٩ فَكُلَّا أَخْذَنَ كَبِيْرَ نَبِيِّهِ فَيَنْهَمُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
 حَاصِبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْذَ تُهُ الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسْفَنَا بِهِ
 الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑩ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولَيَاءَ
 كَمَثَلُ الْعَنْكَبُوتِ إِذَا تَخَذَّلْتُ بَيْتَهَا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيْوَتِ لَبَيْتُ
 الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ⑪ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ
 دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ أَعْزَىُ الْحَكَمَمَ ⑫ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ بِهَا
 لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَوْنَ ⑬ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ
 وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْلَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ⑭

(৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের অতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সন্ধিদার তোমরা আস্ত্রাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে যিখ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা

ভূমিকল্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আ'দ ও সামুদকে ধ্বনি করেছি। তাদের বাড়িস্বর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সংগঠ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হাঁশিয়ার। (৩৯) আমি কারুন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বনি করেছি। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। অতঃপর তারা দেশে দষ্ট করেছিল। কিন্তু তারা জিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারণ প্রতি প্রেরণ করেছি প্রত্যরসহ প্রচও বাতাস, কাউকে পেরেছে বজ্রপাতে, কাউকে আমি বিজীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুক্ত করার ছিলেন না : কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুক্ত করেছে। (৪১) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত ! (৪২) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই ; কিন্তু জানীরাই তা বুঝে। (৪৪) আল্লাহ, যথার্থের নভোমগ্নি ও তৃষ্ণামুণ্ড সৃষ্টি করেছেন। এতে নির্দর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি মাদইয়ানবাসীর প্রতি তাদের (জাতি) ভাই শোআয়ব (আ)-কে রাসূল করে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন—হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত কর। (শিরক ত্যাগ কর) কিয়ামত দিবসকে ভয় কর (তাকে অঙ্গীকার করো না)। এবং দের্শনে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বাদ্যার হক নষ্ট করো না। তারা কুফর ও শিরকের গুনাহের সাথে মাপে ও ওয়নে কম দেয়ার দোষেও দোষী ছিল। ফলে অনর্থ সৃষ্টি হতো) কিন্তু তারা শোআয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলে দিল। অতঃপর তারা ভূমিকল্প দ্বারা আক্রান্ত হলো এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। আ'দ ও সামুদকেও (তাদের হঠকারিতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে) ধ্বনি করেছি। তাদের বাড়িস্বর থেকেই তাদের ধ্বনিস্বরস্থা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। (তাদের জনশূন্য ধ্বনিস্বরশেষ তোমাদের শাম দেশে যাওয়ার পথে পড়ে। তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) শয়তান তাদের (কু) কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সংগঠ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল (এমনিতে) হাঁশিয়ার (উল্লাস ও নির্বোধ ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বুজিমস্তাকে কাজে লাগায়নি।) আমি কারুন, ফিরাউন ও হামানকেও (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বনি করেছি। মুসা (আ) তাদের (তিনজনের) কাছে (সত্যের) সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দষ্ট করেছিল। কিন্তু (আমার আয়ার খেকে) পালাতে পারেনি। আমি এই পঞ্চ-সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তার গুলাহের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারণ প্রতি প্রেরণ করেছি প্রচও বড়ো হাওয়া (অর্থাৎ আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি), কাউকে আঁঘাত করেছে ভীষণ বজনাদ (অর্থাৎ সামুদ সম্প্রদায়কে), কাউকে আমি বিজীন করেছি ভূগর্ভে (অর্থাৎ

কার্কনকে) এবং কাউকে করেছি (পানিতে) নিমজ্জিত । (অর্থাৎ ফিরাউন ও হামানকে) এবং (তাদের আযাবের ব্যাপারে) আল্লাহ যুগ্ম করেন নাই । (অর্থাৎ বিনা কারণে শাস্তি দেয়া বাহ্যত যুগ্ম যদিও সার্বভৌম অধিকারের কারণে আল্লাহর জন্য এটোও যুগ্ম ছিল না ।) কিন্তু তারা নিজেরাই (দুষ্টামি করে) নিজেদের প্রতি যুগ্ম করত (যে নিজেদেরকে আযাবের যোগ্য করে ধূংস হয়েছে । ফলে, তারা তাদের ক্ষতি করেছে ।) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা । সে ঘর বানায় । আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতর (সুতরাং মাকড়সা যেমন নিজ ধারণায় তার একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করে; কিন্তু বাস্তবে তা দুর্বলতর হওয়ার কারণে না থাকার শামিল হয়ে থাকে, তেমনি মুশরিকরা যিথে উপাস্যদেরকে তাদের আশ্রয় মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা আশ্রয় ঘোটাই নয়) যদি তারা (প্রকৃত অবস্থা) জানত (তবে একপ করত না,) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর পূজা করে, আল্লাহ তা (অর্থাৎ তার ব্রহ্মপ ও দুর্বলতা) জানেন । (সেগুলো ধূবই দুর্বল) তিনি (নিজে অর্থাৎ আল্লাহ) শক্তিশালী, প্রভাময় । (অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও কর্ম শক্তিতে কামিল) এবং (আমি এসব কিছুর ব্রহ্মপ জানি বিধায়) আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য দেই (তন্মধ্যে একটি উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে) এসব উদাহরণের কারণে তাদের মূর্খতা দ্বর হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেবল জ্ঞানীরাই এগুলো বুঝে (কার্যত জ্ঞানী হোক কিংবা জ্ঞান ও সত্যাবেষণকারী হোক) । এরা জ্ঞানীও নয়, অবেষণকারীও নয় । ফলে মূর্খতায় লিপ্ত থাকে । কিন্তু এতদস্বেচ্ছে সত্য সত্যই থাকবে । আল্লাহ তা জানেন ও বর্ণনা করেন । এ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ ব্যক্তিত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় । এরপর আল্লাহ ইবাদতের যোগ্য—এ বিষয়ের অধ্যাপ বর্ণিত হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা যথার্থের নভোমওল ও ভূমওল সৃষ্টি করেছেন । (তারাও একথা শীকার করে ।) ইমানদার সম্পদায়ের জন্য এতে (তাঁর ইবাদতের যোগ্যতার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসম পয়গম্বর ও তাদের সম্পদায়ের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের কাহিনী পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে । উদাহরণত শোআবর (আ)-এর কাহিনী সূরা আ'রাফে ও হৃদে । আ'দ ও সামুদের কাহিনীও সূরা আ'রাফে ও হৃদে এবং কার্কন, ফিরাউন ও হামানের কাহিনী সূরা কাসাসে এই মাত্র বর্ণিত হয়েছে ।

—**কানোয়া মস্টিচ্চের্স**— এর অর্থ চক্ষুরানতা । এর অর্থ চক্ষুরানতা । উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুকুর ও শিরক করে করে আযাব ও ধূংসে পতিত হয়েছে, তারা ঘোটাই বেগুকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না । বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও ইশিয়ার ছিল । কিন্তু তাদের বৃক্ষ ও চালাকি বন্ধুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় । তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরুষার এবং শাস্তির কোন দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে । কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিয় ও আপরাধী বৃক ফুলিয়ে ঘূরাকিরা করে এবং মজলুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে । এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও গরকাল বলা হয় । এ ব্যাপারে তাদের বৃক্ষ সম্পূর্ণ অকেজো ।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمُمْكِنٌ عَنْهُ أَخْرَى مِنْ فَاعْلَمُونَ —
অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজকর্ম কুর কুরে ; কিন্তু প্রকালের ব্যাপারে
উদাসীন ।

কোন কোন তফসীরবিদ **وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ** বাকোর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা
প্রকালেও বিদ্যাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত কিন্তু পার্থিব বার্ষ তাদেরকে
অঙ্গীকারে বাধ্য করে রেখেছিল ।

—**مَا كَفَرُوا بِالنَّبِيِّنَ وَكَفَرُوا بِالْأَنْبَيْتَ**— মাকড়সাকে বলা হয় । মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার
আছে । কোন কোন মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে । বাহ্যত এখানে তা বুঝানো
হয়নি । এখানে সে মাকড়সা বুঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে খুলতে
থাকে । এই জালের সাহায্যে সে যশা-মাছি শিকার করে । বলা বাহলা, জন্ম আনোয়ারের
যত প্রকার বাসা ও ঘর বিনিড় আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর । এই তার
সামন্তর বাতাসেও ছিল ঘৃণ ঘোঁষে পাইব । আলোচ্য আরাইতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ
ব্যক্তিগত অন্তর্ভুক্ত ইবাদত করে এবং অন্তর্ভুক্ত উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার
জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল । এমনিভাবে যারা কোন প্রতিষ্ঠা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা
করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে ।

মাস ‘আলা ৪ মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলিমদের
বিভিন্ন উক্তি আছে । কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না । কেননা, এই স্থুদু জন্মুটি হিজরতের
সময় সওর গিরিওহার শুধু জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে । খর্তীর
হিজরত আলী (রা) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন । কিন্তু সালাবী ও
ইবনে আতিয়া হিজরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, **مَنْ نَسْجَنَ تَرَكَ**,
—**أَرْدَى** মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ । গৃহে জাল রেখে
দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয় । উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয় । তবে অন্যান্য
হাদীস দ্বারা বিতীয় রেওয়ায়েতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের
আভিনা পরিষ্কার রাখ । —(জহল-মা’আনী)

لِكُلِّ الْأَمْمَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ.

মাকড়সার জাল ধৰা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে
যে, আমি সুশ্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের হজ্জপ বর্ণনা করি ; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও
কেবল আলিমগণই জান আহরণ করে । অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না । ফলে সত্য তাদের
সামনে ফোটে না ।

আল্লাহর কাছে আলিম কে ? ইমাম বগভী হিজরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সেই আলিম, যে আল্লাহর কালাম
নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসম্ভুটির কাজ থেকে বিরত
থাকে ।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলিম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হ্যরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রাসূলপ্রাহ (সা)-এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হ্যরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট প্রেরণ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলিম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে।

হ্যরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন **إِنَّ الْمُشَاهِدَاتِ نَفْسٌ لَّهَا** (لِلنَّاسِ مَا يَعْتَقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ) (ইবনে কাসীর)

**أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقْتِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ④٤٠**

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিচয় নামায অশুলি ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর শ্রবণ সর্বশেষ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ (সা) যেহেতু আপনি রাসূল, তাই) আপনি (প্রচারের জন্য) আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব (মানুষের সামনে) পাঠ করুন। (উকিগত প্রচারের সাথে কর্মগত প্রচারও করুন অর্থাৎ কর্তৃর মাধ্যমেও ধর্মের কাজ বলে দিন ; বিশেষত) নামায কায়েম করুন। (কেননা, নামায সর্বশেষ ইবাদতও এবং এর প্রতিক্রিয়াও সুদূরপ্রসারী।) নিচয় নামায (গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে) অশুলি ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। (অর্থাৎ নামায যেন একথা বলে, তুমি যে মানুষের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করছ এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করছ, অশুলি ও গর্হিত কাজে লিঙ্গ হওয়া তাঁর প্রতি ধৃষ্টা। এমনিভাবে নামায ছাড়া আরও যত সৎকর্ম আছে, সেগুলোও পালনীয়। কারণ, সেগুলো মৌখিক অথবা কার্যত আল্লাহ তা'আলা'র শ্রবণই।) আর আল্লাহর শ্রবণ সর্বশেষ। (তুমি যদি আল্লাহর শ্রবণে শৈথিল্য প্রদর্শন কর, তবে তুমে নাও,) আল্লাহ তোমাদের সব কর্ম জানেন (যেমন কাজ করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞানস্তুতি বিষয়

— **أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّكَ** — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উচ্চতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ভৃত কাফির এবং তাদের উপর বিভিন্ন

আয়াবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মু’মিনদের জন্য সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গঞ্জরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারালো উচিত না।

আলব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোগ ব্যবস্থাপত্রের দু’টি অংশ আছে, কোরআন তিলাওয়াত করা ও নামায আদায় করা। উভয়কে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উভয়ের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তিলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তুতি। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে, নামায তাকে অশ্রুল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত ^ش শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্ত্র কাজ, যাকে মু’মিন-কাফির নির্বিশেষে প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্ত্র মনে করে ; যেমন ব্যতিচার, অন্যায হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মন্ত্র এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে মন্ত্র বলা যায় না। ^ف শব্দসম্মের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো বয়ং নিঃসন্দেহজনপে মন্ত্র এবং সংকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কায়েম করে সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে ; তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী ^{أقامت صلوة} অন্যান্য মাধ্যমে যাবতীয় হতে হবে। ^{أقامت صلوة}-এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই ^أ-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুরুত্বনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেইভাবে নামায আদায় করা অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্তু ও নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামা আতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য গুরুত্বনীতি। অপ্রকাশ্য গুরুত্বনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়বন্ত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিরবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সংকর্মের তাওফীকপ্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সন্তুষ্ট গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের যাবতীয় কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৮৭

মধ্যেই ক্রটি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো : **إِنَّ الصَّلَاةَ تَهْلِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** — এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন : **مَنْ لَمْ يَنْهِ مَسْأَلَتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ** — অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামায অশুল ও গহীত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يطِعْ الصَّلَاةَ** — অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলা বাছল্য, অশুল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হ্যরত ইবনে আবুআস (রা) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বৃক্ষ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহই থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনিটি রেওয়ায়েত উক্তৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি নয় : বরং ইমরান ইবনে হসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আবুআস (রা)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হ্যরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরায করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাঙ্গুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সজ্জুরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে। — (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সল্লেহের জওয়াব : এখানে কেউ কেউ সম্মেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সন্দেশ বড় বড় শুনাহে শিষ্ট থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুক জানা যায় যে, নামায নামাযীকে শুনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে শুনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি জ্ঞানে না করেই শুনাহ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ তখু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াও নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে শুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। যার এক্রমে তাওফীক হয় না, চিন্তা করলে অমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ক্রটি রয়েছে এবং সে নামায কায়েম করার যথৰ্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

—**وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ** — অর্থাৎ আল্লাহর স্বরগ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ত্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহর স্বরগ'-এর এক অর্থ এই যে, বাস্তা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহকে যে স্বরগ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এক্রমও হতে

পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। **فَإِنَّ رَبَّكَ رَوِيَ أَذْكُرْكُمْ**। এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবৈয়ী থেকে এই দিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এনিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে শুনাহ থেকে মৃক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ ব্যং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্পাণেই সে শুনাহ থেকে মৃক্তি পায়।

**وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْقِتْلِيْهِ أَحْسَنُ قَصْلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّيْنَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمْنًا بِاللَّذِيْنِيْ اتَّزِلَّ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَّ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهِنَا وَإِلَيْهِمْ
وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ⑥٦** **وَكَذَلِكَ اتَّزِلَّنَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَإِلَيْنَ
أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ هُوَ لَاءُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ دُوَّمَابِحَدُ
بِإِيمَانِنَا إِلَّا الْكُفَّارُونَ ⑥٧** **وَمَا كُنْتَ تَسْلُو أَمْنَ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُلْهُ
بِإِيمَانِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبِطِلُونَ ⑥٨** **بِلَّهُوَايَتَ بِإِيمَانِنِ فِي صُدُورِ إِلَّيْنَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَبْحَثُ بِإِيمَانِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ ⑥٩** **وَقَالُوا لَوْلَا اتَّزِلَّ عَلَيْهِ
إِيمَانِنِ رَبِّهِ دَقْلُ إِنَّا لَا يَتِعْنُ اللَّهَ وَإِنَّا أَنَا نَذِيرُ مُبَيِّنَ ⑦٠** **أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ
أَنَا اتَّزِلَّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ دَإِنَّ فِي ذِلِكَ لَرْحِمَةٌ وَذِكْرِي لِقَوْمِ
يُؤْمِنُونَ ⑦١** **قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَسِيْرَى وَبِيْنَكُمْ شَهِيدٌ أَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَ**
وَالَّذِينَ أَمْنَوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِيرُونَ ⑦٢ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ دَ وَلَوْلَا أَجْلُ مُسَيْئَ لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ دَ وَلَيْا تَيْمِنُهُمْ
بَعْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑦٣** **يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ دَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ**

لِمُحِيطَةٍ بِالْكُفَّارِ ④٤٦ / يَوْمَ يُغْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فُوْقِهِمْ وَمِنْ مَنْ تَحْتِ
لِمُحِيطَةٍ بِالْكُفَّارِ ④٤٧ / يَوْمَ يُغْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فُوْقِهِمْ وَمِنْ مَنْ تَحْتِ

أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قَوْمًا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④٤٨ /

(৪৬) তোমরা কিভাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উভয় পছায়। তবে তাদের সাথে সহ, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাবিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস হ্রাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিভাব অবঙ্গীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিভাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (যক্তিবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফিররাই আমার আয়তসমূহ অবীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিভাব পাঠ করেন নি এবং দীর্ঘ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিভাব লিখেন নি। এরপ হলে যিথ্যাবাসীরা অবশ্যই সম্বেদ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে, জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়তসমূহ অবীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পাশনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নির্দর্শন অবঙ্গীর্ণ হলো না কেন? বলুন নির্দর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন সুন্পট সতর্ককারী মানু। (৫১) এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট সহ যে, আমি আপনার প্রতি কিভাব নাবিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য অসহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন-আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমগুলে ও ভূমগুলে আছে। আর যারা যিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অবীকার করে তারাই ক্ষতিপ্রাপ্ত। (৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্তুরাবিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিচেরই আকর্ষিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্তুরাবিত করতে বলে; অথচ জাহানায় কাফিরদেরকে যেরাও করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে যেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে। আল্লাহ বলবেন তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন পয়গম্বর (সা)-এর রিসালত প্রমাণিত, তখন হে মুসলমানগণ, রিসালত অবীকারকারীদের মধ্যে যারা কিভাবধারী, তাদের সাথে কথাবার্তার পদ্ধতি আমি বলে দিছি। বিশেষ করে কিভাবধারীগণের কথা বলার কারণ এই যে, প্রথমত তারা বিদ্বান হওয়ার কারণে কথা শোনে। পক্ষান্তরে মুশ্রিকরা কথা শোনার আগেই নির্যাতন শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত বিদ্বানগণ ইমান আনলে সর্বসাধারণের ইমান অধিক প্রত্যাশিত হয়ে যায়। পদ্ধতিটি এই :। তোমরা কিভাবধারীগণের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না। কিন্তু উভয়

পছায়। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। (তাদেরকে কটু ভাষায় জওয়াব দেওয়ায় দোষ নেই; যদিও এ ক্ষেত্রেও উভয় পছায় জওয়াব দেওয়া ভাল।) এবং (উভয় পছায় এই যে, উদাহরণত তাদেরকে) বল, আমরা আমাদের প্রতি অবজীর্ণ কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং সেই কিভাবেও (বিশ্বাস স্থাপন করেছি), যা তোমাদের প্রতি অবজীর্ণ হয়েছে। (কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ হওয়াই বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি। আমাদের কিভাব যে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবজীর্ণ, একথা যখন তোমাদের কিভাব ধারাও প্রয়োগিত, তখন আমাদের কিভাব কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। তোমরাও স্বীকার কর যে,) আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই, (যেমন আল্লাহ বলেন : ﴿إِنَّمَا يُبَشِّرُ بِمُنْفَعًا﴾ তা ওহীদ যখন সর্বসম্মত বিষয় এবং পদ্ধী ও ধর্মব্যাঙ্গকদের প্রতি আনুগত্যের কারণে শেষ নবী (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা তা ওহীদের পরিপন্থী, তখন আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তোমাদের উচিত। যেমন আল্লাহ বলেন : ﴿يَنْبَغِيْ بِمُنْفَعًا﴾ —এই কথাবার্তার পর তোমরা যে মুসলমান, একথা হৃশিয়ারীর উদ্দেশ্যে শুনিয়ে দাও) আমরা তো তাঁরই আনুগত্য করি, (এতে বিশ্বাস ও কর্ম প্রভৃতি সব এসে গেছে। অর্থাৎ তোমাদেরও একপ করা উচিত। যেমন আল্লাহ বলেন : ﴿فَإِنْ تَوْلُوا فَمُؤْلِنُوا بَأْنَى مُسْلِمُونَ﴾ —আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি যেমন কিভাব অবজীর্ণ করেছি (যার ভিত্তিতে উভয় পছায় তর্ক-বিতর্কের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে) অতঃপর যাদেরকে আমি কিভাব (অর্থাৎ কিভাবের হিতকর জ্ঞান) দিয়েছি, তারা এই কিভাবে বিশ্বাস করে এবং তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কও কুঠাপি হয়ে থাকে) এবং অদেরও (মুশার্রিকদেরও) কেউ কেউ এমন (ন্যায়পন্থী) যে, তারা এতে বিশ্বাস রাখে (বুঝে হোক কিংবা বিজ্ঞানদের ইমান দেখে হোক। প্রমাণাদি পরিচৃট হওয়ার পর) কেবল (হঠকারী) কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে। (উপরে বিশেষভাবে ইতিহাসবিদগণকে সঙ্গেধন করে ইতিহাসগত প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ব্যাপক সঙ্গেধনের মাধ্যমে যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা আপনার নবুয়ত অঙ্গীকার করে, তাদের কাছে সন্দেহের কোন উৎসও তো নেই। কেননা) আপনি তো এই কিভাবের (অর্থাৎ কোরআনের) পূর্বে কোন কিভাব পাঠ করেননি এবং নিজে হাতে কোন কিভাব লেখেননি। একপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত (যে, সে লেখাপড়া জানা যানুৰ। খোদারী গ্রন্থসমূহ দেখে-তলে সেগুলোর সাহায্যে অবসর সময়ে বিষয়বস্তু চিন্তা করে নিজে লিখে নিয়েছে এবং মুখ্য করে আমাদের শুনিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ একপ হলে সন্দেহের কিছুটা উৎস হতো; যদিও তখনও সন্দেহকারীরা মিথ্যাবাদীই হতো; কেননা কোরআনের অলৌকিকতা এরপরও নবুয়তের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। কিছু এখন তো সন্দেহের একপ কোন উৎসও নেই। কাজেই এই কিভাব সন্দেহের পাত্র নয়।) বরং এই কিভাব (এক হওয়া সন্দেহ যেহেতু এর প্রতিটি অংশই মুঁজিয়া এবং অংশও অনেক, তাই সে একাকীই যেন) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অভরে অনেক সুস্পষ্ট প্রমাণ। (অলৌকিকতা দেবীপ্যমান হওয়া সন্দেহও) কেবল হঠকারীরাই আমার আয়াতসমূহ অঙ্গীকার করে। (নতুন ন্যায়পন্থীদের মনে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।) তারা (কোরআনকারী মুঁজিয়া দেওয়া সন্দেহ নিছক হঠকারিতাবশত) বলে, তাঁর পালনকর্তার

পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি (আমাদের চাওয়া) নিদর্শনাবলী অবজীর্ণ হলো না কেন ? আপনি বলুন, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন (আমার ক্ষমতাধীন বিষয় নয়)। আমি তো (আল্লাহর আয়াব থেকে) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (রাসূল) যাই। (রাসূল হওয়ার বিশেষ প্রমাণ আমার আছে)। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রমাণ হচ্ছে কোরআন। এরপর আর কোন বিশেষ প্রমাণের কি প্রয়োজন ? বিশেষত যখন সেই প্রমাণ না আসার মধ্যে রহস্যও রয়েছে। অতঃপর কোরআন যে বড় প্রমাণ, তা বর্ণিত হচ্ছে।) এটা কি (নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে) তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিভাব (মু'জিয়া) নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে (সর্বদা) পাঠ করা হয়, (যাকে একবার শুনলে অলৌকিকতা প্রকাশ না পায়, তবে দ্বিতীয়বার শুনলে প্রকাশ পায় অথবা এর পরে প্রকাশ পায়। অন্য মু'জিয়ায় তো এ বিষয়ও থাকত না। কেননা তা চিরস্থায়ী অলৌকিক হতো না। এই মু'জিয়ায় আরও একটি অগ্রাধিকার এই যে,) নিচয়ই এই বিভাবে (মু'জিয়া হওয়ার সাথে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে। (রহমত এই যে, এই কিভাব খাঁটি উপকারী বিধানাবলী শিক্ষা দেয় এবং উপদেশ এই যে, উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকাজে উদ্বৃদ্ধ করে। অন্য মু'জিয়ার মধ্যে এই শুণ কোথায় থাকত ? এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একে যথা সুযোগ মনে করে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। এসব প্রমাণের পরেও যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে শেষ জওয়াব হিসাবে) আপনি বলে দিন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই (আমার রিসালতের) যথেষ্ট সাক্ষী। তিনি জানেন যা কিছু নভোমগুলে ও ভূমগুলে আছে। (যখন আমার রিসালত ও আল্লাহর জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি হলো, তখন) যারা মিথ্যায় বিশ্বাস ও আল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহর কথাকে) অবীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (অর্থাৎ যখন আল্লাহর কথা দ্বারা আমার রিসালত প্রমাণিত তখন একে অবীকার করা আল্লাহকে অঙ্গীকার করা। আল্লাহর জ্ঞান সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত, তিনি এই অবীকৃতির কথাও জানেন। তিনি এর জন্য শাস্তি দেন। সুতরাং তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা আপনাকে আয়াব ভুলাবিত করতে বলে (এবং তাৎক্ষণিক আয়াব না আসার কারণে আপনার রিসালতে সম্মেহ করে।) যদি (আল্লাহর জ্ঞানে আয়াব আসার জন্য) সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে (তাদের চাওয়ার সাথে সাথেই আয়াব তাদের উপর এসে যেত। (যখন সেই সময় এসে যাবে,) আকস্মিকভাবে তাদের উপর এ আয়াব এসে যাবে অথচ খবরও থাকবে না। (অতঃপর তাদের মূর্বতা প্রকাশ করার জন্য তাদের আয়াব ভুলাবিত করার কথা পুনরায় উল্লেখ করে আয়াবের নির্দিষ্ট সময় ও আয়াবের কথা বলা হচ্ছে :) তারা আপনাকে আয়াব ভুলাবিত করতে বলে (আয়াবের প্রকার এই যে,) নিচয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে (চার দিক থেকে) ঘিরে নেবে। যেদিন আয়াব তাদেরকে উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে ঘেরাও করবে এবং (আল্লাহ তখন তাদেরকে) বলবেন, তোমরা (দুনিয়াতে) যা কিছু করতে, (এখন) তার বাদ গ্রহণ কর।

আনুমতিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— وَلَا تُجَادِلُونَا أَمْلَكَتَابَ الْأَيْلَنْدِيَّ مِنْ أَخْسَنَ الْأَدْلِنْدِيَّ طَلَسْوَا — অর্থাৎ কিভাবধারীদের সাথে উন্মত্ত পছাড়া তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণ্ত কঠোর কথা-বার্তার জওয়াব ন্তৃত ভাষায়,

ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসূলত হট্টগোলের জওয়াব গার্জীর্পূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

—**كِتْمُ يَارَا تَوْمَادِهِ الرَّفِيْقِيْنَ طَلَمْرُ** —কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে—তোমাদের গার্জীর্পূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং **سُمْرَقْ** প্রমাণাদির মুকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েয়। যদিও তখন তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়। **وَإِنْ عَاقِبَنِمْ فَعَاقِبْنَاهُ بِمِثْلِ مَا عَوْقِبْنَاهُ بِهِ وَإِنْ** : **صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِصَابِرِيْنَ** —অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উন্নম পছায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশ্রিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে—আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অস্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে :

قُولُوا أَمْنًا بِإِنْدِنِيْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِإِنْ —অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা এ কথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গস্থরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গস্থরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি ? : এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইন্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ইমান রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এই সব কিতাবে যা কিন্তু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ইমান আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলেও এই সব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ইমান তথ্য সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্যরত মুসা ও ইসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইন্জীলকে সত্যও বলতে নেই এবং যিন্ধ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হ্যরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইন্জীল আসল হিস্তি ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শেনাত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং যিন্ধ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল : **أَمْنًا بِإِنْدِنِيْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِإِنْ** —অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গস্থরগম্বের

প্রতি অবজীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা যিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীরগুলুমূলে তফসীরকারকগণ কিভাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্বপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক র্যাদান ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

— مَكْنُتْ تَقْتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ وَلَا تُخْطَلُهُ بِمَمْنَكْ إِذَا حُرْتَابَ الْمُبْطَلُونَ — অর্থাৎ আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিভাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিভাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উচ্চী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে যিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিভাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাঝ, কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষক হওয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বড় প্রের্তি ও বড় মু'জিয়া : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মু'জিয়া প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষক রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চাঞ্চিষ্টি বছর তিনি যাকাবাসীদের সাথে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন সময় কিভাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ, যাকায় কোন কিভাবধারী বাস করত না। চাঞ্চিষ্টি বছর পূর্তির পর হঠাতে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন হিল মু'জিয়া, তেমনি শান্তিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালক্ষণের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলিম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসাবে তারা হৃদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সক্ষিপ্ত লেখা হলে তাতে প্রথমে منْ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ লিখিত হিল। এতে মুশরিকরা আপন্তি তুলে যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের ধাতিরে একপ করতে অঙ্গীকৃত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদন্তলে منْ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে 'রাসূলুল্লাহ (সা)' নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিজ্ঞায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিয়া হিসাবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এভন্তীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা

পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) লেখা জ্ঞানেন-বিনা প্রমাণে এক্ষণ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। বরং চিত্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

يَعِبَادِي اللَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَى فَاعْبُدُونِ^(৫৬) كُلُّ
 نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ قَدْ تَمَّ لِنَا تَرْجِعُونَ^(৫৭) وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّلِحَاتِ لِتَبُوئُنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ عُرْفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
 خَلِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ^(৫৮) فَطَلِيلُ الدِّينِ صَبَرُوا وَعَلَى رِبِّهِمْ
 يَتَوَكَّلُونَ^(৫৯) وَكَانَ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ دِرْزَقَهَا تَعْلَمُ اللَّهُ يَرْزُقُهَا
 وَإِيَّاكُمْ بَلْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(৬০) وَلَمَّا سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ هُوَ فَإِنِّي يُؤْفِكُونَ^(৬১)
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ مَا إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ^(৬২) وَلَمَّا سَأَلَهُمْ مَنْ شَرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَهُ فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ
 مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ^(৬৩) قَالُوكُلَّمَلِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^(৬৪)

(৫৬) হে আমার ইমানদার বাস্তাগণ, আমার পৃথিবী প্রশংস। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর বাদ অহংক করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশ্বাস হ্রাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্মাতের সুউচ্চ প্রাপ্তি হ্রাপন দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উচ্চম পুরুকার কর্মাদেব। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তা উপর ডরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্ম আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই নিয়ন্ত দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রান্ত, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজেস করেন, কে নভোমগুল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিরোজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহ’। তাহলে তারা মা’আরেফুল কুরআন (৬২)—৮৮

কোথায় ঘূরে বেড়াচ্ছে ? (৬২) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশ্ন করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। নিচয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিষ্কার। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বাস্তি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সংজীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, সম্মত প্রশংসা আল্লাহরই তা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, (যখন তারা চূড়ান্ত শক্তিবিশিষ্ট শরীয়ত ও ধর্মবলগ্নের কারণে তাদের উপর নিপীড়ন চালায়, তখন এখানে থাকাই কি জরুরী?) আমার পৃথিবী প্রশ্ন। অতএব (যদি এখানে থেকে ইবাদত করতে না পার, তবে অন্য কোথাও চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে) একান্তভাবে আমারই ইবাদত কর (কেননা এখানে মুশরিকদের জোর বেশি। সুতরাং খাঁটি তাওহীদ ভিত্তিক ও শিরকমৃক্ত ইবাদত এখানে সুরক্ষিত। তবে শিরকযুক্ত ইবাদত এখানে সম্ভবপর; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ইবাদতই নয়। যদি দেশত্যাগে আজ্ঞায়ৈস্বর্জন ও মাতৃভূমির বিছেদ তোমাদের কাছে কঠিন হনে হয়, তবে বুঝে নাও যে, একদিন না একদিন এই বিছেদ হবেই। কেননা) জীবনমাত্রাই মৃত্যুর হাদ (অবশ্যই) প্রহণ করবে। (তখন সবাই ছেড়ে যাবে।) অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (অবাধ্য হয়ে আমার মধ্যে শাস্তির ভীতি পূরোপুরিই বিদ্যমান।) আর (যদি এই বিছেদ আমার সম্মুক্তির কারণে হয়, তবে আমার কাছে পৌছার পর এই ওয়াদার যোগ্য পাত্র হয়ে যাও যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে (যেসব সৎকর্ম সম্পন্ন করা যাবে মাঝে দেশত্যাগের উপর নির্ভরশীল থাকে, ফলে তখন তারা দেশত্যাগও করে,) আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ ধাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। (সৎ) কর্মদের কৃত চমৎকার পূরকার! যারা (হিজরতের বিপদমহ নানা বিপদাপদে) সবর করে এবং (অন্য দেশে পৌছার পর কষ্ট ও ঝর্ণী-রোজগারের যে সমস্যা দেখা দেয়, তাতে) তাদের পাশনকর্তার উপর নির্ভর করে। (যদি হিজরতের ব্যাপারে তোমাদের মনে কুমুদ্রণা দেখা দেয় যে, বিদেশে খাদ্য কোথায় পাওয়া যাবে, তবে জেনে রাখ;) এমন অনেক জীবজন্ম আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। (অনেক জীবজন্ম আবার রাখেও।) আল্লাহই তাদেরকে (নির্ধারিত) ঝর্ণী পৌছান এবং তোমাদেরকেও (তোমরা যেখানেই থাক না কেন। কাজেই এক্ষণ কুমুদ্রণাকে মনে স্থান দিও না; বরং মন শক্ত করে আল্লাহর উপর নির্ভর কর।) আর (তিনি ভরসার যোগ্য। কেননা) তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এমনভাবে অন্যান্য শব্দেও তিনি পূর্ণতার অধিকারী। যিনি এমন পূর্ণ শুণসম্পন্ন, তিনি অবশ্যই ভরসার যোগ্য। ইবাদতগত তাওহীদ সৃষ্টিগত তাওহীদের উপর ভিত্তিশীল। সৃষ্টিগত তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমগুল ও দ্বিমগুল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে (সৃষ্টিগত তাওহীদ যখন স্বীকার করে, তখন ইবাদতগত তাওহীদের বেলায়) তারা কোথায় ঘূরে বেড়াচ্ছে? (ম্রষ্টা যেমন আল্লাহ-ই, তেমনি) আল্লাহ-ই (রিযিকদাতাও; সেমতে তিনি) তাঁর বান্দাদের

মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশংস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা, হ্রাস করে দেন। নিচ্য আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (যেকুপ উপযোগিতা দেখেন, সেইকুপ রিযিক দেন। মোটকথা, তিনিই রিযিকদাতা। কাজেই রিযিকের আশংকা হিজরতের পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহীদ তাদের কাছেও স্বীকৃত। এমনিভাবে জগতকে স্থায়ী রাখা ও তার পরিচালনার ক্ষেত্রেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে। সেমতে) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বায়ি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে শুক (ও অনুর্বর) হওয়ার পর সজীবিত (ও উর্বর) করে, তবে তারা (জওয়াবে) অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বলুন, আলহামদুলিল্লাহ (এতটুকু তো স্বীকার করলে, যদ্বারা ইবাদতগত তাওহীদও পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু তারা মানে না,) বরং (তদুপরি) তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (জান নেই, এ কারণে নয়, বরং তারা জানকে কাজে লাগায় না এবং চিন্তাভাবনাও করে না ফলে জাজুল্যমান বিষয়েও তাদের অবোধগম্য থেকে যায়)।

আনুবন্ধিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফিরদের শর্ততা, তাওহীদ ও রিসালাত অঙ্গীকার এবং সত্য ও সত্যপঞ্জীদের পথে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফিরদের অনিষ্ট থেকে আঘাতক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম ‘হিজরত’ তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সম্বন্ধের নিরসন :
 اَنْ اَرْمِنْ وَاسْفَعْ فَلَيْلَىٰ
 —আল্লাহ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশংস্ত। কাজেই কারণ এই ওয়র গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফিররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কৃফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলী নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বৃক্ত করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক, নিজের প্রাপ্তির আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফিররা বাধা দেবে এবং যন্ত্র করতে উদ্বৃত্ত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফিরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে,
 كُلْ نَفْسٍ بِرَبِّ الْمُوْتَ
 —অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্ত্রি হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হিকায়তের যত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে

অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর তয় অন্তরায় না হওয়া উচিত । বিশেষত আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ । পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে । পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে : *الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِتُبَوَّبُنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عَرَفًا الْخَ*

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর ইরামী-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে ? জনস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে । হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে । কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিছুপে হবে ? পরের আয়াতএয়ে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিযিকের ঘথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল । প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই রিযিক দান করেন । তিনি ইচ্ছা করলে বহিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বস্তিত থাকতে পারে । প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে : *وَكَانُونَ مِنْ دَارِبْلَهُ لَا تَحْسُلُ رِزْقَهُ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَرْزُقُ* — অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্ম আছে, যারা ধার্দ সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না । কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন । পতিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্ম একপই । কেবল পিপীলিকা ও ইদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে । পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না । তাই শ্রীস্বকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেঁটা করে । জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে । কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায় । মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্মের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সঞ্চিত করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই । হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সক্ষ্যাম উদ্দৱপূর্তি করে ফিরে আসে । তাদের না আছে ক্ষেত্ৰখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি । তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয় । তারা আল্লাহ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে । এটা একদিনের ব্যাপার নয়—বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা ।

রিযিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে । আল্লাহ বলেন, স্বয়ং কাফিরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে ? চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে । বৃষ্টি কে বর্ষণ করে ? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উত্তিদ কে উৎপন্ন করে ? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও দ্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ । আপনি বলুন, তাহলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিছুপে মনে কর ?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা । এটা ও মানুষের ভুল । জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ন্ত্বাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান । তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য

দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-র ১৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বৰ্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর “ফরযে আইন” ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরয়েই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তক্রপণেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফিরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ ﴿هُنَّ يَهَا جِرْوًا فِي سَبِيلِ اللَّٰهِ﴾ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কালেমা যেমন ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে সক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহিত্ত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) ﴿أَلْمُسْتَضْعَفِينَ أَوْ لِلَّٰهِ تَوْقَاهُمُ الْمُلَائِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ تَوْقَاهُمُ الْمُلَائِكَةُ فَأُولَئِكَ مَا وَمُّهُمْ جَهَنَّمُ﴾ —থেকে পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল,— হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে ঝুপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন এই ঘরে আদেশ জারি করেন : **مَنْ حَرَّبَ بَعْدَ الْفَتْحِ أَرْثَادَ مَكَّةَ**। অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রয়োগিত। ফিকাহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাস’আলা চয়ন করেছেন :

মাস’আলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্থাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্থাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব; তবে যার স্ফর করার শক্তি নেই কিংবা জন্মপ স্থাধীন ও মুক্ত দেশেই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওয়র আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাস’আলা : কোন দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানবলী পালন করার স্থাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোত্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল

কুফর হওয়া জরুরী নয়, বরং ‘দারুল ফিল্ক’ (পাপচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেধান থেকেও হিজরত করার ভুক্ত একটি। যদিও খাসক মসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হাজর ফতুল্ল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসলিমদে আহমাদে আবু ইয়াহুয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে-রাশুলুল্লাহ (সা) বলেন : لَمْ يَأْتِ بِهِ بَلْ بِاللهِ—وَالْعِبادُ عِبادُ اللهِ حِينَما احْبَتْ خِيرًا فَاقْرَأْ—অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বাস্তা আল্লাহর বাস্তা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে কাসীর)

ହୟରତ ସାଙ୍ଗିଦ ଇବନେ ଜୁବାୟର ବଲେନ, ସେ ଶହରେ ବ୍ୟାପକ ହାରେ ଶୁନାହ ଓ ଅଶ୍ଵିଳ କାଜ ହୟ, ମେଇ ଶହର ଛେଡ଼େ ଦାଓ । ହୟରତ ଆତା ବଲେନ, କୋନ ଶହରେ ତୋଯାକେ ଶୁନାହ କରତେ ବାଖ୍ୟ କରା ହଲେ ମେଥାନ ଥେକେ ପାଲିଯେ ଯାଓ ।—(ଇବନେ କାସୀର)

وَمَا هُنَّ إِلَّا لَهُوَ لَعْبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُنَّ
الْحَيَّانُ مَرْأُوكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّهُمُ إِلَى الْبَرِّ أَذَاهُمُ يُشْرِكُونَ ۝ لَيَكْفُرُوا
بِمَا أَتَيْنَاهُمْ ۖ وَلَيَسْتَعْوِدُوهُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۝ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا
حَرَمًا مِنْأَوِيَّةً يَخْطُفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعِمُونَ
اللَّهُ يَكْفُرُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِالْحَقِّ لَئِنْجَاءَهُ أَلِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّجٌ لِلْكُفَّارِ ۝ وَالَّذِينَ
جَاهُدُوا فِينَا نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لِمَعِ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৬৪) এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জ্ঞানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আয়োগ্য করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি বখন হলে এসে তাদেরকে উচ্চার করেন, তখনই তারা শর্মীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অঙ্গীকার করে এবং

ভোগবিলাসে ছুবে থাকে। সত্ত্বেই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুর্পার্শে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা যিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নিয়ামত অঙ্গীকার করবে ? (৬৮) যে আল্লাহ সম্পর্কে যিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অঙ্গীকার করে, তার চাইতে অধিক বে-ইনসাক আর কে ? (৬৯) যারা আমার জন্য অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিচের আল্লাহ সংকর্ষপরামর্শদের সাথে আছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(তাদের চিন্তাভাবনা না করার কারণ দুনিয়ার কর্মব্যক্তি। অথচ) এই পার্থিব জীবন, (যার এত কর্মব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে) ক্রীড়াকৌতুক বৈ কিছুই নয়। পর জগতই প্রকৃত জীবন। (দুনিয়া ধৰ্মসূল এবং পরকাল অক্ষয়, এ থেকে উভয় বিষয়বস্তু পরিস্কৃট। সুতরাং অক্ষয়কে বিশ্বৃত হয়ে ধৰ্মসূলের মধ্যে এতটুকু মগ্নতা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়।) যদি তারা এ সম্পর্কে (যথেষ্ট) জানত, তবে এক্ষণ করত না। (অর্থাৎ ধৰ্মসূলের মধ্যে মগ্ন হয়ে চিরস্থায়ীকে বিশ্বৃত হতো না; বরং তারা চিন্তাভাবনা করে বিশ্বাস স্থাপন করত; যেমন তারা স্বয়ং স্বীকার করে যে, জগৎ সৃষ্টি ও একে স্থায়ী রাখার কাজে আল্লাহর কোন শরীর নেই।) অতঃপর (তাদের এই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী খোদায়ীতে ও ইবাদতে তাকেই একক (মেনে নেওয়া ও তা প্রকাশ করা উচিত ছিল। (সেমতে) যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে (এবং নৌকা টোলমাটাল করতে থাকে) তখন একাধিকভে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকে।

—لَنْ أَنْجِيَتْنَا مِنْ هَذِهِ لَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (أَيُّ الْمُوْحَدِينَ) —এতে খোদায়ী ক্ষমতা ও উপাস্যতায়ও তাওহীদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কিছু দুনিয়ার মগ্নতার কারণে এই অবস্থা তেমন টেকসই হলো না। (সেমতে) অতঃপর যখন তাদেরকে (বিপদ থেকে) উদ্ভার করে স্থলের দিকে নিয়ে আসে, তখন অন্তিবিলাহৈ তারা শিরক করতে থাকে। এর সারমর্শ এই যে, আমি যে নিয়ামত (মুক্তি ইত্যাদি) তাদেরকে দিয়েছি তাকে অঙ্গীকার করে। তারা (শিরক বিশ্বাস ও পাপাচারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে) আরও কিছুকাল ভোগবিলাসে মন্ত থাকুক। সত্ত্বেই তারা সব খবর জানতে পারবে। (এখন দুনিয়ায় মগ্নতার কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাওহীদের পথে তাদের এক অন্তরায় তো হচ্ছে এই মগ্নতা। বিভীষণ অন্তরায় হচ্ছে তাদের আবিষ্কৃত একটি অযৌক্তিক অপকৌশল। তারা বলে : إِنْ تَبْغِيَ الْهُدًى — অর্থাৎ আমরা যুসলমান হয়ে গেলে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে। অথচ চাকুর অভিজ্ঞতা এর বিপরীতে। সেমতে তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের মক্কা নগরীকে) নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি; এর চতুর্পার্শে (হারমের বাইরে) যারা আছে, তাদেরকে (যারধর করে গৃহ থেকে) বহিকার করা হচ্ছে। (ঘর-

বিপরীতে তারা শাস্তিতে দিলাক্ষিপাত করছে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তারা জাগৃত্যামান বিষয়াদি অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষাধিক করে এবং ধর্মসের তত্ত্বকে ইমানের পথে ওয়ারন্সে ব্যক্ত করে। সত্য প্রকাশের পর এ বোকায়ি ও জেদের কি কোন ইয়ত্তা আছে যে,) তারা মিথ্যা উপাস্যে তো বিশ্বাস করে যাতে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই (বরং পরিপন্থী অনেক) এবং আল্লাহর (যার প্রতি বিশ্বাস করার অনেক কারণ ও প্রমাণ আছে, তাঁর) নিয়ামতসমূহ অঙ্গীকার করে। (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শিরক করে। কেননা শিরকের চাইতে নিয়ামতের বড় কোন অঙ্গীকৃতি আর নেই। বাস্তব কথা এই যে,) সেই ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিয় কে হবে, যে (প্রমাণ ব্যাতিরেকে) আল্লাহর বিরলক্ষে মিথ্যা রচনা করে (যে, তাঁর শরীক আছে। এবং) যখন তার কাছে সত্য (প্রমাণসহ) আগমন করে, তখন তাকে অঙ্গীকার করে। (প্রমাণহীন কথাকে সত্য মনে করা এবং প্রমাণ্য কথাকে মিথ্যা মনে করা যে যুভূত, তা বলাই বাহ্যিক। যারা এত বেইনসাফ) কাফির, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম নয় কি ?) অর্থাৎ অবশ্যই তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কেননা যেমন অপরাধ তেমনি শাস্তি হয়ে থাকে। মহা অপরাধের মহা শাস্তি। এ পর্যন্ত কাফির ও প্রবৃত্তি-পূজারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন তাদের বিপরীতদের কথা বলা হচ্ছে। যারা আমার পথে শ্রম স্বীকার করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নেকটা ও সওয়াব অর্থাৎ জান্নাতের) পথে পরিচালিত করব। (ফলে তারা জান্নাতে পৌছে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন : وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي مَدَّنَا إِلَىٰ النَّعَمَ (অর্থাৎ তাঁর সম্মতি ও রহমত) সংকর্মপরায়ণদের সঙ্গী (দুনিয়াতেও এবং পরকালেও।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশর্রিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নতোমগুল ও তৃমগুলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তম্ভারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সম্মত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, এ কথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, এরপরও তাঁরা অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্নাদ পাগল তো নয়: বরং চালাক ও সমবাদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ কারবার সূচারূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুরু হয়ে যাওয়ার কারণ কি ? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধর্মসূল কামনা বাসনার আসঙ্গি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অক্ষ ও অবুরু করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থির জীবন ঝীঝো-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

حيوانٌ وَمَا هُنَّ مِنْ حَيَاةٍ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ لَعِبٌ وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهُيَ الْحَيَاةُ
ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।—(কুরতুবী)

এতে পার্থিব জীবনকে ঝীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ঝীড়া-কৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদুপ।

পরবর্তী আয়তে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আচর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আয়াদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং উহা নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্য কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকেই ডাকে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবস্থার থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া করুল করেন এবং উপস্থিতি ধর্সের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালিমরা যখন তীরে পৌছে ইতির নিষ্পাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে।

এই আয়ত থেকে আনা গেল যে, কাফিরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদেরও দোয়া করুল করে নেন। কেননা সে মন্ত্র তথা অসহায়। আল্লাহ তা‘আলা অসহায়ের দোয়া করুল করার ওয়াদা করেছেন।—(কুরতুবী)

অন্য এক আয়তে আছে، **وَمَا دُعَا إِلَّا كَافِرُونَ**— অর্থাৎ কাফিরদের দোয়া অহঙ্কোগ্য নয়। বলা বাহ্য্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফিররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু করুল করা হবে না।

— **أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَهَنَّمَ أَمْنًا لَا يَبْغِي** — উপরের আয়তসমূহে মুক্তার মুশরিকদের মূর্খতাসূলত কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্বষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা‘আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্ভিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তা‘আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এক্ষণ্ঠাপোশ পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম এইখন করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আবাব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আবাব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।—(কুহল মা‘আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অস্তঃসারশূন্য । আল্লাহ্ তা'আলা বাযতুল্লাহ্ কারণে মকাবাসীদেরকে এমন যাহাত্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন হানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি । আল্লাহ্ বলেন, আমি সমগ্র মঙ্গাতৃষ্ণিকে হারেম তথা আপ্রয়ৱল করে দিয়েছি । মু'মিন কাফির নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে । এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে । মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তৃন করাও সবার মতে অবৈধ । বহিরাগত কোন ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সে-ও ইত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায় । অতএব মকাব বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঢ়া অজুহাত বৈ নয় ।

جَهَادٌ — وَالَّذِينَ جَاهُدُوا فِي نَعْمَانِهِمْ سُبْلَتْ
এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর
করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা । কাফির ও পাপিট্টদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি
এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত । তবে
জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা
জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি । অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে
ভাল মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সম্বেদ জড়িত থাকে কোনু পথ ধরতে হবে তা
চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে
সোজা, সরল ও সুগম পথ বরে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সেই পথের
দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন ।

ইল্ম অনুযায়ী আমল করলে ইল্ম বাড়ে : এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদ্বারদা
বলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত ইল্ম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের
সামনে নতুন নতুন ইল্মের দ্বার খুলে দেই । ফুয়ারল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে
ব্রহ্মী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই ।—(মাযহারী) *وَاللَّهُ أَعْلَمُ*

سُورَةُ الرُّومِ

সূরা আর-রুম

মোস্তার অবজীর্ণ, ৬০ আয়াত, ৬ ক্লুক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

الَّتِي ۝ عَلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ ۝ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
 سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضُعِّفِ سِنِينَ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِهِ
 وَيَوْمَئِذٍ يَقْرُأُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ ۝ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعَدَ اللَّهُ ۝ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۝ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ۝ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الَّتِي
 وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে উচ্চ।

(১) আলিফ, লাম, মীম, (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতি সত্ত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ-পচাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন যু'নিগণ আলন্দিত হবে (৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আল্লাহর প্রতিশ্রূতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রূতি খেলাক করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।) রোমকরা একটি নিকটবর্তী অঞ্চলে (অর্থাৎ রোম দেশের এমন এক অঞ্চলে, যা পারস্যের তুলনায় আরবের নিকটবর্তী।

[অর্থাৎ আয়রন্যাত ও বুস্রা। এগুলো শাম দেশের দুইটি শহর। (কামুস) রোম সাম্রাজ্যের অধীন হওয়ার কারণে এগুলোকে রোমের অঞ্চল বলা হতো। এই স্থানে রোমকরা পারসিকদের মুকাবিলায়] পরাজিত হয়েছে। (ফলে মুশরিকরা হর্ষেৎফুল হয়েছে।) কিন্তু তারা (রোমকরা) তাদের (এই) পরাজয়ের পর অতি সত্ত্ব (পারসিকদের বিপক্ষে অন্য যুদ্ধে) তিনি থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। (এই পরাজয় ও জয় সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। কেননা পরাজিত হওয়ার) পূর্বেও ক্ষমতা আল্লাহর হাতেই ছিল (ফলে তাদেরকে পরাজিত করে দিয়েছিলেন) এবং (পরাজিত হওয়ার) পচাতেও (আল্লাহই ক্ষমতাবান। ফলে তিনি বিজয়ী করে দিবেন।) সেই দিন (অর্থাৎ যেদিন রোমকরা বিজয়ী হবে,) মুসলমানগণ আল্লাহর এই সাহায্যের কারণে আনন্দিত হবে। (এই সাহায্য বলে হয় এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের কথায় সত্যবাদী ও বিজয়ী করবেন। কারণ, মুসলমানরা এই ভবিষ্যতবাণী কাফিরদের কাছে প্রকাশ করেছিল এবং কাফিররা এ কথাকে যিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। কাজেই মুসলমানদের কথা অনুযায়ী রোমকরা বিজয়ী হলে মুসলমানদের জিত হবে। না হয় একথা বুঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদেরকেও যুদ্ধে জয়ী করা হবে। সেমতে বদরযুক্তে তাদেরকে সাহায্য করে জয়ী করা হয়েছিল। সর্বাবস্থায় সাহায্যের প্রতি মুসলমানগণই। মুসলমানদের বাহ্যিক পরাজয়ের অবস্থা দেখে কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের বিজয়কে অসম্ভব মনে করা ঠিক নয়। কেননা সাহায্য আল্লাহর ইখতিয়ারে।) তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করেন। তিনি পরাক্রমশালী (কাফিরদেরকে যখন ইচ্ছা কথায় কিংবা কাজে পরাত্ত করে দেন এবং) পরম দয়ালু (মুসলমানদেরকে যখন ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন।) আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (এবং) আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভূঙ্গ করেন না (তাই এই ভবিষ্যতবাণী অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে)। কিন্তু অধিকাংশ লোক (আল্লাহ তা'আলার কার্যক্ষমতা) জানে না। (বরং তাঁর বাহ্যিক কারণাদি দেখে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে তারা এই ভাবযোগীকে অবাস্তর মনে করে। অথচ কারণাদির নিয়ন্ত্রক ও মালিক আল্লাহ তা'আলা। কারণ পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সহজ এবং কারণের বিপক্ষে ঘটনা ঘটানোও সহজ।

ভবিষ্যতবাণী বাস্তবে পরিণত হওয়ার পূর্বে যেমন বাহ্যিক কারণাদির অনুপস্থিতির কারণে তারা তা অঙ্গীকার করে, তেমনি, ভবিষ্যতবাণীকে পূর্ণ হতে দেখেও তারা একে দৈবাং ঘটনা মনে করে। তারা একে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন মনে করে না। তাই بِمَلْءِ শব্দে উভয় বিষয় দ্বারিল আছে। তারা যে আল্লাহ তা'আলা ও নবৃত্যত সম্পর্কে গাফেল, এর কারণ এই যে,) তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জ্ঞাত এবং পরকালের ব্যাপারে (সম্পূর্ণ) বেঁধবে। (সেখানে কি হবে, তারা তা জানে না। ফলে দুনিয়াতে তাঁরা আধাবের কারণাদি থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা করে না এবং মৃত্তির কারণাদি তখা ইমান ও সৎকর্মে ব্রহ্মী হয় না।)

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সুরা 'আনকাবুতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুজাহিদা করে, আল্লাহ

তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা ধারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহর সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুক্তের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুক্তে উভয় পক্ষই ছিল কাফির। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাস্তুত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোন কৌতুহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল প্রিস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি-যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহাইতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম স্ত্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ﴿تَعَالَى إِلَيْكُمْ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিষ্ঠোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্তায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজর প্রস্তুতের উক্তি অনুবাদী তাদের এই যুক্ত শামদেশের আয়ুর্ব্বাত ও বৃক্ষরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুক্ত চলাকালে মুক্তায় মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মাযহাবের দিকে দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু ইলো এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুক্তে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনষ্ট্যান্টিনোপলিসও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য স্ত্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিচিত্ত হয়ে যায়।—(কুরআনী)

এই ঘটনায় মুক্তায় মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লঙ্ঘন দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মুকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জারীর ইবনে আবী হাতেম)

সূরা কুমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবজীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হয়রত আবু বকর সিন্ধীক (রা) যখন এসব আয়াত শনলেন, তখন মুক্তায় চতুর্পার্শে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে যোৰূপা করলেন, তোমাদের হর্দোক্ষেত্র হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি যিথ্যা বলছ। এরপ হতে পারে না। হয়রত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর দৃশ্যমন তুই-ই যিথ্যাবাদী।

আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিনি বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি তাকে দশটি উষ্টী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো (বলা বাছল্য; এটা ছিল জুয়া; কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না)। একথা বলে হযরত আবু বকর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে করীম (সা) বললেন, আমি তো তিনি বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্য بِضَعْ سَنِينَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিনি থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্টীর স্থলে একশ উষ্টীর বাজি রাখছি; কিন্তু সময়কাল তিনি বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবু বকর আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হলো।—(ইবনে জারীর, তিরমিয়ী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্টী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোম রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উষ্টী পরিশোধ করবে। হযরত আবু বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবু বকর (রা) বাজিতে গেলেন এবং একশ উষ্টী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্টীগুলো সদকা করে দাও। আবু ইয়ালা ও ইবনে আসকিনে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে একপ ভাষা বর্ণিত আছে : هذا السحت تصدق به এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(রহল-মা'আনী)

জুয়া ৪. কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে “শয়তানী অপকর্ম” আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سَعْت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিন্তু সম্ভত হবে? ফিকাহবিদগণ এর জওয়াবে

বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল; কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রাসূলুল্লাহ (সা) পছন্দ করতেন না। তাই হ্যুরত আবৃ বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ (সা) ও হ্যুরত আবৃ বকর (রা) কখন-ও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ স্থীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেয়া হয়, তবে সহীহ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মাকরহ ও অপচন্দনীয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : كُسْبُ الْحِجَامَ سُحْتٌ এখানে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে سُحْت-এর অর্থ মাকরহ ও অপচন্দনীয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' ঘষে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পক্ষতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গুরুত্বে এই মাল হারাম থাকলে মীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুর্ভার হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এক্ষণ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

—أَرْبَعَةٌ يَمْنَدُ بِفَرَّحِ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِ اللَّهِ
হবে, সেই দিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎসুক হবে। বাক্যবিন্যাস পক্ষতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফির ছিল, কিন্তু অন্য কাফিরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবাস্তুর, বিশেষত, যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক, মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ করে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই, তখনকার দিমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যাই ছিল কাফিরদের দুই প্রাণক্ষি। আল্লাহ তা আলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রস্তুত করেছিল। —(রহল মা'আনী)

—يَقْلِمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمُمْعَنِ الْآخِرَةِ فَمَعَافُونَ
অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নথদর্শণে। ব্যবসা কিংবলে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, তবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে—এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ

সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পঙ্গিৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের ব্রহ্মণ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা । অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখন্দা । এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে । মানুষ এখানকার নয় ; বরং পরকালের বাসিন্দা । এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র । এখানে তার কাজ এই যে, ঘদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে । বলা বাহ্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ইমান ও সংকর্ম ।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন এর সাথে ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ يَعْلَمُونَ । এর সাথে ظَاهِرًا منَ الْحَيَاةِ يَعْلَمُونَ । এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না । আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেধবর ।

পরকাল থেকে পাকেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বৃক্ষিমত্তা নয় ; কোরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈর্ঘ্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ ; তাদের অগুভ পরিগতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে । আর পরকালের চিরহ্যায়ী আয়ার তো তাদের ভাগ্যগ্লিপি হয়েছেই । তাই এসব জাতিকে কেউ বৃক্ষিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না । পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং বিলাস-ব্যবস্থের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বৃক্ষিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বশিত হয়, যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে একপ লোককে বৃক্ষিমান বলা বৃক্ষির অবমাননা বৈ কিছুই নয় । কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বৃক্ষিমান, যারা আল্লাহ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—জীবনের লক্ষ্য বানায় না । এন আয়াতে অর্থ তাই ।

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَاجِلٌ مُسْئَىٰ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ③

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ، كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمِروهَا أَكْثَرَ
مِمَّا عَسِرَ وَهَا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ

كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۖ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الدِّينِ أَسَاءُ وَالسُّوءُ أَيْمَانُ
ۖ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا رِجَالًا يَسْتَهْزِئُونَ ۖ ۱۰

(৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমগল, ভূমগল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ব্যথাব্যথকাপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিগাম কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বন্তুত আল্লাহু তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিগাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিজ্ঞপ করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পরকালের বাস্তবতার প্রমাণাদি উন্নেও কি তাদের দৃষ্টি ইহকালে নিবন্ধ রয়েছে এবং) তারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, আল্লাহু তাঁ'আলা নভোমগল, ভূমগল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যথাব্যথকাপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? (তিনি আয়াতসমূহে খবর দিয়েছেন যে, যথাব্যথ কারণাদির মধ্য থেকে একটি হচ্ছে প্রতিদান ও শান্তি দেওয়া। নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে কিয়াবত। তারা যদি মনে মনে চিন্তা করত, তবে এসব ঘটনার সজ্ঞাবত্তা যুক্তি দ্বারা, বাস্তবতা কোরআন দ্বারা এবং কোরআনের সজ্ঞতা অলৌকিকতা দ্বারা উল্লিখিত হবে যেত। ফলে তারা পরকাল অঙ্গীকার করত না। কিন্তু চিন্তা না করার কারণে অঙ্গীকার করেছে। এটাই কি, আরও) অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা কি (কোন সময় বাড়ি থেকে বের হয় না, এবং) পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না, অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের (সর্বশেষে) পরিগাম কি হয়েছে? (তাদের অবস্থা ছিল যে,) তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যমীন (তাদের চাইতে বেশি) চাষ করত এবং তারা যতটুকু (সাজসরঞ্জাম ও গৃহ দ্বারা) এটা আবাদ করছে, তারা এর চেয়ে বেশি আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ মু'জিয়া নিয়ে আগমন করেছিল। (তারা সেগুলো আনল না এবং খৎস হয়ে গেল। তাদের খৎসের চিহ্ন শাম দেশের পথে অবস্থিত নির্জন গৃহাদি থেকে সুস্পষ্ট।) বন্তুত (এই খৎসে) আল্লাহু তাদের প্রতি যুলুমকারী ছিলেন না। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অঙ্গীকার করে তারা খৎসের যোগ্য হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা। অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, (পরকালে) তাদের পরিগাম হয়েছে মন্দ (তথু) এ কারণে যে, তারা আল্লাহু তাঁ'আলা'র আয়াতসমূহকে (অর্থাৎ নির্দেশাবলী ও সংবাদাদিকে) মিথ্যা বলত এবং (তদুপরি) সেগুলো নিয়ে উপহাস করত (দোষখের শান্তি হচ্ছে তাদের সে পরিগাম)।

আনুষাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতের পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষাৎ বক্স। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধৰ্মসীল বিলাস-ব্যবস্নে মন্তব্য হয়ে জগৎজৈবী কারখানার বক্স ও পরিণাম সম্পর্কে বেধবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন যথান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগমিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খৌজে ব্যাপ্ত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা বাহ্যিক যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শান্তি হওয়াও জরুরী। নতুনা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই একপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশী জীবন যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরক্ষার ও মন্দ কাজের শান্তি দেওয়া হবে। এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই *أَوْلَمْ يَنْتَهُوا فِي الْأَرْضِ* এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পূর্ববর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাকুৰ ও অভিজ্ঞতালক বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ বক্স পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

—أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরক্ষ্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামনে সফর করে—এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রভ্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্যিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্দুরা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিঁজ করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাগার থেকে ঝর্ণ, ঝোপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উৎসোলন করত এবং তদ্দুরা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষম্যিক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মন্তব্য হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্তৃত হয়। আরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনদিকেই জ্ঞানকে প্রকাশ করে নি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আয়াবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধৰ্মসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষাৎ

দিছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আয়াবে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন যুশুয় হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুশুয় করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আয়াবের কারণাদি সংক্ষয় করেছে।

اللَّهُ يَبْدِئُ وَالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑮ وَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ⑯ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شَرِّ كَايْهِمُ
 شَفَعَوْمًا وَكَانُوا يُشَرِّكُونَ ⑰ كَايْهِمُ كُفَّارِيْنَ ⑱ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِنْ
 يَتَفَرَّقُونَ ⑲ فَإِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي
 رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ ⑳ وَإِمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَقَائِي
 الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضُونَ ㉑ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حَمْدُ
 تَمْسُونَ وَحْيَنَ تَصْبِحُونَ ㉒ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَعَشِيًّا وَحْيَنَ تَظَاهِرُونَ ㉓ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمِيتَ
 مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ٰ وَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ ㉔

(১১) আল্লাহ ধর্মবাদ সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরাবৃত্ত সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে থাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অধীকার করবে। (১৪) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) যারা বিশ্বাস হ্রাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জাগাতে সমাদৃত হবে; (১৬) আর যারা কাফির এবং আয়ার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাত্কারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আয়াবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। (১৭) অতএব তোমরা আল্লাহর পরিদ্রোগ স্বরূপ কর সক্ষ্যাত্ব ও সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্ন। নভোসংগ্রহ ও জ্যুগলে তাঁরই প্রশংসন। (১৯) তিনি যৃত থেকে জীবিতকে বহিগত করেন, জীবিত থেকে সৃতকে বহিগত করেন, এবং ভূমির সৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উপস্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা মখ্বুককে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায়ও সৃষ্টি করবেন। এরপর (সৃজিত হওয়ার পর) তোমরা তার কাছে (হিসাব-নিকাশের জন্য) অত্মবর্তিত হবে। যে দিন কিয়ামত হবে (যাতে উপরোক্ত পুনরুজ্জীবন সম্পন্ন হবে) সেদিন অপরাধীরা (কাফিররা) হতভব হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন যুক্তিযুক্ত কথা বলতে পারবে না) এবং তাদের (তৈরি) দেবতাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না। (তখন) তারা (গ) তাদের দেবতাকে অধীকার করবে। (বলবে, **وَإِنَّ رَبَّنَا مَكَنْ شُرِكَنْ**) যে দিন কিয়ামত হবে, সেদিন উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও আরও একটি ঘটনা ঘটবে এই যে, বিভিন্ন যত্তের) সব মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, তারা তো জান্নাতে আরামেই থাকবে আর যারা কুফর করেছিল এবং আয়াতসমূহ ও পরকালের ঘটনাকে যথ্য বলেছিল, তারা আয়াবে ঘেফতার হবে। (বিভক্ত হওয়ার অর্থ তাই)। বিশ্বাস ও সৎকর্মের প্রেরণ যখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে,) অতএব তোমরা আল্লাহ্ পবিত্রতা বর্ণনা কর (বিশ্বাসগত ও অস্তরণতভাবে অর্থাৎ ইমান আল, উত্তীর্ণতভাবে অর্থাৎ মুখে উচ্চারণ কর ও তার বিকর কর এবং কার্যগতভাবে অর্থাৎ সব ইবাদত—ইত্যাদি সম্পন্ন কর, বিশেষত ও নামায কার্যম কর। মোটকথা, তোমরা সর্বদা আল্লাহ্ পবিত্রতা বর্ণনা কর ; বিশেষ করে) সক্ষায় ও সকালে। (আল্লাহ্ বাস্তবে পবিত্রতা বর্ণনার যোগ্যও ; কেননা,) নভোমঙ্গল ও ভূমগলে তাঁরই প্রশংসা (অর্থাৎ নভোমঙ্গলে ফেরেশতা এবং ভূমগলে কেউ বেছায় এবং কেউ বাধ্য হয়ে তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করে ; যেমন **أَنْ مَنْ شَئَ لِي سَبِّعْ بِخْمَدْ**, **وَإِنْ مَنْ شَئَ لِي سَبِّعْ بِخْمَدْ**, **كَاجِي** তিনি যখন এমন সর্বগুণসম্পন্ন সত্তা, তখন তোমাদেরও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা উচিত।) এবং অপরাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর) ও মধ্যাহ্নে (পবিত্রতা বর্ণনা কর। এসব সময়ে নিয়ামত নবায়িত হয় এবং কুদরতের চিহ্ন অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়। কাজেই এসব সময়ে পবিত্রতার নবায়ন উপযুক্ত। বিশেষত নামাযের জন্য এ সময়গুলোই নির্ধারিত। **فَلَمَّا** শব্দের মধ্যে মাগরিব ও এশা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। **عَشِي** শব্দের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু যোহর পৃথকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় শুধু আসর অন্তর্ভুক্ত আছে। সকালও পৃথকভাগে উল্লিখিত হয়েছে। পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয় ; কেননা, তাঁর প্রতি এমন যে,) তিনি যত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে যতকে বহির্গত করেন (যেমন শুক্রবীর্য ও ডিশ থেকে মানুষ এবং ছানা ; আবার মানুষ ও পক্ষী থেকে শুক্র ও ডিশ) এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর (অর্থাৎ শুক্র হওয়ার) পর জীবিত (অর্থাৎ সজীব ও শ্যামল) করেন। এভাবেই তোমরা (কিয়ামতের দিন) কবর থেকে উদ্ধিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حَبَرٌ থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। **حَبَرَنَ** — **فِي رُوْسَةِ حَبَرَنَ** — **حَبَرَنَ** যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবাই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে : **فَلَادِ تَلَمْ** **أَنْفَسْ** **مَنْ أَنْفَسْ** **لَمْ مِنْ قَرْأَةِ أَنْفَسْ**

শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বক্তু উল্লেখ করেছেন! এগুলো সব এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ -

অর্থাৎ **সবুজ স্বপ্ন ধাতু**। এর ক্রিয়া উহু আছে অর্থাৎ **স্বপ্ন ধাতু**—এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝারীনে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরী। কারণ, নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গলে তিনিই একমাত্র প্রশংসনার ঘোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসনায় মশগুল। আয়াতের শেষ ভাগে **عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ** বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাক্তে তথ্য আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথ্য সূর্য পচিয়াকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অঞ্চল এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অঞ্চল রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অঞ্চল রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা তথ্য সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সন্ধ্যাকে যোহরের অঞ্চল রাখার এক কারণ সত্ত্বত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ অথবা নামায সম্পন্ন করা স্বত্ত্বাত কঠিন। এ কারণেই কোরআনে **صَلَوةٌ وَسَطْرٌ** তথ্য আসরের নামাযের বিশেষ আকীদ বর্ণিত হয়েছে :

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উল্কিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণিত হয়েছে। যিকরের যত প্রকার আছে তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উভয়রূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জগানা নামায ও সে সবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে আবুলাস (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআন পাঞ্জগানা নামাযের শপ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ **حِينَ تُمْسُونَ** শব্দে মাগরিবের নামায, **شَدِّي** শব্দের ফজরের নামায, **عَشِيًّا** শব্দে আসরের নামায এবং **وَحِينَ تُظْهِرُونَ** শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশা নামাযের প্রমাণ আছে অর্থাৎ **مِنْ يَنْذِلُهُ اللَّهُ** : **حِينَ تُمْسُونَ** শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জাতব্য ৪ আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে : —**হযরত ইবরাহীম (আ)** সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হয়েরত মুজায ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে হয়েরত ইবরাহীম (আ)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হয়েরত ইবনে আবুআস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হয়েরত ইবনে আবুআস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।—(জনুল মা'আনী)

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تُنَشِّرُونَ ⑭
 أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَسَاحِمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑮
 وَمِنْ أَيْتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافُ الْسِنَّتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِلْعَلَمِيْنَ ⑯ وَمِنْ أَيْتِهِ مَنْ آمَّكُمْ بِالْيَوْمِ وَالنَّهَارِ
 وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَسْعَوْنَ ⑰
 وَمِنْ أَيْتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَاعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ
 بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑱
 وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَا كُمْ دُعْوَةً
 مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ⑲ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 كُلُّ لَهُ قِنْتُونَ ⑳ وَهُوَ الَّذِي يَبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ
 أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ㉑

(২০) তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শাস্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারম্পরিক সম্মতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিচয় এতে চিনাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমগ্ন ও ভূমগ্নের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিচয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন : রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অব্যবহণ। নিচয় এতে মনোযোগী সম্পদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভৱ ও ভৱসার জন্য এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্ধারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নিচয় এতে বুক্ষিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৫) তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে খোঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) নভোমগ্নে ও ভূমগ্নে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবধ। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অঙ্গিতে আননন্দ করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীলের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। (হয় এ কারণে যে, আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছিলেন।) তাঁর মধ্যে সমস্ত বংশধর মুক্তায়িত ছিল ; না হয় এ কারণে যে, বীর্যের মূল উপাদান খাদ্য। চার উপাদানে খাদ্য গঠিত, যার প্রধান উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।)অতঃপর অজ্ঞ পরেই তোমরা মানুষ হয়ে (পৃথিবীতে) বিচরণ করছ। তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য তোমাদের স্তুগণকে সৃষ্টি করেছেন, (উপকার এই,) যাতে তোমরা তাদের কাছে শাস্তি পাও এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে সম্মতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এতে চিনাশীল লোকদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (কেননা, প্রমাণ করার জন্য চিন্তা দরকার। ‘নিদর্শনাবলী’ বহুবচন ব্যবহার করার কারণ এই যে, উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে বহুবিধ প্রমাণ নিহিত রয়েছে।) তাঁর (শক্তির) নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন নভোমগ্ন ও ভূমগ্নের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। (ভাষা বলে হয় শব্দাবলী বুঝানো হয়েছে, না হয় আওয়াজ ও বাচনভঙ্গি।) এতে জ্ঞানীদের জন্য (শক্তির) নিদর্শনাবলী রয়েছে (এখানেও বহুবচন আনার কারণ তাই)। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নিদর্শন রাতে ও দিনভাগে তোমাদের নিদ্রা (যদিও রাতে বেশি ও দিনে কম ঘুমাও) এবং তাঁর কৃপা অব্যবহণ (যদিও দিনে বেশি এবং রাতে কম অব্যবহণ কর। এ কারণেই অন্যান্য আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং কৃপা অব্যবহণকে দিনের

সাথে বিশেষভাবে সহক্ষযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে)। এতে (প্রমাণাদি অনোয়োগ সহকারে) প্রোত্তা লোকদের জন্য (শক্তির) নির্দর্শনাবলীরাপে রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নির্দর্শন এই যে, তিনি (সৃষ্টির সময়) তোমাদের বিদ্যুৎ দেখান, যাতে (তার পতিত হওয়ার) ত্যও থাকে এবং (তদ্বারা বৃষ্টির) আশাও হয়। তিনিই আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা মৃত্তিকার মৃত (অর্থাৎ শুষ্ক) হওয়ার পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সঙ্গীব) করেন। এতে (উপকারী) বুদ্ধির অধিকারীদের জন্য (শক্তির) নির্দর্শনাবলী রয়েছে। তাঁর (শক্তির) অন্যতম নির্দর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে (অর্থাৎ ইচ্ছায়) আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (এতে আকাশ ও পৃথিবীর স্থায়িত্বের বর্ণনা আছে এবং উপরে **عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** অর্থাৎ আয়াতে সৃষ্টির পর্যায় বর্ণিত হয়েছিল। তোমাদের জন্য ও বংশবির্তার, পারম্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক, আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রতিষ্ঠা, ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য দিবারাত্রির পরিবর্তনে নিহিত উপকারিতা, বারিবর্ষণ এবং এর সূচনা ও চিহ্নের বিকাশ, বিশ্বের উল্লিখিত এসব ব্যবস্থাপনা ততক্ষণ কায়েম থাকবে, যতক্ষণ দুনিয়া কায়েম রাখা উদ্দেশ্য। একদিন এগুলো সব খতম হবে যাবে।) অতঃপর (তখন এই হবে যে,) ঘন্থন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে ডাক দেবেন, তখন তোমরা একযোগে উঠে আসবে (এবং অন্য ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়ে যাবে, যা এখানে আসল উদ্দেশ্য)। উপরে শক্তির নির্দর্শনাবলী থেকে জানা হয়ে থাকবে যে, নভোমঙ্গল ও ভূমঙ্গলে যা কিছু (ফেরেশতা, মানব ইত্যাদি) আছে সব তাঁরই (মালিকানাধীন)। সব তাঁরই আজ্ঞাবহ (কুদুরতের অধীন) এবং (এ থেকে প্রয়োগিত হয় যে,) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন (এটা কফিরদের কাছেও স্বীকৃত)। অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এটা (অর্থাৎ পুনর্বার সৃষ্টি) তাঁর জন্য (মানবের বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে প্রথমবার সৃষ্টি করার চাইতে) সহজ। (যেমন মানবিক স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে সাধারণ সীতি এই যে, কোন বন্ধু প্রথমবার তৈরি করার চাইতে দ্বিতীয়বার তৈরি করা সহজ।) আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ। (আকাশে তাঁর মত সহায় কেউ নেই এবং পৃথিবীতেও নেই। আঙ্গুহ বলেন, তিনি পরাক্রমশালী (অর্থাৎ সর্বশক্তিশালী ও) প্রজ্ঞাময়। (উপরে বর্ণিত কার্যাবলী থেকে শক্তি ও প্রজ্ঞা উভয়ই প্রকাশমান। সুতরাং তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। এতে যে বিরতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে প্রজ্ঞা ও উপকারিতা নিহিত আছে। সুতরাং শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রয়োগিত হওয়ার পর এখনই পুনর্বার সৃষ্টি না হওয়ার কারণে একে অবীকার করা মূর্খতা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কুমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফিরদের পথস্ত্রিতা ও সত্ত্বের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা এসমূল পার্থিব জীবনকে লঙ্ঘ হ্রির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ, শান্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবস্থার মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুর্পার্শে জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ

করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অঙ্গীদার নেই। এসব সাক্ষাৎ-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সন্তানেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পূর্ণগংথরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরজীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্মাতে অথবা জাহানামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক ‘শক্তির নিদর্শনাবলী’ শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা'র অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত একার উপাদান আছে তল্লুধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলক্ষ্মির নাম-গন্ধ ও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুর্ষয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বিপৰ্যত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভূতার কারণে তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুবল না যে, অন্তত ও আভিজ্ঞাত্যের চাবিকাটি স্মৃষ্টি ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হয়রত আদম (আ)-এর দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবশ্য নয়। এটাও সত্ত্বপূর্বক যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান ধারা গঠিত তল্লুধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই ঘটেছে নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ﴿كُلُّ أَرْبَعٍ تُؤْمِنُوا بِهَا نَاهِيَّ تَوْدِيْنَ كَمَا يَأْتِيَنَّ مِنْ حَمَلَةِ رَحْمَةٍ وَّمِنْ حَمَلَةِ شَفَاءٍ﴾। অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌছে শাস্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ষ সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্য হচ্ছে মানসিক শাস্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্য হচ্ছে মনের শাস্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সফল। যেখানে মানসিক শাস্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই ধাক্ক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহ্য্য যে, পারম্পরিক শাস্তি তখনই সত্ত্বপূর্বক যখন নারী ও মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৯১

পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারায় ঝীভিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। অল্প-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক মৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি; এর জন্য পারম্পরিক সম্মীতি ও দয়া জঙ্গলী : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাঙ্গত্য জীবনের লক্ষ্য—মনের শান্তিকে ছির করেছে। এটা তখনই সম্ভবগত, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নজুব অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় হিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাব করে তজ্জন্য কঠোর শান্তিবাণী শোনালো হয়েছে। শান্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্হিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ দেয় যে, তখু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহজীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্ত্ব—إِنَّمَا—ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারম্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোন আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়তে আনতে পারে না এবং কোন আদাঙ্গতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাস্লুল্লাহ (সা) কোরআন পাকের সেই সব আয়াত ঘনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহজীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহজীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-ঝীর পারম্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি ; বরং মানুষের ইভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারম্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্ধৃত করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাপ্তের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোলা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি বভাবগত ভালবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-ঝীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে : وَجَعْلُ بَيْنَكُمْ مُّؤْدِةً وَرُحْمًا—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-ঝীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি ; বরং তাদের অন্তরে সম্মীতি ও দয়া প্রদিত করে দিয়েছেন। এ ও এর শান্তিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালবাসা ও পীতি। এখানে আল্লাহ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—এক, بَرَتْ ও দ্বিতীয় رَحْمَتْ। সর্বত্ত এতে ইঙ্গিত আছে যে, তথা ভালবাসার সম্পর্ক মৌলিককালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরম্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়।—(কুরআনী)

এরপর বলা হয়েছে —*إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لُّفْرُونَ يَنْكُرُونَ*—অর্থাৎ এতে চিঞ্চাশীল লোকদের জন্য অনেক নির্দর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নির্দর্শন এবং শেষভাগে একে ‘অনেক নির্দর্শন’ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়—বহু নির্দর্শন।

আল্লাহর কুদরতের ভূতীয় নির্দর্শন : ভূতীয় নির্দর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সূজন, বিভিন্ন শরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন শরের বর্ণবেষম্য ; যেমন কোন শর খেতকায়, কেউ কৃষ্ণকাষ্ঠ, কেউ সালচে এবং কেউ হলসেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সূজন তো শক্তির মহানির্দর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিশ্বাসকর দীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরম্পর এত ভিন্ন রূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কষ্টস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কষ্টস্বর অন্যজনের কষ্টস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কষ্টস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোট, তালু ও কষ্টনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও এক রূপ।

بَارَكَ اللَّهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ

أَحْسَنُ الْخَالقُونَ

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মাই করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিঞ্চাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও এবংবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রক্ষেপ নির্দর্শন দিয়ামান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অভিস্কৃত চিঞ্চা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুস্থান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নির্দর্শন রয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নির্দর্শন : মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অব্বেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অব্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অব্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অব্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিদ্যাম শহঁগেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় কক্ষব্য দ্বা স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্শের আভায় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অব্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিরেছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অবেষণ সংসার-বিস্তৃতি এবং তাওয়াকুলের পরিপন্থী নয় । এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অবেষণ করাকে মানুষের জনগত বভাবে পরিপন্থ করা হয়েছে । এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ'র দান । আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্বামৈর উৎকৃষ্টতর আয়োজন সংগ্রহে কোন কোন সময় নিদ্রা আসে না । যাকে যাকে ডাঙ্গারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায় । আল্লাহ যাকে চান উন্নত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন ।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয় । দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বৃক্ষসম্পদ, সমান অর্থসম্পদ, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বলে ; কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয় । আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপর নির্ভরশীল করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয় । এর পেছনে অনেক ইহস্য ও উপকারিতা আছে । তাই জীবিকা উপার্জন উপায়দির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য । কিন্তু বৃক্ষিয়ানের কাজ আসল সত্ত্ব বিস্তৃত না হওয়া । উপায়দিকে উপায়দির স্থানকেই মনে করতে হবে ।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَبِياتٌ لَقُومٌ يُنْسَمُونَ﴾ অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে অবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নির্দশন রয়েছে । এতে অবণের অসঙ্গ বলার কারণ সত্ত্বত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয় । এভাবে পরিশ্রম, মজ্জারি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারা ও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে । এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ'র অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্রের অন্তরালে থাকে । পর্যবেক্ষণ তা বর্ণনা করেন । তাই বলা হয়েছে, এসব নির্দশন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পর্যবেক্ষণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেলে নেয়—কোন হস্তকারিতা করে না ।

আল্লাহ'র কুদরতের পক্ষ নির্দশন : পক্ষ নির্দশন এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চৰক দেখান । এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পচাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয় । তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুক ও মৃত শৃঙ্খিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলকুল উৎপন্ন করেন । এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَبِياتٌ لَقُومٌ يُنْسَمُونَ﴾ অর্থাৎ এতে বৃক্ষিয়ানদের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে । কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন বে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে হয়, একথা সুজি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বুঝা যেতে পারে ।

আল্লাহ'র কুদরতের ষষ্ঠ নির্দশন : ষষ্ঠ নির্দশন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা'রই আদেশে কায়েম আছে । হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোন ক্ষতি দেখা দেয় না । আল্লাহ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ডেখে দেরার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিম্নের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিচিঙ্গ হয়ে যাবে । অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরজীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে ।

এই ষষ্ঠি নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও জন্ম। একেই বুঝানের জন্য এর আগে পৌঁছাটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

—যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সামুদ্র্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার বস্তু হয়। সম্পূর্ণজগৎ অন্য বস্তুর মত হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাঁ আলাইর যে মত আছে, একথা কোরআনের কয়েক জায়গার উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :
كِتَابٌ مُّثَبَّتٌ لِّمَنْ يَرْجُو مَسْكَنًا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ॥

صَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ مِّنْ
شُرَكَاءِ فِي مَا سَرَّقْتُمْ فَإِنَّمَا قُرْبَةُ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَعِصْفَتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ تُفْصِلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ④ بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مِنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ نَصِيرٍ ⑤ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُونَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِمَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۖ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥ مِنْ يُنْهَا إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑦ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِسَالِدِهِمْ فَرِحُونَ ⑧ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ
ضُرُّ دُعَوَارِبِهِمْ مِنْ يُنْهَا إِلَيْهِ شَمَّ أَذَا أَذَا فَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ أَذَا فَرِيقٌ
مِنْهُمْ بِرِيزِمِ يُشْرِكُونَ ⑨ لَيَكْفُرُوا إِنَّهُمْ فَتَمَعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ⑩
أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ⑪ وَإِذَا

اَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً فِرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصْبِهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمُتُمْ اِيَّنِي يَهُمْ
اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۝ اَوْلَمْ يَرَوُ اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يَوْمَ مِنْ ۝ فَاتِّ ذَا الْقُرُبَىٰ حَقَّهُ
وَالسِّكِينُ وَابْنُ السَّبِيلٍ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِعُونَ ۝ وَمَا اتَّهَمْ مِنْ رَبِّ اِلْيَزِبُوا فِي اَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا اتَّهَمْ مِنْ زَكُوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ
يُمْيِنُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَاءِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ
مِّنْ شَيْءٍ ۗ سَبِيعَتَهُ وَتَعَلَّ عَنْنَا يُشْرِكُونَ ۝

- (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃঢ়াত্ত বর্ণনা করেছেন : তোমাদের আমি যে কৃষি দিয়েছি, তোমাদের অধিকারভূক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেবণ ভয় কর, যেক্ষণ নিজেদের লোককে ভয় কর? এমনিভাবেই আমি সম্বন্ধদার সম্পদাদের জন্য নিদর্শনাৰণী বিস্তারিত বর্ণনা করি। (২৯) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশিৰ অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ্ যাকে পথঅঞ্চ করেন, তাকে কে বুঝাবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) যুধি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহহুর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহহুর সৃষ্টিৰ কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) সবাই তাঁৰ অভিযুক্তি হও এবং তাঁৰ কর, মামায় কামেয় কর এবং মুশরিকদের অঙ্গুরুক্ত হয়ে না, (৩২) যারা তাদের ধর্মে বিজেড সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অত্যেক দলই নিজ নিজ যত্বাদ নিয়ে উল্লুপ্তি। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্মর্ণ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহবান করে তাঁৰই অভিযুক্তি হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের দ্বাদ আহবান করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে পিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অবীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা লুটে নাও, সত্ত্বেই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নায়িল করেছি,

যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের বাদ আবাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের কলে যদি তাদের কোন সুরক্ষা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহু যার জন্য ইজ্বা রিযিক বর্ধিত করেন এবং দ্রাস করেন। নিচয় এতে বিশ্বাসী সম্মানের জন্য নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (৩৮) আল্লাহর অভিযন্তাকে তাদের ধাপ্য দিল এবং যিসকীন ও মুশরিকদেরও। এটা তাদের জন্য উভয়, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সকলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃক্ষি পাবে—এই আশায় তোমরা সুন্দে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃক্ষি পায় না। পক্ষতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি সাতের আশায় পবিত্র অন্তরে যা দিয়ে থাকে, অতএব তারাই বিতণ্ণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের সৃজ্য দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কि, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা থাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ তা'আলা (শিরককে নিষ্কীয় ও যিখ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে) তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (দেখ) তোমাদের আমি যে মাল দিয়েছি, তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের শরীক যে, তোমরা ও তারা (ক্ষমতার দিক দিয়ে) তাতে সম্বন্ধ হও এবং যাদের (কাজ কর্তৃর সময়) এতটুকু খেয়াল রাখ, যেমন নিজেদের (বাধীন শরীক) লোকদের খেয়াল রাখ এবং তাদের অনুযাতি নিয়ে কাজকর্ম কর অথবা কমপক্ষে বিবেচিতারই তায় কর। বলা বাহ্য্য, দাসদাসীরা এমন শরীক হয় না। সুতরাং তোমাদের দাস তোমার মত মানুষ এবং অন্য অনেক বিষয়ে তোমার সমরক্ষ ও তোমারই মত। পার্বক্য কেবল এক বিষয়ে; তুমি ধনদৌলতের অধিকারী—সে অধিকারী নয়। এতদসম্বেও সে যখন তোমার বিশেষ কাজ-কারবারে তোমার অংশীদার হতে পারে না, তখন তোমাদের যিখ্যা দেবদেবী, যারা আল্লাহর দাস এবং কোন সন্তাগত ও গুণগত দিক দিয়েই আল্লাহর সম্ভূত্য নয়; বরং কোন কোনটি আল্লাহর সৃষ্টিদের হাতে গড়া, তারা উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা'র শরীক কিন্তু পে হতে পারে? আমি যেমন শিরককে যিখ্যা প্রতিপন্ন করার এই প্রয়াণ বর্ণনা করেছি।) এমনিভাবে আমি সম্বৰদার সম্মানের জন্য নির্দর্শনাবলী বিজ্ঞানিত বর্ণনা করি। (তদন্যায়ী তাদের উচিত ছিল সত্ত্বের অনুসরণ করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা; কিন্তু তারা সত্ত্বের অনুসরণ করে না।) বরং যারা বে-ইনসাফ, তারা (কোন বিশেষ) প্রয়াণ ছাড়াই (গুরু) নিজেদের (যিখ্যা) খেয়াল-পুশির অনুসরণ করে। অতএব আল্লাহ যাকে (হঠকারিতার কারণে) পদ্ধতিটি করেন তাকে কে বুঝাবে? [এর উদ্দেশ্য] এই নয় যে, সে ক্ষয়াই; বরং উদ্দেশ্য রাস্তালুচ্ছাহ (সা)-কে সাধনা দেওয়া যে, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার কাজ আপনি করেছেন। যখন এই পদ্ধতিদের আধাৰ হবে, তখন] তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (উপরের বিষয়বস্তু থেকে যখন তাঙ্গীদের বক্তব্য কুটে উঠেছে, তখন অত্যেক

ବ୍ୟକ୍ତିକେଇ ବଲା ହଜ୍ଜେ,) ତୁମ (ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ ଥେକେ) ଏକମୁଖୀ ହୟେ ନିଜେକେ (ସତ୍ୟ) ଧର୍ମେର ଉପର କାହେମ ରାଖ । ସବାଇ ଆଶ୍ରାହ୍ ଧ୍ୱନି ଯୋଗ୍ୟତର ଅନୁସରଣ କର, ଯେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଉପର ଆଶ୍ରାହ୍ ତା'ଆଲା ମାନୁସ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । (ଆଶ୍ରାହ୍ ଫିତରାତ'-ଏର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆଶ୍ରାହ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ସୃଷ୍ଟିଗତଭାବେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ରେଖେଛେ ଯେ, ମେ ଯଦି ସତ୍ୟକେ ଶୁଣତେ ଓ ବୁଝାତେ ଚାହ, ତରେ ବୁଝାତେ ସକ୍ଷମ ହୟ । ଏଇ ଅନୁସରଣର ଅର୍ଥ, ଏହି ଯୋଗ୍ୟତାକେ କାଜେ ଲାଗାନୋ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଆମଲ କରା । ମୋଟକଥା, ଏହି ଫିତରାତ ଅନୁସରଣ କରା ଦରକାର ଏବଂ) ଯେ ଫିତରାତେର ଉପର ଆଶ୍ରାହ୍ ମାନୁସ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଉଚିତ ନନ୍ଦ । ଅତଏବ ସରଳ ଧର୍ମ (-ଏର ପଥ) ଏଟାଇ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନୁସ (ଚିନ୍ତା-ଭାବନା ନା କରାର କାରଣେ) ଜାନେ ନା (ଫଳେ ଏଇ ଅନୁସରଣ କରେ ନା । ମୋଟକଥା,) ତୋମରା ଆଶ୍ରାହ୍ ଅଭିମୁଖୀ ହୟେ ଫିତରାତେର ଅନୁସରଣ କର, ତାଙ୍କେ (ଅର୍ଥାଂ ତା'ର ବିରୋଧିତା ଓ ବିରୋଧିତାର ଶାନ୍ତିକେ) ଭୟ କର—ଏବଂ (ଇସଲାମ ପ୍ରହପ କରେ) ନାମାଯ କାହେମ କର—(ଏଟାଓ କାର୍ଯ୍ୟତ ତା'ଓହିଦ,) ମୁଶରୀକଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ହୋଇ ନା, ଯାରା ତାଦେର ଧର୍ମକେ ସଂ-ବିଦ୍ୱତ୍ କରେଛେ (ଅର୍ଥାଂ ସତ୍ୟ ହିସେ ଏକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅନେକ । ତାରା ସତ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ ମିଥ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରେଛେ । ଏଟାଇ ସଂ-ବିଦ୍ୱତ୍ କରା ଅର୍ଥାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ପୃଥିକ ପୃଥିକ ପଥ ଧରେଛେ) ଏବଂ ଅନେକ ଦଲେ ବିଭିନ୍ନ ହୟେ ପଡ଼େଛେ । (ସତ୍ୟର ଉପର ଥାକଲେ ଏକଇ ଦଲ ଥାକତ । ସତ୍ୟତ୍ୟାଗୀ ସବଞ୍ଚଲୋ ପଥ ବାତିଲ ହୁଏଗୋ ସମ୍ବେଦ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଲଇ ନିଜ ନିଜ ମତବାଦ ନିଯେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ । ଯେ ତା'ଓହିଦେର ପ୍ରତି ଆମି ଆହ୍ଵାନ କରି, ତା ଅସୀକାର କରା ସମ୍ବେଦ ବିପଦମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନୁସେର ଅବହ୍ଵା ଓ କଥାର ମଧ୍ୟେ ଝୁଟେ ଥିଲେ । ଏ ତା'ଓହିଦ ସେ ସୃଷ୍ଟିଗତ, ତାରା ଓ ସମର୍ଥନ ପାଞ୍ଚମୀ ଯାଇ । ମେ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରା ହୟ ଯେ, ମାନୁସକେ ସଖନ ଦୁଃଖ-କୁଟୀ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତଥନ (ଅହିର ହୋଇ) ତାରା ତାଦେର ପାଲନକର୍ତ୍ତାର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ତାଙ୍କେ ଡାକେ (ଅନ୍ୟ ସବ ଦେବଦେଵୀକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ; କିନ୍ତୁ) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ (ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତେଇ ଏହି ଅବହ୍ଵା ହୟ ଯେ,) ତିନି ସଖନ ତାଦେରକେ କିଛି ରହମତେର ବାଦ ଆସାନ କରାନ, ତଥନ ତାଦେର ଏକମଳ (ଆବାର) ତାଦେର ପାଲନକର୍ତ୍ତାର ସାଥେ ଶିରକ କରାତେ ଥାକେ, ଯାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆମି ତାଦେରକେ ଯା କିଛି (ଆରାମ ଆୟୋଶ) ଦିଯେଇଛି, ତା ଅସୀକାର କରେ (ଏଟା ସୁଭିଗତଭାବେଓ ମନ୍ଦ) । ଅତଏବ ଆରା କିଛଦିନ ମଜା ଲୁଟେ ନାହିଁ । ଏରପର ସତ୍ୟରେ (ଆସନ ସତ୍ୟ) ଜାନତେ ପାରବେ । (ତାରା ଯେ ତା'ଓହିଦ ସୀକାର କରାର ପରାଣ ଶିରକ କରେ, ତାଦେର ଜିଜ୍ଞେସ କରା ଉଚିତ ଯେ, ଏଇ କାରଣ କି) ଆମି କି ତାଦେର କାହେ କୋନ ଦଲୀଲ (ଅର୍ଥାଂ କିତାବ) ମାଯିଲ କରେଇ, ଯେ ତାଦେରକେ ଆମାର ସାଥେ ଶରୀକ କରାତେ ବଲେ? (ଅର୍ଥାଂ ତାଦେର କାହେ ଏଇ କୋନ ଇତିହାସଗତ ଧ୍ୟାଣଓ ନେଇ । ତାଦେର ଶିରକ ଯେ ସୁଭିରାଣ ପରିପଣ୍ଠୀ ଏକଥା ବିପଦମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଦେର ଶୀକାରୋତ୍ତି ଥେକେ ବୁଝା ଯାଇ । କାଜେଇ ଶିରକ ଆଦ୍ୟାପାତ ବାତିଲ । ଏରପର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରିଶିଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଜ୍ଜେ ?) ଆମି ସଖନ ମାନୁସକେ ବରହମତେର ବାଦ ଆସାନ କରାଇ, ତଥନ ତାରା ତାତେ (ଏବନ) ଆନନ୍ଦିତ ହୟ (ଯେ, ଆନନ୍ଦେ ଯତ ହୟେ ଶିରକ ତରୁ କରେ ଦେଇ ; ବେଳ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛେ ।) ଆର ତାଦେର କୁ-କର୍ମର ଫଳେ ଯଦି ତାଦେର ଉପର କୋନ ବିପଦ ଆମେ, ତରେ ତାରା ହତାଶ ହୟେ ଥିଲେ । (ଏଥାନେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଜାନା ଯାଇ ଯେ, ଏହି ପରିଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟେ ଆସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆନନ୍ଦାନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ବୈପରୀତ୍ୟ ଅକାଶ କରାର ଅଳ୍ୟ ଆଲା ହୋଇଛେ । କେବଳା, ଉତ୍ସର୍ଗ ଅବହ୍ଵାୟ ଏକଟ୍ରୁ ପ୍ରଯାଗିତ ହୟ

যে, এর সম্পর্ক আল্লাহর সাথে কম ও দুর্বল। সামান্য বিষয়ও এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। এরপর তার বিভীষণ প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ (এরা যে শিরক করে, তবে) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ণিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা ত্রাস করেন। (মুশর্রিকরা একথা স্থীকারণ করত যে, কৃষ্ণের ত্রাস-বৃক্ষি আল্লাহর কাজ। এক আয়াতে আছে : ﴿وَلِئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا مَأْفَاجِيَّاً لِّلْأَرْضِ مَنْ بَعْدَ مُؤْتَهَا إِلَّا﴾ (১৩) এতে বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য (তাওহীদের নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (অর্থাৎ তারা বুঝে এবং অন্যরাও বুঝে যে, যে এরপ সর্বশক্তিমান হবে, সে-ই উপাসনার যোগ্য হবে) অতএব (যখন জানা গেল যে, কৃষ্ণের ত্রাস-বৃক্ষি আল্লাহরই পক্ষ থেকে, তখন এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, কার্গণ্য করা নিষ্পন্নীয়। কেননা, কৃপণতা দ্বারা অবধারিত রিযিকের বেশি পাওয়া যাবে না। তাই সৎ কাজে ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না ; বরং) আজীয়-জজনকে তাদের প্রাপ্ত দাও, যিসকীন ও যুসাফিয়িরদেরকেও (তাদের প্রাপ্ত দাও !) এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (আমি যে বলেছি, ‘এটা তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে’-এর কারণ এই যে,) এই যে, আমার কাছে ধন-সম্পদ ব্যয় করাই কৃতকার্যতার কারণ নয় ; বরং এর আইন এই যে, যা কিছু তোমরা (দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে, যেমন কাউকে কোন কিছু) এই আশায় দেবে যে, তা মানুষের ধন-সম্পদে (শামিল হয়ে অর্থাৎ তাদের মালিকানায় ও অধিকারে) পৌছে তোমাদের জন্য বেশি (হয়ে) আসবে, (যেমন বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে প্রায়ই এই উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ দেওয়া হয় যে, আমাদের অনুষ্ঠানের সময় আরও কিছু বেশি শামিল করে আমাদেরকে দেবে।) আল্লাহর কাছে তা বৃক্ষি পায় না। (কেননা, আল্লাহর কাছে কেবলমাত্র সেই ধন-সম্পদই পৌছে ও বৃক্ষি পায়, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয়। হাদীসেও বলা হয়েছে, একটি মকবুল খেজুর ওহুদ পাহাড়ের চাইতেও বেশি বেড়ে যায়। যেহেতু উপরোক্ত ধন-সম্পদে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে না। কাজেই কবুলও হয় না, বাড়েও না) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত (ইত্যাদি) দিয়ে থাকে, তারাই আল্লাহর কাছে (তাদের প্রদত্ত ধন) বৃক্ষি করতে থাকবে। (আল্লাহর পথে যায় করার এই আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ রিযিকদাতা। সুতরাং এই বিষয়বস্তু তাওহীদকে জোরদার করার একটি উপায়। তাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এখানে তাওহীদ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এরপর তাওহীদই বর্ণিত হচ্ছে)

আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, এরপর (কিয়ামতে) তোমাদের জীবিত করবেন। (এগুলোর মধ্যে কোন কোন বিষয় কাফিরদের স্থীকারোভি দ্বারা প্রমাণিত এবং কোন কোনটি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। মোটকথা, আল্লাহ এমনি শক্তিশালী, এখন বল), তোমাদের দেবদেবীদের মধ্যেও এমন কেউ আছে কि, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটি করতে পারেং (বলা বাহ্য্য, কেউ নেই। কাজেই প্রমাণিত হলো যে) আল্লাহ তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও মহান (অর্থাৎ তাঁর কোন শরীক নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষা-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়ধাই শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবে একটি উদাহরণ আরা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের পোলাম-চাকর তোমাদের মর্তই মানুষ ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরীক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দুরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোন কুন্দ ও হামুলী শরীককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টিগং আল্লাহর সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর শরীক কিরূপে বিশ্বাস কর।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিকার ; কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোন জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, যখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসূলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে শুধু করুন **فَأَقْمِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنَّفُوا**

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা ইত্তেব ধর্মের অনুরূপ, একর্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : **فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا إِلَّا تَبْيَنُوا لِخَلْقِ اللَّهِ — ذَلِكَ الَّذِينَ حَنَّفُوا**

এরপর ইবন খনিফ প্রাচ্যাটি পূর্ববর্তী ফাতেম বাক্যের ব্যাখ্যা এবং **فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي**—**ذَلِكَ الَّذِينَ حَنَّفُوا**—এর একটি বিশেষ শৈলের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ ইবন খনিফ হচ্ছে এবং প্রাচ্য বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে ? এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলিমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলিমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কারোম থাকে না। বুঝারী ও মুসলিম বর্ণিত এ এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইয়াম কুরুতুরী বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মুনীরীর উক্তি।

দুই. ফিতরাত বলে যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্টোকে চেনার ও তাকে ঘেনে চেলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে : **إِلَّا تَبْيَنُوا لِخَلْقِ اللَّهِ — فَأَقْمِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنَّفُوا**—কেই বুঝানো হয়েছে।

কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুধারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা ব্যরং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরণে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাহিতে কাফির বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরাত হলে এই পরিবর্তন নিরণে ও কেন?

ত্বর্তীয় আপত্তি এই যে, হয়রত খিয়ির (আ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে ক্ষফ ছিল। তাই খিয়ির (আ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরাতের অর্থ ইসলাম নিসে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী।

ত্বর্তীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরিকালের সওয়াব কিরণে অর্জিত হবে? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুক্রম ফিকাহবিদগণের ঘৃতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসরী যন্তে করা হয়। পিতামাতা কাফির হলে সন্তানকেও কাফির ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপশত্তি ‘মাসাবীহ’ প্রচ্ছের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরাতের অর্থ প্রসঙ্গে খিয়ির উকিলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফির হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিশ্চেষে হয়ে যায় না। খিয়ির (আ)-এর হাতে নিহত বালক কাফির হয়ে জন্মহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বুঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত সুস্থির। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুধারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরাতের খিয়ির অর্থ অনুযায়ী সুস্থির। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত ; কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উকিলের অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয় ; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বুঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উকিলের এই অর্থ মূহাম্মদ-ই দেহলভী (র) মেশকাতের টীকা ‘লামআতে’ বর্ণনা করেছেন।

‘হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ প্রচ্ছে শিখিত শাহ শুলালিউল্লাহ দেহলভী (র)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেধাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদব্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ

করতে পারে । অর্থাৎ যে জীবকে স্তুতি করতে পারে আয়াতের মর্মও তাই । অর্থাৎ যে জীবকে স্তুতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন । আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন । আল্লাহ স্তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেলা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে অনে সংক্ষিত করার যোগ্যতা নিহিত রয়েছেন । এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রয়েছেন, যদিগুরা সে আপন স্তুটাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে । এরই নাম ইসলাম ।

—**تَبَدِّلُ لِخَلْقِ اللَّهِ** — উল্লিখিত বঙ্গব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহর প্রদর্শ ফিতরাত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না । ভাস্তু পরিবেশ কাফির করতে পারে । কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না ।

—**لَّمْ يَلْفَزْ لِخَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا بِعَذَابٍ** — আয়াতের মর্মও পরিকার হয়ে যায় । অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যক্তিত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি । উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রয়েছে দিয়েছি । তারা একে কাজে লাগালে তাদের দারা ইবাদত ব্যক্তিত অন্য কোন কাজ সংঘটিত হবে না ।

—**لَمْ يَلْفَزْ لِخَلْقِ اللَّهِ** — বাতিলপর্হীদের সম্বর্গ এবং ভাস্তু পরিবেশ থেকে দূরে থাকা করুন । অর্থাৎ থবর আকারের । অর্থাৎ থবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরাতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না । কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয় । তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বুঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিন্দিয় অথবা দুর্বল করে দেয় । এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভাস্তু পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপর্হীদের পৃষ্ঠকান্দি পাঠ করা ।

—**وَأَقْبِلُوا مَسْلَةً وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** — পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল । আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কারোম করতে হবে । কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ইমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে । এরপর বলা হয়েছে । —**وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** —**أَرْبَعَةِ** যারা শিরক করে, তাদের অস্তুর্জুত হয়ে না । মুশরিকরা তাদের ফিতরাত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি । এরপর তাদের পথপ্রস্তুতা বর্ণিত হচ্ছে । —**شِبْعَةِ** অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা ইত্তাবধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা ইত্তাবধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে । ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । —**شِبْعَةِ** এর বহুবচন । কোন একজন অনুসন্ধানের অনুসারী দলকে —**বলা** হয় । উদ্দেশ্য এই যে, ইত্তাবধর্ম ছিল তাওহীদ । এর প্রতিক্রিয়াব্রহ্মণ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন শোকের চিঞ্চাধারার অনুগামী হয়েছে । মানুষের চিঞ্চাধারা ও অভিযতে বিরোধ থাকা বাজাবিক । তাই অভ্যক্তেই আলাদা আলাদা মাঝহাব বানিয়ে নিয়েছে । তাদের কারণে অনগ্রণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । শয়তান তাদের মিজ নিজ মাঝহাবকে

সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপ্ত করে দিয়েছে যে, অর্থাৎ كُلُّ حَزْبٍ يُنَا لِدِيْهِمْ فَرِحُونَ، তারা অপরের মতবাদকে ভাস্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভাস্ত পথে পতিত রয়েছে।

পূর্বের আরাতে বলা হয়েছিল যে, রিযিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহ'র হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা ত্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ' প্রদত্ত রিযিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিযিক ত্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ' যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ ত্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। এক. আঞ্চীয়বজ্জন, দুই. যিসকীন, তিনি. মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ' প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ' তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোন অনুগ্রহ নয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বলে বাহ্যত সাধারণ আঞ্চীয় বুঝানো হয়েছে, মাহ্রাম হোক বা না হোক। حق
বলেও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য আঞ্চীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক—সবই বুঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আঞ্চীয়-বজ্জনকে করলে তার চাহিতে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এমনকি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : যে ব্যক্তির আঞ্চীয়-বজ্জন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহ'র কাছে অর্হণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আঞ্চীয়-বজ্জনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্বন্ধে ন হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সাম্ভূনা দানও তাদের প্রাপ্য। হ্যরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সচলতা আছে, তার জন্য আঞ্চীয়-বজ্জনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।—(কুরআনী)

আঞ্চীয়-বজ্জনের পরে যিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুন সহ্যবহার।

وَمَا أَنْتَمُ مِنْ رِبَّاً لَّيْسَ بِأَنْتَمُ
—এই আয়াতে একটি কুপ্রধার সংক্ষার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আঞ্চীয়-বজ্জনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আঞ্চীয়-বজ্জনের সাধারণত একে অপরকে যা দের, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে। বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপটোকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা

হয়েছে যে, আজ্ঞায়দের প্রাপ্তি আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি, এই নিয়মতে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আজ্ঞায়ের ধনসম্পদে শাহিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহর কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাকে এই 'বেশি'-কে রিবা (সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাস'আলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপচৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিষ্পন্নীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আজ্ঞায়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মত এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কেউ কোন উপচৌকন দিলে সুযোগ মত তিনিও তাকে উপচৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস—(কৃতৃত্বী) তবে এই প্রতিদানঘাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسْبٌ تَأْيِّدُ بِعَصْمٍ
 إِنَّمَا عَمِلُوا لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ④
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُينَ ⑤
 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ الْقِيمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرْدَلَةٌ مِنَ اللَّهِ
 يَوْمٌ يُبَيَّنَ الصَّدَّقَاتُ ⑥ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرَهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسٌ هُمْ يَمْهُدُونَ ⑦ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مِنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارِينَ ⑧

(৪) ইলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের সঙ্গে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আবাদন করাতে চান, যাতে তারা কিরে আসে। (৪২) বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিব্রহ্ম কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিশায় কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাহ্বত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেমিন মানুষ বিস্তু হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুকুর করে, তার কুকুরের জন্য সে-ই দানী এবং যে সংকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই তখনে নিজে। (৪৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সংকর্ম করেছে যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিচ্য তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।

তাফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শিরক ও আল্লাহ গ্রহণ মন্দ যে,) হলে ও জলে (অর্থাৎ সারা বিশ্বে) মানুষের কৃকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে উদাহরণত (সূর্ভিক, মহাঘাতী, বল্যা) ; যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শান্তি আবাদন করান—যাতে তারা (এসব কর্ম থেকে) ফিরে আসে। (অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : **وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ**) “কোন কোন কর্মের” বলার কারণ এই যে, সব কর্মের শান্তি দিতে পেলে তারা **لَوْيَأَخْذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ طَلَى** : এই অর্থে পূর্বোক্ত আয়াতে **وَيَغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ** অর্থাৎ অনেক অনেক তুল্য তো আল্লাহ আক্ষয় করে দেন—কোন কোন আমলেরই শান্তি দেন মাত্র। মৌটিকথা, কৃকর্মই যখন সর্বাবহুয়া শান্তির কারণ, তখন শিরক ও কুফর তো সর্বাধিক আযাবের কারণ হবে। মুশরিকরা যদি একথা মেনে নিতে ইতস্তত করে, তবে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে প্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্বে যারা (কাফির ও মুশরিক) ছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। (অতএব দেখ, তারা আল্লাহর আযাবে কিভাবে ধৰ্ম হয়েছে। এ থেকে পরিকার বুঝা গেল যে, শিরকের বিপদ ভয়ঙ্কর। কেউ কেউ অন্য প্রকার কুফরে লিপ্ত ছিল, যেমন লৃতের সম্মানয় ও কানুন এবং বাসন ও শূকরে জুপান্তরিত জাতি। আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলা এবং নিষেধ অমান্য করার কারণে তারা কুফর ও লানতে লিপ্ত হয়। মুকার কাফিরদের বিশেষ ও প্রসিদ্ধ অবস্থা ‘শিরক’ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে শিরক উল্লেখ করা হয়েছে। যখন প্রমাণিত হলো যে, শিরক আযাবের কারণ, তখন হে সর্বোধিত ব্যক্তি,) আপনি সরল ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামী তাওহীদের) উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাক্ষত হবে না। (অর্থাৎ দুনিয়াতে বিশেষ আযাবের সময়কে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ওয়াদার উপর পিছিয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠিত দিন যখন আসবে, তখন একে প্রত্যাক্ষত করবেন না এবং বিগতি ও সময় দেবেন না। এই বাক্যে শিরকের পারলৌকিক শান্তি বর্ণিত হয়েছে, যেমন **وَظَاهِرَ الْفَسَادُ إِلَّا** বাক্যে **كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْعَجَزِ** ও **الْفَسَادُ إِلَّا** বাক্যে ইহলৌকিক শান্তি বর্ণিত হয়েছে।) সেদিন (আমলকারী) মানুষ (আমলের প্রতিদান হিসাবে) বিড়ক হয়ে পড়বে (এভাবে যে,) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্য সে দারী এবং নিন্দনীয় কাজ। যারা সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেবেন। যারা সংকর্ম করছে, তারা নিজেদের লোভের জন্যই উপকরণ তৈরি করে নিজে : এর ফল হবে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এ সৎ লোককে নিজ অনুগ্রহে (উন্নতি) পুরুষার দেবেন—যারা ঈমান এনেছে এবং তারা সৎকর্মও করেছে ; (এবং এ থেকে কাফিররা বঞ্চিত থাকবে ; যা পূর্ববর্তী আয়াতের **فَمُلِيهِ كُفَّارُهُ**) যার কারণ হলো এই যে, নিচয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না বরং কুফরের কারণে তাদের প্রতি অসম্মতি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيُ النَّاسِ
বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় হার্ডিয়ে পড়েছে। তফসীরে ইহল মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী, বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বৃঞ্চিতে হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহ আসে।

وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيُكُمْ وَيَعْلَمُونَ عَنْ كَثِيرٍ
— অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ শৈর্ষ করে, সেগুলো
তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণ। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই
যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্ত্বিকার কারণ তোমাদের গুনাহ যদিও দুনিয়াতে এসব
গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহের কারণেই বিপদ আসে না,
বরং অনেক গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোন কোন গুনাহের কারণেই বিপদ আসে।
দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহের কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না :
বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও
পুরোপুরি শান্তি দুনিয়াতে দেন না : বরং সামান্য স্বাদ আল্লাদেন করানো হয় যাত্র ; যেমন
এই আয়াতের শেষে আছে : يَدْرِيْقُهُمْ بِعَمَلِ الذِّي عَمَلُوا^১ যাতে আল্লাহ তোমাদের কোন কোন
কর্মের শান্তি আল্লাদেন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ
প্রেরণ করাও আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে
গাফিল মানুষকে সাবধান করা যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্য
উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিমামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : لَعْنَمُ يُرْجِعُونَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে : তাই কোন কোন আলিম
বলেন, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুর্পদ জন্ম ও পশ্চপক্ষীদের
প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গুনাহের কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ
দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই
গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শর্কীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারায় মাল ধায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই
মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই মূল্য করে না ; বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার
করে থাকে। (ইহল মা'আনী) কারণ, প্রথমত একজনের মূল্য দেখে অন্যদের মধ্যেও
মূল্য করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার
মূল্যের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবাবিত
হয়।

একটি আগস্তির জওয়াব : সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলগ্লাহ (সা)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফিরের জাহান। কাফিরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধনসম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দ্বিতীয় একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদ্যয় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে : —**أَنَّ النَّاسَ بِلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْفَلَقُ مُثْلِدٌ**—অর্থাৎ দুনিয়াতে পঞ্চমরণগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অঙ্গপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষে করা হয় যে, মু'মিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এবং কাফিররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহৰ কারণে হতো, তবে ব্যাপার উঠে হতো।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গুনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারণ উপর কোন বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহৰ কারণেই আসবে। এবং যে ব্যক্তি বিপদগত হবে, সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী উষ্ণ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক ; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য উষ্ণ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জুর নিরাময়কারী ঐবধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, যুদ্ধের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় দূর আসে না।

কাজেই আয়াতের সারঝর্ম এই যে, গুনাহৰ কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহৰ আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গুনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর ; যেমন পঞ্চমরণ ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গুনাহ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহৰ ফল সাব্যস্ত করেনি ; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ছিরে ফেলে এবং তার অভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জনুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেইসব বিপদাপদকে সাধারণত গুনাহৰ এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহৰ ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রজোয্য নয়, বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংগ্রিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষার উক্তীগ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মাঝারেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ৯৩

মূসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুয়ুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুলাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ উয়ালীউল্লাহ (র) 'হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; এক, বাহ্যিক ও দুই, অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিশয় বোধগম্য কারণ। অভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উৎপন্ন বাল্প, (মৌসুমী বায়ু) যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ঝটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ সাহেব বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রাকৃত-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুশাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন নমজদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ও নববিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারণও জন্য সুরক্ষিত হয় এবং কারণও জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব

অভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা ত্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাঞ্জকর্ম যদি হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরম্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভৃতি বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সব্য প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-বাস্তু ও গৌণীয়ে কাহিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিষ্কৃত হয়ে উঠে। পরম্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শান্তি ও আয়াবের মধ্যে গার্ভক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গুনাহৰ শান্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষাব্লক্ষণ বিপদে নিষেপ করা হয়। উভয়ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরণে বুঝা যাবে ? এর পরিচয় শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) লিখেছেন যে, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত উষ্ণধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সন্ত্বেও সন্তুষ্ট থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে ; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে ; সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শান্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরী বাকে পর্যন্ত পৌছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও ইতিগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শান্তির বিপদ নয় ; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এক্ষণ হয় না, বরং হা-হতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ আল্লাহর গবেষণা ও আয়াবের আলামত। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّئَامَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِينَ يُقْكِمُ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَلِتَجْرِيَ الْفُلَكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُلُّكُمْ شَكْرُونَ^⑥
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُهُمْ وَهُمْ يَا بَيِّنُتِ
فَإِنْ تَعْقِمُنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرٌ

الْمُؤْمِنِينَ ④٥ أَللهُ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فِي سَطْهَ
 فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
 خَلْلِهِ ۝ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
 يَسْتَبِّشُونَ ④٦ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ
 لَمْ يُبَلِّسُنَّ ④٧ فَأَنْظُرْ إِلَى أَثْرِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحِيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 إِنَّ ذَلِكَ لَمَحِيُّ الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④٨ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ جِنَّا
 فَرَاوَهُ مُصْفَرًا الظَّلُومُ امْنَ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ④٩ فَإِنَّكَ لَا تُسِّمُ الْمَوْتِي وَلَا
 تُسِّمُ الصَّمَمَ اللَّعَاءَ إِذَا أَوْلَأَمْدُ بِرِينَ ⑤٠ وَمَا أَنْتَ بِهِدْيِ الْعَيْنِ عَنْ
 ضَلَالِهِمْ ۝ إِنْ تُسِّمُ الْأَمْنَ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِمْ مُسْلِمُونَ ⑤١

(৪৬) তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্মানের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মু'যিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে বেড়াবে ইহু আকাশে ছাড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও—তাঁর অধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বাসদাদের মধ্যে যাদেরকে ইহু তা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্যুকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিচে তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সরকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হরে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব আপনি মৃতদেরকে তনাতে পারবেন না এবং

বধিরকেও আহ্বান তনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অকদেরও তাদের পথভূষিত থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই তনাতে পারবেন, যারা আমার আয়তসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুসলমান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাঁর (আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, তাওহীদ ও নিয়ামতের) নির্দশনাবলীর একটি এই যে, তিনি (বৃষ্টির পূর্বে) সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন (এক তো মন প্রফুল্ল করার জন্য এবং) যাতে (এর পরে বৃষ্টি হয় এবং) তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আবাদন করান (অর্থাৎ বৃষ্টির উপকারিতা উপভোগ করান) এবং (এ কারণে বায়ু প্রেরণ করেন,) যাতে (এর মাধ্যমে পালের) নৌকাসমূহ তার নির্দেশে বিচরণ করে এবং যাতে বায়ুর সাহায্যে নৌকায় সমুদ্র প্রমাণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর (অর্থাৎ নৌকা ঢলা এবং অনুগ্রহ তালাশ করা উভয়ই বাতাস প্রেরণ দ্বারা অর্জিত হয়—প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয়টি নৌকার মধ্যস্থতায়) এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (এসব অকাট্য প্রমাণ ও নিয়ামত সন্দেশ মুশরিকরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ শিরক, পয়গম্বরের বিরোধিতা, মুসলমানদের নির্বাচন ইত্যাদি দুর্ভুব্য করে। আপনি তজ্জন্যে দুঃখিত হবেন না। কেননা আমি সত্ত্বরই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব। এতে তাদের পরাভূত এবং সত্যপঙ্খীদের প্রবল করব, যেমন পূর্বেও হয়েছে। সেগতে) আমি আপনার পূর্বে অনেক পয়গম্বর তাঁদের সম্মানয়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে (সত্য প্রমাণের) সূচন্ত প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন যাতে কেউ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কেউ কেউ করে না।) অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছি। সত্যকে মিথ্যা বলা, সত্যপঙ্খীদের বিরোধিতা করা ছিল অপরাধ। এই শাস্তি দিয়ে আমি তাদের পরাজিত এবং সত্যপঙ্খীদের বিজয়ী করেছি।) মু'মিনকে প্রবল করা (প্রতিশ্রূতি ও রীতি অনুযায়ী) আমার দায়িত্ব। (আল্লাহর এই শাস্তিতে কাফিরদের ধৰ্ম হওয়া অথবা পরাভূত হওয়া এবং মুসলমানদের রক্ষা পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া অবধারিত ছিল। মোটকথা, এই কাফিরদের কাছ থেকেও এমনিভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হবে—দুনিয়াতে কিংবা মৃত্যুর পরে। সাম্রাজ্য এই বিবরণস্থ মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর বায়ু প্রেরণের উল্লিখিত কতক সংক্ষিপ্ত ফলাফলের বিবরণ দান করা হচ্ছে) আল্লাহ্ এমন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময় ও অনুগ্রহদাতা।) যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা (অর্থাৎ বায়ু) যেষমালাকে (যা বায়ু আসার পূর্বে বাস্প হয়ে উঠে যেষমালায় ঝরাপ্তুরিত হয়েছিল; আবার কোন সময় এই বায়ু দ্বারাই বাস্প উল্লিখিত হয়ে যেষমালা হয়ে যায়। এরপর বায়ু যেষমালাকে তার স্থান থেকে অর্থাৎ শূন্য থেকে অথবা মাটি থেকে) সঞ্চালিত করে। অতঃপর আল্লাহ্ যেষমালাকে (কখনও তো) যেভাবে ইচ্ছা আকাশে (অর্থাৎ শূন্যে) ছড়িয়ে দেন এবং (কখনও) তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন।) (প্রস্তুতি—এর মর্ম একত্রিত করে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া, প্রস্তুতি—এর অর্থ কোন সময় অল্প দূর পর্যন্ত এবং কোন সময় দূর পর্যন্ত এবং প্রস্তুতি—এর উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত হয় না, বিচ্ছিন্ন থাকে।) এরপর (উভয় অবস্থায়) তুমি বৃষ্টিকে দেখ যে, তার মধ্য থেকে নির্গত হয়। (একত্রিত যেষমালা থেকে তো প্রচুর বর্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষতুতে

বিজ্ঞপ্তি মেঘমালা থেকেও প্রচুর বর্ষণ হয়।) এরপর (অর্থাৎ মেঘমালা থেকে নির্গত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের অধ্যে যাকে ইচ্ছা তা পৌছান তখন সে আনন্দিত হয়। তারা প্রথমত তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আনন্দিত হওয়ার পূর্বে (সম্পূর্ণ) নিরাশ ছিল। (অর্থাৎ এইমাত্র নিরাশ ছিল এবং এইমাত্র আনন্দ লাভ করেছে। আসলেও দেখা যায়, এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।) অতএব আল্লাহর রহমতের (অর্থাৎ বৃষ্টির) ফল দেখ, কিভাবে তিনি (এর সাহায্যে) মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (অর্থাৎ সজীব-সত্ত্বে) করেন। (এটা নিয়ামত ও তাওহীদের দলীল হওয়া ছাড়া এ বিষয়েরও দলীল যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। এ থেকে জানা গেল যে, যে আল্লাহ মৃত্যুর মৃত্তিকারে জীবিত করেন,) নিচ্যই তিনিই মৃত্যুদেরকে জীবিত করবেন; তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (মৃত্তিকা জীবিত করার সাথে মিল রেখে মৃত জীবিত করার এই বিষয়বস্তু মধ্যবর্তী বাক্য ছিল। অতঃপর বৃষ্টি ও বায়ুর কথা বলা হচ্ছে। এতে গাফিলদের অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা আছে অর্থাৎ গাফিলরা এমন অকৃতজ্ঞ যে, এমন বড় বড় নিয়ামতের পর) যদি আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি, যার ফলে তারা শস্যকে (গুরুত্ব ও) হলদে হয়ে যেতে দেখে (অর্থাৎ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে যায়।) তবে তারা এরপর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় (এবং পূর্ববর্তী সব নিয়ামত বিন্যুত করে দেয়)। অতএব (তারা যখন এতই গাফিল ও অকৃতজ্ঞ, তখন প্রয়াণিত হলো যে, তারা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন। কাজেই তাদের অবিশ্বাসের কারণে দুঃখ করাও অনর্থক। কেননা) আপনি মৃত্যুদেরকে (তো) শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরকে (ও) আওয়াজ শোনাতে পারবেন না, (বিশেষ করে) যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (এবং ইঙ্গিতও দেখতে পায় না)। আপনি (এমন) অক্ষদেরকে (যারা চক্ষুস্থানের অনুসরণ করে না) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না (অর্থাৎ তারা চৈতন্য-বিকল ও মৃত্যের সমতুল্য)। আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, অতঃপর মেনে (ও) চলে। (আর এরা যখন মৃত, বধির ও অক্ষদের সমতুল্য, তখন তাদের কাছ থেকে ঈমান আশা করবেন না এবং দুঃখ করবেন না)।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—فَأَتَسْتَعْنُ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَنْئاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ—অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মু'মিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কৃপাবশত মু'মিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে প্রাপ্ত করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফিরদের মুকিবিলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অধিচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের অধ্যেই নিহিত আছে যে, মু'মিন বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ওয়াক্তে জিহাদ করে, তাদের বুরানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী

করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্থলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহদ যুক্ত সম্পর্কে অবং কোরআনে আছে : اَنْ—اَر्थात् তাদের কতক ভাস্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্থলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা পরিণামে স্ব'মিনদেরই বিজয় দান করেন—যদি তারা তাদের ভূল বুঝতে পারে। ওহদ যুক্তে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে স্ব'মিন, আল্লাহর বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফিরদের বিজয়ের সময়ও গুলাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অঙ্গৰূপ নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থার উপকারী।

فَإِنَّ لَا تُشْعِنَ الْمُنْفَلِقِ
আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে উন্নাতে পারেন না।
মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কি না—সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

اللَّهُ أَنَّىٰ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً طَيْخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَيْرُ^④
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ لَا مَالِكُوْلَوْا غَيْرَ سَاعَةٍ طَكْنَالِك
كَانُوا يُؤْفَكُوْنَ^④ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ
لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثَةِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثَةِ وَلَكُمْ
كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ^④ فِي يَوْمِ الْبَعْثَةِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُم
وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُوْنَ^④ وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ
كُلِّ مَثَلٍ وَلِئِنْ جَعَلْتُمْ بِاِيَّاهُ لِيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
مُبْطِلُوْنَ^④ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ^④
فَاصِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْفِنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُوْنَ^④

(৫৪) আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম থেঁয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্যবিমুখ হতো। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ইমান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, ‘তোমরা আল্লাহর কিছাক যতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছে। এটাই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা তা জানতে না।’ (৫৭) সেদিন জালিয়দের ওয়ার-আগস্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তাদের করে আল্লাহর সম্মতি শাতের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আগনি যদি তাদের কাছে কোন নির্দর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী। (৫৯) এমনিভাবে আল্লাহ জানহীনদের ক্ষমতা যোহুরাক্তি করে দেন। (৬০) অতএব আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ এমন, যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেছেন (এতে শৈশবের প্রথমাবস্থা বুঝানো হয়েছে।) অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (অর্থাৎ যৌবন) দান করেছেন, অতঃপর শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি (সব কাজ সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ (এবং ক্ষমতা প্রয়োগে) সর্বশক্তিমান। সুতরাং এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন নয়। এ হচ্ছে পুনরুত্থানের সম্ভাবনার বর্ণনা। অতঃপর তার বাস্তবতা বর্ণিত হচ্ছে।) যেদিন কিয়ামত হবে, অপরাধীরা (অর্থাৎ কাফিররা কিয়ামতের ডয়াবত্তা ও অস্ত্রিতা দেখে তাকে অভ্যন্ত অসহনীয় মনে করে) কসম থেঁয়ে বলবে যে, (কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে।) তারা অর্থাৎ আমরা বরযথে এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি (অর্থাৎ কিয়ামত আগমনের যে সময়কাল নির্ধারিত ছিল, তা পূর্ণ না হতেই কিয়ামত এসে গেছে। উদাহরণত ফাসির আসামীকে এক মাস সময় দিলে যখন এক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তার মনে হবে যেন এক মাস অতিবাহিত হয়নি, বরং বিপদ সত্ত্বে এসে গেছে। আল্লাহ বলেন,) এমনিভাবে তারা (দুনিয়াতে) উল্টা দিকে চলত। (অর্থাৎ পরকালে যেমন সময়ের পূর্বে কিয়ামত এসে গেছে বলে কসম থেতে শুরু করেছে, তেমনি দুনিয়াতেও তারা কিয়ামত স্বীকারই করত না এবং আসবে না বলে কসম থেত।) যাদের জ্ঞান ও ইমান দেওয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ঈমানদার, কেন্দ্র তারা শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী,) তারা (এই অপরাধীদের জওয়াবে) বলবে, (তোমরা বরযথে নির্ধারিত সময়কালের কম অবস্থান করনি। তোমাদের দাবি জাত; বরং) তোমরা বিদিলিপি অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই কিয়ামত দিবস। কিন্তু তোমরা যে সময়কালের পূর্বে কিয়ামত এসেছে বলে মনে কর, এর কারণ এই যে, তোমরা দুনিয়াতে কিয়ামত হবে বলে জানতে না অর্থাৎ বিশ্বাস করতে না; বরং মিথ্যা বলতে। এই অবীকারের শাস্তিবন্ধনে আজ তোমরা অস্ত্রিতার সম্মুখীন হয়েছ। তাই অস্ত্র মনে এই ধারণা করছ যে, এখনও

সময়কাল পূর্ণও হয়নি। দুনিয়াতে বিশ্বাস করলে কিয়ামত তাড়াতাড়ি এসে গেছে বলে মনে করতে না ; বরং আরও তাড়াতাড়ি এর আগমন কামনা করতে। কারণ, মানুষ যে যিষ্যব্য থেকে সুখ ও খাসির উয়াদা পায়, সে দ্রোবতই তার দ্রুত আগমন কামনা করে। প্রতীকার জ্ঞানিটি মৃহূর্ত তার জন্য কষ্টকর ও দীর্ঘ মনে হতে থাকে। হাদিসেও বলা হয়েছে, কাফির ব্যক্তি করবে বলে, رَبِّ الْأَسْعَادِ مُؤْمِنٌ بِهِ وَرَبِّ الْمُشَكِّكِ مُؤْمِنٌ بِهِ (রবুন্নাসুদের মু'মিনগণের এই জওয়াব থেকেও বুরা যায় যে, এখানে উচ্চিষ্ঠের বরযথের অবস্থান সম্পর্কে মু'মিনগণ যথেষ্ট ভালোভাবে বোঝগণ করে নিয়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা কিয়ামতের দ্রুত আগমন আগ্রহাবিত ছিল।) সেদিন জানিমদের (অর্থাৎ কফিরদের অঙ্গীরতা ও বিপদ এরূপ হবে যে, তাদের) উপর আপত্তি (সভ্যবিধা যাই হোক,) উপকারে আসবে না এবং তাদের কাছে আল্লাহর অস্তুষ্টির ক্ষতিপূরণ চার্জয় হবে না। (অর্থাৎ তাওয়া করে আল্লাহকে সম্মুক্ত করার সুযোগ দেয়ব্যাপে হবে না।) আবিস্নামহেম (হিদায়াতের) জন্য এই কোরআনে (অথবা এই সূরায়) সর্বপ্রকার জরুরী) স্থান বর্ণনা করেছি। (সেগুলো যারা কফিরদের হিদায়াত হবে যাওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু তারা হঠকারিতাবশত কুল করেনি এবং বাহিন উপকার লাভ করেনি। কোরআনেই কি বিশেষত্ত্ব, তাদের হঠকারিতা তো এতদূর পৌছেছে যে,) যদি আপনি (কোরআন ছাড়া তাদের) কোন ফরায়ামেশী) নির্দশনও তাদের কাছে উপস্থিত করেন, তবুও কাফিরয় এ কথাটি বলবে, তোমরা সবাই (অর্থাৎ পয়গম্বর ও মু'মিনগণ—যারা কোরআনের শর্তায়তগত ও আল্লাহর বিশেষ বিধানগত আয়াতসমূহের সত্যায়ন করে, তারা) নিরেট বাতিলপন্থী। (তারা অর্থাৎ কফিরয়া পয়গম্বরের উপর জাদু বিদ্যার অগবাদ চাপিয়ে তাঁকে বাতিল বলছে এবং মুসলমানগণ যেহেতু পয়গম্বরের অনুসরণ করে অর্থাৎ তারা যেটাকে জাদু বলে অভিহিত করে মুসলমানগণ উটাকেই সত্য বলে দ্বীকার করে নেয়। সেহেতু তাদেরকে বাতিলপন্থী বলাছে। প্রধানযোগ্য, তাদের এই হঠকারিতার ব্যাপারে আসল কথা এই যে,) যারা মিদর্শন ও প্রামাণ্য প্রকাশ হওয়া সম্মতি) বিশ্বাস করে না, (এবং তা অর্জন করার চেষ্টা করে না।) আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বদর অমিনিতাবে মোহরাবিত করে দেন বেমন এই কফিরদের স্বদয় মোহরাবিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সত্য ধৃহদের যোগজ্ঞ গোজই নিতেজ ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে আনুগত্যে শৈখিল্য এবং হঠকারিতার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব (তারা যখন এরূপ হঠকারী, তখন তাদের বিরুদ্ধাচরণ, নির্যাতন ও কটুকথার জন্য) আপনি সবর করুন। নিচয় আল্লাহর উয়াদা (এই যর্থে যে, এরা পরিণামে অকৃতকার্য এবং মু'মিনগণ কৃতকার্য হবে—তা) সত্য। (এই উয়াদা আবশ্যই পূর্ণ হবে। কাজেই অঙ্গ দিনই সবর করতে হবে।) যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে (অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে যাই ঘটক না কেন, আপনি সবর পরিত্যাগ করবেন না)।

আনুসন্ধিক জাতব্য বিষয়

এই সুরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অবীকারকার্যদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা'র সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নির্দশন যা 'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৯৪

বর্ণনা করে আনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্ধিষ্ঠিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভাবিতে এই বিষয়বস্তু অধ্যাপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ বর্তাবতই তৃপ্তি-বিষয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্তৃত হয়ে যেতে অভ্যন্ত। তার এই অভাসই তাকে অনেক মারাঞ্চক ভাবিতে নিপত্তি করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাঝায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির সেশ্যায় মগ্ন হয়ে বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিশেষ কোনভাবে গতিবজ্ঞ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অভিভূতের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখালো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিষ্কিতও দুর্বল। মাঝামানে কিছু দিলের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণহস্তীয় শক্তির যমানায় নিচুরে পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্তৃত না হওয়াই বৃক্ষিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌছেছে, তার বিভিন্ন তর সর্বদা সামলে রাখা আবশ্যিক।

أَنْتُمْ مِنْ ضُلْفَ — রাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাশ কর্তৃক দুর্বল, বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বল ছিলে। তুমি ছিলে এক ফোটা নিঝীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোটাকে প্রথমে জয়াট রাক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে ঝুপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অঙ্গ পেঁচে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গপ্রত্যসের সৃষ্টি যত্নপাদ্য সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অভিত্ব ভ্রান্তমাণ ফ্যাটলীতে ঝুপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচ্চি ব্রহ্মক্রিয় যত্নপাদ্য সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাটলীই নয় ; বরং ক্ষুদ্র একটি জগৎ। এর অভিভূতের মধ্যে সারা বিশ্বের সমুন্ন শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওর্কার্শপে নয় ; বরং মাত্তগর্ডের তিনটি অঙ্গকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় যাস এই সংকীর্ণ ও অক্ষকার প্রকোষ্ঠে মাত্তগর্ডের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অভিজ্ঞ সৃজিত হয়েছে।

أَخْرَجْكُمْ مِنْ بُلْوَنْ أَمْهَاكُمْ لَا تَعْلَمُونْ — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভারু বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ অগতে আসার পর তার অবহা ছিল এই আশার নেতৃত্বে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাত্তগর্ড থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষাদাতাকার পালা তুক ছলো। সর্বপ্রথম তিনি কৃন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি হনোয়োগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-ত্বক্ষা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দুটি বিদ্যা শিক্ষা দেয় ? তার স্বষ্টা ব্যক্তিত কারও একল করার শক্তি ছিল না। এ জো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমৰ্শ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজনে টাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়।

এখন থেকে চলুন এবং মৌবন কাল পর্যন্ত তার ত্রিমোন্নতির সিদ্ধিগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিশ্বাসকর নমুনা সামনে আসবে।

—**إِنَّمَا جَعَلْتُ مِنْ بَعْدِ حُكْمِيْ فَهُوَ**—এখন সে শক্তির সিদ্ধিতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেঠে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও হ্রদে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্তৃত হয়ে (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে)।—এর প্রোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন মৃষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাহুত করার জন্য আল্লাহ বলেন : **إِنَّمَا جَعَلْتُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً**—হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃক্ষি পাবে এবং এক সময়ে ছুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য ঘটনা নয়—নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি থাঁ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, **أَرْبَاعٌ أَنْتَ بِطَلْقٍ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيرُ** অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাবুল ইয়ত্তেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা পুনর্যাগৃহণ করতে পারেন কি না এ বিষয় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

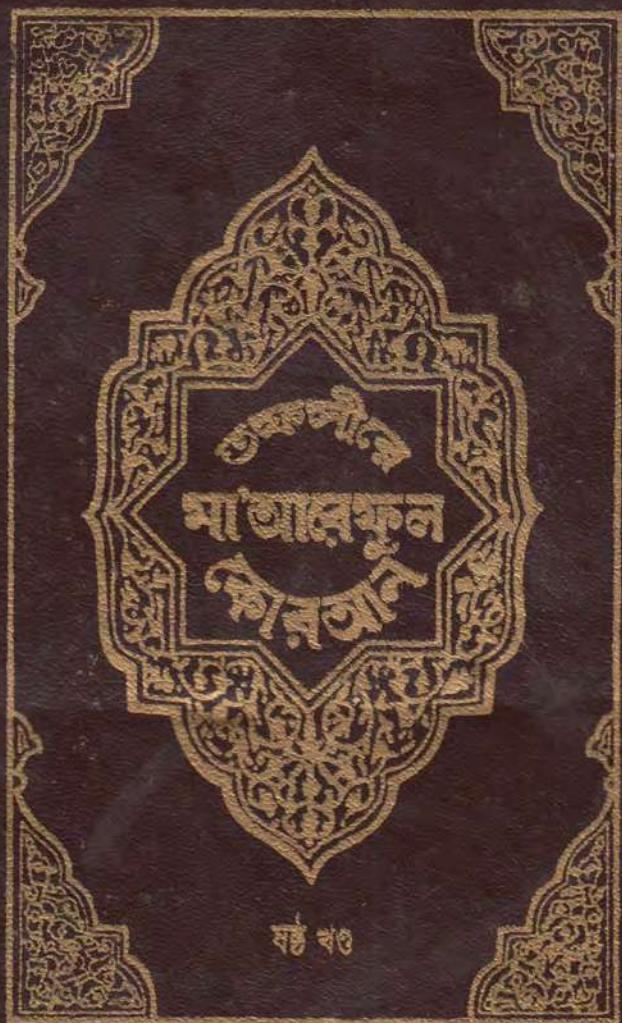
অতঃপর আবার কিয়ামত অঙ্গীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মৃৰ্ত্তা বর্ণিত হচ্ছেঃ **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقْسِمُ الْجِنْمَوْنَ مَالِيْلَوْا غَيْرَ سَاعَةٍ** তখনকার তয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম থাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দ ও ভোগ-বিলাসের ঘণ্টে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বত্ত্বাবত্তই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযথের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযথে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে। আমরা বরযথে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হায়ির। তাদের একপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয় বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের হতাহ এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফিররা যদিও কবরে তথা বরযথেও আঘাত ভোগ করবে; কিন্তু কিয়ামতের আঘাতের তুলনায় সেই আঘাত আঘাত নয়—সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম থাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহ'র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি ? আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফিররা কপম থেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অস্তৰ করে এক মুহূর্তের বেশি ধারিনি । অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে : **وَاللّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ** — অর্থাৎ তারা কসম থেয়ে বলবে, আমরা মুশরিক ছিলাম না । কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাবুল আলায়ানের আদালত কার্য হবে । তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন । তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোন বিবৃতি দিতে পারবে । কেননা, রাবুল আলায়ানের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্থীকারোক্তি করা না করার মুখ্যপেক্ষী নন । মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাকিত করে দেয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ নেওয়া হবে । এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে । এরপর আর কোন প্রমাণ আবশ্যিক হবে না । **أَلَيْرُونَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنَكْلِمُنَا الْعَ** আয়াতের অর্থ তা-ই । কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাটে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং অত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে । এক অবস্থানস্থলে আল্লাহ'র অনুমতি ব্যক্তিত কারণ কথা বলার অধিকার থাকবে না । যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্জন কথা বলতে পারবে—মিথ্যা বলার সামগ্র্য থাকবে না । যেমন ইরশাদ হয়েছে : **لَا يَنَّكِمُونَ إِلَّا مَنْ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ قَالَ صَرَبَ**

করে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না । এর বিপরীতে সহীই হাদীসে বর্ণিত আছে যে, করবে যখন কাফিরকে জিজেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ (সা) কে ? জখন সে বলবে **مَا هَذَا بِأَرْبَى** অর্থাৎ হায়, হায়, আমি কিছু জানি না । সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা আছলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন হিল না । এটা আচর্যের বিষয় রটে যে, কাফিররা আল্লাহ'র সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না । কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আচর্যের বিষয় নয় । কারণ, ফেরেশতা অদ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না । তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফির ও পাপাচারীই করবের আয়াব থেকে নিহতি পেয়ে যাবে । কিন্তু আল্লাহ' কন্দয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ নিয়ে মিথ্যা কাঁস করে দেয়ার শক্তিও তিনি রাখেন । কাজেই হাশরে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনরূপ জটি সৃষ্টি করবে না ।

১৩১



ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.almodina.com